

বনফুল

রচনাবলী ১৯

বনফুল রচনাবলী

ঊনবিংশ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৪
সম্পাদনায় :

সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীদীপককুমার ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

সূচীপত্র

বহুবর্ণ :

স্মৃতি-কথা

রবীন্দ্র-স্মৃতি

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীমান ভুদেব চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

ভাই ভুদেব,

তোমার আগ্রহ না থাকলে এ স্মৃতি-কথা আমি লিখতাম না। তাই তোমার নামের সঙ্গে এই বইটিকে যুক্ত করলাম। আমাদের আন্তরিক আদান-প্রদানের ইতিহাসও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল।

ভাগলপুর
৪।১০।৬৬

শুভার্থী
বলাইদা

[এই পুস্তকে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের চিঠির কয়েকখানির প্রতিলিপি দেওয়া হইল। জীর্ণতা হেতু বাকিগুলির ব্লক করা সম্ভব হয় নাই।]

রবীন্দ্র-স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এবিষয়ে বরাবরই আমার একটু সংকোচ ছিল। তাই এড়িয়ে গিয়েছিলাম। সংকোচের প্রথম কারণ ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়ত আমি এ ধরনের প্রবন্ধে যে সব নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করতে বাধ্য হব তার কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারব না। কেউ যদি বলেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ, তাহলে চুপ ক'রে থাকতে হবে। তৃতীয়ত, এরকম স্মৃতি-চিত্রে আমাকে-লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত না করলে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে ঠিক কি ছিল তা বোঝানো যাবে না। সে চিঠিগুলিতে আমার এত প্রশংসা করেছেন তিনি যে, সেগুলি তুলে দিলে অনেকে মনে করবেন আমি হয়তো বুড়ো বয়সে আত্ম-বিজ্ঞাপনে রত হয়েছি।

এই সব কারণে রবীন্দ্রস্মৃতি সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম। কিন্তু সকলের আগ্রহাতিশয্যে সে নীরবতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হলাম। বাল্যকাল থেকেই আমি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় ভক্ত। ভক্তির মাত্রা এত বেশী ছিল যে তাঁকে দেবতা ব'লে মনে করতাম। তাঁর দেবত্বে কোনরকম কলঙ্ক সহ্য করা অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে। বাল্যকাল থেকে আমি একটা অত্যন্ত বিশুদ্ধ নৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। ফলে আমার মনের নেপথ্যে নীতির যে মানদণ্ডটি গ'ড়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত কড়া এবং তীক্ষ্ণ। তাই দিয়েই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি সবাইকে মাপতাম। একটু বড় হয়ে সেই মাপকাঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যখন মাপতে গেলাম তখন দেখলাম তাঁরও মনুষ্যোচিত অনেক দুর্বলতা আছে। তিনি তোষামোদপটু একদল পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকেন এবং তাদের ইঙ্গিতে চলেন, নানারকম অশোভন হুজুগে মাততেও তাঁর আপত্তি নেই। এমন কি তাঁর শেষ বয়সে লেখা প্রেমের কবিতাগুলি পড়ে অবাক হয়ে ভাবতাম—যে বয়সে আমাদের বানপ্রস্থে যাওয়া উচিত সেই বয়সে উনি এরকম প্রেমের কবিতা লিখেছেন! কবিতাগুলি অপরূপ, কিন্তু এ বয়সে ও ধরনের কবিতা লেখা কি শোভন? তারপর দেখলাম, উনি নানা অক্ষম লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন এবং সেগুলি সর্বত্র ছাপা হচ্ছে। দেবতার গায়ে এইসব কলঙ্ক দেখে আমি যেন ক্ষেপে গেলাম। এরই ফলে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলাম শনিবারের চিঠিতে। সময়টা বোধ হয় ১৯৩৭-৩৮ : এর পর আর একটা ঘটনা ঘটল। জনৈক রামচন্দ্র ঝা কালীঘাটে এসে পাঁঠা বলির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাহবা দিয়ে এক কবিতাও লিখলেন প্রবাসীতে। এ দেখে আরও ক্ষুব্ধ হলাম আমি। দোলসংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন ক'রে এক চিঠি লিখলাম কবিতায়। কবিতাটি আমার ঠিক মনে নেই, আমার কোনও সংকলনেও ওটিকে স্থান দিইনি। তবে কবিতাটির ভাবার্থ এই : আপনি অসহায় অজশিশুর প্রতি যে করুণা প্রকাশ করেছেন তা আপনার মহত্ত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু শুনেছি আপনি শুধু কবি নন, বিজ্ঞানীও। তাই আপনাকে প্রশ্ন করছি ছাগ-শিশুর প্রতি এ পক্ষপাতিত্ব কেন? যে সব ফুল গাছ থেকে কেটে এনে আপনার ফুলদানীতে সাজানো হয় বা মালা গাঁথা হয় তারা কি জীবন্ত নয়? আপনি

যে গরদ-তসরের জামা-কাপড় পরেন তা যে কত লক্ষ কীটকে নৃশংসভাবে মেরে তৈরী হয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই, আপনার প্রেয়সীর চরণ অলক্তকে রাঙাবার জন্য যে কত কোটি কীট প্রাণ দেয়—এও আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু এদের হত্যা-নিবারণ-কল্পে আপনি কখনও কিছু লেখেন নি তো। ছাগ-শিশুর প্রতি এ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি জানবার জন্য উৎসুক রইলাম।

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছু পরে কলকাতায় একদিন আমার এক প্রাক্তন কলেজী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বলল, তুমি আনন্দবাজারে যে কবিতাটি লিখেছ তা প'ড়ে গুরুদেব খুব খুশী হয়েছেন। জিগ্যেস করছিলেন—'বনফুল' লোকটি কে, কোথায় থাকে। আমার কাছে কখনও আসেনি তো! তুমি যেও তাঁর কাছে। খুব খুশী হবেন।

আমি বললাম, ভাই, অতবড় লোকের দরবারে যেতে ভয় করে। তাছাড়া, আমি ডাক্তার এবং ব্রাহ্মণ, 'কল' না পেলে কোথাও যাই না। অতবড় লোকের কাছে অনিমন্ত্রিত যাওয়ার সাহসও নেই। দারোয়ান হয়তো ঢুকতেই দেবে না।

আমি আশা করিনি যে সে এসব কথা রবীন্দ্রনাথের কর্ণগোচর করবে। কিছুদিন পরে অবাক হয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিটি হারিয়ে ফেলেছি। তার মর্ম কিন্তু মর্মে গাঁথা আছে।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম, ত্রুটি মার্জনা কোরো। আগামী অমুক তারিখে এখানে বসন্তোৎসব হবে। তুমি সপরিবারে এলে খুশি হব। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হবে না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম এ চিঠি পেয়ে।

এরপর যেতেই হ'ল। সপরিবারেই গেলাম। আমাদের ঘরে তখন গাই ছিল। ঘরের দুধ থেকে খানিকটা সন্দেশ তৈরি ক'রে নিলেন গৃহিণী। আমার প্রথম সন্তান কেয়ার বয়স তখন সাত বছর হবে, বড় ছেলে অসীমের বয়স বোধ হয় চার বছর, আর ছোট ছেলে চিরন্তন এক বছরের শিশু, বড় জোর দেড় বছর, হামাগুড়ি দিচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে আমরা গিয়ে হাজির হলাম শান্তিনিকেতনে। গিয়ে উঠলাম আমার তৃতীয় ভ্রাতার শাশুড়ীর বাসায় গুরু-পল্লীতে। তিনি তখন তাঁর ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওখানেই থাকতেন। সোনাদি নামে প্রখ্যাত ছিলেন তিনি। সকালবেলা কবি-সন্দর্শনে গেলাম। তিনি তখন বাইরে মাঠে একটা ঘরের ছায়ায় ব'সে চা খাচ্ছিলেন। চায়ের টেবিলে আরও দুএকজন ছিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহনবাবু; তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রণাম করতেই বললেন, "বস, বস। ভারী খুশী হয়েছি।"

আমার হাতে সন্দেশের কৌটোটা দেখিয়ে বললেন, "ওটা কি?"

বললাম, "সন্দেশ এনেছি আপনার জন্যে!"

কৌটোটা খুলে রাখলাম তাঁর সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিলেন। দু'-একবার মুখ নেড়েই বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

বললেন, "এ সন্দেশ তুমি ভাগলপুরে পেলে কি করে?"

গৃহিণীকে দেখিয়ে বললাম, "ইনি করেছেন। আমাদের গাই আছে, তারই দুধ থেকে করেছেন।"

ক্ষিতিমোহনবাবুর দিকে চেয়ে কবি গম্ভীরভাবে বললেন, "এতো বড় চিন্তার কারণ হল।"

"কেন ?"

"বাংলাদেশে তো দুটি মাত্র রস-স্রষ্টা আছে। প্রথম দ্বারিক, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-যে তৃতীয় লোকের আবির্ভাব হল দেখছি।"

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখ মুখ।

এমন সময় আমার মেয়ে কেয়া একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল তাঁকে—

"আপনার গলায় ফুলের মালা নেই তো! আমাদের বাড়িতে আপনার যে ফটো আছে সেটাতে ফুলের মালা আছে কিন্তু।"

হেসে উত্তর দিলেন, "আজকাল আর আমাকে মালা কেউ দেয় না। কি করব বল ?"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললেন, "কোথায় উঠেছ ?"

"গুরু-পল্লীতে আমার এক আত্মীয়া আছেন, সেখানেই উঠেছি।"

"আমার এখানে ওঠা উচিত ছিল। যাই হোক, বিকেলে কিন্তু চা খাবে। তোমার লেখা প'ড়ে মনে হয় তুমি ঝাল খেতে ভালোবাস। বিকেলে বড় বড় কাবলে মটরের ঘুগনি করলে কেমন হয়? ঘুগনির মাঝখানে একটা লাল লঙ্কা গোঁজা থাকবে। কি বল ?"

"বেশ তো।"

সুধাকান্তদা রবীন্দ্রনাথের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ভুরু কুঁচকে চোখ মুখের কি একটা ইঙ্গিত করছিলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "বলডুইন (Baldwin), বলাইকে ভালো ক'রে ঘুগনি খাওয়াও আজ। লাল লঙ্কা যেন থাকে।"

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী তখন রবীন্দ্রনাথের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। মাথায় প্রকাণ্ড টাক ব'লে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদর ক'রে 'বলডুইন' আখ্যা দিয়েছিলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, "তোমার নাম 'বনফুল' কে দিয়েছিল? তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'বিছুটি'। যা দু'এক ঘা দিয়েছ তার জ্বলুনি এখনও কমেনি।"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। রবীন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, "আমি তো এখন লিখতে বসব। তোমরা এগারোটা নাগাদ 'উত্তরায়ণে' এসো"।

জিজ্ঞাসা করলাম, "বসন্তোৎসব কখন হবে ?"

"সে তো দু'দিন পরে হবে।"

"কিন্তু আপনি আমাকে তো আজ আসতে বলেছিলেন !"

"তাই না কি? তারিখটা লিখতে হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা, আজও তোমাদের কিছু দেখিয়ে দেব। স্টেজ বাঁধা হয়েছে।"

এগারোটা নাগাদ উত্তরায়ণে গেলাম।

দেখলাম রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে তখনও লিখছেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "বস তোমরা। আমার এখুনি হয়ে যাবে।"

বসলাম। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম নানা রকম দামী আসবাবে ঘর সাজানো।

বললাম, "অত ঝুঁকে লিখতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? আজকাল তো নানারকম চেয়ার বেরিয়েছে, ঠেস দিয়ে বসে আরাম ক'রে লেখা যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—

"সব রকম চেয়ারই আমার আছে। কিন্তু ঝুঁকে না লিখলে লেখা বেরোয় না। কুঁজোর জল কমে গেছে তো, তাই উপুড় করতে হয়।"

লেখা শেষ করলেন। কথাবার্তা শুরু হল।

"শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখলে নাকি?"

"না, এখনও দেখা হয়নি।"

"এর আগে আসনি কখনও?"

"না।"

আমি একটু অসুবিধায় পড়েছিলাম। রুন্তুকে আমি কোলে ক'রে বসেছিলাম। সে কিন্তু কোলে থাকতে চাইছিল না, নামতে চাইছিল। দুরন্ত দামাল ছেলে, আমার ভয় হচ্ছিল এখনই হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে হয়তো কোন দামী আসবাবে হাত দেবে, কোনও ফুলদানী হয়তো ভেঙে ফেলবে। তাকে কোলের উপর চেপে ধরে বসেছিলাম।

লেখা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওকে ধরে রেখেছ কেন, ছেড়ে দাও না।"

"ঘরের চারদিকে এত দামী জিনিস ছড়ানো রয়েছে, ওকে ছেড়ে দিলে এখুনি গিয়ে ধরবে, ভেঙেও ফেলতে পারে।"

"ফেলুক। ও সব শিশু-স্পর্শ-বঞ্চিত হতভাগ্য জিনিস। ওর হাতে কোনটা ভেঙে গেলে তার মুক্তি হবে। ছেড়ে দাও ওকে"—

রুন্তুকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র সে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোণের একটা বড় নীল রঙের 'ভাস্' (ফুলদানী) ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাস্‌টা খুব বড় এবং উঁচু। রুন্তু সেটা ধরতেই পড়ে গেল সেটা। আমি হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলুম।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "ওটা কাগজের, ভাঙবে না। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। এ ঘরের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর কোন জিনিসই ওর নাগালের মধ্যে নেই। ওকে বেপরোয়া ছুটে বেড়াতে দাও—"

রুন্তু (চিরন্তন) বেপরোয়া হামাগুড়ি দিতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে চেয়ে বললেন, "ভাগলপুরেই সর্বপ্রথম এক বড় সাহিত্য-সভায় আমাকে কবি ব'লে স্বীকার করেছিল। ভাগলপুরেই আগে সাহিত্য এবং গান-বাজনার খুব চর্চা ছিল। এখন কি আছে?"

"এখন তার তত নেই।"

"ভাগলপুরেই কি তোমার বাড়ি?"

"না। আমি প্র্যাকটিস করবার জন্যে ওখানে গেছি। আমার আসল বাড়ি বাংলাদেশে হুগলী জেলায়। আমার বাবাও ডাক্তার, তিনি পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী গ্রামে প্র্যাকটিস করতে বসেছিলেন। সেইখানেই আমার জন্ম হয়, সেইখানেই আমাদের বাড়ি।"

"প্র্যাকটিস করতে করতে লেখার সময় পাও কি করে ?"

"আমি general practice করি না, আমার একটা ল্যাবরেটরি আছে, ক্লিনিকাল পরীক্ষা করি। তারই ফাঁকে ফাঁকে লিখি।"

"বই বেরিয়েছে ?"

"বেরিয়েছে দু'এক খানা। আপনার কাছে ভয়ে পাঠাতে পারিনি। এবার গিয়ে পাঠাব ?"

"পাঠিও।"

মনে হল তাঁর চোখে শঙ্কা ঘনিয়ে এল। ভাবলেন বোধহয়—ওরে বাবা, একজন সার্টিফিকেটের উমেদার হাজির হ'ল বুঝি।

"প্রশংসাপত্রের লোভে পাঠাব না কিন্তু। আপনি সময় ক'রে প'ড়ে আপনার সত্যিকার অভিমত যদি জানান, তাহলে অবশ্য কৃতার্থ হব। গালও যদি দেন, আপত্তি করব না।"

মুচকে হেসে বললেন, "বেশ।"

তারপর টেবিল থেকে তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বইখানা তুলে নিয়ে তাতে লিখতে লিখতে বললেন, "এবার তোমাকে দিচ্ছি না। প্রথমে ওঁকে দিচ্ছি। তোমার নাম কি ?"

গৃহিণী তখন সপ্তম স্বর্গে। মাথা উঁচু করে বললেন, "লীলা, লীলাবতী।"

নাম লিখে বইখানা আমার গৃহিণীর হাতে দিয়ে আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হাসলেন একটু।

চুপ ক'রে রইলাম।

একটু পরেই দেখলাম রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য নীলমণি দ্বারপ্রান্তে উঁকি দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওই আমার সমন এসে গেল। এবার উঠতে হবে।"

আমি ব্যাপারটা যে বুঝতে পারিনি তা আমার চোখের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছিল বোধহয়।

পরিষ্কার ক'রে বললেন, "আমার খাবার দেওয়া হয়েছে। নীলমণি বড় কড়া গার্জেন। এক মিনিট এদিক ওদিক হবার জো নেই।"

আমরা উঠে পড়লাম।

উনি নীলমণির সঙ্গে চ'লে গেলেন। দেখলাম, বেশ কুঁজো হয়ে হাঁটছেন।

বিকেলে রঙ্গমঞ্চে সত্যিই নৃত্যানুষ্ঠান হল আমাদের জন্য। খুব ভালো লাগল। নাচের সঙ্গে গানও ছিল অবশ্য। মোহর (কণিকা) অনেক গান শোনাল। একটি সুন্দরী মেয়ের নাচ (যতদূর মনে পড়ছে মেয়েটি অবাঙালী, নাম জিগাসিয়া) খুব ভালো লেগেছিল আমার। নাচ শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন লাগল ?"

"চমৎকার। বিশেষ ক'রে মাঝখানে যে মেয়েটি নাচছিল তার নাচ খুব ভালো লেগেছে।"

"নাচের তুমি কিছু বোঝ ?"

"না।"

"তাহলে মাঝখানের মেয়েটি যে বেশী ভালো নাচছিল তা কি করে বুঝলে ?"

অকপটে বললাম, "মেয়েটি দেখতে যে ভালো—"

একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল চোখেমুখে। কিছু বললেন না।

একটা প্রশ্ন অনেক দিন থেকেই কাঁটার মতো মনের মধ্যে বিঁধে ছিল, এবার প্রকাশ করলাম।

বললাম, "আপনি যে মেয়েদের এত নাচ গান শেখাচ্ছেন এতে কি ভালো ফল হবে শেষ পর্যন্ত? তাছাড়া মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা তো দু'দিন পরেই বিয়ে করবে, তখন তারা নাচবার সুযোগ পাবে কি?"

রবীন্দ্রনাথের চোখের দৃষ্টিতে এককণা আলো চকচক ক'রে উঠল। বললেন, "আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পরে মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলেরা আর উপার্জন করতে পারবে না। তখন এই মেয়েরাই নেচে গেয়ে তাদের খাওয়াবে। তাই এ বিদ্যেটা ওদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এতে ওদের সহজাত একটা নিপুণতাও আছে।"

চুপ ক'রে রইলাম। মনে মনে তখন তাঁর কথায় সায় দিতে পারিনি। কিন্তু এখন দেখছি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা ফলেছে।

"বিকেলে তোমরা 'উত্তরায়ণে' এসো। ওখানে সুধাকান্ত তোমাদের জন্যে কিছু খাওয়ার আয়োজন করেছে।"

এই বলে তিনি উঠে গেলেন।

একটু পরেই সুধাকান্তদা'র সঙ্গে দেখা হ'ল।

তিনি বললেন, "তুমি আজ আমাকে মেরে ফেলেছ।"

"কি রকম?"

"কাবুলী মটর কাছে-পিঠে পাওয়া যায় না জানতুম। আমাকে মোটর নিয়ে সিংহবাবুদের ওখানে যেতে হয়েছিল। তোমাকে তখন চোখের ইশারা করলাম। তুমি যদি বলে দিতে—আমি খাব না, তাহলে আমার এ দুর্ভোগ হত না।"

বললাম, "অত কষ্ট করতে গেলে কেন? না হয় ওটা বাদই যেত।"

"ওরে বাবা, খাবার টেবিলে ঘুগনি হাজির করতে না পারলে আমার আজ শির যেত।"

উত্তরায়ণে গিয়ে দেখি একটা বারান্দাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে, সেইখানেই আমাদের খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। আমাদের পাঁচজনের জন্য পাঁচটি টেবিল, তাতে থরে থরে নানারকম খাবার সাজানো। লাল লংকা-সমন্বিত ঘুগনিও রয়েছে একটি টেবিলে। টেবিলগুলো অদ্ভুত। প্রত্যেক টেবিলে তিনটি কি চারটি থাক (ঠিক মনে নেই), তার প্রত্যেক থাকেই খাদ্য এবং পানীয়। উপরের থাকের খাবার খাওয়া হয়ে গেলে হাত দিয়ে একটু ঠেললেই সেটা সরে যাবে, বেরিয়ে পড়বে খাবারসুদ্ধ দ্বিতীয় থালাটা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে একটা উঁচু চৌকিতে বসেছিলেন। তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছিল, বারান্দায় ঢাকা থাকা সত্ত্বেও গরম হচ্ছিল একটু। পাখা অবশ্য ঘুরছিল।

রবীন্দ্রনাথ হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর বললেন, "অস্তাচল-চূড়াবলম্বী রবি।"

ঘুগনি ছাড়া আরও নানারকমের প্রচুর খাবার ছিল। সবই খেলাম। আমার ছোট ছেলে রন্তুর জন্যও একটা টেবিল ছিল। সে টেবিলে ঠিক নাগাল পাচ্ছিল না।

তাকে আলাদা করে একটা প্লেটে মিষ্টান্ন দেওয়া হ'ল। তার জল ফুরিয়ে গিয়েছিল।

সে হঠাৎ বলে উঠল—'দল'। আমাদের প্রত্যেকেরই পিছনে একজন করে চাকর দাঁড়িয়ে ছিল। রন্তুর পিছনে যার দাঁড়িয়ে থাকবার কথা সে বোধহয় বাইরে গিয়েছিল একটু। আমি রন্তুকে আমার গ্লাস থেকে জল ঢেলে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মুখে কে যেন আবীর মাখিয়ে দিলে। টকটকে লাল হয়ে উঠল সারা মুখটা। চোখের দৃষ্টি থেকে ঠিকরে পড়ল অগ্নি-কণা। বললেন, "এরা সব গেল কোথা—"

চাকরটা বাইরে থেকে ছুটে এল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলে আর এক গ্লাস জল।

আমি বললাম, "আর জল দরকার নাই। আমি ওকে দিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ওকে চাইতে হ'ল কেন?"

নির্বাক হয়ে রইলাম সকলে। তারপর রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ক'দিন আছ?"

"আজই চলে যাব।"

"আজই? এতো তাড়া কেন? ও, তুমি যে ডাক্তার সে কথা ভুলেই গেছি।"

আমরা সকলে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে এলাম। ভাগলপুরে যখন ফিরলাম, তখন মনে হ'ল একটা পরম সম্পদ লাভ করেছি। এমন পরম প্রাপ্তি আমার জীবনে আর ঘটেনি। কয়েকদিন পর্যন্ত মনে হতে লাগল একটা অপরূপ ছন্দ যেন আমার মনে অহরহ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

এর পরের বার যখন শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম তখন সকালবেলা। রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী'তে ছিলেন। দেখলাম তাঁর চিঠিপত্র এসেছে ডাকে। প্রকাণ্ড একটা থলি বোঝাই। আমাকে দেখে বললেন, "বস। এগুলো দেখে নিই।"

তারপর হঠাৎ একটা বড় প্যাকেট আমার হাতে দিলেন। দেখলাম সেটা Registered with acknowledgement due. না খুলেই আমাকে দিলেন। কি করব বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ এটা আমাকে দিলেন কেন? আমার বিব্রত ভাবটা দেখে একটু হেসে বললেন, "ওটা তুমি ভাগলপুরে নিয়ে যাও, পড়ে দেখো। তোমার গল্প লেখার কিছু খোরাক হয়তো পাবে।"

"আপনি খুলে দেখবেন না?"

"না খুলেই বুঝতে পারছি কি আছে ওর মধ্যে। রোজ একটা করে আসে। লোকটির অধ্যবসায় আছে।"

পরে খুলে দেখেছিলাম সেটা। বিরাট ব্যাপার।

জনৈক ভদ্রলোক ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখন আমাদের কি কি করা উচিত তারই এক সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অতি বিশদ এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করেছিলেন, এইটুকুই শুধু মনে আছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বোধহয় পাগল।

টেবিলের উপর একটি মাসিকপত্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ ডাক দেখছিলেন, আমি সেটা ওলটাচ্ছিলাম। দেখলাম, একজন লেখককে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন সেটা তাতে ছাপা হয়েছে।

ডাক দেখা শেষ ক'রে কবি আমার দিকে চাইলেন।

"কি পড়ছ ওটা?"

"আপনার প্রশংসাপত্র। সত্যিই কি এই লেখকের লেখা আপনার খুব ভালো লেগেছে ?"

হাসলেন একটু।

"না, খুব ভালো লাগেনি। তবে লেখার ক্ষমতা আছে ওর।"

"তাহলে এতো ভালো সার্টিফিকেট দিলেন যে ?"

"ওরকম দিতে হয়। আমি প্রার্থীকে পারতপক্ষে নিরাশ করি না। সাহিত্যের বিচারক মহাকাল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা বা নিন্দার কি কোনও মূল্য আছে ?"

চুপ ক'রে রইলাম।

একটু পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার নতুন গল্পের বইটা এসেছে। এখনও পড়া হয়নি। প'ড়ে যা মনে হয় পরে জানাব।"

বললাম, "যদি দোষ কিছু চোখে পড়ে দেখিয়ে দেবেন। তাতে আমার উপকার হবে।"

"প্রশংসা একটুও করব না ?"

তাঁর চোখে হাসি চিক্‌মিক্‌ করতে লাগল।

"যা খুশী করবেন।"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "আপনার কাছে দু'-একটা উপদেশ নিতে চাই। দেবেন ?"

"আমি উপদেশ বড় একটা দিই না। ও জিনিস লোকে নেয় কিন্তু পালন করে না। কিসের উপদেশ ?"

"লেখা সম্বন্ধে।"

চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, "তুমি যখন লিখবে তখন মনে রেখো তুমি যা লিখছ তা জগতের শ্রেষ্ঠ রসিকশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা পড়বেন। তাঁদের জন্যই লিখবে। বাজে লোকের সস্তা চাহিদা মেটাবার জন্যে যারা লেখে তারা কবি নয়, ব্যবসায়ী।"

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "বঙ্কিমচন্দ্র লেখকদের যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা পড়েছ তো ?"

"পড়েছি—"

"ওইটেই সবচেয়ে ভালো উপদেশ। কিন্তু ওর সবগুলো আজকাল পালন করা শক্ত। আজকাল সম্পাদকদের তাড়া এত বেশী যে লেখা লিখে ফেলে রাখবার উপায় নেই। কালি শুকুতে না শুকুতে ওরা নিয়ে যাবে। সুবিধা হয়, কাছেপিঠে যদি কোন সমঝদার শ্রোতা বা শ্রোত্রী পাওয়া যায়, আর তার যদি নির্ভয়ে সমালোচনা করবার তাগদ থাকে। তোমার কাছাকাছি এরকম লোক আছে কেউ ?"

"আছে দু-একজন। আমার গিন্নীই আমার লেখার প্রথম পাঠিকা ও সমালোচক। মাঝে মাঝে সজনীও আসে—"

"তাহলে তো ভালো লোক পেয়েছ। কোন্ সময় লেখ ?"

"সকাল বেলায়।"

"রোজই এক সময়ে লিখতে বসবে। আর রোজই বসা চাই। লেখা মনে না এলেও

টেবিলে গিয়ে বসবে। ক্রমশঃ দেখবে সেই সময়টাতেই লেখা মনে জোগাবে। একটা বিশেষ সময়ে রোজ খেলে যেমন সেই সময় খিদে পায়, একটা বিশেষ সময়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে পূজায় বসলে মনে যেমন ভক্তি জাগে—একটা বিশেষ সময় রোজ লিখতে বসলেও তেমনি মনে লেখা জোগায়। রোজ একটা নির্দিষ্ট সময় করে লিখতে বসবে। কতক্ষণ লেখ রোজ ?"

"সব দিন সমান হয় না। দু-তিন ঘণ্টার বেশি পারি না।"

"ওই যথেষ্ট। পড়ো তো ?"

"কি বই পড় ?"

"ক্ল্যাসিকাল উপন্যাসই বেশী পড়ি। ইতিহাস বিজ্ঞানও পড়ি কিছু কিছু—"

"ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন এই সবই বেশী করে পড়া চাই। উপন্যাস না পড়লেও চলবে। জমিতে যেমন সার দিতে হয়, মনেও তেমনি সার দিতে হয়। তা না দিলে ভালো ফসল ফলে না। আচ্ছা, এবার আমি লিখতে চললুম। তুমি আর কারও সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। শান্তিনিকেতনটা ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখ না ? আগে দেখেছ ভালো করে ?"

"না—"

"তাহলে তাই দেখ গিয়ে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তোমার মতামত পরে শোনা যাবে।"

বেরিয়েই আমি একজন সঙ্গিনী পেয়ে গেলাম। আমার ভাইয়ের শালী অনু আমার খোঁজে আসছিল। তাকেই বললাম, "শান্তিনিকেতনে যা যা দেখবার আছে, আমাকে দেখিয়ে দাও।"

অনেকক্ষণ ঘুরলাম দু-জনে। প্রায় দু-আড়াই ঘণ্টা।

অনু বাড়ি চলে গেল। আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম তিনি আরাম-কেদারায় বসে কি একটা পড়ছেন।

"কে, বলাই না কি, এসো।"

বসলাম গিয়ে একটা চেয়ারে। এখন একটা কথা মনে হচ্ছে, তখন হয়নি। অতবড় একজন বিরাট লোকের সামনে বসেছিলাম, কিন্তু কিছুমাত্র সংকোচ হয়নি। মনে হয়েছিল যেন একজন অতি পরিচিত নিকট আত্মীয়ের কাছে বসে আছি। সে আত্মীয় এত নিকট যে, তার কাছে মনের যে-কোন কথা অসংকোচে বলা যায়।

"শান্তিনিকেতন দেখা হ'ল ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন দেখলে ?"

"ভালোই।"

আমার দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত হাসিমুখে। তারপর বললেন, "মনে হচ্ছে প্রাণ খুলে ভালো বলছ না।"

আমিও হাসলাম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আর কিছু করে না থাকতে পারি, কতকগুলো পাকা বাড়ি তো করিয়েছি। আগে ফাঁকা মাঠ ছিল একটা—"

"সে তো নিশ্চয়ই। এরকম বিদ্যালয় তো ভারতবর্ষের কোথাও নেই। তবে—"

চুপ করে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে।

"আমার যা মনে হচ্ছে তা বললে আপনি রাগ করবেন না তো?"

"না বললেই রাগ করব।"

একটু ইতস্তত করে শেষকালে বলে ফেললাম।

"আমার মনে হচ্ছে এটাকে যদি পুরোপুরি মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় করে দেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। ছেলেদের এখানে না রাখাই ভালো। আমার মনে হয় এখানে ছেলেদের লেখাপড়া হওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথের সামনে আমার এরকম স্পর্ধা কি করে হ'ল, বার বার 'আমার মনে হয়' 'আমার মনে হয়' উচ্চারণ করে কি করে ওকথা বলতে পারলাম তা ভেবে এখন আমি নিজেই বিস্মিত হই। সত্যিই Fools rush in where Angels fear to tread গোছের ব্যাপার করে ফেলেছিলাম সেদিন। ফেলতে পেরেছিলাম তার কারণ রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে, মুখের হাসিতে, তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে আমি এমন একটা কিছু দেখেছিলাম যা আমাকে নির্ভয় করেছিল, যা আমার আর তাঁর মধ্যে সমস্ত ব্যবধান দূর করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর সহজ সহৃদয় ব্যবহারে আমাকে প্রায় তাঁর সমকক্ষ করে নিয়েছিলেন সেদিন; যেন সংকোচের কোন অবসরই ছিল না, যেন অকপটে তাঁর সংগে আলাপ না করলেই অশোভন হবে এই রকম একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল সেদিন।

"ও, তোমার বুঝি এইসব মনে হয়েছে! এখানে ছেলেদের লেখাপড়া হওয়া শক্ত হবে কেন?"

"ছেলেরা যদি মেয়েদের সংগে ছাত্রজীবনে খুব বেশী মেলামেশা করে তাহলে সাধারণতঃ তাদের লেখাপড়ায় মনোযোগ বসে না। এতদিন তো আপনার স্কুল হয়েছে, খুব বেশী কৃতি ছেলে কি বেরিয়েছে এখান থেকে?"

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হাসলেন একটু।

"একেবারে যে বেরোয় নি তা নয়। কিন্তু তারা আমাকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে অন্যত্র চলে গেছে। এখানকার অনেক ভালো ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছি আমি। আমার আশা ছিল তারা এখানেই আবার ফিরে আসবে, কিন্তু তারা তা আসেনি। অনেকেই অন্যত্র ভালো চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। তারা যদি থাকত তাহলে তাদের সংগে আলাপ করলে বুঝতে পারতে এখানে লেখাপড়া তারা ভালোই শিখেছিল।"

"আমি একটা ভুল কথা বলে ফেলেছি। লেখাপড়া মানে আমি জ্ঞানার্জন বলতে চাইনি। এখানে জ্ঞানার্জন করার নানারকম সুযোগসুবিধা আছে তা কে অস্বীকার করবে। লেখাপড়া মানে আমি বলতে চেয়েছিলাম পাঠ্য বই পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা। এখানকার আবহাওয়া তার অনুকূল নয়। Co-education ছাড়া আর একটা কারণও এখানে আছে।"

"সেটা কি?"

"সেটা আপনি নিজে। আপনার বিরাট অস্তিত্ব এখানে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে তার কাছাকাছি থেকে পরীক্ষা-পাশের জন্য পড়া মুখস্থ করা শক্ত। এখানে আজ গান্ধীজী আসছেন, কাল জহরলাল, পরশু সিলভাঁ লেভি, আরও কত লোক।

পৃথিবীর যে-কোন বিদগ্ধ লোক একবার অন্তত এখানে আসবেনই। শুধু আসবেন না, এসে বক্তৃতাও দেবেন। এ-সব ছাড়া এখানে নানারকম উৎসব লেগেই আছে। আর লেগে আছে আপনার নাটকের রিহার্সাল। এগুলোর খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু এটাও ঠিক, এর ভিতর বসে পরীক্ষার পড়া করা শক্ত।"

"তুমি তাহলে পরীক্ষার পড়াটাকেই জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতে চাও?"

"না দিয়ে উপায় কি। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের বাঁচতে হলে পরীক্ষা পাশ করে ভালো একটা ডিগ্রি যোগাড় করতেই হবে। না করতে পারলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন বা শিল্প-সৌন্দর্য-চর্চা করলে তাদের চলবে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেদের পক্ষেই এ কথা সত্য। মেয়েদের নিছক জ্ঞানার্জন বা শিল্প-সৌন্দর্য-চর্চা চলতে পারে, কারণ তাদের এখনও পেটের অন্নের জন্যে চাকরির ক্ষেত্রে নামতে হয়নি। তাই বলছিলাম এটা মেয়েদের ইউনিভার্সিটি হলে ভালো হয়।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমিও ভয় পেয়ে গেলাম মনে মনে। ও'র সামনে এরকম বাচালতা যে কি করে করেছিলাম তাই ভেবে এখনও অবাক লাগে।

কয়েক মুহূর্ত পরে রবীন্দ্রনাথের মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "বেশ তো, তুমি যা বলছ তা হাতেকলমে করে দেখিয়ে দাও। বিশ্বভারতী তো ডেমক্র্যাটিক ইন্‌স্টিটিউশন। তুমি এখানে এসে তার সভ্য হও, আর তোমার মতে সবাইকে আনাতে চেষ্টা কর। তুমি যা বলছ তা যদি করতে পার তাহলে আমিও এখান থেকে চলে যাব, আমাকে যেখানে যেতে বলবে সেইখানে যাব। তোমার ভাগলপুরেও যেতে আমার আপত্তি নেই।"

এটা দুঃখ না ব্যঙ্গ কিসের অভিব্যক্তি তা বুঝতে পারলাম না। চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হ'ল।

ঠিক সেই সময় আর একটি ঘটনা ঘটাতে এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। আমি বাঁচলুম। একটি ছাত্র এসে দাঁড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ও, তুমি 'সাহিত্যিকা' থেকে এসেছ বুঝি বলাইকে নিমন্ত্রণ করতে?"—তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—"যাও না, ওদের সাহিত্যসভায় আজ। ওরা কি রকম লেখে শুনে এসো—"

বললাম, "নিশ্চয়ই যাব"।

ঠিক হ'ল সেই দিনই বিকেলে 'সাহিত্যিকা'য় যাব।

মনোরম পরিবেশে সভা আরম্ভ হ'ল। ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকটি লেখা শুনলাম। মনে হ'ল অত্যন্ত কাঁচা লেখা। অত্যন্ত মামুলি পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি আর চর্বিত-চর্বণ। নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য বা কল্পনা-কুশলতার কোনও প্রমাণ না পেয়ে দুঃখিত হলাম। এর চেয়ে বেশী পাব এই আশা করে এসেছিলাম। সভাপতির ভাষণে আমার হতাশার কথা ব্যক্তও করলাম। বললাম, "তোমরা রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে আছ। তোমাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করেছিলাম। ফাঁকি দিয়ে সাহিত্য-সাধনা করা যায় না। তার জন্যে নিষ্ঠা চাই, শ্রদ্ধা চাই, অধ্যয়ন চাই। কিন্তু তোমাদের লেখার মধ্যে এক গতানুগতিকতা ছাড়া আর তো কিছু পেলাম না।"

হঠাৎ নজরে পড়লো সামনের বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে সুধাকান্তদা মাথা এবং হাত-পা নেড়ে আমাকে কি যেন বলতে চাইছেন। কি বলছেন ঠিক বোঝা গেল না। সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার দেখা হল তাঁর সঙ্গে।

"আমাকে কিছু বলছিলেন না কি?"

"হ্যাঁ। গুরুদেব আমাকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন, ওদের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প শুনে বলাই হয়তো রেগে যাবে। ওকে বলে দিও যেন ছেলে-মেয়েদের বেশী না বকে। কিন্তু তুমি তো ওদের যাচ্ছেতাই করলে। আমি মাথা নেড়ে নেড়ে তোমাকে বারণ করছিলাম কিন্তু তুমি তো সেদিকে দৃকপাত পর্যন্ত করলে না।"

কি আর বলব, মুচকি হেসে চুপ করে রইলাম।

রবীন্দ্র-চরিত্রের আর একটা দিক আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ছে। সেই বারেরই ঘটনা না অন্যবারের, তা এখন ঠিক মনে নেই। কি একটা সভা হচ্ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় তাঁর 'বসন্ত' কবিতাটি পড়েছিলেন বই থেকে। আমিও ছিলাম। দেখলাম তিনি দুটো stanza বাদ দিয়ে পড়ে গেলেন। সভা শেষ হয়ে যাবার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন একটু?"

"না। কেন?"

"আপনি কবিতার দুটো stanza বাদ দিয়ে গেলেন কি না, তাই মনে হচ্ছিল…"

প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি।

"তুমি ধরতে পেরেছ?"

"ও কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে।"

"এখানে কেউ ধরতে পারে না। প্রায়ই আমি বাদ দি—"

বললাম—"বাইরে আপনাকে আমরা পেতে চেষ্টা করি আপনার লেখার ভেতর দিয়ে। এরা এখানে আপনাকে খুব কাছে পেয়েছে, তাই বোধহয় আপনার লেখা পড়ে না।"

এর কিছুদিন পরেই বোধহয় আমার 'কিছুক্ষণ' বইটা প্রকাশিত হয়েছিল। বইটা উৎসর্গ করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের নামে। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এক কপি পাঠিয়ে দিলাম, আর দুরু দুরু হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কোন জবাব আসে কি না। অবিলম্বেই জবাব এল।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

সাবাস্! তোমার 'কিছুক্ষণ' খুবই ভালো লাগল। উল্টে-পড়া রেলগাড়ি যে অসংলগ্ন জনতা বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে তার মধ্যে থেকে তুমি যথেষ্ট রস আদায় করে নিয়েছ। এর মধ্যে ঝাঁজ আছে কম নয়, সেটা যে কেবল স্বাদের পক্ষে ভালো তা না, পথ্যও বটে। সমস্ত বইখানার মধ্যে কেবল প্রথম প্যারাগ্রাফটার উপর আমি কালীর আঁচড় না চালিয়ে থাকতে পারি নি। আমার বেহোঁস অবস্থায় তুমি যে বইখানি পাঠিয়েছিলে সেটা আমার চৈতন্যলোকের নেপথ্যে মারা গেছে। ইতি—২৪।১।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপ্লাসে আক্রান্ত হয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে যান, ঠিক তার আগে আমি তাঁকে খুব সম্ভবত আমার একটি গল্পসংগ্রহ 'বনফুলের আরও গল্প' পাঠিয়েছিলাম। এ বইটি তিনি পাননি। পরে আবার পাঠিয়েছিলাম। সে খবর যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করব।

রবীন্দ্রনাথের অসুখের পর আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখি যে তাঁর কাছে যদি যাই তাঁর অসুবিধা হবে কি না, তিনি এখন কেমন আছেন। কোনরকম অসুবিধা হলে যাব না। উত্তর পেলাম।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

তুমি ডাক্তার। আমার আয়ুক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে আমার সম্পূর্ণ ছুটির দাবির নিশ্চয়ই সমর্থন করবে। তোমার দ্বৈরথ পেয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি—কিন্তু এখন সে সব কথা থাক, আমার মৌনব্রত শুরু হয়েছে। আশীর্বাদ জেনো। ইতি—২।৬।৩৮

শুভার্থী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' আমার হাতে এল। দেখলাম আমার 'ছাত্রী ও ছাত্র' শীর্ষক কবিতাটি তাতে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি আমার কোনও কবিতা সংগ্রহে নেই। চিঠি লিখলাম আবার রবীন্দ্রনাথকে। লিখলাম, আপনার সম্পাদনায় যদি 'বাংলা গল্প পরিচয়'ও প্রকাশিত হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। আমার 'দ্বৈরথ' এবং 'তৃণখণ্ড' সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন নি বলে একটু অভিমানও প্রকাশ করেছিলাম সম্ভবত। আবার কবে শান্তিনিকেতন যেতে পারি তা-ও জানতে চেয়েছিলাম। অবিলম্বে উত্তর পেলাম। চিঠির উত্তর দিতে কখনও তিনি অযথা বিলম্ব করতেন না।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

যখন খুশি এসো, খুশি হব। এক কাজ করো। আগামী মঙ্গলবার বর্ষামঙ্গল উৎসব, সেদিন এলে কিছু দেখবার শোনবার জিনিস পাবে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করলুম। তোমার নতুন বইখানি হাতে এসে পৌঁছয় নি। তোমার লেখার কি অভিমতের অপেক্ষা আছে? তারা তো স্বয়ং জ্যোতিষ্মান।

বাংলা গল্প পরিচয় বের করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এরকম বই বের করতে সাহস হয় না। মেস-এ রন্ধন ব্যবস্থার যারা অধ্যক্ষ, আর সংকলনের যারা সম্পাদক, লোকের মন পাওয়া তাদের কর্ম নয়। দেখা হলে পরামর্শ করা যাবে। ইতি—১৭।৭।৩৮

শুভার্থী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উত্তরায়ণে যেতেই অনিলদার সঙ্গে দেখা। অনিলদা মানে অনিল চন্দ। তিনি বললেন—আসুন আমার সঙ্গে। ভিতরে বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল হচ্ছে। ওই দেখুন। দেখলাম একটি হলের মতো বড় ঘরে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন এবং তাঁর সামনে অনেকগুলি মেয়ে নাচছে। অনিলদা আমাকে বাইরের একটি চেয়ারে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। আমি বারান্দা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে এবং নৃত্যপরা মেয়েদের দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হাত তুলে নাচ থামিয়ে দিলেন। তারপর একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোর পা তো ঠিক তালে তালে পড়ছে না।" তাকে একা নাচতে বললেন। তারপর দেখলাম

অনিলদা গিয়ে তাঁকে আমার আগমনবার্তা জানালেন। তিনি কি বললেন আমি শুনতে পেলাম না। অনিলদা বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন—"আপনি চলুন, একটু চা-টা খাবেন। রিহার্সাল এখনি শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনি 'শ্যামলী'তে গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবেন। এখনি উনি ফিরে যাবেন 'শ্যামলী'তে। আপনার থাকবার জায়গাও ঠিক পাশেই হয়েছে।" অনিলদার সঙ্গে গেলাম। চা খেতে খেতে তাঁরই সঙ্গে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। একটু পরেই অনিলদা উঠে পড়লেন—"যাই, গুরুদেবকে নিয়ে আসি।" আমি বললাম, "এখন উনি কেমন আছেন, এখন আমি আর দেখা করব না। কাল সকালে যা হয় হবে।" একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ এলেন, যতদূর মনে পড়ছে, বড় একটা মোটর গাড়ি করে। এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন। আমি বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আধঘণ্টা পরে অনিলদা এসে বলে গেলেন, গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন, যান। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরেই বসেছিলেন, গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন—"এবার একা এসেছ বুঝি ?"

"হ্যাঁ, ওরা সব কলকাতায়।"

তারপর একটু স-সঙ্কোচে বললাম, "আপনি এখন ক্লান্ত হ'য়ে আছেন নিশ্চয় রিহার্সালের পর। এখন—"

"না, না, আমি ক্লান্ত হই না কখনও। তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই বনমালী করেছে। সুবিধে হবে না এখানকার খাওয়া। শুনেছি তুমি খাইয়ে লোক। কাল দুপুরে বৌমার কাছে খেও। বস।"

বসলাম।

"গানের কিছু বোঝ ?"

"সে, বিশেষ কিছু নয়। প্রথম প্রথম ডাক্তারি পাশ করে সেতার শেখবার ঝোঁক হয়েছিল। একজন ওস্তাদের কাছে শিখেছিলাম কিছুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলুম না। ডাক্তারি আর সাহিত্য তো ছিলই, তার উপর সেতার আর সামলানো গেল না। তবে গান আমি খুব ভালোবাসি।"

তারপর একটু থেমে বললুম—"আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি যখন গান গাইতেন তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম। আপনার গান শোনবার সৌভাগ্য হয়নি। ইদানিং আপনার একটা রেকর্ড বেরিয়েছে 'তবু মনে রেখো'—সেইটে কিনে রেখেছি। মাঝে মাঝে বাজাই।"

"তুমি যে গানের কিছু কিছু বোঝ তার প্রমাণ তোমার 'দ্বৈরথ' বইয়ে আছে। আচ্ছা, 'দ্বৈরথ' বইয়ে যে সব চরিত্র এঁকেছ তাদের তুমি দেখেছ ?"

"খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। বাবা ওইসব জমিদারদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গেছি ওদের বাড়িতে।"

"চরিত্রগুলি খুবই জীবন্ত হয়েছে।"

এরপর বনমালী দ্বারপ্রান্তে এসে খবর দিলে—ডাক্তারবাবুর খাবার দেওয়া হয়েছে।

প্রণাম ক'রে উঠে পড়লুম।

খাওয়া বেশ ভালোই ছিল। কয়েক রকম নিরামিষ তরকারি আর রুটি। ভালো দুধও ছিল খানিকটা।

খেয়ে দেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়েছি, তখনও ঘুম আসেনি, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার ঘরে কে যেন ঢুকে ঘুর ঘুর করছে।

"কে—"

"আমি বনমালী। আপনি ঘুমিয়েছেন কি না বাবুমশায় জিগ্যেস করলেন।"

"না আমি ঘুমুইনি। কেন?"

"হয়তো কিছু বলবেন আপনাকে—"

তখনি মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম। রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একটা হাই পাওয়ারের বাল্‌ব জেলে বসে আছেন, দু'হাতে দুটো কাচের গ্লাস। একটাতে দুধ রয়েছে, আর একটাতে মনে হল সাবু। আমাকে দেখেই বললেন, "বস। আমি রাত্রের খাওয়াটা শেষ করে নি। আজকাল রাত্রে দুধসাবু ছাড়া আর কিছু খাই না।"

আমি ভাবলাম, নিশ্চয় দুধ-সাবু-খাওয়া দেখবার জন্যে ডাকেন নি, অন্য কোন কথা আছে নিশ্চয়। কি সেটা, সবিস্ময়ে বসে বসে ভাবছিলাম সেই কথা। রবীন্দ্রনাথ আস্তে আস্তে দুধের সঙ্গে সাবু একটু একটু ক'রে মিশিয়ে খাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ হলে রুমাল দিয়ে মুখ গোঁফ দাড়ি নিপুণভাবে মুছে আমার দিকে মৃদু হেসে চাইলেন। দেখলাম হাসির ঝিলিক চিকমিক করছে চোখের কোণে।

"আমার গান শুনবে? আমি এখনও গান গাইতে পারি, তবে আস্তে আস্তে, গুণ গুণ ক'রে গাই। বল তো শুনিয়ে দিতে পারি এখনই—"

আমি আর কি বলব। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম—"আপনার কষ্ট হবে না তো—"

"না। কোন গানটা গাইব বল।"

"আপনার যেটা খুশী। আমি আর কি বলব।"

রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমায় 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' এই গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। কি যে অপূর্ব মনে হয়েছিল তা লিখে বর্ণনা করা যাবে না। মনে হয়েছিল যেন একটি তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ ভ্রমর সুরের অদ্ভুত মায়া-লোক সৃজন ক'রে গেল। গান শেষ হ'তে দু'জনেই চুপ ক'রে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, "এতদিন আপনাকে দূরে থেকে পেয়েছিলুম। আজ খুব কাছে পেলুম।"

রবীন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, "দূরে থেকে পাওয়াই ভালো। খুব কাছে এলে সবটা পাওয়া যায় না। আমার কৈশোরে বঙ্কিমকে খুব কাছে পেয়েছিলাম। খুব গম্ভীর লোক ছিলেন তিনি, কাউকে বিশেষ আমোল দিতেন না। আমি কিন্তু তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলাম। যখন তখন চটি প'রে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে পড়তে আমার বাধা ছিল না। তখন কিন্তু বঙ্কিমকে ভালোভাবে পাইনি। দূরে থেকে এখন তাঁর বিরাট রূপ দেখতে পাচ্ছি, বিরাট পাহাড়ের মতন দাঁড়িয়ে আছেন।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বন্দেমাতরম্" গানটায় আমিই সুর দিয়ে, কংগ্রেসে গেয়েছিলাম। এখন কিন্তু মনে একটু সন্দেহ জেগেছে ওটা কি জাতীয় সঙ্গীত হবার উপযুক্ত? আমাদের দেশে মুসলমানের সংখ্যা কম নয়, তারা দেশকে 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' বলে সম্বোধন করবে কি করে?"

বললাম, "উনি 'বন্দেমাতরম্' গানকে তো জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে লেখেন নি। লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের জন্য। তারপর যখন আমাদের দেশে জাতীয়

জাগরণ হল—তখন যেসব ছেলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এল তাদের অধিকাংশই হিন্দু আর অধিকাংশই মূর্তি-পূজক। আর সম্ভবত 'আনন্দমঠ' বইটাই ছিল তাদের প্রেরণা। তাই তারা মহা উৎসাহে 'বন্দেমাতরম্' গান গেয়ে মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ও গানের দাম অনেক—"

"তাতো ঠিক। কিন্তু এখন ও গান চলবে কি ?"

"চলছে তো। ও গানের যা 'প্রেস্টিজ্' তা আর কোনও গানের নেই। চেষ্টা করলেও ও গানকে আর হটানো যাবে না।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হ্যাঁ, ও গান অমর। তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। এবার শুয়ে পড় গে যাও।"

···শুয়ে পড়বার খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার কে আমার মশারীর চারপাশে ঘুরছে।

"কে—"

"আমি বনমালী। মশারীটা ঠিক গোঁজা আছে কি না।"

"সব ঠিক আছে। তুমি আবার কষ্ট করে এলে কেন ?"

"বাবুমশায় বললেন যে, দেখে এসো আর একবার ভালো ক'রে।"

পরদিন সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। যখন উঠলাম তখন প্রায় আটটা। বিছানা থেকে নেমেই বনমালীর সঙ্গে দেখা। বনমালী হেসে নমস্কার করল।

"রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল তো ?"

"হ্যাঁ। প্রচুর ঘুমিয়েছি।"

"চা তৈরি করি ?"

"কর। গুরুদেবের চা খাওয়া হয়ে গেছে ?"

"কখন। ভোর চারটেয় ওঠেন তো।"

"কোথায় তিনি ?"

"ও-দিকের বারান্দায় ব'সে লিখছেন।"

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিলাম। পাশেই সব ব্যবস্থা ছিল। এসেই দেখি বনমালী চায়ের টেবিলে নানারকম খাবার সাজাচ্ছে। সিঙাড়া, কচুরি, কেক, বিস্কুট—আরও কত কি।

"এত সব আমি খেতে পারব না এখন—"

দু' একখানা বিস্কুট দিয়ে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিলাম।

বনমালী বললে, "দুপুরে আপনি বৌমার কাছে খাবেন। উনি জানতে চেয়েছেন কটার সময় আপনি খান।"

"বারোটার আগে নয়।"

তারপর গেলাম কবি-সন্দর্শনে। যদিও জানতাম এ সময় গেলে উনি বিরক্ত হবেন, এখন উনি লিখছেন, তবু লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাবলাম গিয়ে একটা প্রণাম ক'রে চ'লে আসব। গিয়ে যা দেখলাম তা না দেখলে রবীন্দ্র-চরিত্রের এ দিকটা বোধহয় আর কখনও দেখতে পেতাম না। দূরে থেকেই দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ জরির কাজ-করা গোলাপী রঙের মস্ত একটা পাগড়ির মতো টুপি প'রে নিবিষ্টমনে লিখে যাচ্ছেন। মনে হল এ ধরনের টুপি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ছবিতে যেন দেখেছিলাম। আর একটু

কাছে যেতেই রবীন্দ্রনাথ মুখ তুলে চাইলেন। আমার দৃষ্টি তখনও টুপির দিকে। হেসে বললেন, "টুপিটা দেখছ? বনমালী ওটা পরিয়ে দিয়ে গেল। ওর ইচ্ছে আমি ওইটে পরেই লিখি।"

"বনমালীর হঠাৎ এরকম ইচ্ছে হ'ল কেন?"

"ওর এরকম খেয়াল মাঝে মাঝে হয়। আজ এসে বললে, 'এই ভালো টুপিটা বাক্সে প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হচ্ছে। ওটা পরে লিখলে ক্ষতি কি।' বললাম, 'দাও—।' সেই থেকে পরেই আছি।"

তারপর চোখ দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বললেন—"বনমালীর বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস নেই।"

আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে বললাম, "আপনি লিখুন, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।"

"তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে তোমার দেখা-শোনা ঠিকমতো হচ্ছে না বোধহয়। এখানে বনমালীই ভরসা।"

"বনমালী যথেষ্ট করছে। কোন ত্রুটি তো দেখলাম না। এই সকালে গরম সিঙাড়া কচুরিও দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে।"

রবীন্দ্রনাথের মুখ দেখে মনে হল খবরটা শুনে তিনি খুব হৃষ্ট হয়েছেন।

"যাও, তাহলে বেড়িয়ে এসো। দুপুরে বউমার কাছে খাবে।"

আজকালকার 'বুফে' ডিনারের যুগে আমার সেদিনকার দুপুরের খাওয়ার ছবিটা স্বপ্নের স্মৃতির মতো মধুর এবং সুদূর হয়ে আছে। সেদিন স্নান করবার পর বনমালীর সঙ্গেই আমি উত্তরায়ণে গেলাম। বনমালীই আমাকে উত্তরায়ণের বাইরের একটা ঘরে বসিয়ে ভিতরে খবর দিয়ে এল। তারপর চলে গেল সে। একটু পরেই ভিতর থেকে আর একজন এসে খবর দিলে—খাবার দেওয়া হয়েছে। আসুন। তার পিছু পিছু গিয়ে স্বল্পান্ধকার একটি বড় ঘরে প্রবেশ করলুম। গিয়েই দেখি একটি ছোট হাত-পাখা হাতে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখেই স্মিতহাস্যে নমস্কার করলেন।

"আসুন। আপনার খাওয়ার বোধহয় দেরি হয়ে গেল। বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।"

"আমি অনেক বেলাতেই খাই। একটার আগে কোনদিন নয়!"

"বসুন।"

সুদৃশ্য একটি কার্পেটের আসনের সামনে বিরাট একটি থালাকে কেন্দ্র ক'রে নানা-রকম খাবারের সমারোহ। অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত নানা মাপের বাটিতে নিরামিষ আমিষ নানারকম তরকারি। এসব ছাড়াও পায়েস এবং দই।

"এত খেতে পারব কি—"

"বেশী কিছু করা হয়নি তো! ভালো মাছ পাওয়াই গেল না।"

খেতে ব'সে দেখি আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের প্রায় সবরকম নিরামিষ রান্নাই করা হয়েছে। শাকভাজা থেকে শুরু ক'রে অম্বল পর্যন্ত সবেতেই একটি বাঙালী

সংস্কৃতির স্বাদ পেলাম। পায়েস যখন শেষ হল তখন বুঝতে পারলাম গুরু-ভোজন হয়েছে। তারপরও সন্দেশ এল দু'রকম এবং দধি-সহযোগে সেগুলিও গলাধঃকরণ করতে হল। প্রতিমা দেবী কিছুতেই ছাড়লেন না। আমি যতক্ষণ খেলাম প্রতিমা দেবী ততক্ষণ আমার সামনে ব'সে পাখা নাড়তে লাগলেন। আমি বারবার মানা করলাম, কিন্তু তিনি নিরস্ত হলেন না। বললেন, "এখানে বড্ড মাছি। এখনি পাতে বসবে।"

অতিথি সম্বর্ধনার এই অনাড়ম্বর অথচ আভিজাত্যময় চিত্র আজকাল আর দেখতে পাই না।

বিকেলে চায়ের টেবিলে আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল। সেখানেও দেখলাম চা ছাড়া কেক বিস্কুট আর নানারকম ফল সাজানো রয়েছে। নানাবিধ ফল, আপেল, আঙুর, মেওয়া প্রভৃতি।

বললাম, "এখন চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারব না। দুপুরে বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গেছে।"

"তুমি তো শুনেছি খাইয়ে লোক। কেক খাও একটা।" খেলাম। তারপর আমার 'বনফুলের আরও গল্প' বইটা দিলাম তাঁকে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম দেব ব'লে।

উলটে-পালটে দেখলেন বইটা, তারপর বললেন, "ভাল ক'রে প'ড়ে তারপর চিঠি লিখব।"

গল্প-সংকলনের কথাও উঠল। বললেন, "কবিতা সংকলন ক'রে চারিদিক থেকে গালাগালি খেতে হচ্ছে। ভীমরুলের চাকে আর খোঁচা দেবার ইচ্ছে নেই।"

এরপর ও আলোচনা চাপা পড়ে গেল। কে একজন এসে বললেন, অতিথিশালায় একজন বিদেশিনী মহিলা এসেছেন, তিনি দেখা করতে চান।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কাল কোন সময় ঠিক কর।"

তারপর আর একজন এলেন অনিলদার সঙ্গে। সাহিত্য-আলোচনা করবার আর সুযোগ পাওয়া গেল না। আমি উঠে পড়লাম।

"আমি একটু বেড়িয়ে আসি। এখানকার 'খোয়াই'টা দেখা হয়নি। দেখে আসি।"

"খোয়াই দেখনি ? দেখে এস তাহলে। ওটা তোমার খুব ভালো লাগবে।"

খোয়াই খুব ভালো লেগেছিল। অনেকক্ষণ একা বসেছিলাম সেখানে। একটা বৈরাগ্যের সুর মনে জেগেছিল, মনে পড়ছে। যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আসবার সময় দেখতে পেলাম আরও অনেকে বসে আছে কাছে-দূরে। তারা কখন এসেছিল জানতে পারিনি। ফিরে এসে শুনলাম বর্ষামঙ্গল উৎসবের দিন পেছিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী'তেই ছিলেন, তাঁকে একাই পেয়ে গেলাম। যেতেই বললেন, "খোয়াই বেড়ানো হল ? কেমন লাগল ?"

"খুব চমৎকার।"

"ওখানে গল্পের কোন প্লট পেলে ?"

"পেলাম না তো !"

রবীন্দ্রনাথ মুচকি হেসে চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর হঠাৎ বললেন, "তোমাকে একটা গল্পের প্লট দেবো। তুমিই ঠিক পারবে। ভেবে দেখলুম আমার পক্ষে

ও গল্প লেখা অশোভন হবে। তুমি ওটাকে বাগিয়ে লেখ দিকি, তোমার হাতেই ওটা ওৎরাবে।"

"কি রকম প্লট, বলুন।"

"তোমাকে পরে লিখে পাঠিয়ে দেব। তুমি ক'দিন আছ?"

"আমি কাল দুপুরের ট্রেনে যাব।"

"এত তাড়া কিসের?"

"অনেক কাজ ফেলে এসেছি।"

"ও, তুমি যে ডাক্তার সে কথা মনেই থাকে না।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা গুরুপল্লীতে আমার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। সেইখানেই রাত দশটা পর্যন্ত কাটল। খাওয়া শেষ ক'রে রাত্রি এগারোটা নাগাদ শ্যামলীতে ফিরে এলাম। দেখলাম তখনও রবীন্দ্রনাথের ঘরে আলো জ্বলছে। বনমালী আমার বিছানা করেই রেখেছিল, গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা চা খাবার পর রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে বললাম, "আমি এই ট্রেনেই ফিরছি আজ।"

"ও।"

তারপর হঠাৎ আমার হাতে 'সে' বইখানা তুলে দিলেন।

"এটা পড়েছ?"

"না, ওটা পড়া হয়নি এখনও।"

"এইটেই গাড়িতে পড়তে পড়তে যাও তাহলে—"

বইটাতে আমার নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।

"তোমার কেমন লাগল তা জানবার জন্যে আগ্রহ রইল।"

"বেশ জানাব।"

আমার ধারণা ছিল 'সে' বইটা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা। প'ড়ে দেখলাম ওটা বয়স্কদের পাঠ্য এবং অতি উৎকৃষ্ট স্যাটায়ার। ফিরে গিয়ে সেই কথা লিখলাম। এরও উত্তর পেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

"সে" বইখানাকে তুমি সম্মান দিয়েছ এটা আমার কাছে নতুন ঠেকল। পাঠকেরা ওটাকে শিশুপাঠ্যের কোঠায় ফেলে দিয়ে ওর প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করেছে—জানে না কাহিনীটা ছোটো থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে স্বয়ং রচয়িতারই মতো—আউষ থেকে আমন, আমন থেকে চৈতালি। বইটাকে ঠিকমতো ক'রে না জানাতে পাঠক ঠিকমতো স্বাদ পায় নি। ইঁচড় বলেই কুটতে বসেছে, শেষকালে কাঁটালের ডালনা বানিয়ে বলেছে এ কী হল।

কিছুদিন থেকে নানা কাজে মনটা অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও ক্লান্ত ছিল। এইবার বোধহয় ছুটি মিলবে, তোমার বইখানা পড়ে যা বলা উচিত বলব। টানাটানির সময় দরাজ মনে পড়া যায় না।

এখানকার রাস্তা তোমার জানা হয়ে গেল, যখন খুশি এসো। স্থানাভাব ঘটবে না। ইতি ২৪।৯।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পের প্লটটিও পাঠিয়ে ছিলেন পরে পত্র-যোগে। আমার ইচ্ছে ছিল এই প্লটটি নিয়ে আলাদা একটা বই লিখব। কিন্তু তা আর পেরে উঠিনি। এই প্লটের মুখ্য চরিত্রটিকে আমার 'নির্মোক' উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলাম। নির্মোকের অমর এই প্লট থেকে সৃষ্টি। প্লটটি এই—

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

সময়টা সেকালের প্রান্ত-ঘেঁষা। মা-ঠাকুরুণ বড় ঘরের ঘরণী—স্বামী-সহকারে চলেছেন তীর্থ-পরিক্রমে। শেমিজ জুতোয় লজ্জা, অশ্বযানে সঙ্কোচ, বাল্যাবধি পাল্কিবাহিনী, আধুনিক পন্থায় স্বামীর তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু যে সনাতনী আচার শ্বশুরকুলের বংশানুগত আভিজাত্য আঁকড়ে ছিল তার কোন ব্যত্যয় গৃহিণী সইতে পারতেন না, যদিও পুরুষমানুষের অনাচারে ধৈর্য রক্ষা করতে অগত্যা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেটি আধুনিক—লোরেটোতে শিক্ষিত মেয়েকে বাপ-মায়ের অগোচরেই বিয়ে করেছিল, মেয়েটির বয়স গৌরীর কাছাকাছি যায় নি ব'লে দুঃসহ ক্ষোভ পরিবারে একদা আলোড়িত হয়েছে। অল্পদিনে প্রমাণ হ'ল এমন সতী-লক্ষ্মী মেয়ে হয় না—এমন কি যে সকল আচারে ও পূজার্চনায় তার অভ্যাস ও বিশ্বাস ছিল না, তারও খুঁটিনাটি সে মেনে চলত। স্বামী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তেজনায় বৃথা চেষ্টা করত। একটা কথা মেয়েটি বুঝতে পারত না কেন স্বামীসহবাস থেকে সে বঞ্চিত ছিল। সে সমস্যার সমাধান এই, স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ভালো, কিন্তু একবার পদস্খলন হয়ে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে ভয় নেই, কিছুকাল চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হবে। সেই আশ্বাসে শ্বশুরের একান্ত ব্যস্ততায় ও সুন্দরীর লোভে সে বিয়ে করলে কিন্তু সংক্রামক সঙ্গ-বিপত্তি থেকে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে চললে। রোগ উপশমের বাহ্যলক্ষণ যতই আশ্বাসজনক হোক, তবু ভয় ছিল রোগটা পাছে সন্তান-পরম্পরায় সংক্রামিত হয়। এদিকে স্ত্রীর বিশ্বাস, এই সংযম স্বামীর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক শুচিতার লক্ষণ। তাই জোড় মিলবার চেষ্টায় নিজের প্রবৃত্তিও দমন ক'রে চলত। অবশেষে হঠাৎ একটা অসংযমের উদ্দীপনার মুখে স্বামীকে অপরাধ স্বীকার করতে হোলো। ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। স্ত্রীর গৃহত্যাগ, অথচ অন্তরের মধ্যে নিরন্তর জ্বলুনি। একবার শ্বাশুড়ির পায়ের ধুলো নেবার প্রলোভনে স্টেশনের নিকটবর্তী গাছতলায় দুর্যোগের অপরাহ্ণে যা ঘটল তার আভাস পেয়েছ। ছেলেটার কলঙ্ক অথচ চরিত্র-মাহাত্ম্যের কথা চিন্তা ক'রে দেখো। ইতি— ৮ই চৈত্র, ১৩৪৫

স্নেহাকৃষ্ট
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এরপর কিছুদিন শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে যে

স্নেহ এবং যে প্রশ্রয় পেয়েছিলাম তা আমাকে স্থির থাকতে দেয়নি। এতকাল রবীন্দ্রনাথের লেখা মনকে মাতিয়ে রেখেছিল, এবার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সারা হৃদয়কে জুড়ে বসল। বার বার যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু কাজের চাপে সময় পেতাম না, কিছু সঙ্কোচও ছিল মনে। চিঠি লিখতে পারতাম, কিন্তু তাতেও সঙ্কোচ এসে বাধা দিত। ভাবতাম, কি নিয়ে চিঠি লিখব। রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা এর যে-কোন একটা নিয়ে পত্রাকারে অনেকে বাগবিস্তার করেছেন কবির কাছে। কিন্তু অযাচিতভাবে নিজেকে তাঁর কাছে জাহির করবার স্পর্ধা বা সাহস আমার ছিল না। কিছুদিন আগে তাঁর কাছে 'বনফুলের আরও গল্প' পাঠিয়েছিলাম, সে সম্বন্ধে কোনও জবাব না পেয়ে অবশেষে সেই প্রসঙ্গ নিয়েই তাঁকে চিঠি লিখলাম একটা। তা-ও অনেক ইতস্তত ক'রে লিখেছিলুম। সর্বদাই ভয় হত পাছে তিনি মনে করেন আমি তাঁর ভদ্রতার এবং স্নেহের সুযোগ নিচ্ছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার লেখার সম্বন্ধে কি বলেন তা জানবার লোভও দুর্দম, বিশেষত তখন আমি নবীন লেখক, মনটা স্বভাবতই প্রশংসা-কাঙাল ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমার 'কিছুক্ষণ'-এর, 'দ্বৈরথ'-এর এবং 'বৈতরণী তীরে'র প্রশংসা করেছেন, ছোটগল্পগুলোরও কি করবেন না? এই প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে রইলাম। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যে উত্তর দিলেন তাতে মন ভরল না। লিখলেন —

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার এবারকার গল্পগুলো প'ড়ে কী মনে হল বলি। যেন তুমি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী, হাটে যাবার মেঠো-রাস্তায় যেতে যেতে এদিকে-ওদিকে আগাছা এবং ঘেসো গাছ-গাছড়া যা তোমার চোখে পড়েছে, তোমার নমুনার বইয়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ। এগুলো পথিকদের চোখ এড়ায়—কেন না এরা না দেয় পুজোর ফুল, না চড়ে চীনে ফুলদানিতে। এরা আদরণীয় নয়, পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধ'রে দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে। মেঠো পথটা চৌরঙ্গী রোড নয়, কিন্তু জীবলোকের নানা আমেজ ওর এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকে, ওর ফড়িং-টিকটিকিগুলো ময়ূর-হরিণের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে' যদি দেখা যায় তাহলে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে—আর ঘেসো জগতের সঙ্গে ওদের মিল দেখে কিছু মজাও লাগে।

তোমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' পড়্‌চি। পরিহাসের পথে তোমার কলম ছোটে লাফ দিয়ে। আমার কাছ থেকে সজনীকান্ত ভুলিয়ে ভালিয়ে একটা প্রহসন নিয়ে গেছে—ও একটা আবর্জনা। এখানকার অধ্যাপকদের অনুরোধে তিনদিনে লিখেছি এবং আরও তিন-চারদিনের পরমায়ু ওর মধ্যে ভ'রে দিয়েছি, মাসিকপত্রের পাতাগুলোর মধ্যে মরা চ্যাপ্টা ব্যাঙের মতো দেখাবে—সুশোভন হবে না। লজ্জিত হয়ে আছি। যা সম্মার্জনীয়, সাহিত্যে তাকে মার্জনা করা চলে না।

কলকাতার মুখে চলতে চলতে এ-পথে কোনো এক-সময়ে যদি নেমে পড়, তাহলে অভ্যর্থনার ত্রুটি হবে না। ইতি—নবমী, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ

এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ আমার যে মন্ত্রমুগ্ধ নাটকের উল্লেখ করেছেন সেটি একটি

প্রহসন, 'শনিবারের চিঠি'তে ক্রমশ প্রকাশিত হ'চ্ছিল তখন। বইটি ওঁর খুব ভালো লেগেছিল। ওঁর নিজের যে প্রহসনটির কথা লিখেছেন সেটি হচ্ছে ওঁর 'মুক্তির উপায়' নামক গল্পটির নাট্যরূপ।

এ চিঠির উত্তরে আমি যা লিখলাম তার মর্ম—আমি আপনাকে পাঠালাম কাব্য আর আপনি আমাকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ঠাওরালেন। এটা ঠাট্টা, না, প্রশংসা বুঝতে পারলাম না ঠিক।

এর উত্তর আসতেও দেরি হল না।

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

তুমি জানো বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা পরগাছা ওষধি বনস্পতি সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাই তো, এতো আমি দেখি নি, কিংবা ঠিকটি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ-ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্য চোখ-এড়ানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে। তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ-পরানো কনে দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখাতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়, ঠিকটি দেখা গেলো ব'লে হাততালি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায়। জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান ক'রে দেখাবার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে—তোমাদের ভয় পাছে ছোটকে বাড়িয়ে বলো, পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট ক'রে ফেলো। অতএব গল্প-সাহিত্যের আসরে তোমাকে যদি বিজ্ঞানীর আসন দিয়ে থাকি তাহলে মানহানির আশঙ্কা করে নালিশের ভয় দেখাচ্ছ কেন?

তোমার মন্ত্রমুগ্ধ ঠিক লাইন ধ'রে চলেছে, derailed হবার আশঙ্কা নেই। যে পাড়ায় ওর টার্মিনাস সে হচ্ছে হতভাগাদের পাড়া—ভাষায় ভঙ্গীতে ব্যবহারে তাদের ঠিক পরিচয়টি পাওয়া যায়। অতিকৃতি আছে—ব্যঙ্গীকরণ অর্থাৎ ক্যারিকেচ্যুরের দ্বারা বিকৃতিকে স্পষ্ট করার জন্যই তার দরকার। তোমার এ বইয়ের সঙ্গে আমার মুক্তির উপায়ের তুলনা করলে তফাৎ বোঝা যাবে—হয়তো মাঝে মাঝে হাসিয়ে থাকবো, কিন্তু চরিত্রগুলো সাজে ভাষায় তাদের বসতির ছাপ নিয়ে আসে নি। অর্থাৎ আমি যে ওদের সম্পূর্ণ চিনি তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। সাহিত্যে তুচ্ছতাই গৌরব পায় যখন সে সুনিশ্চিত হয়। ইতি – ৭।১০।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠি পাওয়ার পর সঙ্গতভাবেই একটু গর্ব জেগেছিল আমার মনে। কিন্তু তবু সামনাসামনি আলাপে ব্যাপারটাকে স্পষ্টতর করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি। তাই এর উত্তরে আমি চিঠি লিখেছিলাম যে, যদি যাই এখন, দেখা হবে কি না। চিঠিটা লেখবার পরই খবর পেলাম উনি কালিম্পং চলে গেছেন। কিন্তু কলকাতা

থেকে নিম্নলিখিত চিঠিটি পেয়ে মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে গেলাম। প্রণাম জানালাম ওঁকে মনে মনে। যাদের মধ্যেই উনি সামান্যতম সাহিত্যিকের আভাসও পেয়েছেন তাদেরই উনি বারবার কাছে টানতে চেষ্টা করেছেন নিজের শত অসুবিধা সত্ত্বেও। অপরের লেখা পড়া এবং তা পড়ে সমালোচনা করা যে কি ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিকর তা এখন নিজেরা বুঝতে পারি। কারণ আমাদের কাছেও এখন অনেক নবীন লেখক বই পাঠান এবং প্রত্যাশা করেন যে আমরা সমালোচনা করে তাঁদের রচনার গুণাগুণ নির্ণয় করব। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ ছিলেন, তিনি যদি তখন দেখা না করতে চাইতেন, তাহলে নালিশ করবার কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি লিখলেন—

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু,

বেরিছিলুম (বেরিয়েছিলুম ?) কালিম্পং যাব বলে গরমের ধাক্কা খেয়ে। অপর দিক থেকে দুর্বলতার ধাক্কা লাগল। ফিরে যাচ্ছি স্বস্থানে। যদি শান্তিনিকেতনে আসতে পার দেখা পাবার ব্যাঘাত হবে না। সজনীকান্তকেও খবরটা দিয়ো। ইতি—১০।১০।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সজনীকান্তের উপর নানাকারণে বিরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সজনী তাঁর হৃদয় জয় করতে পেরেছিল। সজনীকে খবরটা দিয়ে আমি একদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। আমার গল্প সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছিল তা লিখতে লজ্জা করছে। কারণ তা নির্জলা প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা কথা হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ও হেনরি কিংবা শেখভের গল্প পড়েছ ?' সত্যিই আমি পড়িনি শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, তোমার গল্প পড়লে ওদের গল্পের কথা মনে পড়ে। ওদের বই পেলে তুমি পড়ে দেখো। বলা বাহুল্য এ আদেশ অমান্য করিনি। দুজনের লেখা পড়েই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, যদিও ও হেনরির সব লেখা পুরো বুঝতে পারিনি, আমেরিকান চলতি ভাষায় গোলকধাঁধায় অনেক সময় পথ হারিয়ে রসের উৎসে পৌঁছতে পারা যায়নি।

স্বভাবতই এর পর আমার যে-সব বই বা লেখা তখন বেরিয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু এ ব্যগ্রতা সত্ত্বেও আমি হুড়মুড় করে রবীন্দ্রনাথের উপর নিজেকে প্রক্ষেপ করিনি কখনও। যখন গেছি তাঁর অনুমতি নিয়ে গেছি। মনে পড়ছে একবার লিখেছিলাম—'এখন আপনি খুব ব্যস্ত আছেন, এই সময় শান্তিনিকেতনে অতিথির ভীড় হয়। আপনার একটু অবকাশ হলে আপনার কাছে যাব, কিংবা আমার দু' একটা লেখা পাঠাব।' তিন চারদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেল।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

ব্যস্ত বললে ঠিক বলা হয় না, ব্যতিব্যস্ত। সকাল থেকে রাত্তির, দিন থেকে

দিনান্তর। নীরন্ধ্র নিরবসর। এই বীচিসঙ্কুল সংক্ষুব্ধ কর্মমহাম্বুধি সম্মুখে কিছু-দূর পর্যন্ত আবর্তিত। আগামী জানুয়ারীর মধ্যভাগের পূর্বে পর্যন্ত কূল দেখছিনে। আগন্তুকদের জনতাও আসন্ন। আমার বুদ্ধিবৃত্তি তল পর্যন্ত আলোড়িত। তারপরে তোমার সঙ্গে আমার ব্যবহারের পথ বাধামুক্ত হতে পারবে। লেখা পাঠালে মন দিয়ে পড়ব, দেখা-সাক্ষাৎ হলে খুশি হব। এখনকার মতো চললুম কাজে। ইতি—
১৬।১২।৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিঠির পর কিছুদিন নীরব ছিলাম। কিন্তু ঠিক এই সময় সুধাকান্তদা (শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী) রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের যে আলেখ্য তিনি এঁকেছিলেন তা অতি মনোরম। প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্র-নাথকে চিঠি লিখলাম, 'সুধাকান্তদা'র প্রবন্ধ পড়ে আবার আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। জানি না এখন আপনার অবসর হয়েছে কিনা। আগের চিঠিতে আপনি জানিয়েছিলেন জানুয়ারির মধ্যভাগ পর্যন্ত আপনার অবকাশ নেই। তার পরই যাব, যদিও এখনি যেতে ইচ্ছে করছে খুব। এর উত্তরও অবিলম্বে এল।

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

কল্যাণীয়েষু,

সুধাকান্তের প্রবন্ধ তোমাকে এখানে আসতে উৎসাহিত করেছে তাতে আমি আনন্দিত। ভয়ের বিষয় পাছে এই উৎসাহের আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে দূরে চলে যায়। প্রবন্ধ যাঁরা পড়েননি তাঁদের সংখ্যা কম নয়, তাঁদের উৎসাহেরও প্রমাণ পাচ্ছি। তোমাকে তারিখ নির্দেশ করে ঠেকিয়ে রেখেছি কিন্তু যাঁরা বেতারিখি আমার নিরবকাশ সময়কে মথিত করে তাঁরা আবিল করে তুলচেন। অথচ তোমাদের মতো মানুষ তারিখের গণ্ডি ডিঙিয়ে যদি এসে পড়তে, তাহলে নিজগুণে ভরপুর ব্যস্ততার মধ্যেও একটা ভালো জায়গার দাবি করতে পারতে। তথাপি সুযোগটা রিজার্ভ করা থাকলে সকল পক্ষেই সুবিধে। শুনচি, সুধাকান্ত আরও লিখবে। শঙ্কিত আছি। অপ্রস্তুত অবস্থায় সে আমাকে অনেক দেখেছে, অতএব আমাকে অপ্রস্তুত করতে পারবে। পাঠকেরা খুশি হবে।

পৌষ, ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ

এ চিঠি পাবার কিছুদিন পরে একটা তারিখ ঠিক করে আবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সে সময় একটা সাময়িকপত্রে আমার 'মানুষের মন' নামে ছোট গল্প বেরিয়েছিল একটা। গিয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ সে গল্পটা পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

বললেন, "তোমার এ গল্পটি খুব ভালো হয়েছে। এর জন্য তোমাকে বকশিশ দেওয়া উচিত। কি নেবে বল ?"

চুপ করে রইলাম।

"আমার টেবিলে তো অনেকগুলো কলম রয়েছে, যদি কোনটা পছন্দ হয় নাও।"

"না, কলম নেব না। ও সব তো বাজারে পাওয়া যায়।"

"তাহলে ওই ছোট রেডিওটা নিয়ে যাও।"

"না না, ও সব কিছু চাই না।"

"কি নেবে তাহলে।"

"আপনি আমার গল্পের প্রশংসা করলেন এই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তা ছাড়া আপনার অনেক বই তো আমাকে দিয়েছেন অটোগ্রাফ করে—"

"কিছু নেবে না তাহলে ?"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "একটা জিনিস নিতে পারি, যদি দেন।"

"কি, বল।"

"আপনার বাক্সে নিশ্চয় আপনার পুরোনো জামা আছে দু' একটা। আপনার সেই পরা জামা পেলে খুশি হয়ে নিয়ে যেতাম।"

"না, না, পুরোনো জামা কেউ কাউকে দেয় নাকি।"

"তাহলে কিছু চাই না।"

তার পরের দিন আসবার সময় যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন দেখি একটা পুলিন্দা তিনি প্যাক করে রেখেছেন। আমাকে বললেন—'এটা কাউকে দেখিয়ো না। এটা আমার খুব পুরোনো জামা। এককালে ওর রূপ ছিল, এখন শ্রী-হীন।' দেখলাম তার সঙ্গে একটা কার্ডে এই কথাগুলি লেখা রয়েছে—

"আমার এই অনেকদিনের পরা সাজ, অতীতে যে ছিল আদৃত এবং বর্তমানে যা বর্জিত সেটি কল্যাণীয় শ্রীমান বলাইকে দান করা গেল। এ রকম দানে দাতারও সম্মান নেই, গ্রহীতারও। নিজের মান রক্ষা অগ্রাহ্য করে অনুরোধ রক্ষাই স্বীকার করেছি এইমাত্রই আমার কৈফিয়ৎ।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

জামাটা এখনও আমার কাছে আছে। প্রকাণ্ড জোব্বা। তার একদিকে দামী পশম আর একদিকে রেশম। চমৎকার জিনিস।

তাড়াতাড়িতে লিখতে গিয়ে লেখার ধারাবাহিকতায় একটু গোলমাল ক'রে ফেলেছি। ১০।১০।৩৮ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আমাকে জানিয়েছিলেন যে দুর্বলতার ধাক্কা খেয়ে তিনি স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। লিখেছিলেন, 'যদি শান্তি-নিকেতনে আসতে পার দেখা পাবার ব্যাঘাত হবে না।' তাঁর এ আহ্বান আমি উপেক্ষা করিনি। একদিনের জন্য গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। খবর দিয়েই গিয়েছিলাম। গিয়ে উঠেছিলাম আমার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি গুরুপল্লীতে। সেখান থেকেই সোজা রবীন্দ্রনাথের চায়ের টেবিলে গিয়ে হাজির হলাম। গিয়ে প্রণাম করতেই হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

"ও তুমি এসে গেছ। বস, বস।"

"আপনার শরীর খারাপ শুনে দেখতে এসেছি।"

তাঁর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি একটা কাচের গ্লাস থেকে চমৎকার সবুজ রঙের কি একটা পানীয় চুমুক দিয়ে দিয়ে খাচ্ছিলেন। মনে হল যেন খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন। অবাক হয়ে গেলাম দেখে।

"এটা তুমি খাবে ?"

"না। সকালবেলাতে তেতো খাবার ইচ্ছে নেই। ওটা তো নিমপাতা-বাটা শ্বনেছি?"

"ও, তুমি শ্বনে ফেলেছ? অনেকে এটাকে পেস্তার শরবৎ ব'লে ভুল করেছে। আচ্ছা, তুমি তবে চা খাও—"

চা খেতে খেতে আমি তাঁর দ্বর্বলতা-প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে লাগলাম। তার পর বললাম, "আমি আপনার 'ইউরিন' পরীক্ষা করতে চাই। শ্বগার (Sugar) বা অ্যালব্বমেন (Albumen) আছে কি না দেখা দরকার—"

"না, না, ওসব আমার কিছ্ব নেই। একটু **Albumen** আছে বোধহয়। তা সে এ বয়সে থাকেই।"

"শ্বগার নেই ঠিক জানেন?"

"না, নেই। তোমার তো এই বয়সেই ডায়াবিটিস Diabetes হয়েছে। এত অল্প বয়সে ডায়াবিটিস হ'ল কেন তোমার?"

তখন বলতে হ'ল—"আসল কারণ লোভ। যত খাই তত শারীরিক পরিশ্রম করি না। সব কাজই ব'সে ব'সে করি—"

তারপর তাঁকে ডায়াবিটিসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা ব্বঝিয়ে বলতে শ্বর্ব করলাম। শ্বর্ব করেই নজরে পড়ল—তাঁর সামনে একটা খাতা রয়েছে। মনে হল হয়তো কিছ্ব লিখছিলেন, আমি বাধা দিলাম।

"আপনি লিখছিলেন, আপনাকে এ সময় বিরক্ত করা উচিত নয়। আমি উঠি—"

"না, না, তোমার ব্যাখ্যা শ্বনতে বেশ লাগছে। তুমি থেমো না। বলে যাও—"

বললাম।

শ্বনে বললেন, "তুমি আমাদের দেহতত্ত্বের রহস্যগ্বলো এমনি ক'রে লেখো না। চমৎকার হবে। লিখো, ব্বঝলে—? আগেও তো তোমাকে বলেছিলাম একবার।"

"আচ্ছা, চেষ্টা করব; আপনি কিছ্ব লিখছিলেন না কি—"

"একটা কবিতা ফেঁদেছিল্বম। যখন হাতে কোন কাজ না থাকে কবিতা লিখি। সময় কাটাবার ওটা ভারি একটা সদ্বপায়। আগে শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মকালে থাকতে হ'ত—তখন ইলেকট্রিসিটি আসেনি—তখন দ্বপ্বরটা কবিতা লিখে কাটাতাম। বারোটা নাগাদ একটা কবিতা নিয়ে বসলে গরমটা যে কোথা দিয়ে চলে যেত ব্বঝতে পারতাম না। হঠাৎ দেখতুম পাঁচটা বেজে গেছে। শ্বনবে?"

"নিশ্চয়—"

কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল। আমার ভাইয়ের শালী অন্ব এসে হাজির হ'ল। সে বলল,—"আপনি আজ দ্বপ্বরে আমাদের ওখানেই খাবেন। মা ব'লে পাঠালেন।"

অন্বর বয়স তখন বোধহয় ষোল সতেরো। রবীন্দ্রনাথ তাকে চিনতেন। এক নজর তার দিকে চেয়ে ম্বচকি হেসে বললেন—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহলে উপলক্ষ মাত্র, তোমার আসল লক্ষ্য অন্য জায়গায়।"

ম্বদ্ব হাসির আবহাওয়ায় অপ্রতিভ হ'য়ে চুপ ক'রে রইলাম। রবীন্দ্রনাথ তারপর জিগ্যেস করলেন—"এরা তোমার আত্মীয় নাকি?"

"এ আমার ছোট ভাইয়ের শালী।"

অনুকে বললাম, "তুমি যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।"

অনু চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"তুমি এখন বরং যাও। স্নানটান ক'রে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর গিয়ে। তুমি কি দুপুরে ঘুমোও ?"

"না—"

"তাহলে দুটোর সময় এসো। তোমাকে একটা গল্প পড়ে শোনাব।"

"আচ্ছা—"

"তুমি আছো তো দু'একদিন ? না, আজই চলে যাবে ?"

"কাল যাব।"

অনুদের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করছি, ঠিক দেড়টার সময় নীলমণি ছাতা মাথায় দিয়ে এসে হাজির। তার বগলেও দেখলাম একটা ছাতা রয়েছে। সেদিন খুব রোদ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ আমার জন্যে একটা ছাতা পাঠিয়ে দিয়েছেন! অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। তখন স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেনও অনুদের বাড়ির পাশেই থাকতেন গুরুপল্লীতে। শুনে তিনিও একটা ছাতা বার ক'রে বললেন, "চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে—"। একটা বড় মাঠ পেরিয়ে তবে রবীন্দ্রনাথের পাড়ায় পেঁছিতে হয়। যেতে যেতে ক্ষিতিমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি দুর্বলতার জন্যে কালিম্পঙে গেলেন না। গল্প পড়তে ও'র কষ্ট হবে না তো ?"

"নিজের লেখা শোনাবার সময় ও'র কোনও কষ্ট হয় না। এখানে এসে ভালোই আছেন আজকাল।"

গিয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট ঘরে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। একপাশে একটি ফুলদানীতে কিছু ফুল। সুরম্য শান্ত পরিবেশ। দেখলাম আরও দু'একজন শ্রোতাও এসে বসে আছেন।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর 'শেষ কথা' গল্পটি প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। কি ভালোই যে লেগেছিল তা বলবার নয়। গল্প পড়া শেষ ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "সমালোচক মশাইয়ের কেমন লাগল। তোমার সামনে গল্প পড়তে ভয় করে—"

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "চমৎকার হয়েছে। সত্যি, খুব চমৎকার—"

সভাভঙ্গ হ'ল।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আবার এখন অনুদের বাড়ি যাবে নাকি ?"

"না—"

"তাহলে এখানে চা খেয়ে যেও—"

চায়ের টেবিলে কথায় কথায় পলিটিক্‌স্-এর কথা উঠে পড়ল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার পলিটিক্‌সের দিকে ঝোঁক আছে নাকি ?"

"না—"

"ভালো। সাহিত্যিক পলিটিক্‌স করলে পলিটিক্‌সও হয় না, সাহিত্যও মার খায়। আমি পলিটিক্‌স করতে গিয়ে খুব ঘা খেয়েছিলুম!"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, "আচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীকে কি বুদ্ধদেবের সমপর্যায়ের লোক ব'লে মনে কর ?"

"না, তা তো মনে হয়নি কখনও। ও'কে আমি শ্রদ্ধা করি খুব, যদিও ও'র অহিংস-নীতির সঙ্গে আমার মতের পুরোপুরি মিল নেই।"

"জহরলালেরও নেই, সে কিন্তু গান্ধীজির একজন চেলা।"

এর পরই জহরলালের কথা উঠল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তাঁর। বললেন, "ভারতবর্ষের ওই ভবিষ্যৎ নেতা।"

আরও অনেক নেতাদের কথা হয়েছিল। অপ্রয়োজনবোধে সে-সব কথা লিখলাম না এখানে।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় আমাকে কয়েকটি গদ্য কবিতা প'ড়ে শোনালেন। যখন কবিতা শোনবার জন্য যাচ্ছিলাম তখন আর একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিরাট একটা শব্দে চমকে উঠেছিলাম। নীলমণির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইতেই সে বললে—"উনি হাঁচলেন।"

ভিতরে গিয়ে দেখলাম উনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন।

"বস—"

"ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি—"

"ও লেগেই আছে একটা-না-একটা—"

ও'র টেবিলে নানারকম বাইওকেমিক ওষুধ থাকত শিশিতে শিশিতে। একটা শিশি থেকে দু'চারটে বড়ি বার করে খেলেন।

"বাইওকেমিক ওষুধ কখনও ব্যবহার করেছ ?"

"না—"

একটা বাদামি রঙের শিশি দেখিয়ে বললেন—"এটা খেও। ভালো ব্রেন টনিক—"

"কি ওষুধ ?"

"কেলি ফস (Kali phos) আমি খেয়ে খুব উপকার পাই। তোমার ডায়াবিটিসেরও একটা ভালো ওষুধ দিতে পারি—নেট্রম্ সাল্ফ (Natrum sulph); যাবার সময় নিয়ে যেও—"

"ডায়াবিটিসের চেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছি অর্শতে—"

"ওরও ভালো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে। দিয়ে দেব তোমাকে। সালফার থার্টি (Sulphur thirty) আর নাক্স টু-হান্ড্রেড্ (Nux two hundred)। সালফার সকালে খেও, দুটোই 'স' মনে থাকবে, আর নাক্স রাত্তিরে, নক্তম্। যাওয়ার সময় তোমাকে দিয়ে দেব সব। একটা হোমিওপ্যাথিক বইও দেব। দেখ, যদি ওর মধ্যে প্রবেশ করতে পার। ওর একটা মস্ত সুবিধে, খুব সস্তা। গরীবদের উপকার করতে পারা যায়।"

"আপনি বাড়িতে পড়েই হোমিওপ্যাথি শিখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। যখন আমি পদ্মায় বোটে ঘুরে বেড়াতাম তখন লোকালয় থেকে অনেক সময় দূরে থাকতে হ'ত। সেই সময় এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর একটা বই নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। কারণ, কাছেপিঠে প্রায়ই ডাক্তার পাওয়া যেত না। নিজের উপর আর বোটের মাঝি-মাল্লাদের উপরই প্রথম প্রথম experiment করতুম। ফল

হ'ত। তাই উৎসাহও ক্রমশ বেড়ে গেল। দু'একটা দুরারোগ্য অসুখও সারিয়েছি। সেণ্ট ভাইটাস্ ডান্স (St. Vitus Dance) সারাতে পার তোমরা ?"

"না—"

"আমি একটা সারিয়েছিলুম। তখন রাঁচিতে ছিলাম আমি। সেখানে আমার যে-সব চিঠি যেত তাতে প্রায়ই ঠিকানা লেখা থাকত—ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকেই ভেবেছিল আমি সত্যিই বুঝি চিকিৎসক একজন। অনেক রুগী জুটতে লাগল। আমিও ওষুধ দিতে ইতস্তত করিনি। একদিন হঠাৎ এক রুগী জুটল, দেখেই বুঝলাম—এতো St. Vitus Dance, বই-টই ঘেঁটে একটা ওষুধ select করলাম। সেটা আবার এ দেশে পাওয়া গেল না। আমেরিকা থেকে আনাতে হ'ল। সে ওষুধ খেয়ে সে সেরে গিয়েছিল বেশ।"

এই সব ডাক্তারি আলাপের পর কাব্যপাঠ শুরু হ'ল। দু'-একটি গদ্য কবিতা প'ড়ে শোনালেন। আমার মনে একটা প্রশ্ন বরাবরই ছিল, সেটাই ব্যক্ত করলাম তখন।

বললাম, "রসাত্মক বাক্যই কাব্য। সে হিসেবে গদ্যও কাব্য হ'তে পারে। কিন্তু কবিতা বলতে আমরা যা বুঝি, গদ্য কবিতা কি ঠিক সেই জিনিস ? লাইনগুলোকে ভেঙে লিখলেই কি কবিতা হবে ? লাইনগুলো ভাঙবার নিয়ম কি ? আপনার 'লিপিকা'র প্রত্যেকটি রচনাই কাব্য, কিন্তু সেগুলোকে তো আপনি লাইন ভেঙে লেখেন নি, গদ্যের মতো করেই লিখেছেন—"

"তুমি আরও কয়েকটা শোন তাহলেই বুঝতে পারবে।"

আরও কয়েকটা প'ড়ে শোনালেন। কিন্তু কি নিয়মে লাইনগুলো ভাঙা হচ্ছে তা স্পষ্ট হল না আমার কাছে।

বললাম, "নৃত্য বলতে আমরা শিল্পকলায় যে বিশিষ্ট রূপটি বুঝি তাতে ছন্দ আছে তাল আছে কিন্তু সাধারণ চলাতে তো তা নেই। চলাকে নৃত্য বলা যাবে কি ?"

"তুমি কি কোনও মেয়ের এমন চলা দেখনি যা দেখে মনে হয় মেয়েটি যেন নেচে নেচে চলছে ?"

"কিন্তু তবু সেটাকে নৃত্য বলব না—"

এমন সময় উত্তরায়ণ থেকে গাড়ি এল একটা। শুনলাম রাত্রে সেখানেই শোবেন। আমি উঠে পড়লাম।

খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়েছি—রাত্রি তখন প্রায় দশটা হবে—নীলমণি এসে হাজির।

"আপনি ঘুমিয়েছেন না কি ?"

"না, কেন—"

"বাবামশায় আপনাকে একবার ডাকছেন।"

গেলাম। উত্তরায়ণে নীচের ঘরেই রবীন্দ্রনাথ শুয়েছিলেন। ইতিপূর্বে শায়িত অবস্থায় তাঁকে দেখিনি। দেখলাম একটা কৌচের উপর শুয়ে আছেন। মশারি খাটানো। আমার সাড়া পেয়েই আলো জ্বাললেন।

"এই কবিতাটি শোন তো। এটা শুনলে হয়তো ব্যাপারটা ঠিক বুঝবে—"

আর একটা কবিতা পড়ে শোনালেন মশারির মধ্যে থেকেই। অনুভব করলাম এখন যদি তর্ক তুলি তাহলে ওঁর আর ঘুম হবে না আজ রাত্রে। তাই বলতে হ'ল—

"এবার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ছন্দ আছে একটা।" শুনে খুশী হলেন। কি নিয়মে যে লাইনগুলো ভাঙা হচ্ছে সে কথা আর তুললাম না। চলে এলাম।

কি নিয়মে যে লাইনগুলো ভাঙা হয় এটা আমি পরে আবিষ্কার করেছিলাম নিজেই, যখন 'মৃগয়া' লিখি। একসঙ্গে যতটা পড়লে ভালো শোনায় ততটাই এক লাইনে লিখতে হয়। এটা রবীন্দ্রনাথকে পরে জানিয়েছিলাম, খুব খুশী হয়েছিলেন শুনে। মৃগয়ার প্রথম দিকটা গদ্য কবিতায় লেখা। ধারাবাহিকভাবে ওটা শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল, তখনই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল।

পরদিন সকাল বেলাই গিয়ে হাজির হলাম তাঁর কাছে। লিখছিলেন, ভাবলাম দূরে থেকে দেখেই চলে যাব। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন।

"বস। কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো ভালো ?"

"হ্যাঁ—"

লিখতে লাগলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। সেই সময় একটা জিনিস দেখে আমার একটু দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। দেখলাম উনি লিখছেন আর মাঝে মাঝে এক একজন এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে নীরবে চলে যাচ্ছে। বেশীর ভাগই মহিলা। লোক যেমন মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম ক'রে যায়, অনেকটা তেমনি।

নীলমণি চা দিয়ে গেল।

আমি চা খেতে খেতে সঙ্কোচে প্রশ্নটা করেই ফেললাম অবশেষে।

"এমনি ক'রে এ'রা রোজ প্রণাম ক'রে যান নাকি আপনাকে ?"

রবীন্দ্রনাথ ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হাসির আভা চিকমিক ক'রে উঠল চোখে মুখে।

বললেন, "হ্যাঁ। ওদের কিছুতেই ঠেকানো যায় না।"

চা খাওয়া শেষ হলে বললেন—"আমার আঁকা ছবিগুলো দেখেছ তুমি ?"

"যেগুলো ছাপা হয়েছে দেখেছি—"

নীলমণি চায়ের কাপ নিতে এসেছিল। তাকে বললেন—"বলাইকে আমার ছবির ঘরে নিয়ে যাও।" ছবির ঘরে গিয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। মনে হল অদ্ভুত এক অবাস্তব লোকে উপনীত হয়েছি যেন। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলাম ছবিগুলো।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতেই প্রশ্ন করলেন, "দেখলে ? কেমন লাগল ?"

"অদ্ভুত। ছবিগুলো দেখতে দেখতে একটা কথাই কেবল মনে হচ্ছিল আমার।"

"কি কথা ?"

"কাব্যে যে ন'টা, না, দশটা রসের কথা আছে প্রথম শ্রেণীর কবির রচনায় তার সব কটাই ফুটে ওঠে। আপনার লেখায় অদ্ভুত বা বীভৎস রসের দেখা পাইনি, দেখা পেলাম আপনার ছবিগুলোতে। খুব ভালো লাগল।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেন, "ওদেশের যারা সমজদার তাদেরও ভালো লেগেছিল।"

ছবির প্রসঙ্গ আর বেশী দূর অগ্রসর হল না। অনিলদা (শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ) এসে বললেন, "একজন মহিলা এসেছেন পোল্যাণ্ড থেকে। তিনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান—"

"বিকেলের দিকে নিয়ে এস।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"তুমি কি আজই যাবে?"

"হ্যাঁ। দুপুরে আমার গাড়ি।"

দুপুরে যাওয়ার আগে যখন প্রণাম করতে গেলাম তখন তিনি আমাকে হোমিওপ্যাথিক আর বায়োকেমিক ওষুধগুলো দিলেন। ডাক্তার ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা Characteristic Materia Medica নামে একখানা হোমিওপ্যাথির বইও দিলেন। তাতে লিখে দিলেন—

কল্যাণীয় বলাই,

আরোগ্য দানের নূতন ভাণ্ডারের একটি চাবি তোমার হাতে দিলাম। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

তাঁর ওষুধ খেয়ে আমার অর্শ সেরে গিয়েছিল। কেলিফস্ খেয়েও খুব উপকার পেয়েছিলাম। কেলিফস্ এখনও আমি ব্যবহার করি। ডায়াবিটিস অবশ্য সারেনি। ডায়াবিটিসের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বেশী দিন করিও নি। ইন্স্যুলিনের উপরই নির্ভর ক'রে আছি এখনও।

পুরাতন চিঠি-পত্র উল্টে লক্ষ্য করলাম কাহিনীর পারম্পর্য আমি ঠিক রাখতে পারিনি। ১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বরের শেষ দিকেও আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম একবার। সে সময় তিনি আমাকে তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইটি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পড়ে কেমন লাগে জানিও। বইটি পড়ে আমি একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। কবিতার নাম 'পরমাণু'। কবিতাটি এই—

॥ ১ ॥

জীবনের খরস্রোতে ভেসে যাব পরমাণু
　　স্রোত সে বহিবে চিরকাল
কভু শীর্ণ, কভু স্ফীত, কভু শান্ত, ক্ষুব্ধ কভু,
　　কভু মন্দ, কভু ক্ষুরধার।
গ্রাসিয়া নগর গ্রাম আনিবে সে কভু সর্বনাশ।
ফেলিয়া নূতন পলি সৌভাগ্যের করিবে সূচনা,
ঋতুচক্র নানা রঙ্গে আবর্তিয়া যাব বারংবার,
　　রূপ হবে নিত্য রূপান্তর।
অন্তহীন অনন্তের কখনও কি মিলিবে সন্ধান?
　　মেলে শুধু অনন্ত আভাস।

॥ ২ ॥

অতি ক্ষুদ্র পরমাণু ভাসিয়া চলেছি বেগে
　　জানিনা কোথায় পরিণাম
আশ্বাস পেয়েছি শুধু যে স্রোতে চলেছি ভেসে,
　　সেই স্রোত চিরবহমান।

অনিত্যের ছন্দরূপে নিত্যধারা বহে চিরন্তন,
মোর নব জন্মাঙ্কুর তার মাঝে আছে সুনিশ্চিত,
নব জন্মে নব ছন্দে নব লোকে নব প্রেরণায়
হবে মোর নব উদ্বোধন।
তবে কেন মৃত্যুভয়, বৃথা শঙ্কা হতাশ আক্ষেপ
আছে পথ চির-পথিকের।

॥ ৩ ॥

সান্ত্বনা মেলে না তবু, মস্তিষ্কই নহে সব,
যুক্তিসার নহি যে নির্মম,
যুক্তির শিখর হ'তে ভূমিসাৎ করে মোরে
অতি ক্ষুদ্র হৃদয় স্পন্দন।
যুক্তিহীন আকুলতা, যুক্তিহীন বন্ধন-কামনা
মোহমুগ্ধ হৃদয়ের অতি ক্ষুদ্র শঙ্কা-শিহরণ
স্তব্ধ করে সব যুক্তি, ব্যর্থ হয় আকাশ বিলাস,
অর্থ খুঁজি অর্থহীনতার,
অতিশয় সীমাবদ্ধ আঁধার হৃদয়লোকে বসি'
উপাসনা করি ভঙ্গুরের।

॥ ৪ ॥

যে অনিত্য রূপ ধরি, প্রাণপুষ্প ফুটেছে সুন্দর
একদিন হবে তো নিঃশেষ
আমি তবু মানি না কো, অন্তরের অন্তস্তলে
মুগ্ধ হিয়া নির্মোক লোলুপ।
অনাগত জীবনের নিত্য নব সম্ভাবনা লোভে
সূচ্যগ্র সমান ভূমি এ জীবনে ছাড়িতে পারি না,
যুক্তির আকাশ হ'তে আলো আসে অনিবার্য বেগে,
মুদি আঁখি, দেখিতে চাহি না।
বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে আলো-বিদ্ধ অণু-পরমাণু
খরস্রোতে চলেছি ভাসিয়া।

এর উত্তরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলাম।

কল্যাণীয়েষু,

'বিশ্বপরিচয়ের' সংঘাত লেগে একখানা ভালো কবিতার দ্যুতি তোমার মনে বিচ্ছুরিত হয়েছে এ একটা জাগতিক ঘটনা। পালটিয়ে পালটিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে সংঘাতে সংঘাতে, মনের সঙ্গে মনের, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার, সংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির, তেজের সঙ্গে তেজের। তোমার নাটকের মধ্যে দেখাচ্ছ ঘাত-প্রতিঘাতে এই রূপ-রূপান্তর। এই জন্যেই সাহিত্যে নাট্য রঙ্গলীলাই সৃষ্টি রঙ্গলীলার সবচেয়ে কাছের জিনিস।

কেমিষ্ট্রীতেও এই দেখছি, ফিজিক্সেও তাই আবার, সাইকলজিতেও—জগৎ জুড়ে নিরন্তর সংঘাতে সংঘাতে অন্তরে বাহিরে সৃষ্টির অন্তহীন বৈচিত্র্য। ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত য়ুরোপে—হঠাৎ ইতিহাসকে এক পর্ব থেকে আর এক পর্বে অভাবনীয় রূপে বদলিয়ে দিলে—এই সৃষ্টি সংঘাত চলছে চীনে জাপানে। ভারতবর্ষেও সৃষ্টির এই পরিবর্তন লীলা চলছে নানা প্রকার ঠোকাঠুকিতে। কত জাতের সঙ্গে এবং হাতুড়ির সঙ্গে নতুন নতুন ঘায়ে ভারতবর্ষের চেহারা উলটিয়ে পালটিয়ে গেল—সেটা না বিচার ক'রে যারা কেবলি মনুসংহিতা আউড়িয়ে চলেছে, তাদের মতো শোকাবহ আর হাস্যকর দৃশ্য আর নেই।

শারীর জগতে প্রাণ রচনার ধারা অন্তর-বাহিরে সংঘাত-সংঘর্ষে জীবের এক দশা থেকে দশান্তরে অভিব্যক্ত হয়েছে এই নিত্য মারের চোটে। আমাদের চৈতন্যও মার খেয়ে খেয়ে জেগে থাকে এবং বিকাশ পায়। ঘাত-প্রতিঘাতের বাঁয়া তবলার তাল কেটে গেলেই বিকৃতি এবং বিনাশ। আমাদের অঙ্গে কোন মৃদঙ্গী দিন-রাত্রি তাল বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করছে সে এক অপরূপ রহস্য। এই রহস্যের কিছু আভাস দেবে তারই ভার তোমার উপর দেওয়া গেছে। এ দায়িত্ব ভুলো না। ইতি ১৯।১০।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ফিজিয়লজি এবং প্যাথলজি নিয়ে সরল সরস প্রবন্ধ রচনা করতে। তখন আমি গল্প উপন্যাস কবিতার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম পরে লিখব, কিন্তু আর লেখা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহার, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং আমার লেখার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ আমাকে যেন পেয়ে বসেছিল। সর্বদাই মনে হ'ত তাঁর কাছে যাই। কিন্তু কোনও উপলক্ষ না থাকলে যাই কি ক'রে।

এর পর দুটো উপলক্ষ জুটে গেল পর পর।

আমার বাবা মা মনিহারীর বাড়ি থেকে ভাগলপুরে এলেন আমার কাছে। রবীন্দ্রনাথ আমাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখেছেন শুনে খুব খুশী হলেন তাঁরা। বাবা মা দু'জনেই রবীন্দ্রনাথের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন। বাবা একদিন আমাকে বললেন, "চল একদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে ওঁকে প্রণাম ক'রে আসি। তুমি আগে ওঁকে চিঠি লিখে একটা দিন ঠিক ক'রে নাও। উনি যেদিন বলবেন সেইদিন যাব আমরা।" লিখলাম চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে অনিলদার এক 'তার' পেলাম—অবিলম্বে চ'লে এস।

একদিনের জন্য গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ যে কি সম্ভ্রমপূর্ণ সহৃদয়তার সঙ্গে আমার বাবা-মাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন তা লিখে বোঝান যাবে না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনও নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপ করছেন। অতিথিদের সঙ্গে যে দূরত্ব রেখে সাধারণতঃ আমরা আলাপ করি, তা যেন ছিল না তাঁর অনাড়ম্বর আন্তরিক আলাপে সেদিন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাদের নিতান্ত আপন লোক। কোনও সাহিত্যিক আলোচনা হয়নি সেদিন। নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্তাতেই সময় কেটে গেল। বাবা কি ক'রে বাংলাদেশ ছেড়ে বিহার এলেন, শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে কেন ডাক্তারি শুরু করলেন, এই সব কথা। একটা কথা সেদিন বলেছিলেন মনে পড়ছে। বলেছিলেন, "বাঙালীরা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বাংলার বাইরে তাদের খাতিরও আছে খুব। যতদিন তারা নিজের শ্রেষ্ঠ জিনিস দান করতে পারবে, নিজেকে বিলিয়ে দিতে

পারবে, ততদিন তাদের এ গৌরব অম্লান থাকবে। কিন্তু প্রাদেশিকতার খাঁচায় বন্দী হলেই মৃত্যু।"

আমার দ্বিতীয় উপলক্ষ হল আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর জন্য। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর সরকার আর ইহজগতে নেই। তিনি মুঙ্গের কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। ওরকম কৃতবিদ্য রসিক লোক আমি খুব বেশী দেখিনি। তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। যে সব লেখকদের লেখা তাঁর ভালো লাগত তা মুখস্থ ক'রে ফেলতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো বটেই, অনেক গদ্য রচনাও গড়গড় ক'রে বলে যেতে পারতেন। তাঁর মুখে বহু বিখ্যাত লেখকের লেখা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—স্বদেশী এবং বিদেশী দুইই। ইংরেজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। তিনি একদিন এসে হাজির হলেন আমার কাছে এবং আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন আমি যেন একবার তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে জামাটা আমাকে দিয়েছিলেন সেটা দেখেছিলেন তিনি। বললেন, "আমাকেও যদি কবি ওই রকম একটা কিছু দেন, কৃতার্থ হয়ে যাব আমি। আপনি ওঁকে লিখুন না একবার।" বললাম, লিখব। কালীকিঙ্করবাবু চলে গেলেন মুঙ্গেরে। আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি তো দিলাম কিন্তু চিঠি লিখতে ব'সে দ্বিধা হতে লাগল। মনে হ'ল এভাবে চিঠি লেখা কি উচিত হবে? শেষে লিখেই ফেললাম দুর্গা বলে। লিখলাম অমুক তারিখে আপনার পরম ভক্ত একজন অধ্যাপককে নিয়ে আপনার কাছে যাব। যদি কোন অসুবিধা থাকে জানাবেন। আপনার চিঠি না পেলে আমি ওই তারিখেই যাব। কোনও চিঠি এল না। কালীকিঙ্করবাবুকে নিয়ে আমি নির্দিষ্ট তারিখে রওনা হ'য়ে গেলাম। শ্যামলীতেই কবির সঙ্গে দেখা হল। গিয়ে প্রণাম করতেই হেসে অভ্যর্থনা করলেন—"এস, এস। ইনিই বুঝি তোমার বন্ধু অধ্যাপক? বস।" বললাম, "ইনি শুধু অধ্যাপক নন। সত্যিকার একজন সাহিত্যরসিকও। যা ভালো লাগে তা একেবারে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলেন। আপনার কবিতা, প্রবন্ধ সব এঁর কণ্ঠস্থ।" রবীন্দ্রনাথ হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "যখন ছাপাখানা ছিল না তখন পণ্ডিতেরা বড় বড় গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেই রাখতেন। এ যুগেও যে এরকম লোকের দেখা পাব তা ভাবিনি। আজকাল তো দেখি, ছোট একটা গানও কেউ মুখস্থ রাখতে পারে না, হার্মোনিয়মের উপর বই রেখে গান গায়।" এই ধরনের নানা রকম কথাবার্তার পর আসল কথাটি বললাম।

"আমাকে যেমন আপনি একটি জামা দিয়েছেন, এঁর ইচ্ছে এঁকেও আপনি তেমনি কিছু একটা দেন।"

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "দেব, কিন্তু ছেঁড়া জিনিস দেব না। তুমি জেদ ক'রে নিয়ে গেলে, আমি কিন্তু লজ্জিত হয়ে আছি—"

"আজ আমরা সন্ধের ট্রেনেই চলে যাব। কাল এঁর কলেজ করতে হবে—"

"যাবার আগে এসো, তখন দিয়ে দেব। আমার কি আছে না আছে, তা আমার চেয়ে নীলমণি ভালো জানে। নীলমণি এখন এখানে নেই—"

"আমরা সন্ধের সময়ই আসব—"

এরপর কালীকিঙ্করবাবু বললেন, "বনফুল ভারতবর্ষ পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নিয়ে একটা নাটক শুরু করেছেন। আপনার চোখে পড়েছে কি?"

"চোখে পড়েছে। কিন্তু পড়া হয়নি। শেষ হ'লে পড়ব।"

আমি বললাম, "আপনি যদি পড়েন তাহলে শেষ হলে ফাইলগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

"দিও। তোমরা উঠেছ কোথায় ?"

"আমার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে। এখন তাহলে উঠি। সন্ধের সময় আসব—"

কালীকিংকরবাবু আমার ভায়ের শ্বশুরবাড়িতে যেতে রাজি হলেন না। তিনি অতিথি ভবনে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যখন আমরা গেলাম তখন দেখলাম রবীন্দ্রনাথের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গেই গল্প করছেন তিনি। আমাদের দেখতে পেয়েই বললেন—"এস। অধ্যাপক মশাইকে একটা সামান্য চাদর দিলাম। একেবারে নতুন। উনি ওটা পরলে খুশী হব।"

কাগজে মোড়া একটা সিল্কের চাদর দিলেন। দেখলাম পাট ভাঙ্গা হয়নি। প্রণাম ক'রে চলে এলাম আমরা।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমার 'শ্রীমধুসূদন' নাটক শেষ হওয়া মাত্রই আমি তার 'ফাইল কপিগুলি' অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিলাম যে তাঁর শরীরটা খুব সুস্থ থাকছে না। এ-ও একবার মনে হয়েছিল যে এখন ওটা পাঠানো কি সমীচীন হবে, কিন্তু তবু আমার তর সইছিল না। আমার এই নূতন ধরনের জীবনী নাটকটা রবীন্দ্রনাথের কেমন লাগবে তা জানবার লোভ আমি সামলাতে পাচ্ছিলাম না। লোভ যে শুধু প্রশংসার লোভ তা নয়, সমালোচনা শোনবার লোভও ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন দোষত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি রবীন্দ্রনাথের উত্তর এসে গেল।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

ঝাপসা দৃষ্টি এবং লুপ্ত অবকাশ নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পড়ে তোমার মধুসূদন শেষ করেছি, চরিত্র-চিত্র উজ্জ্বল হয়েছে কিন্তু এত বেশী ইংরেজির মিশোল চলবে কী ক'রে ? যদি বল জিনিসটি কলেজি দলের জন্যেই লেখা তাহলে আপত্তি নেই কিন্তু মধুসূদনের জীবন-বৃত্তান্তকে পূর্ণতা দেবার জন্যে যে স্বপ্নের সহায়তা নিয়েছ, সেটাকে আমি দুর্বলতা ব'লে মনে করি। যদি আগাগোড়াই স্বপ্নের সৃষ্টি করতে সে একটা চীজ হোতো কিন্তু স্বপ্নের বাস্তবে এক ঘাটে জল খাবে এমন সমন্বয়কে জোড়া-তাড়া বলা যায়, কিন্তু তার বাঁধন নেই, কোনো সাহিত্যিক চেম্বার্লেন এদের স্থায়ী মিলন ঘটাতে পারবে না। ইতি ১৯।১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলা বাহুল্য, চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম না। মনে হ'ল উনি তাড়াহুড়ো ক'রে প'ড়ে যা হোক একটা মন্তব্য লিখে দিয়েছেন,—নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, বইটার প্রতি সুবিচার করেন নি। কিন্তু একথা তো লেখা যায় না আবার। মনের দুঃখ মনেই চেপে ছিলাম। কি আর করব। কিন্তু কোনও অদৃশ্য বার্তাবহ বোধহয়

আমার মনের দুঃখটা সঞ্চারিত করেছিল তাঁর মনে। এরই নাম বোধহয় 'টেলিপ্যাথি'। ঠিক দু'দিন পরে আর একটা চিঠি পেলাম রবীন্দ্রনাথের।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

তাড়াতাড়িতে লেখা আমার চিঠির সুরে ক্ষুণ্ণ হোয়ো না। বাংলা সাহিত্যে এই মধুসূদন নাটিকাটি নূতনত্ব পেয়েছে। মধুসূদনের চরিত্র বাস্তব হয়ে উঠেছে। কিন্তু তুমি মধুসূদনের জীবন-বৃত্তান্তকে সম্পূর্ণতা দেবার লোভ সামলাতে পারো নি। ভুলেচ এতো জীবন-বৃত্তান্ত নয়, এ যে নাট্য। না হয় তথ্য কিছু বাদ পড়ল। অবাস্তবের সহায়তায় বাস্তবের উপর শমনজারি করো কেন? এটা বেআইনী, অতএব আসামী সত্য আদালতে হাজির হয় নি। এই অংশগুলো ধের করে' দিলে আমার বিশ্বাস তোমার এই রচনাটির ভুত ছাড়ানো হবে। ইতি ২১।১।৩৯

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

এর উত্তরে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে জানালাম যে বইটার ভুল-ত্রুটি আমি সংশোধন করে দেব, কিন্তু তার আগে সামনা-সামনি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা হ'লে ব্যাপারটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট হবে। আপনি আদেশ করলেই আমি যাব। 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে একটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল। মধুসূদন যখন মাদ্রাজে ছিলেন তখনকার ঘটনা-পরম্পরাকে 'বাস্তব' রূপে দিতে হ'লে—খৃষ্টান মাদ্রাজীদের আনতে হ'ত নাটকে। সেটা আমার পছন্দ হয়নি। তাই আমি একটা স্বপ্নের অবতারণা করেছিলাম। গৌরদাস বসাক যেন স্বপ্ন দেখছেন যে তাঁর বন্ধু মধুসূদন কলকাতায় এসেছেন। স্বপ্নে গৌরদাসের সঙ্গে আলাপের সময়ই তাঁর মাদ্রাজের প্রবাস কাহিনী ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটা পছন্দ করলেন না। চেম্বার্লেন তখন হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন। আমার চেষ্টাও তেমনি ব্যর্থ হয়েছে এই কথাটা ব্যঙ্গের সুরে আমাকে জানিয়ে দিলেন কবি।

চিঠি লিখে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। ভয় হ'তে লাগল এই সামান্য বিষয় নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাতে রাজি হবেন কি? মনে হ'তে লাগল 'সামনা-সামনি আলোচনা'র কথাটা না লিখলেই পারতাম। কিন্তু বরাবর যা হয়েছে এবারও তাই হ'ল। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যি সত্যি কত বড় তার প্রমাণ আবার পেলাম। একদিন হঠাৎ অনিলদার (অনিল চন্দ) টেলিগ্রাম এল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে যেতে লিখেছেন একটা নির্দিষ্ট তারিখে। যখন টেলিগ্রাম পেলাম তখন সকালের ট্রেনটা চলে গেছে। সন্ধের ট্রেনে না গেলে নির্দিষ্ট তারিখে পৌঁছানো যাবে না। ট্রেনটা তখন ভাগলপুর থেকে সন্ধের সময় ছেড়ে ভোর চারটের সময় বোলপুরে পৌঁছত। অনিলদাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে সেই ট্রেনেই রওনা হ'য়ে গেলাম। তখন শীতকাল। সমস্ত রাত্রি প্রায় জেগেই ব'সে রইলাম, পাছে বোলপুর পেরিয়ে যায়।

বোলপুরে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ অন্ধকার। ঠাণ্ডাও খুব। স্টেশনে নেমেই ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিওলাই খবর দিলে গুরুদেব এখন

শ্যামলীতে আছেন। শ্যামলীর সামনে যখন গাড়ি এসে থামল তখন দেখলাম শ্যামলীর সামনের বারান্দায় লণ্ঠন নিয়ে কে একজন বসে আছে। গাড়ি থামতেই সে উঠে দাঁড়াল।

"ভাগলপুর থেকে ডাক্তারবাবু এলেন কি ?"

"হ্যাঁ—"

লোকটি এগিয়ে আসতেই চিনতে পারলাম—নীলমণি।

"আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বাবামশায় বললেন ভোরের ট্রেনে আপনি আসবেন। চলুন, ভিতরে চলুন।"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভিতরে গেলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক কাপ গরম চা আর খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে হাজির হ'ল নীলমণি।

"আপনি চা খান, বাবামশায় এখনি আসবেন।"

কাছেই 'হড়াস্' 'হড়াস্' ক'রে জল-ঢালার শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি পাশের ঘরেই।

"কিসের শব্দ নীলমণি ?"

"বাবামশায় চান কচ্ছেন—"

"এই শীতে ! এত ভোরে ?"

"রোজই তো করেন। আমি যাই খাবার টাবার ঠিক করি গিয়ে, এইবার খাবেন।"

নীলমণি চলে গেল। স্নানের শব্দও থেমে গেল একটু পরে। আমার সঙ্গে একটা বই ছিল, সেইটের পাতাই ওলটাতে লাগলাম বসে বসে।

"বলাই, এসে গেছ ?"

সুসজ্জিত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন পিছনের একটা দরজা দিয়ে। গরম জামা-কাপড়ে প্রায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। মাথাতেও একটা কালো কান-ঢাকা টুপি। মুখটি কেবল অনাবৃত। সাদা গোঁফ দাড়ির মহিমার সঙ্গে লাল টুকটুকে গাল দুটির আর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টির প্রসন্নতা ভারি অপরূপ লাগল।

"আপনার শরীর ভালো আছে তো ?"

"এ বয়সে কি আর শরীর ভালো থাকে, চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কোনও রকমে—"

মনে হ'ল বলি—"আপনাকে আমি কষ্ট দিলুম"—কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে মনে হ'ল তিনি পরমাত্মীয়। তাঁর কাছে এসব লৌকিক বিনয়-বচন নিতান্তই অশোভন হবে। চুপ ক'রে রইলাম। নীলমণি এসে প্রবেশ করতেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—

"নীলমণি, এবার আমাদের খাবার দাও"—তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমি যা খাই তা কি তুমি খাবে ?"

"আপনি কি খান তা তো আমি জানি না।"

"দেখ তাহলে। নীলমণি আমার খাবার আন।"

নীলমণি চলে যেতেই আমাকে বললেন, "নীলমণি তোমার জন্যেও খাবার করেছে। গন্ধ পাচ্ছিলুম। তুমি সকালে কি খাও—"

"চা খাই। আর তার সঙ্গে কখনও রুটি, কখনও লুচি, তরকারি দিয়ে—"

"নোনতা খাবার বেশী পছন্দ। না?"

নীলমণি খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটি কাঁসার থালার মাঝখানে রূপোর বাটি দিয়ে কি যেন ঢাকা রয়েছে। আর তার চারিপাশে তরকারির মতো কি যেন সাজানো রয়েছে সব। কোনটাই পরিমাণে বেশী নয়, কিন্তু মনে হ'ল সংখ্যায় অনেকগুলি। বারো চোদ্দ রকম।

রবীন্দ্রনাথের সামনে থালাটি রাখতেই তিনি বাটিটি তুলে ফেললেন। সাধারণতঃ থালার মাঝখানে যতখানি ভাত বেড়ে দেওয়া হয় পরিমাণে প্রায় ততখানিই একটা সাদা জমানো জিনিস বেরিয়ে পড়ল বাটিটা তুলতেই।

"ওটা কি—"

"ক্রীম। আর এগুলো নানা রকম ডাল, আর ফল ভিজানো। তুমি খাবে?"

"না।"

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম মুগের ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস, আখরোট তো আছেই, আরও নানারকম কি আছে, একটা তো উচ্ছের বিচির মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু ও বিষয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করা অভব্যতা হবে ভেবে চুপ ক'রে রইলাম। নীলমণি দুটো কাঁচা ডিম ভেঙে একটা ডিশে ক'রে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে নিলেন। নীলমণি দু'টুকরো মাখন-মাখানো রুটিও আনল।

"বলাইয়ের খাবার দাও।"

"এই যে আনছি—"

নীলমণি ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেল।

আমি বললাম, "আপনি শুরু করুন না। আমি একটু আগে চা খেয়েছি তো—"

রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ডিশে চুমুক দিয়ে ডিমটা খেয়ে নিলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো শিশি বার করলেন। একটা দেখলাম মার্কের গ্লুকোজ আর একটা স্যানাটোজেন। দুটো থেকেই দু'চামচে ক'রে বার ক'রে মেশালেন ক্রীমের সঙ্গে। তারপর কিসমিস পেস্তা সহযোগে খেতে লাগলেন সেটা।

বললেন, "চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তাই ডাক্তাররা এই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ঝাপসা দৃষ্টি আর স্বচ্ছ হবে না জানি, তবু হুকুম তামিল করতে হবে, তা না করলে হৈ হৈ বাধিয়ে দেবে সবাই।"

পরক্ষণেই কফি এল। কাপে নয়, কেতলিতে। 'কফি' ব্রু (brew) করার যে বিশেষ ধরনের কেতলি থাকে—তাতে। কেতলির ঢাকনির উপর কাঁচের একটা ছোট বালবের মতো ছিল। তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কফি ফুটছে। কেতলির নীচে আগুন ছিল বোধহয়।

রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, "বলাইয়ের খাবারটা আগে দাও।"

পরমুহূর্তে আর একটা চাকর আমার খাবার নিয়ে এল। গরম ফুলকো লুচি, আলুর ছেচকি, গরম সিঙাড়া, কচুরি, সন্দেশ। তাছাড়া কেক, বিস্কুট, আপেল, কলা। তার সঙ্গে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম। আরও খাবার ছিল, কি কি ছিল এখন ঠিক মনে পড়ছে না। অত সকালে আমার জন্যে এত রকম খাবারের আয়োজন করা হয়েছে দেখে অবাক হ'য়ে গেলুম।

বললাম, "এতো তো আমি খেতে পারব না।" রবীন্দ্রনাথ একবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন আমার দিকে। চোখে হাসি চিকমিক করছে!

"তুমি তো খাইয়ে লোক। আরম্ভ ক'রে দাও—।" আরম্ভ করে দিলাম। রবীন্দ্রনাথের খাওয়া শেষ হ'তেই নীলমণি থালাটা সরিয়ে নিয়ে পাঁউরুটি দু'খানা এগিয়ে দিল আর একটা প্লেটে। রবীন্দ্রনাথ মধুর শিশি থেকে মধু বার ক'রে তাতে মাখিয়ে খেতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম মধুটা বিদেশ থেকে আমদানী। অস্ট্রেলিয়ার মধু। বললাম, "বিদেশী মধু খাচ্ছেন, দেশী টাটকা মধু পাওয়া যায় না এখানে?"

"যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু দেশে বোধহয় মধুর অভাব আছে। তাই তাঁরা 'মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এই নীতি অনুসরণ করেন। গুড়টা আজকাল আমার তেমন হজম হয় না।"

রুটি খাওয়া শেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আবার টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। সেখান থেকে এবার বেরুল আর একটা ফাঁকমুখো শিশি। তাতে দেখি মুড়ি রয়েছে। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মুখটা বড় বেশী মিষ্টি হ'য়ে গেল। একটু নোনতা খেয়ে ঠিক ক'রে নেওয়া যাক। খাবে তুমি? এর সঙ্গে কুসুম বিচি ভাজাও আছে—"

"দিন—"

একটি প্লেটে কিছু মুড়ি ঢেলে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। নিজে শিশি থেকেই একমুঠো বার ক'রে নিয়ে মুঠো থেকেই খেতে লাগলেন। দাড়ির উপর অনেক মুড়ি ছড়িয়ে পড়ল।

"এবার কফি খাওয়া যাক। তুমি কফি খাও তো?"

"খাই।"

সেকালের বড় ব্রেকফাস্ট্ কাপের প্রায় তৃতীয়-চতুর্থাংশ দুধে ভরতি ক'রে তার সঙ্গে কফি মেশালেন।

"আমি একটু চিনি দিয়ে খাব। তোমার জন্যে স্যাকারিন আছে।"

স্যাকারিনের শিশিটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন—"তুমি নাটক লেখবার আর লোক পেলে না? মধুসূদনকে নিয়ে লিখলে।"

দেখলাম চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করছে। একটু চুপ করে থেকেই বললাম, "ওঁর চরিত্রে নাটকের অনেক উপাদান আছে যে। তাছাড়া ওঁর জীবন-চরিত প'ড়ে আমার মনে হয়েছিল যে ওঁর কবিসত্তাকে জীবনচরিতকারেরা যথেষ্ট মর্যাদা দেননি। উনি যে উচ্ছৃংখল ছিলেন এইটেই বেশী ফুটেছে যেন। কেন উচ্ছৃংখল ছিলেন, কি উদ্দাম প্রেরণা ওঁকে উচ্ছৃংখল করেছিল, সেটা যেন উহ্য থেকে গেছে। তাই আমার মনে হ'ল—"

"নাটক তোমার ভালো হয়েছে। তবে ওসব আলোচনা নয়, এখন আমি লিখতে বসব। এগারোটা পর্যন্ত লিখব। তারপরে তোমার নাটকটা নিয়ে পড়া যাবে—"

তারপর হঠাৎ জানালার দিকে চেয়ে বললেন—"একি তুমি এত দেরিতে এলে। আমার যে কফি খাওয়া হ'য়ে গেল।"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "খেজুর রস খাবে? টাটকা রস এখনই পেড়ে এনেছে—"

"খেতে পারি—"

"নীলমণি দাও তাহলে দু'গ্লাস—"

অপূর্ব খেজুর রস অনেক দিন পরে খেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগল।

খেজুর রস খাওয়া শেষ হ'লে রবীন্দ্রনাথ বললেন—"এরপর দু'এক চুমুক গরম চা খেয়ে নিলে কেমন হয়। তুমি তো চা খাওনি দেখছি। তুমি এক কাপ নাও, আমাকেও এক কাপ দাও। দু'একটা কচুরিও দিও আমাকে। তুমি ফল একেবারে ছুঁলে না যে। গীতার মা ফলেষু কদাচন—তোমার motto না কি!"

"চায়ের সঙ্গে ফল ভালো লাগে না তত।"

"বিকেলে খেও। এখন খেয়ে একটু ঘুমুবে কি? রাত্রে ট্রেনে তো ঘুম হয়নি নিশ্চয়।"

"না এখন ঘুমুব না। একটু ঘুরে ফিরে আসি।"

"সেই ভালো। এখানে বন্ধুত্ব হয়েছে না কি কারো সঙ্গে—"

"অনেককেই চিনি।"

"বেশ। এগারোটার পর এসো। এখানেই খেও। আমি দু'খানা রুটি খাই। তুমি ভাত খাবে নিশ্চয়—"

"কেন আমিও রুটি খাব।"

"নীলমণি, বলাইও রুটি খাবে। এখানে কিন্তু সবাই নিরামিষ। তুমি শুনেছি মাংসাশী।"

"আমি নিরামিষও ভালোবাসি।"

"বেশ, ওই কথা রইল তাহলে।"

ঠিক এগারোটার সময় ফিরে দেখি রবীন্দ্রনাথ লেখা শেষ ক'রে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। নীলমণি দু'খানি শুকনো রুটি এবং একটু নিরামিষ তরকারি দিয়ে গেল আমার সামনেই।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমি দুপুরে বেশী খাই না। যা খাবার সকালেই খেয়ে নি। এখনও বিশেষ খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু বউমার পীড়াপীড়িতে কিছু খেতে হয়। তুমি এখন খাবে কি?"

"সাধারণতঃ আমি বারোটার পরে খাই। তবে এখন খেয়ে নিতেও আপত্তি নেই। খিদে কিন্তু পায়নি এখনও।"

"বেশ পরেই খেও। তোমার রান্নাও হয়নি বোধহয় এখনও। তোমার নাটক সম্বন্ধে আলোচনাটা এখনই শেষ ক'রে ফেলা যাক।"

রুটি খাওয়া শেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন—"তোমার নাটক থেকে স্বপ্নটা বাদ দিতে হবে। ওটা বেমানান হয়েছে। মধুসূদনের মাদ্রাজের জীবন না হয় বাদই পড়ল, ক্ষতি কি—"

"না, মাদ্রাজের জীবন বাদ দেওয়া যাবে না। মাদ্রাজেই উনি দু'বার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজি খৃষ্টানদের সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। সে সময় বাংলা দেশের দুর্ব্যবহারে উনি যে কত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তার অনেক খবর ওঁর অনেক চিঠিতে আছে। এ সব না দিলে ওঁর চরিত্রটা ঠিক ফুটবে না।"

"তাহলে সেটা অন্যরকম ক'রে কর। স্বপ্ন চলবে না। তেলে জলে মিশ খায় কখনো ?"

"শেক্‌সপীয়রের Midsummer Night's Dream তো খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা বাস্তব—"

"স্বপ্নকে মূর্ত করবার জন্যেই যেটুকু বাস্তবের দরকার তাই আছে ওতে। কিন্তু তোমার এ যে অন্য জিনিস—"

চুপ ক'রে রইলাম।

তারপর বললাম, "আচ্ছা, ভেবে দেখব।"

রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন—"মধুসূদনের কবি-সত্তা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটাবার জন্যে মাদ্রাজ আনবার দরকার কি। ওটা বাদই দাও, তাতে তোমার নাটকের অঙ্গহানি হবে না।"

চুপ ক'রে রইলাম। মাদ্রাজ কিন্তু আমার বাদ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখের উপর সে কথা বলি কি ক'রে; চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। বইটার প্রথম সংস্করণ ওই স্বপ্নসুদ্ধই ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে স্বপ্নটা বাদ দিয়েছিলাম, কিন্তু মাদ্রাজের দৃশ্য ছিল একটা। নটবর নামে একটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলাম। মাদ্রাজ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর কিছু বললেন না। একেবারে শেষ দৃশ্যের কথা তুললেন।

"শেষ দৃশ্যে মধুসূদনের ভূতকে এনে তুমি আর একটা ছেলেমানুষি করেছ। ওটাও বাদ দাও। ওটা ওঁর জীবনীতে কি কোথাও পেয়েছ ?"

"না, ওটা কল্পনা করেছি। ওই শেষ দৃশ্যটা লিখতে আমার সবচেয়ে বেশী সময় লেগেছে। মধুসূদনের জীবনের শেষ দৃশ্য যে কি তা সবাই জানে—হাসপাতালে রোগযন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে মারা গেছেন। এই বাস্তব ছবিটা নাটকের শেষ দৃশ্য করলে কি মানাতো ? তাই আমি কল্পনা করেছি মধুসূদন তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তাঁর সব বইগুলো দিয়ে মহাযাত্রায় চলে গেলেন। এতে দোষটা কি হয়েছে—"

"ভূত না এনে অন্য রকম ক'রে কর সেটা তাহলে—"

"ভূত থাকলে বা! হ্যামলেটে ভূত নেই ? নাটকের প্রয়োজনে অনেক বড় বড় নাট্যকার একাজ করেছেন। আমার শেষ দৃশ্যটা নাটকীয় হয়েছে কিনা বলুন। তা যদি না হ'য়ে থাকে তাহলে ওটা বদলে দেব।"

রবীন্দ্রনাথ স্মিতমুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"আচ্ছা, আর একবার ভেবে দেখি, তাহলে। তুমি উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছ দেখছি। আমারও ও রোগটা আছে। থাক এখন ও আলোচনা—"

নীলমণির ঠিক এই সময়ে আবির্ভাব হ'ল দ্বারপ্রান্তে।

"ডাক্তারবাবুর খাবার হ'য়ে গেছে। বাথরুমে গরম জল দিয়ে দিয়েছি—"

উঠে পড়লাম।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"বিকেলে চা খেতে এস। তখন তোমার নাটকের শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে যা বলবার বলব।"

নীলমণি খাওয়ার আয়োজন ভালোই করেছিল। ভাত রুটি দুইই ছিল। আর ছিল

চমৎকার ডাল, আলু পোস্ত, আলুর দম, বেগুন ভাজা, বড়ি ভাজা, আর অম্বল। আরও দু'একটা কি যেন তরকারি ছিল, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। দই ছিল।

আহারাদির পর নীলমণিকে বললুম, "এবার আমি একটু ঘুমুই। তুমি চায়ের সময় আমাকে তুলে দিও।"

সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি। অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নীলমণি উঠিয়ে দিতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম।

"গুরুদেব উঠেছেন ?"

"উনি তো ঘুমোন না। সমস্ত দিনই লেখাপড়া করেন। এইবার ওঁকে চা দেব। আপনিও চলুন।"

দেখলাম রবীন্দ্রনাথ চায়ের টেবিলে ব'সে তখনও পড়ছেন। একটা মোটা 'জিওলজি'র (Geology) বই। আমাকে দেখে বইটা মুড়ে সরিয়ে রাখলেন।

বললেন, "তোমার নাটকের শেষ দৃশ্য যেমন আছে তেমনি থাক। তুমি যখন বদলাতে চাইছ না, তখন আমি আর জোর করব না। নাটকের শেষ হিসাবে ভালোই হয়েছে। থাক যেমন আছে।"

নীলমণি চা ছাঁকতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন—"তুমি আমার কথা শুনলে না, কিন্তু আমি নিবেদিতার অনুরোধে গোরার শেষটা বদলে দিয়েছিলাম।"

"কি রকম ! শুনিনি তো এখবর। শেষটা বদলে দিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। নিবেদিতা নাছোড় হ'য়ে ধরে বসল। আবার ঢেলে সাজালাম সব !"

"গোরার শেষটা অন্যরকম ছিল ?"

"হ্যাঁ। আমি গল্পটা বিয়োগান্ত করেছিলাম। সুচরিতা আর গোরার বিয়ের যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন সত্যটা বেরিয়ে পড়ল যে গোরা সায়েবের ছেলে। জাতে সে যা-ই হোক, কিন্তু মতে সে হিন্দুধর্মের উগ্র ধ্বজাবাহক। এই নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হ'য়ে তাই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। সে নিজের ঘরে দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে বসে ছিল। এমন সময় সুচরিতা এসে ঘরে ঢুকল। সে গোরার দিকে চেয়ে বলল—'আপনাকে আমি গুরু বলে স্বীকার করেছি। আপনিই বলে দিন আমার এ অবস্থায় কি করা উচিত। আপনি যা বলবেন তাই করব।' গোরা কোনও উত্তর দিতে পারলে না। যেমন বসেছিল তেমনি বসেই রইল। সুচরিতা নীরব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর কোন উত্তর না পেয়ে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেল। গল্পটা ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে বেরুচ্ছিল। কিন্তু ওটা আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। নিবেদিতা তখন বলল—গোরার শেষটা কি রকম করেছেন দেখি। দেখালাম। পড়েই সে বলে উঠল—না না, এ রকম হতে পারে না। ওদের মিলন না হলে বড়ই নিদারুণ ব্যাপার হবে যে। বাস্তব জগতে যা ঘটে না কাব্যের জগতেও কবি সেটা ঘটিয়ে দেবেন না ? কাব্যের ও জগৎ তো আপনার সৃষ্টি, ওখানে আপনি অত নিষ্ঠুর হবেন না। ওদের মিলন ঘটিয়ে দিন। দিতেই হবে। এমন জেদ করতে লাগল যে রাজি হ'তে হল। সবটা আবার ঢেলে সাজালাম।"

বললাম, "এখন যেটা আছে সেটাও বেশ ভালো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি আগে যে ভাবে শেষ করেছিলেন সেটা যেন আরও ভালো।"

চুপ করে রইলেন রবীন্দ্রনাথ।

তারপর বললেন, "তোমার নাটকটা নতুন পথের সন্ধান এনেছে। আমাকে নিয়েও একটা লিখো।"

"আপনি তো মহাকাব্যের বিষয়। নাটকের পরিধিতে আপনাকে ধরা যাবে কি? হার্ডি অবশ্য নেপোলিয়নকে নিয়ে মহা-নাটক লিখেছেন একটা। সেটা কিন্তু আসলে মহাকাব্য। তবে আপনার একটা বিশেষ 'মুড' বা বিশেষ ছবিকে নাটকে আঁকা যেতে পারে। সে চেষ্টা করব।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক পরেই 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রসংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে আমি 'অন্তরীক্ষে' নামে একটি একাঙ্ক নাটিকা লিখেছিলাম। সে নাটিকায় আমি রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিয়ে আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছি অন্তরীক্ষে অনুষ্ঠিত বিশ্বকবিসভায়। এ নাটক যখন বেরিয়েছিল তখন রবীন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থানের পথে অন্তর্ধান করেছেন, মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি কি টের পেয়েছেন আমি এ নাটক লিখেছি? 'অন্তরীক্ষে' নাটকে সবটাই অসম্ভব, সবটাই ভুতুড়ে কল্পনা, এটা ভালো লেগেছে কি তাঁর?' এর উত্তর চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে।

সেদিন আমার নাটকের আলোচনা শেষ হ'য়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি ভুতে বিশ্বাস কর?"

"করি। আমি যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি তখন একবার ভুত দেখেছিলাম।"

গল্পটা বললাম তাঁকে। এটা আমি ছোটগল্প আকারেও লিখেছি পরে। গল্পটার নাম 'ঘটনা'--বনফুলের গল্প-সংগ্রহ দ্বিতীয় শতকে আছে। শুনে রবীন্দ্রনাথ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন—"আমার মনে হয় মৃত্যুর পর সব শেষ হ'য়ে যায় না। আমরা ছেলেবেলায় প্ল্যানচেট করতাম। স্পিরিট এলে প্ল্যানচেটে লেখা হয়ে যেত পেন্সিল দিয়ে। এ ভাবে আসতে বাধ্য করলে অনেক সময় অনেক স্পিরিট অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। একবার আমরা আমাদের এক বৌঠানের স্পিরিটকে আনিয়েছিলাম। তিনি খুব ভালবাসতেন আমাকে। প্ল্যানচেটে প্রথম যে লেখাটা বেরুল তাতে আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলাম। লেখা হ'ল—'খোকন, তুমি কী যে কর!' আমি কোনও দুষ্টুমি করলে বৌঠান ঠিক ওই ভাষাতেই বকতেন আমাকে। ওর চেয়ে তীব্রতর বকুনি তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না কখনও।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—"এবার আমার যখন ইরিসিপ্লাস হয়েছিল তখনও অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার একটা। নিদারুণ যন্ত্রণায় আমি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমি বিরাট একটা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি। যতদূর দৃষ্টি চক্রবাল রেখা নেই। আর আমিও ঠিক যেন মাটির উপর দাঁড়িয়ে নেই, শূন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর হঠাৎ আবার জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম ডাক্তার নীলরতন সরকার আমার দিকে চেয়ে চিন্তিত মুখে বসে আছেন। মনে হয় মুহূর্তের জন্য আমি বোধহয় মারা গিয়েছিলাম। পরলোকের একটা আভাস পেয়েছিলাম ক্ষণিকের জন্য। তারপর নীলরতনবাবু আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলেন।"

আবার চুপ করলেন।

তারপর বললেন—"এর পর যে কবিতাগুলো লিখেছিলাম—সেগুলো যে বইয়ে সংকলিত হ'ল তাই তার নাম দিয়েছিলাম 'প্রান্তিক'। পড়েছো বইটা?"

"পড়েছি। আপনার সব বই-ই পড়েছি—"

এই সময় অনিলদা এসে বললেন—"লণ্ডন থেকে এক অধ্যাপক দম্পতী এসেছেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। অতিথি ভবনে এসে উঠেছেন।"

"জ্বালাতন"—অস্ফুটকণ্ঠে বললেন।

"কাল কোন-সময়ে ব্যবস্থা কর। এগারোটার পর। বলাই তুমি কাল থাকবে কি?"

"না, আমি সকালেই চলে যাব।"

"চল, আমিও তোমার সঙ্গে পালাই। দিন কতক কাটিয়ে আসি তোমার ল্যাবরেটরিতে।"

বললাম, "বেশ তো, বেশ তো। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। সত্যি যাবেন?"

"যেতে পারি, যদি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পার—"

"তা কি করে সম্ভব। আপনি স্টেশনে নাবলেই তো সবাই জেনে ফেলবে!"

রবীন্দ্রনাথ হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন। তারপর অনিলদাকে বললেন—"ওঁদের কাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিয়ে এস।"

অনিলদা চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"ল্যাবরেটরির কথায় মনে পড়ল—আমার ল্যাবরেটরির গল্পটা পড়েছ? তুমি তো ল্যাবরেটরির লোক, কেমন লাগল গল্পটা—"

বললাম, "বঙ্কিমচন্দ্র রোহিনী এঁকেছিলেন, আপনি সোহিনী এঁকেছেন। অতি চমৎকার হয়েছে চরিত্রটা।"

"অনেকে গাল দিচ্ছে—"

চুপ ক'রে রইলাম।

রবীন্দ্রনাথই বললেন—"গালের গালিচাতেই সারাজীবন বসে আছি। এ দেশে স্তুতি নিন্দার মূল্য ঠিক বোঝা যায় না। স্তুতিটা খোসামোদ কিনা, নিন্দাটা পরশ্রীকাতরতার ঝাঁজ কি না তা বুঝতে পারা যায় না অনেক সময়। এ দেশে রসিক যে নেই তা নয়, কিন্তু দেখছি রসিকরাও অনেক সময় পরশ্রীকাতর হয়। কেউ বড় হলেই, উপরে উঠলেই তাকে পা ধ'রে টেনে কাদায় নাবাবার চেষ্টা করাটাই এদেশে সমালোচনার পদবী পেয়েছে। তোমার অনেক বন্ধুও এ কাজে ব্রতী। বিদেশে গুণের কদর আছে—। তোমার গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করেছ?"

"না—"

"কর। এদেশে সবাই নিজেদের পিসে খুড়ো ছেলে ভাগ্নেদের সামনে এগিয়ে দিয়ে পিছনে ঠেলে দেবে।"

"আমি কি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারব?"

"খুব পারবে। সারাজীবন তো ইংরেজিই পড়েছ। নিজে ক'রে তারপর কোন সাহেবকে দিয়ে বা ইংরেজি-নবীশ ভালো প্রফেসার দিয়ে দেখিয়ে নিও। আমিও প্রথমে ভেবেছিলাম যে ইরেজি লিখতে জানি না। কিন্তু জলে নেবে সাঁতার কাটতে শিখলাম। তুমিও নেবে পড়।"

এরপর ওঁর একজন আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে, জোড়াসাঁকো থেকে কারা যেন আসছেন সন্ধ্যের ট্রেনে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"নীলমণিকে আর বউমাকে খবরটা দিয়ে দাও।"

আমি প্রণাম ক'রে উঠে এলাম।

ভাগলপুরে ফিরে এসে দেখলাম আমার এক রোগী এক ভাঁড় সরষে ফুলের মধু আমার জন্যে নিয়ে এসেছে। আমি সমস্তটা একটা কাঁচের বড় শিশিতে ঢেলে সেটা পাঠিয়ে দিলাম রবীন্দ্রনাথকে একজন ভদ্রলোকের মারফত। ভদ্রলোক রেলে কাজ করতেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনি বললেন তিনি নিজে গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসবেন মধুটা। দিন কয়েক পরেই চিঠি এল।

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

এই মাত্র অক্ষত কাচ ভাণ্ডে তোমার মধু পাওয়া গেল—তুমি যে নাম গ্রহণ করেছ, এই দানের দ্বারা তা মধুর ভাবে সার্থক হয়েছে। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৯।১১।৩৯

রবীন্দ্রনাথ

এর পর রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার আর যাওয়া ঘটেনি। তবে আমার লেখা বই পাঠিয়ে ছিলাম দু'এক খানা। বই পেয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কোন তারিখ নেই। আমাকে লেখা এই তাঁর শেষ চিঠি।

বলাইচন্দ্র,

মাঝে মাঝে বৈকালিক জ্বর আসে। শরীরটা সত্যাগ্রহ করতে প্রস্তুত। এর উপরে একটা প্রতিশ্রুতি ঘাড়ের উপর চড়ে বসেছে। গল্প লিখতে হচ্ছে দায়ে পড়ে। তোমার লেখা পড়তে কিছু মন দেওয়া উচিত সে পরিমাণ মন আমার নেই—তলায় যেটুকু আছে সেটুকু তুলে আনতে অনেকখানি দড়ির টান লাগে—ছাতির জোর ততটা নেই—অতএব আপাতত ইতি—

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের খবর পাচ্ছিলাম সজনীকান্তের কাছ থেকে। আমার সম্বন্ধে সজনীকে তিনি নাকি অনেক কিছু বলেছেন। সে 'অনেক কিছু' এত গৌরবজনক যে তা আর আমি লিখলাম না।

হঠাৎ একদিন সজনীর একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথকে কলকাতায় আনা হয়েছে। তিনি খুব অসুস্থ। এই বোধ হয় তাঁর শেষ অসুখ। আমাকে দেখে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি অবিলম্বে চ'লে এস।

আমি যাব-যাব করছি এমন সময় খবর এল সব শেষ হয়ে গেছে।

রেডিওর সামনে ব'সে বন্ধুবর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মুখে সমস্ত দেশের বুক-ফাটা হাহাকার শুনতে লাগলাম।

সমস্ত দিন যে কি ভাবে কাটল তা বর্ণনা করতে পারব না। রাত্রে ঘুম হ'ল না। সকালে উঠেই একটা কবিতা লিখে "প্রবাসী"তে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আর একটা কবিতা (নাম "সেদিন") লিখে পাঠালাম ভারতবর্ষে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমি একটিমাত্র কবিতা তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলাম "দেশ" পত্রিকায়। আফসোস হতে লাগল কেন আরও বেশী লিখিনি। তারপর লিখলাম "অন্তরীক্ষে", তবু তৃপ্তি হয়

নি। বার বার মনে হয়েছে, যা করা উচিত ছিল তা যেন করিনি। তাঁর বিরাট প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিরাট হৃদয়—আমাকে কিছুক্ষণের জন্য স্পর্শ করেছিল, তিনি আমাকে আপন জনের মতো কাছে টেনে বসিয়েছিলেন, হাসিমুখে আমার আবোল-তাবোল প্রগল্‌ভতা সহ্য করেছিলেন এই আনন্দের উজ্জ্বল বর্ণ-বিচিত্র স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে কেবল। চিরকাল থাকবে।

প্রণাম

[১]

রবীন্দ্রনাথ আজ নেই :
আছে তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি।
নিজের সৃষ্টিতেই আজ রূপান্তরিত
তাঁর ব্যক্তি-সত্তা।
সেই সৃষ্টির বিশালত্বকেই
আজ আমরা প্রদক্ষিণ করছি
মহা-বিস্ময়ে।

সে সৃষ্টি বিরাট অরণ্যের মত।
জটিল অথচ সুন্দর,
গহন অথচ গোপন নয়।
অসংখ্য রূপের অনন্য প্রকাশ
অলঙ্কৃত করেছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে,
তার বনস্পতিকে,
ওষধিকে,
ক্ষুদ্রতর লতা-গুল্মকেও।
তার পরমাশ্চর্য ব্যাপ্তিতে
বেজেছে অসীমের সুর,
উদাত্ত তার গাম্ভীর্যে
লেগেছে চিরন্তনের বর্ণ-বিন্যাস।

সে সৃষ্টি নগাধিরাজ হিমালয়ের মত।
একদিকে তা স্পর্শ করে আছে মৃত্তিকা
অন্যদিকে আকাশ।

একদিকে তা ধ্যান-মৌনতায় স্তব্ধ,
অন্যদিকে তা নির্ঝরের কলোল্লাসে চঞ্চল :
একদিকে তা ধ্যান-মগ্ন শঙ্কর,
অন্যদিকে তা মরকত-সন্নিভ শ্যাম-শোভায়
বুধ গ্রহের মত চির-কিশোর।
সে সৃষ্টি মহাসমুদ্রের মত দিগন্তস্পর্শী,
যে মহাসমুদ্র তরঙ্গ-চঞ্চল,
যে মহাসমুদ্র রত্নাকর,
যে মহাসমুদ্র আকুল আগ্রহে
আঁকড়ে আছে পৃথিবীকে,
যে মহাসমুদ্র গভীর স্তরে
নিস্তরঙ্গ সমাধি-মগ্ন :
যে মহাসমুদ্রে
মহাকাশ প্রতিবিম্বিত,
প্রতিফলিত
সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র মেঘমালা :
কিন্তু তবু যা নির্বিকার,
তবু যা সত্য-শিব-সুন্দরের মহাকাব্যে
একান্ত আগ্রহে নিমগ্ন।

সে সৃষ্টি আলোকের মত
স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, ক্ষিপ্রগতি,
বহু দূরগামী।
সে সৃষ্টি কল্পনার নানা বৈচিত্র্যে সজ্জিত
অনন্যপূর্ব এমন এক মহানগরী
যা বাস্তবে আজও সৃষ্টি করেনি কেউ,
কল্পলোকের অলকাপুরীতে
চিরস্থায়ী মণি-মাণিক্য ভূষণে
যা অনবদ্য, অপরূপ
স্বয়ং-প্রভ, অনির্বচনীয়।
এই সৃষ্টির সমুজ্জ্বল কিরণে
আমরাও আজ আলোকিত :
আমাদেরও চিত্ত-কমল
রবিকর-স্পর্শেই প্রস্ফুটিত,
আকাশের দিকে উন্মুখ।

আজ পঁচিশে বৈশাখের পুণ্য-লগ্নে
এই অভূতপূর্ব মহাসৃষ্টির
লোকোত্তর স্রষ্টাকে,

আমাদের গুরুদেবকে,
প্রণাম করে ধন্য হলাম :
কৃতার্থ হলাম
তাঁকে প্রণাম করবার
সুযোগ পেয়েছি বলে :
চরিতার্থ হলাম
তাঁর বন্দনা-গান করে।*

[২]

পঁচিশে বৈশাখের শুভ লগ্নে
প্রণাম জানাই
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে,
প্রণাম জানাই সেই সহস্রদল রূপ-কমলকে
যার উপর মূর্ত হয়েছেন পরিপূর্ণা বাণী
সৃষ্টি-প্রেরণার পরম দীপ্তিতে
কল্পনার অভুতপূর্ব বর্ণসমারোহে
আনন্দের পরমাশ্চর্য প্রকাশে
জ্ঞানের গরিমায়
ধ্যান-প্রসন্ন প্রতিভার নির্মল শোভায়
সাহিত্যের উদ্বোধনে
সঙ্গীতের স্বতোৎসারে
শিল্পের উন্মেষ-মহিমায়।

রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রণাম করি
তখন প্রণাম করি
ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শকে
যা
রূপে রসে রঙে
শ্রদ্ধায়, গৌরবে
মণ্ডিত করেছে সেই মনুষ্যত্বকে
যা ঐশ্বর্যলোলুপ ভিক্ষুক নয়
দারিদ্র্যের পঙ্কিল স্পর্শ যাকে মলিন করে না
যা নির্ভীক
যা ঊর্ধ্বমুখী
যা ভূমাবিলাসী
যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।

* ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯, ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে পঠিত।

সনাতন ভারতের আধুনিক রূপ রবীন্দ্রনাথ,
মুক্তি আকাঙ্ক্ষার শাশ্বত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ,
সত্য-শিব সুন্দরের বিগ্রহ-নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ,
প্রতি বছরই পঁচিশে বৈশাখে প্রণাম জানাই তোমাকে
এবারও জানালাম :
প্রতি বছরের মতো এবারও প্রশ্ন জাগল মনে
এ প্রণাম কি আন্তরিক ?
এ প্রণাম কি সার্থক ?
তুমি কোথায় আর আমরা কোথায় !
দীন হীন স্বার্থ-ক্লিন্ন পশুত্বের আস্ফালন
তামসিকতার জড়তার মিথ্যার জঞ্জাল স্তূপ
আজও তো আকাশচুম্বী ।

হে নিত্যকালের স্পর্শমণি
আমাদের স্পর্শ করবে কবে ?
এ প্রণামে কবে বাজবে অন্তরের সুর
কবে লাগবে মনুষ্যত্বের দীপ্তি
কবে আমরা বলতে পারব
আমাদের কবিকে
আমাদের গুরুদেবকে
আমরা সত্যি সত্যি প্রণাম করতে পেরেছি ?

আমার তুমি

[১]

আকাশ-ভরা তোমার আলো
ছড়িয়ে আছে তারায় তারায়
কোন্ সাগরে পাড়ি দিয়ে
কোথায় জাগে, কোথায় হারায় ।
রং ফেলেছে রসিক চিতে
উঠছে ফুটে বন-শ্রীতে
জলে স্থলে ফুলের দলে
দুলছে তারা হাসছে তারা
বীণার তারে গমক তুলে
অসাড় প্রাণে চমক তুলে
কোথায় যেন গিয়েছিল
আবার ফিরে আসছে তারা

প্রাণের ডাকে আসছে ফিরে
মরণ-সাগর ওই যে পারায়
আকাশ-ভরা তোমার আলো
ছড়িয়ে আছে তারায় তারায় ॥

[২]

ভুবন-ভরা তোমার বাণী
শুনতে আমি পাই কি সবই
আমার ছোট আকাশটিতে
সাজাই তোমায় ছোট্ট রবি
ছোট্ট রবি ছোট্ট ঠাকুর
শোনায় মোরে আনন্দ-সুর
তাহার পরেও আছে জানি
কিন্তু শোনার সামর্থ্য নাই
আমার ছোট 'বেতার'-খানি
শোনায় শুধু সীমার বাণী
সেই বাণীতে, ওগো কবি,
তোমার শুধু আভাসটি পাই
সেই আভাসে রং বুলিয়ে
আঁকি তোমার স্বপন ছবি
ভুবন-ভরা তোমার বাণী
শুনতে আমি পাই কি সবই ?

জয়তু

নিখিল-রসিকজন-চিত্ত-কমল-বন
উদ্বোধক কবি রবি হে
নীলাম্বর গতি তিমিরহরণ জ্যোতি
প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক ছবি হে ॥
ঊর্ধ্বগ উজ্জ্বল শুদ্ধ
মুগ্ধ মধুর রসবন্ধ
আনন্দধারা নিষ্যন্দ
নব নব সৃষ্টি বিধাতা
হে নায়ক উদ্গাতা
সুন্দর হে নব ছন্দ—
জয়তু, জয়তু, জয়তু ॥

অস্তাচলমুখী মায়া মরীচি তব
নব নব রূপ ধরে পলকে
অবর্ণনীয় ঘটা অদ্ভুত বর্ণ ছটা
অস্ত অচল শিরে ঝলকে
সুন্দর, স্বপ্ন-বিচিত্র,
হে গুরু হে চিরমিত্র
তোমারে হৃদয় ভরি অর্চি
অশীতি অশীত তব কিরণে
প্রদীপ্ত তারুণ্য হিরণে
হে চির দীপ্ত উদর্চি
জয়তু, জয়তু, জয়তু।

মৃত্যু-দিনে

ভরা দুপুর
কড়া রোদে পুড়ছে চারিদিক,
বসেছিলাম বাতায়নের ধারে।

পিচের রাস্তা হচ্ছে মেরামত,
গলদ্‌ঘর্ম কুলিরা সব মিলে
গাঁইতি মেরে ফেলছে তুলে পাথরগুলো সব,
প্রকাণ্ড এক লৌহ-কটাহেতে
ফুটছে কালো পিচ।

চলছে জোরে চাবুক
ছুটছে বেগে ছ্যাকড়া গাড়িখানা
মালে এবং মনুষ্যেতে ঠাসা
ছুটছে তবু জোরে।

খঞ্জ ভিখারীটা
ভিক্ষা মেগে ফিরছে দ্বারে দ্বারে
প'রে কাঠের পা।

তালা-বন্ধ ভাঁড়ে
করছে ফেরি দুধ-মেশানো জল
খাঁটি দুধের নামে।

আপিসমুখো কেরাণী এক ছুটছে দ্রুতবেগে
'লেট' হয়েছে তার।

সুদের হিসাব সেরে,
পৈতে-কানে গামছা-কাঁধে খুড়ো
দাঁতন মুখে নিয়ে
ছুটছে ঘাটের পানে
রাখী পূর্ণিমা যে !

তার পিছনে ঠিক
সাইকেল-রিক্‌শাতে
গগল্‌-পরা কালো সাহেব বসে আছেন খাসা,
বিরাট মোটা দেহ
মুখে চুরুট
কোলে চ্যাপটা ব্যাগ।

বাজিয়ে জোরে ইলেক্‌ট্রিক হর্ন
বেরিয়ে গেল বেগে
দামী মোটরখানা।
খঞ্জ ভিখারীটা
ড্রেনের ধারে নোনা-ধরা দেয়ালটাকে ধ'রে
কোনক্রমে রক্ষা পেল অপমৃত্যু থেকে।

পিটিয়ে ঢাক ঢোল
আর একখানা ছ্যাকড়াগাড়ি এল,
পিছনে তার বাঁধা
প্রকাণ্ড এক ছবি-বিজ্ঞাপন,
চুম্বন-উদ্যত
দুটো রঙীন মুখ
সিনেমার যুগ্ম-তারা দু'জন,
ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী দেখছে সব চেয়ে
সারি সারি খুলছে বাতায়ন।

"আইস্‌ক্রীম—চাই আইস্‌ক্রীম"
হাঁকছে দূরে মাড়োয়ারির চাকর।

আধ ঘোমটা দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে জরা জীর্ণ ছেলেটাকে তার
আসছে কাদম্বিনী,
মান-সম্ভ্রম শিকেয় তুলে রেখে
ঝি-গিরিতে বাহাল হয়েছে সে
দিন চলে না আর
স্বামী গেছেন মারা।

হাতকড়ি আর শিকলের ঝনৎকার তুলে
সারি বেঁধে যাচ্ছে কয়েদীরা,
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে যাচ্ছে সারি বেঁধে
লাল-পাগড়ি পুলিশ।

ছুটছে ঝাঁকামুটে
ঝুলছে ঝাঁকা থেকে
চর্মহীন মুণ্ডহীন খাসি।

তাড়ির দোকান থেকে
ঈষৎ মত্ত আসছে হরিজন,
কানে-বিঁড়ি হাতে ঝাঁটা নিখুঁত কালো রং
টুকটুকে লাল শালুর কামিজ গায়ে।

দু-চারখানা এঁটো পাতা নিয়ে
করছে কলরব
পাড়ার যত কাক এবং কুকুর।

অনর্গল বেগে
পাশের বাড়ির লুঙ্গি-পরা ছোঁড়া
মারছে রাজা উজির;
বহু রকম চেষ্টা করেও চাকরি মেলেনি তার।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়াং
ছক ছক ছক ছক
এনজিনটা আসছে ধীরে ধীরে
সামনে রোলার পিছনেতেও রোলার
আর্তনাদ করছে পাথরগুলো
ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং
দলে' পিষে করছে সমতল
ঢালছে গরম পিচ
অনিবার্য বেগে
এগোচ্ছে এনজিন।

হঠাৎ এল খবর
মারা গেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রইল এরা সব
মারা গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!
এদের ফেলে চলে গেলেন কবি?
মনে হল.........

চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার
রাত্রি কত নাই তা জানা ঠিক
পূর্বাচলের পানে চেয়ে নীরব প্রতীক্ষায়
বসে আছি বাতায়নের পাশে।

গল্পগ্রন্থ

এক ঝাঁক খঞ্জন

উৎসর্গ

পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বিভাবতী মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু—

আপনার কাছে অনেক পেয়েছি, সেই কথা স্মরণ ক'রে আমার এ সামান্য গল্প সংগ্রহটি আপনার নামে উৎসর্গ করলাম।

১০।১।৬৭ — প্রণত

কলিকাতা। — বলাই

নিবেদন

চৈত্র ১৩৭১ তারিখের পর হইতে অদ্যাবধি যে সমস্ত গল্প লিখিয়াছি—তাহা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইল। ফাইলের গোলমাল হওয়ার জন্য আমার পূর্ব-প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহের আটটি গল্প ভ্রমক্রমে এই সংগ্রহে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনিচ্ছাকৃত এই প্রমাদের জন্য আমি লজ্জিত। গল্পগুলির নাম—মহামানব কেনারাম ও কমলেশ্বর সাধু, নমো যন্ত্র, আর একটি কথা, পুনর্মিলন, মৃত্যুঞ্জয়, শেষ ছবি এবং মতিভ্রম। এ গল্পগুলি চৈত্র ১৩৭১ তারিখের আগে লেখা।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৭৪ — বনফুল

(ইং ৩।৭।৬৪)

ভাগলপুর।

প্রমাণ

প্রবীণ ডাক্তার ঘনশ্যাম সেন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গলার ডাক্তার হাজরার ক্লিনিকে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার হাজরা তাঁহার অনেক কালের বন্ধু। নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইল।

সেন। আজ দুপুরে ভাত খাবার সময় গলায় একটা কাঁটা বিঁধেছে। দেখ তো বার করতে পার কি না। মনে হচ্ছে টনসিলে বিঁধে আছে। তখুনি মেছুনীটাকে বললাম, ছোট ছোট মাছ দিস নি, তা শুনল না।

হাজরা। তুমি তো নিজে বাজারে গিয়ে রোজ পাকা মাছ কিনে আন। ছোট মাছ তো আগে ছুঁতে না, হঠাৎ আজ কিনলে যে —

সেন। ওই মেছুনী মাগীর জেদে। আজ বাজারে বড় রুই-কাতলা ছিল না। ওই মেছুনীর কাছে ছিল বড় চিতল আর আড়। চমৎকার লাল আড়। বললাম, ল্যাজের দিকটা আমায় কেটে দে। দিলে না। বললে, ডাক্তারবাবু, তোমার বাত হয়েছে, খুঁড়িয়ে হাঁটছ, তোমাকে আড় মাছ দেব কি! বাতে আড় মাছ খাওয়া বারণ। বললাম—তা হলে চিতলের পেটি কেটে দে। সে বলল, বাতে চিতলও খাওয়া চলবে না। বললাম, আমি ডাক্তার, আমি জানি না, তুই আমার চেয়ে বেশী জানিস? সে চোখ পাকিয়ে বললে, জানি। বাত হলে চিতল, আড়, বোয়াল, কোনওটা চলবে না। তুমি নিজের চিকিৎসা নিজে কোরো না। তুমি এখন রুগী, তুমি বুতরুর মতো অবুঝ। বতরু মানে জানো তো? শিশু। তারপর সে-ই অন্য আর-একজনের কাছ থেকে ছোট ছোট রুইমাছের বাচ্ছা এনে দিলে। প্রত্যেকটি কাঁটার কুণ্ডু! দু'গ্রাস ভাত খেতে না খেতেই খচ্ ক'রে গলায় কাঁটা বিঁধল। দেখ তো বার করতে পার কি না।

হাজরা। হাঁ কর—

ডাক্তার সেন চেয়ারে বসিয়া প্রকাণ্ড হাঁ করিলেন। ডাক্তার হাজরা টং ডিপ্রেসার (Tongue Depressur) দিয়া জিবটা চাপিয়া ধরিয়া আলোকপাত করিলেন তাঁহার গলার ভিতর।

হাজরা। ও, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। টনসিলেই রয়েছে কাঁটাটা। বার করে দিচ্ছি এখুনি, হাঁ করেই থাক একটু।—এই—হ্যাঁ—বেরিয়ে গেছে। খুব ছোট কাঁটা—

হাজরা ফরসেপসের প্রান্তে ধৃত ছোট কাঁটাটি ডাক্তার সেনকে দেখাইলেন।

সেন। ছোট কাঁটা তো হবেই। যা ছোট ছোট মাছ দিয়েছিল—

হাজরা। একটু গার্গল (Gurgle) করে ফেল।

সেন গার্গল করিয়া পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন এবং সেটি নিপুণভাবে ধরাইয়া হাজরার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন, "কি কাণ্ড!"

হাজরা। আমি ভাবছি, মেছুনীটা কি ধূর্ত। খুব সম্ভবত ওর আড় আর চিতল দুটোই পচা ছিল। ও জানে, তোমার সঙ্গে হেলথ অফিসারের ভাব আছে, তোমাকে পচা মাছ গছাতে সাহস করে নি তাই! তোমার হিতৈষী সেজে অন্য দোকান থেকে ছোট মাছ এনে দিয়েছে। বুদ্ধি আছে মাগীর—

সেন। তুমি যা বলছ, তা অবশ্য হতে পারে। ওদের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে—

হাজরা। কি—

সেন। ওই মেছুনীটারই একবার বাত হয়েছিল। আমি চিকিৎসা করেছিলাম। তখন আমিই ওকে আড়, চিতল আর বোয়াল মাছ খেতে বারণ করি। বলেছিলাম, ছোট মাছ ছাড়া অন্য কিছু চলবে না।

হাজরা। আমাদের শাস্ত্রে আড়, চিতল আর বোয়াল মাছ গাউটে চলবে না, এ কথা কি কোথাও লেখা আছে ?

সেন। আমাদের শাস্ত্রে দ্রব্যগুণ বিষয়ে সম্যক আলোচনা নেই, অন্তত আমি পড়ি নি। কলাইয়ের ডাল খেলে ঠাণ্ডা লাগে, ডিম খেলে বাত হয়, এ-সব আলোচনা আমাদের ডাক্তারী বইয়ে নেই। কিন্তু সাধারণ লোকেদের ও-সবে খুব বিশ্বাস। আমি পারতপক্ষে সাধারণ লোকেদের এ-সব বিশ্বাসে আঘাত করতে চাই না।

হাজরা। তা হলে তোমার কি ধারণা, মেছুনীটা সত্যিই তোমার হিতৈষী ? আই ডোণ্ট থিংক সো। যারা সুযোগ পেলেই ওজনে কম দেয়, পচা মাছ বিক্রি করে, চোরা-বাজারের অলি-গলিতে যাদের হরদম আনাগোনা, তারা যে হঠাৎ এমন উদার হিতৈষী হ'য়ে উঠবে তা ভাবা শক্ত।

সেন। প্রমাণ দিতে পারব না, কিন্তু আমার মনে হয়—

ডাক্তার সেন ধীরে ধীরে চুরুটে টান দিতে লাগলেন।

প্রমাণ কিন্তু পরমুহূর্তেই পাওয়া গেল।

"ঘনশ্যামবাবু ডাক্‌টার হিঁয়া ছে— ?"

(ঘনশ্যামবাবু ডাক্তার এখানে আছে —?)

হাজরা তাঁহার ক্লিনিকের সুইং ডোর (Swing door) খুলিয়া দেখিলেন, একটা কালো কুৎসিত বুড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তার সেনও উঠিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে মেছুনী বুড়ীকে চিনিতে পারিলেন।

"কি খবর—"

ছেকাছেনি ভাষায় বুড়ী যাহা বলিল—তাহার মর্ম এই ঃ—

"বেটা বুঝতে পারছি আজ তোর খাওয়া হয়নি। এবেলা বড় রুই মাছ এসেছিল বাজারে। খুব টাটকা। তোর জন্যে তাই নিয়ে এলাম এক সের। তোর দাবাখানায় গিয়ে শুনলাম, তুই এখানে—তাই এখানেই নিয়ে এলাম —"

"দাম কত এর—?"

"দামের কথা পরে হবে—"

ওপার থেকে

নিমাই জানে সীমার মধ্যে যা সে দেখছে, ভাবছে, বুঝছে, কল্পনা করছে তা সীমাবদ্ধই থেকে যাবে চিরকাল। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে তা তাকে চমকে দেবে না কোনদিন। বাড়ির সামনের ওই তালগাছ তালগাছই থাকবে বরাবর, হঠাৎ চন্দন গাছ হবে না। তার প্রতিবেশীরাও যেমন আছে তেমনি থাকবে। বুড়ো হরেনবাবু দেখা হলেই তাঁর আপিসের গল্প করবেন। পরশ্রীকাতর বিষ্ণু বোস মক্ষিকার মতো নানা ব্রণ

অনুসন্ধান ক'রে বেড়াবেন আর সেটা তারিয়ে তারিয়ে নিজে তো উপভোগ করবেনই অপরকেও উপভোগ করাবার চেষ্টা করবেন ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে। সান্যালদের বাড়ির বুড়ী ঠানদি তেমনি রোজ কুঁজো হয়ে গঙ্গাস্নানে যাবেন তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। তার রাঁধুনী মৈথিল বিলট্ ঝা ঠিক তেমনি এক ধাঁচের রান্না রেঁধে যাবে বরাবর। সেই ভাত কোনদিন অতি-সিদ্ধ, কোনদিন আধ-সিদ্ধ, ডাল কোনদিন লবণ-হীন, কোনদিন হলুদ গন্ধ, সেই ঝাল-হীন মাছের ঝাল আর ঝোল-সমুদ্র মাছের ডালনা। বিলট্ ঝা কোনদিন ইতালীয়ান 'চেফ' হবে না। যা যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে। তার চাকর 'ধোঁকা' চিরদিনই ধোঁকা দেবে তাকে। ডাকলে সাড়া দেবে না, ভদ্রলোকদের সামনে অসভ্যের মতো কুঁচকি চুলকোবে, বাজার থেকে পয়সা চুরি করবে আর বকলে ক্যাবলার মতো হাসবে হলদে দাঁত বের ক'রে। তবু ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে ও টিকে আছে বলে। নিমাইয়ের যিনি মনিব সেই নামজাদা প্রিন্সিপাল সাহেব, তিনিও বরাবর সেই একই চেষ্টা ক'রে যাবেন কি ক'রে তাঁর 'অঘা' ছেলেগুলিকে বেশী নম্বর পাইয়ে চাকরির বাজারে যোগ্যতম প্রার্থীরূপে পাচার ক'রে দেবেন একে একে। আর কোন বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রফেসার তাঁর পিঠ চাপড়ে কবে বলেছিলেন ও সিং ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল—এই একই গল্প বারবার ক'রে যাবেন উদ্ভাসিত মুখে সকলের দিকে চাইতে চাইতে। এই সবই বরাবর চলবে। সীমাবদ্ধ জগৎ তার সেই এক-রঙা চেহারা নিয়ে সীমাবদ্ধই থাকবে চিরকাল তার চোখের সামনে। পয়লার পর দোসরা আসবে, শনিবারের পর রবিবার, দিনের পর রাত্রি। আসতেই থাকবে ক্রমাগত আমরণ। এ পাড়ার গরু, ছাগল, কাক, শালিক, চড়াই পর্যন্ত চেনা হয়ে গেছে নিমাইয়ের। ওদের মধ্যেও কোন নূতনত্ব নেই, চমক নেই। নিমাইকে কলেজে ইংরেজী সাহিত্য পড়াতে হয়। তাতেও কি নূতনত্ব আছে ? মোটেই না, সেই একই পুনরাবৃত্তি চলেছে বছরের পর বছর। সেই এক নোট, এক সমালোচনা, পরীক্ষায় সেই একই রকম প্রশ্ন করা, সেই একই রকম ভুলে-ভরা উত্তর, ফেল-করা ছেলেদের পাশ করিয়ে দেবার সেই একই রকম তদ্বির খোশামোদ। না নিমাইয়ের সীমাবদ্ধ জীবন নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ছুটির সময়ে বেড়াতে যায় সে। কখনও দার্জিলিং, কখনও রাঁচি, কখনও দেওঘর। সেখানেও সেই এক রকম পাহাড়, এক রকম একঘেয়ে সিনেমা আর খবরের কাগজ। সে সব জায়গাতে যা ঘটে তা সবই প্রত্যাশিত ঘটনা, সবই সীমাবদ্ধ। নিমাই মনে মনে অপেক্ষা করে, এই সীমার ওপার থেকে নূতন কিছু কি আসবে না কখনও ? গরুর গাড়ির মতো বাঁধা-ধরা রাস্তায় টিকিস্ টিকিস্ ক'রে চলতে হবে তাকে চিরকাল ? তার জীবনের সীমার ওপারে নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে যা বিস্ময়কর, যা এলে মনে হবে আবির্ভাব, যা সমগ্র চেতনাকে উন্মুখ ক'রে তুলবে। কিন্তু কই আসে না তো ! তার ত্রিশ বছরের জীবনে প্রেমও আসেনি কখনও। নারী এসেছে, প্রেম আসেনি। এঁদো পুকুরে নেবেছে সে দু'একবার, কিন্তু বিরাট প্রপাতের সম্মুখীন হয়নি কখনো। কেউ তাকে ভালোবাসেনি, সে-ও কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। মা বাবা খুব ছেলেবেলায় মারা গেছেন, আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন তাঁরা স্বার্থের তাগিদে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করেন। বন্ধু-বান্ধবরাও আসেন কখনও-কখনও বিনা পয়সায় চা-চুরুট খাবার জন্যে। প্রাণের যোগ কোথাও নেই। তার মাঝে মাঝে মনে হত আমি তো নোঙর-হীন নৌকো, হয়তো সমুদ্রেরই জলে দাঁড়িয়ে আছি,

কিন্তু কই ভাসতে পারছি না তো অজানা দিগন্তের উদ্দেশ্যে। একঘেয়ে জীবনের পরিচিত অভ্যাসগুলোই কি অদৃশ্য নোঙরের মতো আটকে রেখেছে আমাকে। সীমার ওপার থেকে অপ্রত্যাশিত জোয়ার কি আসবে না কোন দিন।

একদিন এল। এটা যে জোয়ার প্রথমে তা সে বুঝতে পারেনি। কলেজ থেকে ফিরে দেখল তার ঘরে ছোট্ট বাদামী রঙের পাখি একটা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। কেমন যেন ভীত ত্রস্ত অসহায় ভাব। মনে পড়ল জানলাটা খোলা ছিল, ওই খোলা জানলা দিয়েই সম্ভবত ঢুকেছিল পাখিটা কিন্তু হাওয়ায় আবার জানলাটা বন্ধ হয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে ফেলেছে বেচারাকে। কি পাখি ওটা ? আলমারির কার্নিশের উপর বসে হাঁপাচ্ছে। কি চমৎকার কালো চোখ দুটি বাদামী রঙের পটভূমিকায় কি চমৎকার মানিয়েছে ! আর কত ছোট। চড়াই পাখির চেয়ে একটু বড়। কিন্তু কি আশ্চর্য ওর ভাব-ভঙ্গি। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা লাজুক-লাজুক ভাব, কি যেন একটু গোপন করতে চাইছে। এ পাখি তো সে দেখেনি কখনও। অধিকাংশ পাখিরই সে নাম জানে না, কিন্তু চেহারাটা চেনে। দেখলে বলতে পারে এ পাখিকে সে আগে দেখেছে। কিন্তু এ পাখি সে আগে দেখেনি কখনও ! কোথা থেকে এল এ ? পাখিটা আবার উড়ল। চেষ্টা করতে লাগল আলমারির ফাঁকে আত্মগোপন করতে। নিমাইয়ের কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি সে যেন সহ্য করতে পারছে না। ছেড়ে দেবে ওকে ? জানলাটা খুলে দিলেই এখনি বেরিয়ে যাবে ! কিন্তু নিমাইয়ের মনে হ'ল ওকে ছেড়ে দিলেই ও বেশী বিপদে পড়বে। ও এদেশে অচেনা আগন্তুক পথঘাট চেনে না, কাকেই ঠুকরে মেরে ফেলবে হয়তো। না, এখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

"ধোঁকা—ধোঁকা –"

যথারীতি ধোঁকা সাড়া দিলে না।

বারান্দার দিকের জানলাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখল নিমাই। ধোঁকা বারান্দার ওধারে বসেই বিড়ি টানছে।

"···ধোঁকা শোন, এই দশ টাকার নোটটা নিয়ে ছুটে বাজারে যা তো। ভালো দেখে খাঁচা কিনে আন একটা। ফাইন জালের কিম্বা বাঁসের তৈরি খাঁচা চাই। ঘরে পাখি ঢুকেছে একটা। সেটা ধরব। যা চট ক'রে—" দশ টাকার নোটটা হাতে পাবে বলেই হোক, কিম্বা পাখির কথা শুনেই হোক ধোঁকা তৎপর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল বাজারে।

পাখিটাকে ধরতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। পাখিটা খাঁচায় পুরে আবার ভাল করে দেখল তাকে নিমাই। না, এ পাখি সে আগে কখনও দেখেনি। ধোঁকা একটু ফড়ে গোছের। সে বলল, "এটা বাবু ভরত পাখি। মাঠে থাকে। এখানে ঢুকে পড়ল কি ক'রে। তাছাড়া ওর পায়ে ওটা পরিয়ে দিলে কে !"

"তাই তো ভাবছি। একটা নম্বরও রয়েছে আংটিটাতে। নিশ্চয় ধরেছিল কেউ—"

"রাস্তার ছোঁড়াদের কাণ্ড।"

"যাই হোক ওকে খেতে দে কিছু। কি দিবি বল তো।"

"ছাতু গুলে দিই একটু। পেঁপে আছে। দেব একটু ক'রে।"

"দে—"

পাখি কিন্তু খেলে না কিছু। খাঁচার একধারে সভয়ে বসে রইল। কেমন যেন ভীতু-ভীতু লাজুক-লাজুক ভাব।

নিমাই তাড়াতাড়ি খেয়ে পাখি নিয়ে তখখুনি ছুটল বায়োলজির প্রফেসার ঘোষের কাছে। তিনি বিলেত-ফেরত লোক। নানা দেশের পাখির সম্বন্ধে জ্ঞান আছে।

প্রফেসার ঘোষ পাখিটা দেখে আশ্চর্য হলেন। "এ পাখি কোথায় পেলেন মশাই! এ যে নাইটিংগেল। বিলিতী পাখি। পায়ে রিং করা আছে দেখছি। কেউ নিশ্চয় ধরে উড়িয়ে দিয়েছিল ওদেশে। এতদূরে সাধারণত আসে না। কোনও ঝড়ে টড়ে পড়ে গিয়েছিল সম্ভবত। উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা দাঁড়ান—"

প্রফেসার ঘোষ কয়েকটা মাসিক পত্র নিয়ে এলেন। একটা বইও।

"দেখুন তো এইগুলো খুঁজে। পাখি 'রিং' করে যারা ছেড়ে দেয়, ওদেশে তাদের নানারকম সোসাইটি আছে। কোন কোন পাখির পায়ে কি নম্বরের 'রিং' পরিয়ে ওরা ছেড়েছে তারও একটা লিস্ট বেরোয় মাঝে মাঝে। ও রিং-এর নম্বর কত? দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। নম্বর উনিশ—"

"দেখি দাঁড়ান—"

মাসিকপত্রগুলো ওলটাতে লাগলেন তিনি।

তারপর বললেন,—"এই যে রয়েছে একটা লিস্ট। দেখি দাঁড়ান। হ্যাঁ এই যে নাইটিংগেল নম্বর নাইনটিন সাউথ ইংল্যান্ড থেকে ছেড়েছে, একটি মেয়ে মিস ওয়াইড-বার্থ। ঠিকানা দিয়েছে। ওই ঠিকানায় আপনি একটা চিঠি দিয়ে দিন যে আপনি পেয়েছেন নাইটিংগেলটাকে। আর পাখিটাকে ছেড়ে দিন—"

"ছেড়ে দেব?"

"তাই দেওয়াই নিয়ম। ওকে তো এখানে বাঁচাতে পারবেন না। শীতের দেশের পাখি। অবশ্য ছেড়ে দিলেও বাঁচবে না। ক্ষীণজীবী পাখি ও কি আর দেশে ফিরতে পারবে। এদেশে কখনও আসে না ওরা। কি করে এল আশ্চর্য। আমার মনে হয় কোনও ঝড়ের মুখে পড়েছিল বেচারী—"

"কি খেতে দি বলুন তো? ছাতু, পেঁপে দিয়েছিলাম খায়নি—"

"ওরা পোকা খায়। ইংল্যান্ডের পোকা। এদেশের পোকা খাবে কি না জানি না। পাখিদের তৈরি খাবার পাওয়া যায় একরকম। আপনি নিউ মার্কেটে গিয়ে যেখানে পাখি টাখি বিক্রি হয় সেখানে খোঁজ করুন। হয়তো বিলিতি তৈরী খাবার পেয়ে যাবেন। কিন্তু যা-ই করুন, ওকে বাঁচাতে পারবেন না।"

"বাঁচাতেই হবে।"

"কি করে বাঁচাবেন! এদেশে ও পাখি বাঁচান শক্ত।"

প্রফেসার ঘোষকে নিমাই তখন কিছু বললে না। কিন্তু এক মাস আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল তা মনে পড়ে গেল তার। তখন সে ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেয়নি। তার মনে হয়েছিল কি আর হবে ওসব করে। সীমার গণ্ডী আর একটু বাড়বে শুধু। কিন্তু—। সহসা মনঃস্থির করে ফেলল নিমাই। বছর খানেক আগে কীট্সের সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখে সে পাঠিয়েছিল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরা সেটা আবার পাঠিয়েছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষক খুব প্রশংসা করেছেন

থীসিসটার এবং বলেছেন ইনি যদি এখানে আসেন আমরা ওঁকে আরও গবেষণা করবার সুযোগ দেব। এখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্টাডি লিভ্ (Study leave) দিয়েছেন। পাসপোর্টও জোগাড় হয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ নিমাইয়ের মনে হয়েছিল কি হবে আর ওসব ক'রে। ডিগ্রীর তকমা পরে লাভ কি। মাইনেও বাড়বে না, কিছুই হবে না। শুধু শুধু সময় নষ্ট। তার চেয়ে বেশ আছি। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হ'ল যে-'কীটস্' ওড্ টু এ নাইটিংগেল (Ode to a nightingle) লিখেছিলেন সেই 'কীটস্'ই বোধ হয় এই নাইটিংগেলকে পাঠিয়েছেন তার কাছে। নিমাই বিজ্ঞানী নয়, কবি। তার মনে হ'ল তার কাছে নাইটিংগেলের হঠাৎ আবির্ভাবের আর অন্য কোনও কারণ নেই।

নিউ মার্কেটে পাখির খাবার পাওয়া গেল।

নাইটিংগেল প্রথমটা খায়নি, কিন্তু শেষে খেল একটু। সোৎসাহে খুব দামী খাঁচা কিনে ফেলল সে একটা। রাত্রে নিজের ঘরেই সে পাখিটাকে নিয়ে শুল। আর, কি আশ্চর্য, ভোরের দিকে গান গেয়ে উঠল পাখিটা। তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল নিমাই। মনে পড়ল সেই লাইনটা—My heart aches and a drowsy numbness pains...... !

বিলেতে পেঁছেই সে প্রথমে গেল মিস ওয়াইড্‌বার্থের সংগে দেখা করতে। তার পাখি তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। অতি যত্নে অনেক খরচ করে পাখিটিকে বাঁচিয়ে এনেছিল সে। মিস ওয়াইডবার্থকে দেখে সে অবাক! সে-ও যেন একটা নাইটিংগেল! একটু আলাপ হবার পর জানতে পারল তার ডাক নাম ফ্যানি (Fanny)। ফ্যানি! কীট্‌সের ফানি!

এর পরই জোয়ার এসে গেল।

দুই শিষ্য

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। লছমনঝোলা পার হ'য়ে পথটি কেদার-বদরীর দিকে চলে গেছে; সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ডান দিকে হিমালয়ের সানুদেশে একটু উঁচুতে সারি সারি কয়েকটি দেওদার গাছ ছিল তখন। হিমালয়ে দেওদার গাছ অনেক। কিন্তু এ গাছগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল একটু। গাছগুলি যেন গোল হ'য়ে ঘিরে রেখেছিল কোন কিছুকে লোক-চক্ষুর দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে। মনে হ'ত কয়েকটি প্রহরী যেন পাহারা দিচ্ছে কাউকে। গাছগুলির একদিকে ছিল একটি পাহাড়ী নদীর খাত, আর একদিকে ছিল উঁচু টিলার মতো একটা ছোট পাহাড়। নদীর খাতে বর্ষাকালে প্রবল স্রোত বইত আর গ্রীষ্মকালে তা পরিপূর্ণ থাকত বিচিত্র উপলখণ্ডে। টিলার উপর ছিল ছোট একটি ঘর। পাথর দিয়ে তৈরি। কে কবে তৈরি করেছিল কে জানে। দু'দিকে পাথরের দেওয়াল, মাথার উপরেও একটা চওড়া পাথরের ছাদ। সামনের দিকটা খোলা। একটি লোক সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। টিলার ওধারে সুন্দর সরোবর একটি। সরোবরে পদ্ম ফোটে। সরোবরের ওপারে আবার দেওদার বন, তার ওপারে উন্মুক্ত আকাশ, আকাশের গায়ে হিমালয়, হিমালয়ের রূপ

ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। এই টিলাটিকেই ওই দেওদার গাছগুলি যেন লোকচক্ষুর অন্তরাল ক'রে রাখতে চাইছিল। টিলার উপর ওই পাথরের ঘরটিতে তখন তপস্বী থাকতেন একজন। পাহাড়ীরা মাঝে মাঝে ফল দুধ দিয়ে যেত তাঁকে। তিনি পাহাড় খুঁড়ে কখনও কখনও এক রকম কন্দও বার করতেন। এ কন্দ খেলে নাকি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়। তাঁর আর এক সহায় ছিল ওই সরোবরটি। এই নির্জন মনোরম স্থানে তিনি তপস্যা করতেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনা ক'রে তিনি সিদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

॥ ২ ॥

লোক-চক্ষুর অন্তরালে কিন্তু বেশীদিন থাকা শক্ত। একদিন দেখা গেল দুটি যুবক সেই নদীর খাতের উপল-খণ্ডগুলি মাড়িয়ে দেওদার গাছগুলির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একজনের নাম পরেশ, আর একজনের নাম সুধীর। ওরা টেরারিস্ট দলে নাম লিখিয়েছিল। পণ করেছিল স্বদেশকে বিদেশীর পরাধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত করবার জন্যে প্রয়োজন হ'লে ওরা প্রাণ দেবে। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষের লেখা ওদের মাতিয়ে তুলেছিল। অরবিন্দই ছিলেন ওদের আদর্শ। সেই অরবিন্দ যখন রাজনীতি ছেড়ে হঠাৎ আধ্যাত্মিক মার্গে চলতে শুরু করলেন তখন ওরা দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিল কিছুদিন। অরবিন্দের সঙ্গে দেখাও করেছিল তারা। তিনি বলেছিলেন—আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই ভারত উদ্ধার করতে হবে। আধ্যাত্মিক পথই ভারতের পথ। আমরা তামসিক হ'য়ে পড়েছি, এ অবস্থায় স্বাধীনতা পেলেও তা আমরা রাখতে পারব না। তোমরা আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের চেষ্টা কর।

নিরালম্ব স্বামী এই নাম নিয়ে একজন টেরারিস্ট সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এরা গিয়েছিল দীক্ষা নিতে। কিন্তু তিনি দীক্ষা দেননি। বলেছিলেন গুরু হবার যোগ্যতা হয়নি আমার এখনও। কিন্তু তিনি বলেছিলেন কেদার-বদরী যাওয়ার পথে এক উঁচু টিলার উপর একজন যোগ্য গুরু আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে যদি দীক্ষা নিতে পার তাহলে খুব ভালো হয়।

পরেশ আর সুধীর যখন টিলায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল তিনি সেই সরোবর থেকে স্নান সমাপন ক'রে সবে এসেছেন। অপরিচিত যুবক দু'টিকে দেখে অবাক হ'লেন। আরও অবাক হ'লেন তাদের অভিপ্রায় শুনে।

বললেন, "আমি নিজেই পথ খুঁজছি। পাইনি এখনও। তোমাদের পথের সন্ধান দেব কি ক'রে?"

তারপর একটু থেমে বললেন, "প্রথম প্রথম পথ নিজেই খুঁজে নিতে হয়। ওই খোঁজাটাই সাধনা। তাতে যদি কোন ফাঁকি না থাকে তাহলে পথ পাবে।"

পরেশ বলল, "কি ক'রে খুঁজব সেইটে বলে দিন।"

সাধু উত্তর দিলেন, "একাগ্র হ'য়ে ধ্যান করতে হবে। আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন। এর যে কোন একটার মূর্তি চোখের সামনে রেখে ধ্যান ক'রে যাও। এর জন্যে দীক্ষার দরকার কি। নিজেই নিজের গুরু হও আগে। তারপর তোমার গুরু আপনিই আবির্ভূত হবেন তোমার কাছে।"

সুধীর বলল, "মনে করুন কোন দেবতাতে যদি মন বসাতে না পারি তাহলে কি করব।"

"ধ্যানটাই আসল, দেবতার মূর্তিটা ধ্যানের অবলম্বন মাত্র। দেবতায় যদি মন না বসে তাহলে কোনও একটা আদর্শে মন বসাও। তাও যদি না বসে একটা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা কর। ভাব—আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, কেন এসেছি। এই প্রশ্নটাকে আঁকড়ে থেকে ধ্যান কর। মন প্রথম প্রথম বসবে না। মনকে ভেসে যেতে দাও, তারপর আবার ফিরিয়ে আন তাকে। শুদ্ধ চিত্ত আর সুস্থ শরীর যদি থাকে ফল পাবে"

পরেশ একটু উৎসুক হ'য়ে উঠল।

"কি রকম ফল পাব?"

"ধ্যান অনুসারে ফল পাওয়া যায়। তন্ত্রের মতে ধ্যান করলে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পেতে পার। কিন্তু সেই সব ক্ষমতা নিয়ে বেশী আস্ফালন না করাই ভালো।" তারপর একটু থেমে বললেন, "তোমরা এখন যাও। আমি ধ্যানে বসব!"

লছমনঝোলার কাছে একটি চটিতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। সেইখানেই ফিরে গেল। পরদিন ফিরে এসে দেখল সাধু সেখানে নেই। অনেকক্ষণ বসে থেকেও তাঁর দর্শন পাওয়া গেল না।

পরেশ বলল, "কতক্ষণ বসে থাকবে তাঁর জন্যে?"

সুধীর উত্তর দিল, "যতক্ষণ না আসেন।"

"আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না ভাই। বাবার অসুখ দেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

"বেশ যাও তুমি। আমি অপেক্ষা করব তাঁর জন্য।"

পরেশ চলে গেল।

সুধীর বসে রইল।

॥ ২ ॥

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আবার দেখা হ'ল দু'জনের বারাণসী তীর্থে। পরেশ তখন আর পরেশ নেই। তিনি তখন স্বামী কৈবল্যানন্দ হয়েছেন। থলথলে মোটা চেহারা, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। পরিধানে রক্তাভ গৈরিক। গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছিলেন। হাতে বড় তামার কমণ্ডলু। পায়ে সুদৃশ্য খড়ম। তাঁর মাথায় একটি লোক বিরাট লাল ছাতা ধরে আছে পিছন থেকে। তাঁকে দেখে পথিকরা সভয়ে স-সম্ভ্রমে সরে যাচ্ছে। আর একটি রোগা গোছের লোক তাঁর পিছন পিছন আসছিল। তারও মুখে সামান্য কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরনে আধময়লা ছেঁড়া কাপড় একখানা। খালি পা। পাগুলো ফেটে ফেটে গেছে। কিন্তু তার মুখে শিশু-সুলভ হাসি, চোখে দুর্লভ জ্যোতি। সমস্ত মুখমণ্ডল যেন অপরূপ আনন্দে উদ্ভাসিত। লোকটি হঠাৎ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল—"আরে, পরেশ না কি!"

স্বামী কৈবল্যানন্দ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"আপনি কে !"

"আমি সুধীর। তোমার চেহারা অদ্ভুত রকম বদলে গেছে। তবু চিনে ফেলেছি ঠিক। তুমি এখানেই থাক না কি ?"

কৈবল্যানন্দ খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন। তারপর তিনিও চিনতে পারলেন সুধীরকে।

"ও, সুধীর ! কি আশ্চর্য ! কতদিন পরে দেখা হ'ল। হ্যাঁ আমি এখানেই থাকি। আশ্রম করেছি একটা। এস আমার সঙ্গে—"

সুধীর কিছু না বলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল কেবল। তার চোখে মুখে কেমন একটা দুষ্টুমি-মাখা হাসি উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগল।

"তোমার আশ্রমে যেতে বলছ ?"

"চল না—"

"দাঁড়াও তাহলে একটু। দুটো ফুলুরি বেগুনি কিনে নি। এসব খেতে পাই না। তুমি খাবে ?"

কৈবল্যানন্দ একটু যেন অপমানিত বোধ করছিলেন।

বললেন, "সন্ন্যাসীরা রাস্তার জিনিস খায় না।"

"আমি খাব। তুমি না কর, তৈলঙ্গ স্বামী আমার সমর্থন করবেন।"

ফুলুরি বেগুনি খেতে খেতে সুধীর স্বামী কৈবল্যানন্দের পিছু পিছু যেতে লাগল। কৈবল্যানন্দ গম্ভীর, সুধীরের চোখে মুখে অপরূপ হাসি। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, "ছাতাটা লাল করেছ কেন ? কালো ছাতাই তো ভালো—"

কৈবল্যানন্দ কোনও উত্তর দিলেন না।

একটু পরে বেশ বড় একটি হর্ম্যের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন কৈবল্যানন্দ। ভিতর থেকে একটি চাকর ছুটে এসে তাঁর খড়মসুদ্ধ পায়ের উপর এক বালতি গঙ্গাজল ঢেলে দিল।

"তুমিও পাটা ধুয়ে নাও সুধীর। রাস্তার পায়ে আশ্রমে ঢোকা ঠিক নয়।"

"পা ধোব ? আচ্ছা বলছ যখন—"

আর এক বালতি জল এল। সুধীর চাকরের হাত থেকে বালতিটা নিয়ে নিজেই পা ধুয়ে ফেলল।

"চল এবার—"

ভিতরে প্রকাণ্ড পাকা উঠান।

ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কৈবল্যানন্দ। তারপর চীৎকার করলেন—"কেশব, কেশব।"

একটি পুরোহিত গোছের ছোকরা বেরিয়ে এল।

"ধূপধুনোর গন্ধ পাচ্ছি না। ধুনো দাওনি আজ—?"

"ধুনোটা ফুরিয়েছে। এখনি আনতে পাঠাব—"

"আমাকে বলনি কেন ! উঠোনের কোণে ওই ভাঙা বালতিটায় কি আছে—"

"মিস্ত্রি কাজ করেছিল। কিছু বালি বেঁচে গেছে—"

"নিয়ে এস ওটা—"

কেশব তাড়াতাড়ি বালতিটা নিয়ে এল। কৈবল্যানন্দ সেই বালতি থেকে একমুঠো বালি তুলে নিলেন।

"বালতিটা নামিয়ে হাত পাত।"

দেখা গেল কৈবল্যানন্দের স্পর্শে বালি ধুনোয় রূপান্তরিত হয়েছে।

"যাও বসবার ঘরটায় ভাল ক'রে ধুনো দিয়ে দাও। গুগ্‌গুল আর চন্দন মিশিয়ে দিও—"

"যে আজ্ঞে।"

রোমাঞ্চিত-কলেবর কেশব চলে গেল। কেশব চলে যাওয়া মাত্র হো হো ক'রে হেসে উঠল সুধীর। হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তার। চোখ মুছে বলল, "শেষ কালে ধুনো—অ্যাঁ—"

কৈবল্যানন্দ মৃদু হেসে গর্বভরেই বললেন—"হ্যাঁ বালিকে আমি ধুনোয় রূপান্তরিত করতে পারি।"

"হ্যা তা তো স্বচক্ষেই দেখলাম। কিন্তু আমরা তো ভাই ব্রহ্ম খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, ধুনো নয়। ধুনো তো বাজারে মেলে—তুমি—" আবার হেসে উঠল সুধীর।

কৈবল্যানন্দ একটু চটেছিলেন। বললেন, "কে বললে আমি ব্রহ্ম লাভ করিনি। কিন্তু এসব না করলে এ বাজারে কলকে পাওয়া যায় না—"

"ও, তাই বুঝি! আচ্ছা দেখি আমি করতে পারি কি না—"

সুধীর বালির বালতির ভিতর হাত ডুবিয়ে এক মুঠো বালি তুললে।

"কই হ'ল না তো। তুমি আর একবার কর তো ভাই, দেখি—"

কৈবল্যানন্দ সগর্বে বালতিতে হাত ঢুকিয়ে বললেন—"এ ত' কিছুই না—"

কিন্তু হাত বার ক'রেই তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বালি বালিই আছে, ধুনো হয়নি। সুধীর ফিক ফিক ক'রে হাসছে।

"আচ্ছা ভাই, আমি চললুম—"

"এর মধ্যেই যাবে কি! এতদিন পরে দেখা। কোথায় আছ তুমি—"

"আমি সেই পাহাড়ে সেই পদ্মপুকুরের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি—"

"কিছু পেয়েছ?"

"কিছু না। খুঁজছি এখনও।"

"গুরুদেব ওইখানেই আছেন?"

"না, তিনি আর ফেরেন নি। তিনি আরও উপরে উঠে গেছেন। চললুম—"

সুধীর বেরিয়ে চলে গেল।

দুর্বা

দশ বছর আগে আমি যখন তাদের পল্লীতে গিয়েছিলাম তখন তাদের দুর্দশা দেখে শিউরে উঠতে হয়েছিল আমাকে। জাতে চামার ওরা। গঙ্গার ধারে ছোট ছোট কুঁড়েঘর বেঁধে থাকত তখন। কইলু চামারের বিরাট গুষ্টি। ভাই, ভাইবো, ভাগ্নে, মৌসি, শাশুড়ি—তাছাড়া নিজের চারটে ছেলে তিনটে মেয়ে। ভাই, ভাইবোয়ের ছেলেও অনেক। নাম শুনলাম একগাদা—সীতিয়া, সোনিয়া, গীতিয়া, কারু, কালেশ্বরী, জুমা,

খুদ্দুরবা, খৈনি, মৈনি, টুনটুন, হরিয়া, তেতরা আরও কত। কইলুর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তার হিসেবে আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির। মানুষ তো গিজগিজ করছেই, তার উপর মুরগি আর ছাগলও কম নয়। নোংরা চারদিকে। মাছি ভন্ ভন্ করছে। উঠোনে ছেলেমেয়েদের বিষ্ঠা। ছেলে-মেয়েগুলোর মাথায় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, চোখে পিচুটি, গা-ময় খোস। প্রকাণ্ড কলসীর মতো পেট দেখে মনে হয় প্রত্যেকটার পেটে কৃমিভরা। বারান্দার একধারে কইলুর বউ 'গুলত্থি' (ক্ষুদ সিদ্ধ) ফ্যান আর নুন দিয়ে মেখে খাওয়াচ্ছিল ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে। তার হাতে মাছি বসছে বার বার। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে সেগুলো তাড়িয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু মাছি সম্বন্ধে সে তত চিন্তিত নয়। সে বেশী চিন্তিত ওই এক থালা 'গুলত্থি'তে অতগুলো ছেলেমেয়ের পেট ভরবে না এই ভেবে। অপেক্ষাকৃত বড় একটা মেয়ে—মিলিয়া—উঠোনের দেওয়ালে গোবর ঠুকে ঘুঁটে দিচ্ছিল। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে গোবর কুড়িয়ে এনেছে। সে একবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে 'গুলত্থি'র থালার দিকে চেয়ে দেখল। সে জানে 'মৌসি' তাকে 'গুলত্থি' দেবে না। একটু আগে সে এক ডেলা ছাতু খেয়েছে। জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রে কাঠ ফাটছে। ঠোঁট ফাঁক ক'রে একদল কাক এসে বসেছে দেওয়ালের উপর, উঠোনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোংরাগুলোর লোভে। ভজুয়া কইলুর এক ভাগ্নে বলল উঠোনের যে দিকটায় ঘরের একটা চাল ভেঙে পড়েছে সেখানে নাকি 'গহুমনা' সাপ বেরিয়েছিল কাল। কইলু ঘরের মধ্যে একটা ছেঁড়া ময়লা কাঁথার উপর শুয়েছিল। চারিদিকে বিষ্ঠা আর বমি। কইলুর চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে, গালের হাড় উঁচু হ'য়ে উঠেছে। কইলুর মা আর দিদিমা তার কাছে বসে আছেন। কইলুরই বয়স পঞ্চাশের উপর। তার মা দিদিমা তবু কিন্তু এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। কইলুর বড় মেয়ে রাজিয়া কলে জল আনতে গিয়েছিল। সে এক বালতি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি যুবতী। কিছুদিন আগে বিধবা হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে যে মুষড়ে পড়েছে তা মনে হয় না। রঙ্গীন কাপড় পরে আছে, গয়নাও গায়ে আছে দু'এক-খানা। কিন্তু সব চেয়ে যা প্রবলভাবে আছে তা তার যৌবন। সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে যেন। গুজব থানার কনষ্টেবল তেজ সিং নাকি তার প্রণয়ী। ওই কনষ্টেবলই আমাকে ডেকে এনেছিলেন এখানে। আমি সম্প্রতি এখানে সরকারী হাসপাতালে বদলি হয়ে এসেছি, সেজন্য থানার লোকেদের সঙ্গে স্বভাবতই একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আমার। কনষ্টেবল তেজ সিং আমাকে বলেছিল এরা আমাকে 'ফি' দেবে। কিন্তু এদের অবস্থা দেখে "ফি"-য়ের কথা ভাবতে পাচ্ছি না। আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়েছে এখন—এ অবস্থায় কি ক'রে কইলুর চিকিৎসা করি। ঝুঁকে তার নাড়ীটা দেখতে গেলাম, পট করে প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। তবু দেখলুম নাড়ীটা। নাড়ী পাওয়া গেল না।

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, "জি হুজুর—"

"কৈসা হ্যায়—"

"আচ্ছা হ্যায় হুজুর। পেটকা গর্দা সব নিকল গিয়া।"

বুঝলাম স্যালাইন দিলে এ বাঁচবে। বাইরে কনষ্টেবলটি দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম—"একে পানি চড়াতে হবে। এখানে হবে না। হাসপাতালে নিয়ে চল। কি ক'রে নিয়ে যাবে বল তো—"

"ডুলির বন্দোবস্ত করছি এখনি। একটা দড়ির খাটিয়ায় ডুলি বানিয়ে ফেলব! হে রে—ভিকুয়া -"

ভিকুয়া নামক একটি বলিষ্ঠ যুবক পাশের একটা কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"একটো খাটিয়া দেকে ডুলি বানা করকে কইলুকো হাসপাতাল লে চল তুরন্ত।"

"জি হুজুর—"

পুলিশের আদেশ অমান্য করবার সাহস এদের নেই।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

কনষ্টেবল আমাকে আমার ফি দিতে এল। নিজের পকেট থেকেই দিচ্ছে মনে হ'ল। প্রেমের অসাধ্যসাধন করবার ক্ষমতা আছে। বললাম, "না, আমাকে ফি দিতে হবে না। তুমি বরং কিছু ফিনাইল কিনে ওদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার করিয়ে দাও। আর একটা মেথর ডেকে—"

"সব হয়ে যাবে হুজুর।"

আমার মোটরটি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, তাতে গিয়ে চড়লুম।

যেতে যেতে মনে হ'ল কি জঘন্য দরিদ্র জীবন যাপন করে এরা। খেতে পায় না, রোগে ভোগে, শিক্ষা নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা পর্যন্ত নেই। জীবন-যুদ্ধে এরা কি টিকবে? মনে হ'ল জন্ম-নিয়ন্ত্রণই এ সমস্যার সমাধান। শিক্ষাও চাই।

॥ ২ ॥

দশ বছর পরে সিভিল সার্জন হয়ে আবার সেই ভাগলপুরেই এলাম। দশ বছর আগে যারা পরিচিত ছিল তারা আর কেউ নেই। সব নতুন মুখ। হঠাৎ একদিন এক পুরাতন লোক এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল। সেই পুলিশ কনষ্টেবলটি। তার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। সে এখন হাবিলদার। এস-পি সাহেবের সুনজর আছে। হয়তো ছোট দারোগাও হয়ে যাবে কিছুদিন পরে। এই সংবাদটি দিয়ে সে বললে—"ফের একবার হুজুরকে 'তক্‌লিফ' করতে হবে। সেই কইলু চামার পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছে। সে খাপরা ছাইবার জন্যে একজনদের চালে উঠেছিল। চালের 'বাত্‌তি' (বাঁখারি) একদম পচে গিয়েছিল। হড়হড়িয়ে সেখান থেকে পড়ে গেছে বেচারা। আপনিই হুজুর বাঁচিয়েছিলেন একদিন ওকে—।"

তখন বর্ষাকাল। বৃষ্টি পড়ছিল। বললাম, "বৃষ্টিটা থামুক, তারপর গিয়ে দেখে আসব।"

"আমি কি তাহলে অপেক্ষা করব?"

"অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমি তো বাড়ি চিনি—"

"আচ্ছা, তাহলে ওদের বাড়িতে গিয়েই অপেক্ষা করছি।"

হাবিলদার চলে গেল।

গেলাম আমি একটু পরে। গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দশ বছর আগে গ্রীষ্মকালে যে জায়গাটা মরুভূমির মতো মনে হয়েছিল বর্ষাকালে তার চেহারা বদলে গেছে। চারিদিকে সবুজ দূর্বাদলে ছেয়ে গেছে। কইলুকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তার

চেহারা বিশেষ বদলায়নি দশ বছরে। তার মা দিদিমাও বেঁচে আছে দিব্যি। কইলুকে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। হাড়টাড় ভাঙেনি। গরম চুনে-হলুদে লাগিয়ে কয়েকদিন শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। আমি এসেছি খবর পেয়ে বাড়িশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। যাদের খুব ছোট দেখেছিলাম—সেই সীতিয়া, সোনিয়া, গীতিয়া, কারু, কালেশ্বরী, জুমা, খুদ্দুরবা, সেই খৈনি, মৈনি, টুনটুনি, হরিয়া, তেতরা—সবাই এখন বড় হয়েছে, সতেজ বন্য চারার মতো সকলেরই চোখমুখে লাবণ্য, দু-একজনের দেহে যৌবনের আভাসও দেখা দিয়েছে। কইলুর বড় মেয়ে রাজিয়া আবার চুমানা করেছে, তার তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে। দশ বছর আগে সাত-আট বছরের যে মিলিয়াকে ঘুঁটে ঠুকতে দেখেছিলাম সে এখন যুবতী, তারও সারা দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে। মনে হ'ল হাবিলদার সাহেব এখন এরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। দশ বছর আগে মনে হয়েছিল এরা জীবন যুদ্ধে হেরে যাবে। কিন্তু দেখছি হারেনি। জিতেছে। আমিই হেরে গেছি। আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতায় বিশ্বাসী হয়ে একটি ছেলে, একটি মেয়ে হবার পর আমার স্ত্রীর টিউব কাটিয়ে ফেলেছিলাম। ছেলেটি পাইলট হয়েছিল। প্লেনক্র্যাস (Plane crash) হওয়াতে মারা গেছে। মেয়েটির টি-বি হয়েছে। স্যানাটোরিয়ামে আছে সে। আমার মোটর আছে, মোটা মাইনে আছে। নানারকম ফার্ণিচার আছে। গিন্নীর অনেক অলংকার আছে, আমার সম্মান প্রতিপত্তিও আছে কিছু। কিন্তু সুখ নেই। এদের ওসব নেই, কিন্তু মনে হ'ল নানা দুর্দশা সত্ত্বেও এরা আমার চেয়ে বেশী সুখী। ওরা জিতেছে, আমি হেরে গেছি। মরশুমি ফুলরা দুর্বার কাছে হেরেই যায়। এর কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটল যাতে বুঝলাম সত্যিই আমরা হেরে যাচ্ছি।

এখানে মিউনিসিপাল ইলেকশন হ'ল। একটি শিক্ষিত বাঙালী যুবক কমিশনার হবেন ব'লে চেষ্টা করেছিলেন নানারকম। কিন্তু তিনি ঐ কইলুর কাছেই হেরে গেলেন। কইলুও ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল আর তার জাতভাইরা সংখ্যায় এত বেশী যে বাঙালী বাবুকে সে অনেক ভোটে হারিয়ে দিলে।

আবার মনে হ'ল সৌখীন মরশুমি ফুলের গাছ দুর্বাদের কখনও হারাতে পারবে না।

ঘুড়ি

ক্ষমতাবান লোক। মানে, পয়সার অভাব নেই। তার উপর খেয়ালী, সবজান্তা এবং জেদীও। যা মনে করেন তাই হয়। না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজের মনেও শান্তি থাকে না, আশপাশের লোকদেরও অশান্ত ক'রে তোলেন। দিনকতক কবিতা লেখবার শখ হয়েছিল। দিস্তা দিস্তা আর্ট পেপার এল বাজার থেকে। রাত দিন কবিতা লেখা চলল। স্তাবকরা বললে, এ রকম কবিতা কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ কেউ লিখতে পারেন নি। দেশের সব কাগজে সে সব কবিতা পাঠানো হ'ল। কিন্তু ছাপা হ'ল না একটিও। স্তাবকরা বললে—সম্পাদকরা সমজদার নন। কিন্তু এ রকম অমূল্য কাব্য লোক-লোচনের আড়ালে থেকে যাবে সেটাও তো ঠিক নয়। রসিক সমাজের প্রতি

অবিচার করা হবে তাহলে। আপনি নিজেই একটা মাসিকপত্র বের করুন। প্রেস কিনে ফেলুন একটা। তাই হ'ল। দামী প্রেসে দামী কাগজে কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল নানা রঙের নানা ঢঙের ছাপার অক্ষরে। স্তাবক মহলে সাড়া পড়ে গেল। তোষামোদের ফেনায় ফেনায়িত হ'ল তাদের অধর-ওষ্ঠ। কিন্তু বেশী দিন নয়। প্রতিভাবান বা সাধক হলে ওই পথেই হয়তো কিছু একটা গড়ে উঠত। কিন্তু পয়সার কুটকুটুনি স্থির হয়ে বসতে দেয় না এক আসনে। হঠাৎ কবিতার খেয়াল চলে গেল তাঁর। পায়রা ওড়ালেন দিনকতক। নানা জাতের নানা দেশের নানা রঙের পায়রা এল, পায়রাকে শিক্ষা দেবার জন্যে, পায়রার তদ্বির করবার জন্য নানা ধরনের লোকও বাহাল হ'ল। যে স্তাবকরা কাব্যামোদী ছিলেন তাঁরাই পারাবত-রসিক হয়ে উঠলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা ডিগবাজি খেতে লাগল আকাশে। তখন যিনি তাঁর প্রেয়সী ছিলেন—দুলারী বাঈ—তাঁর পাশে বসে এ দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত হতে লাগলেন তিনি, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগলেন, একবার পিছলে পড়েও গেলেন, একবার মুক্তকচ্ছ হয়েও পড়লেন, কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না কিছু। মানুষ যখন মাতোয়ারা হয় তখন এসব ছোটখাটো ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। কিন্তু পায়রাও বেশী দিন রইল না। কয়েক লক্ষ টাকার সঙ্গে তারাও অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর এল আরও নানারকম খেয়াল। টিকিট জমানো, ফোটো তোলা, রেস খেলা, অশ্লীল ছবি কেনা—এ সবেও গেল কয়েক লক্ষ টাকা। স্তাবকরাও কখনও টিকিট-রসিক, কখনও ফটো-রসিক, কখনও রেস-রসিক, কখনও অশ্লীল-ছবি-রসিক হয়ে বেশ কিছু টাকা পিটলেন। কখনও মুগ্ধ হয়ে, কখনও আহ্লাদে আটখানা হয়ে, কখনও হি-হি-ক'রে হেসে চাকরি বজায় রাখতে পারলেন তাঁরা।

হঠাৎ ধনী সন্তানের হুঁশ হ'ল—তাঁকে কেউ পোঁছে না। খবরের কাগজে তাঁকে নিয়ে হই-চই হয় না, তাঁর ছবি বেরোয় না, তাঁর বাণী ছাপা হয় না। তিনি যে একজন কেউকেটা একথা মানতেই চায় না যেন কেউ।

তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করলেন একজন স্তাবকের কাছে।

স্তাবকটি হাত কচলাতে কচলাতে বললে—"আমরাও তো সেই কথা বলাবলি করি হুজুর নিজেদের মধ্যে। গুণের সমাদর কি আর আছে আজকাল দেশে? তবে হ্যাঁ, একটা হক কথা বলব, হুজুর যদি না রাগ করেন।"

"কি হক কথা বলবে আবার। বল, চুপ ক'রে রইলে কেন। হক কথায় আমি কি রাগ করেছি কখনও?"

স্তাবকটি বললেন—"সব জিনিসেরই একটা পদ্ধতি আছে হুজুর। কবিতা লেখা, পায়রা-ওড়ানো, ফোটো-তোলা, রেস-খেলার মতো এরও একটা পদ্ধতি আছে, তাগ-বাগ আছে। হুট্‌ ক'রে কোনও কিছু হয় কি? এবার আপনি ইলেকশনে নেবে পড়ুন। কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতা দিলে কাগজে আপনার নাম উঠবে। এই যে এত সব সভা হয় নানারকম, সাহিত্য-সভা তো অলিতে গলিতে হচ্ছে, সে সব সভায় সভাপতি হয়ে বসুন, বক্তৃতা দিন, হাততালি পড়ুক। দেখি আপনার নাম কাগজে কেমন না বেরোয়। নাম বেরুবে। এই সবই হ'ল বাজারে নাম জাহির করার পদ্ধতি। আপনি ঘোষালের পরামর্শে প্রেসটা আর কাগজটা তুলে দিলেন ফট্‌ ক'রে। থাকলে কত সুবিধে হত। প্রতি মাসে যদি হাজার খানেক পত্রিকাও ছাপতেন তাহলে অন্তত দশ হাজার লোক প্রতি মাসে

জানতে পারত 'সাহিত্য-হংস' পত্রিকার সম্পাদক রায়বাহাদুর জগজ্জ্যোতি চৌধুরী কত বড় কবি। সত্যিই আপনি বড় কবি কিন্তু পাবলিসিটি নেই বলে লোকে আপনার নাম জানে না।"

জগজ্জ্যোতি গুম হয়ে বসে রইলেন।

তারপর বললেন, "ঘোষালটা চিরকালই আমাকে ভুল পথে চালিয়েছে। এবার তোমার বুদ্ধিতেই চলি। ইলেকশনেই দাঁড়াই এবার তাহলে, যা যা করবার তুমিই কর।"

এ স্তাবকটির উপাধি ঘোষাল নয় ঘোষ। ঘোষ এসে একদিন বললেন—"কোনও দলেরই টিকিট পাওয়া গেল না এবার হুজুর। এবার নির্দলীয় প্রার্থীরূপে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। বেশী খরচ হবে না। হিসেব ক'রে দেখলাম লাখ দুই টাকা খরচ করলেই কুলিয়ে যাবে।"

জগজ্জ্যোতি ঢালা হুকুম দিলেন—'কুছ পরোয়া নেই, আগে বঢ়ো।' জগজ্জ্যোতির পূর্বপুরুষেরা আগে বিহার অঞ্চলে বাস করতেন। তাই তাঁর কথাবার্তায় মাঝে মাঝে বিহারের ছিট এসে পড়ে।

টাকা দিয়ে ভোট কেনা যায়। সুতরাং রায়বাহাদুর জগজ্জ্যোতি চৌধুরী ভোট-যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। পতাকা উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজিয়ে সে বার্তা বিঘোষিত হ'ল পাড়ায় পাড়ায়। খবরের কাগজে তাঁর নামও বেরুল।

কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে গিয়ে। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর বৈঠকখানায় তাঁর অনুগৃহীত স্তাবকরা তাঁকে দেখলেই যেমন স-সম্ভ্রমে তটস্থ হয়ে পড়ে ওখানেও সেই জাতীয় কিছু হবে একটা। কিন্তু কেউ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না। ওখানে কলকেই পেলেন না তিনি। অধিবেশন যখন শুরু হ'ল তখন পাকিস্তান নিয়ে কি একটা 'ডিবেট' আরম্ভ করে দিলেন কতকগুলি সভ্য। কিছুই বোধগম্য হ'ল না তাঁর। তারপর চীৎকার চেঁচামেচি শুরু হ'ল। তিনি দেখলেন তাঁদেরই পাড়ার একটা বখা ছোঁড়া খুব মাতব্বরী করছে। তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতও করল না কেউ। পরদিন খবরের কাগজে দেখলেন ওই বখা ছোঁড়াটার নামই ফলাও ক'রে ছাপা হয়েছে। তিনি যে অধিবেশন-গৃহ অলঙ্কৃত করেছিলেন একথার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তিনি বুঝলেন ঘোষ তাঁকে ঠকিয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না তিনি। তিনি সমাদৃত হননি একথা বাইরে প্রকাশ ক'রে লাভ কি। কাউন্সিলের কোনও অধিবেশনে আর গেলেন না তিনি। চতুর ঘোষ ব্যাপারটা আন্দাজে বুঝেছিল, সে-ও আর পীড়াপীড়ি করল না। জগজ্জ্যোতি একদিন বললেন—"অতক্ষণ সোজা হয়ে বসে থাকলে আমার কোমর টনটন করে। কষ্ট হয় বেশ।"

"তবে আর যাবেন না হুজুর। শরীর আগে, তারপর অন্য সব।"

ঘোষ এমন মুখভাব করলেন, সত্যিই যেন তিনি তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হয়েছেন।

এর কয়েকদিন পরেই পঁচিশে বৈশাখ এসে পড়ল। ছেলেরা কবি-গুরুর জন্মদিনের উৎসব একটু ধুমধাম ক'রে করতে চায়। ঘোষকে এসে ধরলে তারা, জগজ্জ্যোতিবাবুর কাছে যদি মোটারকম চাঁদা পাওয়া যায়। বললে, একজন বড় সাহিত্যিককে আনতে চায় তারা লক্ষ্ণৌ থেকে। তিনিই সভাপতিত্ব করবেন। রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ নাকি। ঘোষ বললেন, তোমাদের হাজার টাকা পাইয়ে দিতে পারি।

আমি বললে হুজুর এখুনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু তোমাদের সভায় ওঁকেই সভাপতি করতে হবে। লক্ষ্ণৌ থেকে লোক আনাতে হবে না। দরকার কি! যদি নিতান্তই আনাতে চাও তাঁকে প্রধান অতিথি-টতিথি, ওই যে সব কি হয়েছে আজকাল, তাই ক'রে দিও। সভাপতি করতে হবে কিন্তু হুজুরকে।"

হাজার টাকা! পাড়ার ছেলেরা যেন আকাশের চাঁদকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল।

ঘোষ গিয়ে জগজ্জ্যোতিকে বললে—"হুজুর পাড়ার ছেলেরা বড্ড ধরেছে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তারা একটা উৎসব করবে। আপনি দয়া ক'রে তাদের সভায় যদি সভাপতিত্ব করেন ধন্য হয়ে যাবে তারা। সাহস করে আপনার কাছে আসতে পারছে না তারা। যদি অভয় দেন তাহলে তাদের বলি—"

"সভায় গিয়ে কি করতে হবে আমাকে"

"রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবেন। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কর্তাবাবুর আলাপ ছিল, আপনিও নিশ্চয় ছেলেবেলায় দেখেছেন তাঁকে—"

"হ্যাঁ তা তো দেখেছি—"

"সেই সব স্মৃতি-কথা বলবেন। আপনি যা বলবেন তাই কৃতার্থ হয়ে শুনবে ওরা।"

"বেশ।"

টাকার কথাটা সেদিন তুললেন না তিনি।

চার পাঁচ দিন পরে এসে বললেন—"ওরা কিছু চাঁদা চাইতে এসেছে। আপনি যে সভার সভাপতি হবেন সে সভাকে ভালো ক'রে সাজাতে হবে তো, খরচ আছে নানারকম। ওদের শখ আছে, আশা আছে, কিন্তু সামর্থ্য কোথায়। যদি হুকুম করেন—"

"বেশ, দিয়ে দাও কিছু। কত দেবে-"

"হুজুরের খ্যাতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দিতে হলে এক হাজার টাকার কম দেওয়া যায় না-"

"বেশ, তাই দাও—"

জগজ্জ্যোতি চৌধুরী এককালে কবিতা নিয়ে মেতেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের কবিতা ছাড়া আর কারও কবিতা বিশেষ পড়েন নি। একবার রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' পড়বার চেষ্টা করেছিলেন, 'সোনার তরী' নামটার জন্যেই করেছিলেন, ভেবেছিলেন সোনাপট্টীর কোনও খবর হয়তো পাওয়া যাবে ওতে। কিন্তু পড়ে কিছুই মাথায় ঢোকেনি তাঁর। সুতরাং পঁচিশে বৈশাখের সেই সাহিত্য-সভায় তিনি যে ভাষণ দিলেন তার সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোনও সম্পর্ক রইল না। তিনি যা বললেন, তা অদ্ভুত। বললেন, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার বাবার খুব আলাপ ছিল। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। আপনারা তাঁকে একজন বড় লিখিয়ে বলে জানেন, কিন্তু আমি জানি তাঁকে বড় খাইয়ে বলে। খুব খেতে পারতেন। একটা ছবি আমার মনে পড়ছে। বাবা একবার তাঁর সামনে বাগবাজারের এক গামলা রসগোল্লা এনে বললেন, "খান, দেখি কটা খেতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ টপাটপ খেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে গামলা খালি হয়ে গেল। শেষকালে রসটাও চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন।"

এই বক্তৃতা শুনে হই-চই ক'রে উঠল সভার লোক। পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, "কান ধরে নামিয়ে দাও উজবুকটাকে। দূর ক'রে দাও—"

মারমুখী হয়ে উঠল জনতা। ঘোষ কোন রকমে সামলে সুমলে নিয়ে এলেন তাঁকে সভা থেকে। সেই থেকে তাঁর নূতন নামকরণও হয়ে গেল একটা। আগে সবাই তাঁকে বলত জগু চৌধুরী, এখন বলতে লাগল—রসগোল্লা চৌধুরী।

এর পর থেকে সভা-সমিতিতে আর যেতেন না তিনি। কোথাও যেতেন না। তিনি বুঝেছিলেন বাইরের যে জগতে আত্ম-প্রচারের ঢক্কানিনাদের জোরে তুচ্ছ লোক উচ্চ হয়ে যায় সে জগতে তাঁর স্থান নেই। সেখানে তিনি বেমানান। বিমর্ষ হয়ে বাড়িতেই বসে থাকতেন পারিষদ পরিবৃত হয়ে। তিনি জানতেন, পারিষদরা নানারকম ফন্দি ক'রে তাঁকে ঠকিয়ে খাচ্ছে, তবু তাদের কিছু বলতেন না। তাদের দূর ক'রে দিলে কাকে নিয়ে থাকবেন তিনি। কেবল ভাবতেন, এবার কি নিয়ে আবার মেতে ওঠা যায়। মনে হত সবই তো ফুরিয়ে গেছে। মাতিয়ে দিতে পারে এমন কী-ই বা আর আছে।

একদিন তেতলার ছাতে একা বসেছিলেন। চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলেন। তাঁর অতীত জীবনের খেয়ালগুলো যেন ঘুড়ির মতো উড়ছে আকাশে। তাঁর কবিতা লেখা, পায়রা-ওড়ানো, ফোটো-তোলা, টিকিট জমানো, রেসের ঘোড়া, অশ্লীল ছবির অ্যালবাম, তাঁর জীবনের নানা নারী—সব যেন ঘুড়ির রূপ ধারণ ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নানাবর্ণের মনোরম ঘুড়ি সব! মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। দেখতে দেখতে তারা মিলিয়ে গেল।

"ছোটকা, ঘোষকে ডেকে নিয়ে আয় তো—"

ত্রস্ত ঘোষ এসে দাঁড়ালেন একটু পরে।

"কি বলছেন হুজুর—"

"আমি ঘুড়ি ওড়াব। ব্যবস্থা কর।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজকীয় ব্যবস্থাই করলেন ঘোষ। কলকাতায় লোক ছুটল ভালো ঘুড়ির কাগজ কিনতে। কলকাতা থেকেই একজন ঘুড়ি-বিশারদ মিস্ত্রিও এল। সে ঘুড়ির কাগজের উপর তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে লাগল নানারকম। তারই নির্দেশে লক্ষ্ণৌ চলে গেল একজন, খুব সরু সরু সোনালি আর রুপালি জরির সুতো আনবার জন্যে। ঘুড়ির লেজ তৈরি হবে। সুদক্ষ একজন ছুতোর চন্দনকাঠ দিয়ে চমৎকার লাটাই বানাল একটি। লাটাইয়ের উপর ছবি আঁকলেন একজন শিল্পী। মানজা এল নানারকম। মেতে উঠলেন জগজ্জ্যোতি চৌধুরী।

তেতলার ছাদে অবশেষে একটি প্রকাণ্ড সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে সুন্দর ঘুড়িটি ওড়ালেন জগজ্জ্যোতি চৌধুরী। আকাশটা ঝলমল ক'রে উঠল যেন। তন্ময় হয়ে ঘুড়ি ওড়াতে লাগলেন তিনি।

তারপর একটা কাণ্ড হ'ল। অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। আর একটা অতি সাধারণ ঘুড়ি বোঁ ক'রে আবির্ভূত হ'ল কোথা থেকে। সাধারণ চার পয়সার ঘুড়ি। জগজ্জ্যোতির ঘুড়িটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরতে লাগল সেটা। তারপরই—ভো কাট্টা! জগজ্জ্যোতির ঘুড়িটা কেটে গেল! টাল খেয়ে খেয়ে নামতে লাগল সেটা আকাশ থেকে।

"কে কাটলে, কার এত বড় বুকের পাটা—"

ঘোষ ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে গেলেন নীচে। দেখলেন, একটা ময়লা-কাপড়-পরা রোগা

ন্যাংলা ছেলে হাতে লাটাই নিয়ে বাঁই বাঁই ক'রে ছুটছে। ঘোষও ছুটলেন তার পিছু পিছু, কিন্তু ধরতে পারলেন না তাকে।

সন্তোষের মা

সন্তোষের মা আমার মায়ের সই ছিলেন। এক বিয়ে বাড়িতে অনেক দিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল। দেখিলাম মাথায় টাক পড়িয়াছে, চুল পাকিয়াছে, গালের চামড়াতে, চোখের কোণে বলিরেখা দেখা যাইতেছে। কিন্তু দাঁত পড়ে নাই। আগে যেমন তিনি সমানে পান চিবাইতেন এখনও তেমনি চিবাইতেছেন। আরও দেখিলাম তাঁহার দেহটা বুড়া হইয়াছে বটে কিন্তু মনটা আগেকার মতোই সতেজ এবং সবুজ আছে। আগেকার মতোই তিনি রসিকতা করিয়া, হাসিয়া, হাসাইয়া চতুর্দিকে আনন্দ বিকিরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখিলাম বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একত্র করিয়া এখনও তিনি প্রতি সন্ধ্যায় রূপকথার আসর বসাইতেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি বলিলেন, "তোর সইমাকে চিনতে পারছিস? চিনতে না পারবারই কথা, চেহারার আর সে জৌলুস নেই।" প্রণাম করিতেই বলিলেন, "বড্ড লম্বা হয়ে গেছিস। ব'স দেখি, একটা চুমু খাই, সেই সেকালে যেমন খেতাম।" জোর করিয়া বসাইয়া তিনি আমার দুই গালে সত্যই চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "সেই ছেলেবেলায় তোকে যেমন কোলে ক'রে নিয়ে ঘুম পাড়াতাম, এখনও ইচ্ছে করছে সেই রকম করি। কিন্তু এখন তা তো আর হয় না। অনেক বড় হ'য়ে গেছিস যে। গল্প শুনতে ভালবাসিস এখনও? সন্ধ্যের সময় আসিস গল্প বলব।"

"সন্ধের সময় আমি থিয়েটারে রিহার্সাল দিতে যাই।"

সন্তোষের মা গালে হাত দিয়া হাস্যদীপ্ত বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "ওমা, তুই আবার থিয়েটার করিস নাকি! কি পালা হচ্ছে?"

"সীতার বনবাস।"

"আমাকে তোদের রিহার্সালে নিয়ে যাবি? দেখতাম তুই কেমন কচ্ছিস। ভুল টুল হ'লে সুধ্‌রে দিতে পারতাম। কি সাজবি তুই?"

"রাম।"

"ওরে বাবা, তাহলে পারব না। একদিন রিহার্সালে না গেলে কি হয়? জানিস, তোকে দেখতেই আমি এসেছি, নেমন্তন্ন খেতে নয়। আজ সন্ধ্যেটা আমার কাছে থাক না। কালই তো চলে যাব।"

"কালই? কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"কুটুম বাড়িতে আর কতদিন থাকব বাবা। তাছাড়া সোডা-ওয়াটারের বোতল কাল যাচ্ছে, ওর সঙ্গেই চ'লে যাই। পরে আবার সঙ্গী পাব কোথা?"

"সোডা-ওয়াটারের বোতল আবার কে?"

সন্তোষের মা মুচকি হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "ওই তোমরা যাকে পটলকর্তা বল—"

পটলকর্তা ঘাড়ে-গরদানে বেঁটে লোক। রাগিয়া গেলে আত্মহারা হইয়া যা তা

কাণ্ড করিয়া বসেন। তাঁহার এমন লাগ-সই নাম সন্তোষের মা ছাড়া আর কেহ দিতে পারিত না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সন্তোষের কি খবর। সে এখন কি করছে—"

"সে-ও রিহার্সাল দিচ্ছে—"

"কিসের রিহার্সাল—"

"ডাক্তারির।"

"কার কাছ থেকে ডাক্তারি শিখলে ও। কোথাও তো পড়েনি।"

"বাড়িতে বাংলা বই প'ড়ে নিজে নিজেই দিগ্‌গজ হয়েছে।"

"রুগী হয় বেশ ?"

"হয় বই কি। সব বিনা পয়সার রোগী। ঘরের খেয়ে বনের মোষ কি ক'রে তাড়াতে হয় তা যদি দেখতে চাও, তোমার বন্ধুটিকে একবার গিয়ে দেখে এসো।"

তাহার পর কণ্ঠস্বরে মিনতি ফুটাইয়া আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, "শঙ্করায় তো অনেকদিন যাসনি। আয় না একবার—"

"আমি এখন কি করব তা ঠিক হয়নি। ঠিক হলেই যাব শঙ্করায় একবার।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় আসিস। তোর মায়ের একখানা শাড়ি আমার কাছে আছে। তোকে দিয়ে দেব। তোর বউ এলে তাকে দিস। সম্বন্ধ কোথাও ঠিক হয়েছে ?"

"আমি এখন বিয়ে করব না। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াই, তারপর ওসব ভাবা যাবে।"

"কিন্তু শুনলাম তোমার মামা নাকি দাঁও মারবার চেষ্টায় আছেন। বলছেন মোটা পণ নিয়ে তোমার বিয়ে দেবেন। কয়েক জায়গায় না কি দর কষাকষি চলছে—।"

"কই, আমি শুনিনি তো।"

"ঠিক হয়ে গেলেই শুনবে। তোর মতো সোনারচাঁদ ছেলের তো মোটা পণ পাওয়াই উচিত······"

সেদিন সন্ধ্যার সময় রিহার্সালে যাই নাই। সন্তোষের মায়ের গল্পের আসরে গিয়া বসিয়াছিলাম। আসরটা বসিয়াছিল একতলায় গুদোম ঘরে। লম্বা গোঁছের ঘরটা। তাহার একদিক বাড়ির ভাঙাচোরা জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই ঘরের মেঝেতে গোটা দুই কম্বল পাতিয়া বসিয়াছিলাম আমরা। ঘরের এককোণে মিটমিট করিয়া রেঁড়ির তেলের বাতি জ্বলিতেছিল। স্বল্পালোকে পরিবেশটা স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সন্তোষের মা সেদিন যে গল্পটা বলিয়াছিলেন তাহা অন্য কোনও পরিবেশে বেসুরা মনে হইত। গল্পের সবটা আমি শুনিতে পাই নাই। যতটুকু শুনিয়াছিল্যম তাহাই বলিতেছি।

"পিতামহ ব্রহ্মার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র একবার মর্ত্যে পালিয়ে এসেছিলেন। এসে আমাদের বেগমপুরের মাঠের মাঝখানে যে বড় বটগাছটা আছে তার উপর লুকিয়ে বসেছিলেন। কতদিন যে ছিলেন তা বেগমপুরের লোকেরা জানতেই পারেনি প্রথমে। জানবে কি ক'রে। রাত্তিরে তো কেউ ওই মাঠে বেরুত না। বেরুলে বুঝতে পারত ইন্দ্রের ছোঁয়া লেগে রাত্তির বেলা ওই গাছের কি অপরূপ চেহারা হয়েছে। দিনে কিন্তু যেমনকার গাছ তেমনি থাকত। দিনের বেলা ইন্দ্র ওই গাছে থাকতেন না, ভোর হ'তে না হ'তেই পাখী হ'য়ে উড়ে যেতেন গাছ থেকে। কোনদিন টিয়া হ'তেন, কোনদিন

ময়না, কোনদিন কাঠ-ঠোকরা। যেদিন যেমন খুশি। রাত্রে কিন্তু তিনি ইন্দ্র হ'য়ে গাছটিতে ব'সে থাকতেন। আর গাছের প্রত্যেকটি পাতা ঝলমল করত। মনে হ'ত প্রত্যেকটি পাতা যেন সাঁচ্চা জরি দিয়ে তৈরি আর প্রত্যেকটি পাতায় যেন জ্যোৎস্না ঝলমল করছে। আকাশে যেদিন চাঁদ থাকত সেদিন তো করতই, যেদিন না থাকত সেদিনও করত। গাছ হ'য়ে উঠত যেন বিরাট এক সিংহাসন আর সেই সিংহাসনে ব'সে থাকতেন দেবরাজ ইন্দ্র। রাত্তির বেলা আর এক কাণ্ড হ'ত। দিনের বেলা তিনি পাখী হ'য়ে ফলটা-পাকড়টা খেয়ে থাকতেন, কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কি তাতে তৃপ্তি হয়? স্বর্গে খবর পাঠিয়েছিলেন লুকিয়ে, শচী দেবী রোজ রাত্রে দু'জন অপ্সরা পাঠিয়ে দিতেন, তাদের হাতে থাকত সুধা-ভাণ্ড। ইন্দ্রকে সুধাপান করিয়ে আবার স্বর্গে ফিরে যেত তারা। অপ্সরারা যখন আসত তখন সেই বটগাছের শোভা আরও বেড়ে যেত। মনে হ'ত দুটো অদ্ভুত ইন্দ্রধনু যেন জড়িয়ে ধরেছে গাছটাকে। সে এক আশ্চর্য শোভা। কিন্তু বেগমপুরের লোকেরা তা দেখতে পেত না, তারা ঘুমুত তখন। কিন্তু একদিন তারা দেখতে পেয়ে গেল, মহেন্দ্র গাঙুলীর ছেলে আর বৌয়ের কল্যাণে।······অনেক দূরের এক গাঁয়ে মহেন্দ্র গাঙুলীর ছেলের বিয়ে হয়েছিল। বরযাত্রীরা বিয়ের পরদিন সকালে আগেই চলে এসেছিল। মহেন্দ্র গাঙুলীর বেয়াই চেষ্টা করেও দুটি গরুর গাড়ী জোগাড় করতে পারেন নি। শেষে তিনি বললেন, এক গরুর গাড়িতেই যেতে হবে বর-ক'নেকে। কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে যাও। তাই হ'ল। কাল-রাত্রি কাটিয়ে তার পরদিন ছেলে বউ নিয়ে বেরুল মহেন্দ্র গাঙুলী। অজ পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিল মহেন্দ্র গাঙুলী ছেলের। একটার বেশী গরুর গাড়ি জুটল না। পালকি তো নয়ই। যে গরুর গাড়িটা জুটল সেটাও অমজবুত গোছের। হাড়-পাঁজরা-বার-করা গরু দুটো, গাড়িটাও ভালো নয়। মহেন্দ্র গাঙুলী আশা করেছিল সে-ও গাড়ির পিছন দিকটায় ব'সে যেতে পারবে। কিন্তু গাড়োয়ান বলল, গরু টানতে পারবে না। রাস্তাও খারাপ। মহেন্দ্র গাঙুলী শেষে বলল, কুছ পরোয়া নেই। আমি হেঁটেই যাব। ছেলে বউকে এখনি রওনা ক'রে দাও। আজ ফুল-শয্যা, সকাল সকাল রওনা ক'রে না দিলে সময়ে পেঁছিতে পারবে না। তাই হ'ল। গরুর গাড়ির ছই-বেঁধে মেঠো পথে রওনা হ'ল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। ছইএর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল নতুন বৌয়ের চেলির আঁচল। মহেন্দ্র গাঙুলী পাগড়ী বেঁধে ছাতা ঘাড়ে ক'রে হাঁটতে লাগল গাড়ির পিছু পিছু। গাড়ির গরু দুটো যদি ভালো হ'ত তাহলে তারা ঠিক সময়ে পেঁাছে যেত, কিন্তু আগেই বলেছি গরু দুটি ভালো ছিল না, হাড়-পাঁজরা-বার-করা বুড়ো গরু, ঢিকিস ঢিকিস করে চলতে লাগল। গাড়োয়ান গরু দুটোকে দমাদ্দম পিটুচ্ছিল। বউটি চুপি চুপি গাড়োয়ানকে বললে, তুমি অমন ক'রে মেরো না বাপু গরু দুটোকে। বউটির নরম মনের সুযোগ নিয়ে গরু দুটো আরো আস্তে আস্তে চলতে লাগল। মহেন্দ্র গাঙুলী অবশ্য চেঁচামেচি করতে লাগল খুব, কিন্তু গাড়োয়ান বউটির কথা অগ্রাহ্য ক'রে গরু দুটোকে আর মারতে রাজী হ'ল না। খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগল তারা। আস্তে আস্তে চলেও রাত এগারোটা নাগাদ তারা হয়তো বেগমপুরে পেঁাছে যেত, কিন্তু বেগমপুরের মাঠে সেই বটগাছটার তলায় এসে গরুর গাড়ির একটা চাকাই গেল ভেঙে। একেবারে অচল অবস্থা হ'য়ে পড়ল তখন। মহেন্দ্র গাঙুলী গাড়োয়ানকে বকতে যাচ্ছিল কিন্তু

গাছটার দিকে চেয়ে নির্বাক হ'য়ে গেল সে। সমস্ত গাছ যেন জড়োয়ার গয়না প'রে দাঁড়িয়ে আছে। গাছ নয় যেন জুয়েলারি দোকানের বিরাট শো-কেশ—এমন বিরাট শো-কেশ কোনও জুয়েলারি-দোকানেও দেখা যায় না। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাঁ ক'রে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বউটি কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ফুলশয্যার রাত্তিরে একি হ'ল আজ। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী নিমেষের মধ্যে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললে। বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক তো, তার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এই অন্ধকার রাত্রে তেপান্তর মাঠের মাঝখানে সারা গাছ জুড়ে যে কাণ্ডটা হচ্ছে তা অলৌকিক কাণ্ড। হয় দেবতা, না হয় উপদেবতা ভর করেছেন, ওই গাছে। গরুর গাড়ির চাকা ভেঙে ফেলাটাও হয়তো তাঁরই কীর্তি। দেবতা-উপদেবতার সঙ্গে জোরজবরদস্তি চলে না, চোখ রাঙিয়ে কাজ আদায় করা যায় না তাদের কাছ থেকে। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী হাত জোড় ক'রে গাছের দিকে তাকিয়ে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে—দোহাই বাবা, রক্ষা করো। আমি গরীব ব্রাহ্মণ রক্ষা কর আমাকে। গাছের ভিতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ এল, কে তুমি। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী করুণ কণ্ঠে বললে, আমি বেগমপুরের মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। ছেলের বিয়ে দিয়ে ফিরছি, আজ ফুলশয্যা। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে গরুর গাড়ির চাকাটা ভেঙে গেছে। কি ক'রে কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। গাছের ভিতর থেকে আবার গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ এল - সব ঠিক হয়ে যাবে। চুপ ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাক সবাই। তাই হ'ল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলী, তার ছেলে, তার বউ, গাড়ির গাড়োয়ান সবাই চোখ বুজে ব'সে রইল। গরু দুটো আগেই চোখ বুজে ফেলেছিল। চোখ বুজে না থাকলে তারা দেখতে পেত দুটি ধপ্‌ধপে শাদা পরী ডানা মেলে উড়ে গেল গাছ থেকে, আর দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আকাশে। আকাশের নক্ষত্রেরা সব সরে সরে তাদের পথ ক'রে দিতে লাগল। চোখ বুজে ব'সে রইল তারা। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর অস্বস্তি হচ্ছিল একটু। এক একবার লোভ হচ্ছিল চোখটা একটু ফাঁক ক'রে দেখে গরুর গাড়ির চাকাটা আপনা আপনি গোটা হ'য়ে যাচ্ছে কিনা। কিন্তু ভয়ে সে চোখ খুলতে পারল না। কি জানি, কিছু যদি হ'য়ে যায়। খামখেয়ালী দেবতা ভালও যেমন করতে পারেন, সর্বনাশও তেমনি করতে পারেন। ভুরু কুঁচকে চোখ বুজে বসে রইল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর মনে হ'ল কুলু কুলু ক'রে একটা শব্দ হচ্ছে যেন। শব্দটা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর সন্দেহ রইল না তাদের যে একটা নদী এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। জোলো ঠাণ্ডা হাওয়াও এসে গায়ে লাগতে লাগল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দও স্পষ্ট শুনতে পেলে মহেন্দ্র গাঙ্গুলী। হঠাৎ শানাই বেজে উঠল আর গাছের উপর থেকে ইন্দ্র হুকুম দিলেন- চোখ খোল। অবাক হয়ে গেল মহেন্দ্র গাঙ্গুলী চোখ খুলে। চারিদিক আলোয় আলো, সামনে সত্যিই একটা নদী আর নদীর উপর ভাসছে চমৎকার একটা ময়ূরপংখী। নদীর জল যেন গলানো সোনা, ময়ূরপংখীর সারা গায়ে জ্বলছে মণি-মাণিক্য আর দুলছে নানা রঙের ফুলের মালা। ময়ূরপংখীর ছাতের উপর ব'সে যারা সানাই বাজাচ্ছে তাদের মতো সুন্দর লোক মহেন্দ্র গাঙ্গুলী আর কখনও দেখেনি। তারা যে কিন্নর, দেখবে কি ক'রে। গাছ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ইন্দ্র আবার আদেশ দিলেন,—স্বর্গ থেকে স্বয়ং মন্দাকিনী ময়ূরপংখী নিয়ে এসেছেন তোমার ছেলে বউকে বেগমপুর পেঁাছে দেবেন ব'লে। তোমরা ওই ময়ূরপংখীতে চড়ে চলে যাও—"

ঠিক এই সময়ে থিয়েটারের পাণ্ডা মন্মথ আসিয়া হাঁকা-হাঁকি করিতে লাগিল। আমার জন্য নাকি রিহার্সাল আটকাইয়া গিয়াছে। উঠিতে হইল।

সন্তোষের মায়ের সহিত আর আমার দেখা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জীবনে অনেক স্ত্রীলোকের সহিত মিশিয়াছি, কিন্তু সন্তোষের মা-এর মতো আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। আর ছিল তাঁহার অপরূপ কল্পনা শক্তি! যে কোনও সময়ে যে কোনও পরিবেশে তিনি গল্পের মায়া-কানন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। জানি না পরলোক আছে কিনা এবং সেখানেও তিনি গল্পের আসর জমাইয়াছেন কি না।

সামান্য কিছু

আশা করি গল্প হিসাবেই এটাকে গ্রহণ করবেন আপনারা। সত্যের সঙ্গে গল্পের কোথায় তফাত সে দুরূহ আলোচনায় আমি প্রবৃত্ত হব না। গোড়াতেই আমি স্বীকার করছি নিত্যলাল চকচন্দা নামে যে মহাজন আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি যে আসলে হস্তীকুমার সাধু, তা আমার জানা ছিল না। হস্তীকুমার সাধুকে আমি তৈল-ব্যবসায়ীরূপেই জানতাম। তিনি যে এতবড় যাদুকর তা-ও আমার অবিদিত ছিল। যে পাখী গোপনে উড়ে এসে কানে কানে খবর সরবরাহ করে, সেই পাখীই খবরটি দিয়ে আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে গেছে। সেই কল্পনা যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীটির ছবি আঁকলেন—যিনি 'কল-কাঠি' নাড়লে অসম্ভব সম্ভব হয়- তাঁর নাম বা পরিচয়ও আমি জানি না। আমি কল্পনায় যা দেখছি, তাই লিখলাম।

বিরাট একটি ঘর। ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মেহগিনির টেবিল। মখমলের উপর সোনার কাজ করা একটি আচ্ছাদন অলঙ্কৃত করেছে সে টেবিলকে। টেবিলের মাঝখানে স্ফটিকের একটি বড় ফুলদানি। তাতে একগোছা নীলপদ্ম। ঘরে নানারকম আলোর সমারোহ। নিওন-বাতির স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে নানা আকৃতির নানা বর্ণের আলোক-পুষ্প স্বপ্নাচ্ছন্ন। টেবিলের সামনে একটি মাত্র চেয়ার। চেয়ার নয়, যেন সিংহাসন। মণিমাণিক্যখচিত। সামনের দেওয়ালে যে নিওন বাতিটি জ্বলছে, সেটি মনুষ্যাকৃতি—হাত-জোড় করে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে জানলা-দরজা দেখা যাচ্ছে না। দেওয়ালগুলি যেন হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরি। মাঝে মাঝে রেখার মতন নীল দাগ টানা রয়েছে। সম্ভবত ওগুলি জোড়। একদিকের দেওয়ালে নিকষ-কৃষ্ণ একটি সুইচ-বোর্ড।

ঘরে কেউ নেই।

মাঝে মাঝে একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে মাঝখানের দেওয়ালটা নিঃশব্দে ফাঁক হ'য়ে গেল। স্মিতমুখে উক্ত পদস্থ রাজকর্মচারীটি প্রবেশ করলেন। পিছনে পিছনে হাতুবাবু, হাত কচলাতে কচলাতে। শুনতে পাওয়া গেল গদগদ-কণ্ঠে তিনি বলছেন: "না, না, সামান্য কিছু আয়োজন করেছি। আপনার জন্যে যদি না করি তাহলে কার জন্যে আর করব। আপনি আমার যে উপকার করেছেন—"

"একটি চেয়ার কেন"—রাজকর্মচারী বললেন—"আপনি বসবেন না ?"

"আপনার সামনে কি আমি চেয়ারে বসতে পারি ! এ ধৃষ্টতা আমার কখনও যেন না হয়। বসুন—"

"চমৎকার ঘরটি। কবে তৈরি করলেন এটা—"

"কালই শেষ হয়েছে। আপনাদের মতো সম্মানিত অতিথিদের জন্যে এটা করিয়েছি নির্জন সমুদ্রসৈকতে। আপনাদের মতো অতিথিকে বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া যায় না, হোটেলেও নয়। জাপানী মিস্ত্রিরা করেছে! যেখানে খুশি তুলে নিয়ে যাওয়া যায়—"

"চমৎকার তো—"

এর পরই দেখা গেল দুটি সুবেশা সুরূপা মেয়ে প্রবেশ করছেন। একজনের হাতে একটি সোনার রেকাবি, আব একজনের হাতে একটি সোনার গ্লাস। দুটি অজন্তার মূর্তি যেন এগিয়ে এলেন। তখন দেখা গেল তাতে সন্দেশ রয়েছে কয়েকটি। গ্লাসে শীতল জল। রেকাবি আর গ্লাস রেখে তাঁরা রাজকর্মচারীর দু'পাশে গিয়ে ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। ছবি সম্পূর্ণ হ'ল।

"এরা কে—"

"এরা মোম্বাসার রাজ-পরিবারের মেয়ে। যমজ। দুজনেই বোবা। এদের আমি নাম রেখেছি মনোহরা আর প্রাণহরা।"

"মোম্বাসার রাজা ? তিনি এসেছেন না কি !"

"এসেছেন। কিন্তু অফিসিয়ালি নয়, এমনি—"

"এ সব কি। আরে—সন্দেশ ! এ কি বে-আইনি কাণ্ড করেছেন আপনি—"

"আজ্ঞে শুধু সন্দেশ নয়, সোনার রেকাবির উপর তা দিয়েছি, জলও সোনার গ্লাসে দিয়েছি। কিন্তু বে-আইনী কিছু করিনি—"

"কি রকম !"

"সন্দেশ বাঘের দুধ থেকে তৈরি করিয়েছি। আর সোনার রেকাবি আর গ্লাস মোম্বাসার রাজা বম্বে থেকে প্লেনে করে পাঠিয়েছেন আমার ফোন পেয়ে। এরা নিয়ে এসেছে—।"

"বাঘের দুধের সন্দেশ ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না ? দেখুন তবে—"

হাতুবাবু এগিয়ে গিয়ে সুইচ-বোর্ডের একটি সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-ধারের দেওয়ালটা সম্পূর্ণ সরে গেল। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দেখতে পেলেন দূরে একটি খাঁচায় এক বাঘিনী গর্জন করছে। আর একটু দূরে রয়েছে লাল রঙের একটা ছোট প্লেন। হাতুবাবু আবার সুইচ টিপলেন। দেওয়াল যথাস্থানে ফিরে এল।

হাতুবাবু বললেন - "ওই বাঘিনীকে দুইবার জন্য একজন গোয়ালা অ্যানিমাল-ট্রেনারকে আনতে হয়েছিল। আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার। চ্যাঁক চোঁক চ্যাঁক চোঁক করে সের খানেক দুধ দুয়ে দিলে। তাকে দিতে হ'ল অবশ্য কিছু মোটা টাকা। কিন্তু আমার কাজটা উদ্ধার করে দিল তো !"

"কেন এত কাণ্ড করতে গেলেন—"

"আপনি যে সন্দেশ ভালবাসেন সার। আইনের কবলে পড়ে আপনারই সবচেয়ে

বেশী কষ্ট হচ্ছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই এই সামান্য আয়োজন। হেঁ হেঁ হেঁ। খান আপনি। খেয়ে দেখুন তো কেমন হয়েছে—"

রাজকর্মচারী একটি সন্দেশ তুলে মুখে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখ দুটি বুজে গেল।

"বাঃ, এতো চমৎকার! কোনও গন্ধ তো নেই, ঠিক যেন গরুর দুধের সন্দেশ!"

"একজন কেমিস্টেরও সহায়তা নিতে হয়েছিল গন্ধটা দূর করবার জন্য।"

"বাঃ ঠিক যেন গরুর দুধের সন্দেশ—"

রাজকর্মচারী আর অধিক বাক্যব্যয় না করে সন্দেশগুলি খেয়ে ফেললেন। তারপর সোনার গ্লাসে জল খেয়ে বললেন, "কেন যে অনর্থক এত টাকা খরচ করলেন আপনি—"

"আমার টাকা সার্থক হ'ল। বেশী খরচ তো হয়নি—সামান্য কিছু—"

অদ্ভুত কাণ্ড

"কি হ'ল?"

মহারাজ জ্বলজ্জ্যোতি সিংহ তাঁর নব-নিযুক্ত গাইডটির দিকে সোৎসুকে চেয়ে রইলেন। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে গোপনে চলে এসেছিলেন কাশীতে। বহুকাল পূর্বেকার সেই দিনগুলিকে আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে। রাজ্যের ঝঞ্ঝাটে অস্থির অশান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন তিনি। তিনি শিব-ভক্ত লোক। আশা করেছিলেন কাশীতে এসে কিছু শান্তি পাবেন।

সঙ্গে লোকজন ছিল না, স্টেশনে তিনি এই লোকটিকে নিযুক্ত করেছিলেন। করেছিলেন তার চেহারার জন্য। ধপধপে ফরসা রং, গম্ভীর মুখভাব। গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে এগিয়ে এসেছিল লোকটা। বলেছিল—"চলুন মহারাজ—"

বিস্মিত হয়েছিলেন জ্বলজ্জ্যোতি।

"আমাকে চেন না কি -"

"হ্যাঁ, অনেকদিন আগে একবার এসেছিলেন তো? তখন থেকেই চিনি আপনাকে।"

"কোথায় থাক?"

"এখন একটা হোটেলে চাকরি করি। সেইখানেই চলুন। কোনও কষ্ট হবে না আপনার।"

হোটেলে এসে একটা ভাল ঘরে তাঁকে তুলে দিয়ে সে বলেছিল, "মহারাজ, আপনার কি কি চাই আমাকে আদেশ করুন।"

মহারাজ বলেছিলেন—"কিছু ভালো জরদা চাই, আর কিছু শাড়ি। আর সেকালে জহর বাঈজির সঙ্গে আলাপ ছিল, খুব ভালো গান গাইত। সে যদি থাকে, তার কাছে নিয়ে যেও। আর বাবা বিশ্বনাথ তো আছেনই, তাঁর কাছে তো নিশ্চয়ই যেতে হবে—"

লোকটি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মহারাজ, আপনি যা-যা চাইছেন তার কিছুই তো নেই। সে জর্দা নেই, সে শাড়ি নেই। জহর বাঈজি অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর মেয়ে এখন সিনেমায়।"

"তাই না কি! কাশীর জিলিপি?"

"তা-ও নেই।"

"মালাই?"

"তা-ও নেই"—তারপর একটু হেসে বললে, "মহারাজ, আগের কিছুই নেই। আপনার রাজ্যই কি আছে?"

"এখানে নবীন মিস্তির ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন—"

"তিনি অনেক দিন আগে অন্ধ হ'য়ে গেছেন। তাঁর ছেলেরা এখন তাঁকে খেতে দেয় না।"

"তাহলে বাবা বিশ্বনাথকে দেখে আসি তারপর চলে যাব।"

"বিশ্বনাথও নেই মহারাজ। পাথরটা আছে।"

"সে কি! কোথায় গেলেন তিনি—"

"এখানেই আছেন। কখনও রাজনৈতিক দলের ক্যানভাসার, কখনও দালাল, কখনও রিকসাওলা; নানাভাবে দিন কাটাতে হয় তাঁকে। এখন তিনি হোটেলে চাকরি করেন।"

বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল মুচকি হেসে।

"ওহে, শোন, শোন—কি করি তাহলে এখন—"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মহারাজও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

আর একটি চাকর এসে দাঁড়াল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"যে লোকটি আমাকে নিয়ে এল এখানে—"

"ও, মহাদেব—"

মহাদেব মহাদেব বলে ডাকতে লাগল চাকরটি। মহাদেবের সাড়া কিন্তু পাওয়া গেল না।

সে তখন বলল, "ও লোকটা পাগলা গোছের হুজুর। কোথাও টিকে থাকতে পারে না। স'রে পড়ল বোধ হয়।"

"মহাদেব ওর নাম?"

হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মহারাজ।

দেশ

সেকালে রায়বাহাদুর-রাজাবাহাদুর ছিল, একালে পদ্মশ্রী-পদ্মবিভূষণ হয়েছে। কিন্তু ওসব উপাধি লোকের মনে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম জাগায় না ঠিক। সেকালেও জাগাত না, একালেও জাগায় না। সরকারের দেওয়া সম্মান কাগজে কলমে লেখা থাকে, খবরটা সংবাদপত্রের কোনও কোণে একদিনের জন্য ছাপা হয়, তারপর লোকে ভুলে যায়। কেউ কেউ তির্যকভাবে দু-চার দিন হয়তো মনে রাখে—হ্যাঁ লোকটার তদ্বির করবার ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু জনসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লোককে যে সম্মান দেয় তা অবিস্মরণীয়। এখানে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল।

লড়াই হয়েছিল রীতিমত। সে লড়াইয়ে একজন সাহেব মারা গিয়েছিল। তাঁর স্মৃতিকে অমর করবার জন্যে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন নি। অনেকখানি জায়গা পাকা দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মনুমেণ্ট করেছেন, মনুমেণ্টের গায়ে পাথরের উপর খুদে তাঁর নাম, কীর্তিকলাপ সব লিখে রেখেছেন বড় বড় ক'রে। অনেকবার সে নামটা পড়েছি, কিন্তু কিছুতেই মনে থাকে না। সাঁওতালদের দলে যে সর্দার ছিল, তার নাম ছিল তিলকা মাঝি। সে-ও যুদ্ধে মারা গিয়েছিল। তার নামে কেউ মনুমেণ্ট করেনি। কিন্তু ওই অঞ্চলটারই নাম হয়ে গেছে তিলকা মাঝি। সেই সাহেব মৃত্যুর সংগেই মারা গেছে, কিন্তু তিলকা মাঝি অমর। ও অঞ্চলটাকে ঘিরে প্রতিদিন তার নাম সহস্র বার উচ্চারিত হচ্ছে। এই সব প্রসংগ মনে পড়ল একটি পল্লী-বিধবার ব্যাপারে। এককালে তাঁর পোশাকী নাম ছিল রাজেন্দ্রাণী দেবী। কিন্তু তাঁর এ নাম কেউ আজ জানে না। কিন্তু 'খুনতি মাসী' বললেই সবাই চিনবে তাঁকে। অদ্ভুত ভালো রাঁধতে পারেন ভদ্রমহিলা। বড় বড় যজ্ঞি বাড়িতে সাদরে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায় তাঁকে সকলে। তিনি যখন যেখানে যান, নিজের চকচকে-মাজা খুনতিটি নিয়ে যান। অনেকের ধারণা, ও খুনতি মন্ত্রপূত। ও খুনতি দিয়ে তরকারি রাঁধলে সে তরকারি ওতরাবেই। উপকরণ অতি সামান্য। পাকা মাছ বা খাসি নয়, হড় হড় করে তেল-ঘি ঢেলে গদগদে মশলা দিয়েও নয়—অতি সামান্য সব জিনিস দিয়ে চমৎকার তরকারি রাঁধেন খুনতি মাসী। লাউয়ের খোসা, সাধারণ শাক-ডাঁটা, তুচ্ছ সিম পটল বেগুন, তাঁর খুনতির স্পর্শে রূপান্তরিত হয় অমৃতে। আগে যখন মাছ মাংস রাঁধতেন তখনও তা অপূর্ব হত। বিধবা হওয়ার পর আর মাছ মাংস স্পর্শ করেন না। এখন নিরামিষই রাঁধেন। তাঁর হাতের মোচার ঘণ্ট, ধোকার ডালনা, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, তাঁর হাতের সুক্তো, ছেঁচকি, অম্বল যাঁরা খাওয়ার সুযোগ পাননি তাঁরা বাঙালী সংস্কৃতির পুরো আস্বাদ থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন সম্ভবত। খুনতি মাসির খুনতির তো প্রসিদ্ধি ছিলই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রসিদ্ধি ছিল তাঁর নিষ্ঠার। ওঁর মতো নিষ্ঠাবতী রমণীও বিরল। তিনবার স্নান করতেন। ভোর থেকে উঠেই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে ঢুকতেন গিয়ে পুজোর ঘরে। নিজের হাতে মুছতেন সে পুজোর ঘর, পুজোর জন্যে নিজের হাতে ফুল তুলতেন, চন্দন ঘষতেন। প্রতিটি ঠাকুরের ছবিকে সযত্নে মুছতেন। বাসী কাপড় ছাড়িয়ে কাচা-কাপড় পরিয়ে দিতেন লক্ষ্মীজনার্দনকে। চারিদিকে জ্বালিয়ে দিতেন ধূপকাঠি। তারপর গিয়ে স্নান করতেন আবার। ভিজে কাপড়েই পরে' ফেলতেন শুদ্ধ পাটের কাপড়টি। তারপর বসতেন পুজোয়। পুরো দুটি ঘণ্টা পুজো করতেন।

পুজো সেরে উঠে বাড়ির গাছ-গাছালিতে নিজের হাতে জল দিতেন। খেতে দিতেন কাককে। তুলসী গাছে জল দিয়ে অনেকক্ষণ প্রণত হয়ে থাকতেন তুলসী মঞ্চের কাছে। তারপর বুধী গাইকে নিজের হাতে খড় কেটে খোল ফ্যান দিয়ে জাব মেখে দিতেন। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিয়ে আসতেন মাঠে একটা খুঁটো পুঁতে। তারপর একটু গংগাজল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আসতেন বুধীর গায়ে। কি জানি কারো অপবিত্র কুদৃষ্টি যদি গাইটাকে কলুষিত করে ফেলে। তারপর আবার এসে স্নান করতেন। ছোঁয়াছুঁয়ির বড় বিচার। বাগদি বউ উঠোনটা ঝাড়ু দিয়ে যায় ভোরে। তারপর উঠোনে গংগাজল ছিটিয়ে বেড়ান। স্বহস্তে কাপড় কেচে ঘরের ভেতরেই শুকুতে

দেন। পাছে কাক-পক্ষী ছুঁয়ে ফেলে। একবেলা স্বপাক খান গঙ্গাজলে রান্না ক'রে। যখন ভোজের বাড়িতে রান্না করবার নিমন্ত্রণ আসে তখন ওঠেন আরও ভোরে। পুজোর ঘরের কাজকর্ম সেরে পুজান্তে একমুঠো মুগের ডাল ভিজানো আর গুড় খেয়ে খুন্তিটি হাতে করে কাজের বাড়িতে গিয়ে রান্নাঘরে ঢোকেন। সেখানে জলস্পর্শ করেন না। বাড়িতে ফিরে এসে আবার স্নান করে উনুন ধরিয়ে দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নেন। অতিশয় নিষ্ঠাবতী রমণী। অনেকের ধারণা তাঁর এই নিষ্ঠার জন্যেই তাঁর হাতের রান্না অত ভালো হয়। তাঁর রান্নাটাও যেন পুজা।

খুন্তি মাসী শিল্পী ছিলেন, নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু ভাগ্যবতী ছিলেন না। আপন লোক কেউ ছিল না তাঁর। গ্রামেরই মেয়ে তিনি, গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই বৈধব্য-বরণ করতে হ'ল। একটি ছেলে হয়েছিল। তাকে টিকে দিতে দেননি। কে যেন বলেছিল তাঁকে, গরুর গায়ে বসন্ত রোগ করিয়ে সেই বসন্তর গুটি থেকে পুঁজ নিয়ে টিকে তৈরী হয়। তাঁর একমাত্র সন্তানের গায়ে এই ঘৃণ্য জিনিস প্রবেশ করতে দেননি তিনি। বলেছিলেন, মা শীতলা রক্ষা করবেন। মা শীতলা কিন্তু রক্ষা করেননি। বসন্ত রোগে মারা যায় ছেলেটি। তাঁর ছেলের সহপাঠী ছিল চঞ্চলকুমার। একসঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। চঞ্চলকুমারের মা-বাপ কেউ ছিল না। মামার বাড়িতে অতি দুর্দশায় মানুষ হচ্ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে কিন্তু পড়াশোনাতে ভাল ছিল না। বদসঙ্গে মিশে বখাটে হয়ে যাচ্ছিল। মামারা বলত "অচল পয়সা"। মামাদের বলে ক'য়ে খুন্তি মাসী তাকে নিজের কাছে এনে রেখে ছিলেন। ইচ্ছে ছিল ছেলের মতন মানুষ করবেন। কিন্তু বিধাতা সেখানেও বাদ সাধলেন। চঞ্চল ক্রমশঃই যেন খারাপের দিকে চলতে লাগল। পড়াশোনা তো করতই না, ক্রমশ নানারকম দৌরাত্ম্য শুরু ক'রে দিলে। খুন্তি মাসী তবু তাকে প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর ছেলেকেই যেন ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন তিনি, ভাবতেন ও সত্যিই যদি আমার ছেলে হ'ত তাহলে আমি কি করতাম? তাড়িয়ে দিতাম কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত চঞ্চলকুমারকে রাখতে পারেন নি খুন্তি মাসী। তার বয়স যখন পনেরো ষোল বছর তখন সে উধাও হ'য়ে গেল একদিন। সে বিড়ি খেয়েছিল বলে খুন্তি মাসী তার কান ধরে যেদিন ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলেন, তার পরদিনই পালাল সে। আর ফিরে আসেনি।

একক জীবনযাপন করছিলেন খুন্তি মাসী। সারাদিন নিজেকে নিয়েই থাকেন। একটা টিয়া পাখী পুষেছিলেন, তাকেই ঠাকুর দেবতার নাম শেখাবার চেষ্টা করছিলেন ইদানীং। হয়ত তাঁর অবশিষ্ট জীবনটা এইভাবে কেটে যেত। কিন্তু মুশকিলে পড়লেন একদিন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর শান্তি বিঘ্নিত হ'তে লাগল। কশের একটা দাঁতে কনকনানি শুরু হ'ল। শক্ত অনড় দাঁত—তাঁর প্রত্যেকটি দাঁতই মজবুত—কিন্তু কি যে হ'ল ওই দাঁতটাতে দিবারাত্রি কনকনানি আর থামে না। প্রতিবেশী বৃদ্ধ ফটিকবাবু পরামর্শ দিলেন গরম জলে একটু নুন দিয়ে কুলকুচো কর, করলেন, কিন্তু তাতে আরও বেড়ে গেল। ফট্‌কিরি গুঁড়িয়ে দাঁতের গোড়ায় দিলেন, কিছু হ'ল না। খয়ের গুঁড়িয়ে দিলেন, কর্পূর দিলেন—কিন্তু যন্ত্রণার উপশম নেই। শেষে অন্নজল ত্যাগ করতে হ'ল। গালের এক দিকটা ফুলে উঠল। তিনু ভট্‌চার্যের ছেলের উপনয়নে যখন তাঁকে ডাকতে এল তিনু তখন তাঁর অবস্থা দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল সে।

"তোমার এমন অবস্থা হয়েছে তুমি আমাকে একটু খবর দিতে পারনি?"

"খবর দিলে কি-ই বা আর করতে তুমি। সব রকম ক'রে দেখেছি—"

"আমার ভাই-পো বিশু জগন্নাথপুরে প্র্যাকটিস করছে যে। খুব নাম ডাক। তাকে খবর দিলেই সে এসে তোমাকে দেখে যেত। তার বাইসিক্‌ল আছে। আট ক্রোশ আসতে আর কতক্ষণ লাগত। কাল সে যজ্ঞিবাড়িতে আসবে। তখন ব্যবস্থা করব। তুমি কাল যেতে পারবে কি? এই কাহিল শরীরে ঢুকতে পারবে রান্নাঘরে?"

"যাব, যতক্ষণ বেঁচে আছি যাব বই কি, ডাকতে এসেছ যখন। টুনুর পৈতেতে না গেলে চলবে কেন?"

"বেশী রাঁধতে দেব না তোমাকে। আলুর দমটি ভাল ক'রে রেঁধে দিও কেবল। আর যদি শরীরে কুলোয় কুমড়োর ডালনাটা। লুচির ভোজ তো, গোটা দুই নিরামিষ তরকারি ভালো হওয়া দরকার। আর চাটনিটা যদি পার—"

"চাটনিও ক'রে দেব আমি। সবই করে দিতুম। এই দাঁতটা—"

"দাঁতের ব্যবস্থা কালই হ'য়ে যাবে।"

বিশু ডাক্তার দাঁত পরীক্ষা করে যা বললে তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল খুনতি মাসীর। বললে "বাইরে থেকে ওষুধ লাগিয়ে কিছু হবে না। মনে হচ্ছে দাঁতের গোড়ায় 'কেরিজ' হয়েছে। ও দাঁত তুলে না ফেললে তোমার শান্তি নেই। আমি ও দাঁত তুলতে পারব না। দাঁত-তোলা চেয়ারে বসিয়ে ঘাড় কাত ক'রে মুখের ভিতর আলো ফেলে দাঁতের গোড়ায় ইনজেকশন দিয়ে ও দাঁত তুলতে হবে। অত সব বন্দোবস্ত আমার কাছে নেই। তোমাকে কলকাতা যেতে হবে।"

"কলকাতা? কে নিয়ে যাবে আমাকে? অত হাঙ্গামাই বা কে পোয়াবে আমার জন্যে!"

"আমার সময় সেই তা না হলে আমিই নিয়ে যেতুম তোমাকে। কাকাকে বল না, লোকের একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যাবেই। তোমার রান্না খেয়ে এ তল্লাটের এত লোক ধন্য ধন্য করছে তোমার এ বিপদে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেই—"

তিনু ভটচায্যি সহৃদয় পরোপকারী লোক। সত্যিই তিনি কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন সব। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের মাতব্বর—দূর সম্পর্কে খুনতি মাসীর দেবর, চন্দ্রকান্ত গাঙুলী মশাই রাজি হলেন খুনতি মাসীর সঙ্গে যেতে। কিন্তু খুনতি মাসি বললেন—অবশ্য আড়ালে তিনুকে বললেন—আমি একা ওঁর সঙ্গে যাব কি। সেটা যে দৃষ্টিকটু হবে। সুতরাং ঠিক হল হাবু গোয়ালাও যাবে। খরচ অবশ্য খুনতি মাসীর। খুনতি মাসী গরীব নন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছেন লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের দরুন। তাছাড়া তাঁর চল্লিশ বিঘে ধেনো জমি। হাবু গোয়ালাই তাঁর সব দেখা শোনা করে। তার থেকে বছরে বেশ কিছু টাকা আয় হয় খুনতি মাসীর। একটা বিধবার খরচই বা কি। সবই প্রায় জমে যায়। পোস্টাফিসে সেভিংস ব্যাংকে জমা থাকে। খুনতি মাসী নিজে গিয়ে জমা করে দিয়ে আসেন। তার থেকে শ'তিনেক টাকা বার করে বেরিয়ে পড়লেন তিনি একদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে। বিশু একজন নামজাদা ডেন্টিস্টের নাম ঠিকানা লিখে দিলে। ঠিক হ'ল খুনতি মাসি কলকাতায় বিশুরই শ্বশুর বাড়িতে উঠবেন। শ্বশুর শাশুড়িও না কি ভারী নিষ্ঠাবতী। তাঁর রান্নাঘরের দেওয়ালও না কি রোজ গঙ্গাজলে ধোওয়া হয়।

সব কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

ডেণ্টিস্টের চেম্বারে গিয়ে খুনতি মাসী দেখলেন অনেক লোক অপেক্ষা করছে। একে একে তারা পাশের ঘরে ঢুকছে আর একটু পরে বেরিয়ে আসছে। তাঁর ডাক পড়লে তবে তিনি যেতে পারবেন ও-ঘরে। তার আগে নয়। দাঁত সমানে কনকন ক'রে যাচ্ছে। তবু অপেক্ষা ক'রে বসে রইলেন খুনতি মাসী। এমন সময় পাশের ঘর থেকে যে বেরুল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। তাদেরই গাঁয়ের সৈরভি বাগদিনী। ডগমগে শাড়িপরা, চোখে কাজল, হাতে আর গলায় ঝকমক করছে গিল্‌টির গয়না। নাম-করা দুশ্চরিত্রা মেয়ে। ও এখানে কেন ?

খুনতি মাসীকে দেখে নিজেই এগিয়ে এল সে।

"খুনতি মাসী, তুমি এখানে ?"

"দাঁত তোলাতে এসেছি। বড় কষ্ট পাচ্ছি—"

"আমিও দাঁত তোলাতেই এসেছিলাম। পুট ক'রে তুলে দিলে, একটুও লাগে নি—"

এর পরই খুনতি মাসীর ডাক এল।

খুনতি মাসী ভিতরে ঢুকেই দেখলেন—চেয়ার একটি।

"এই চেয়ারেই কি সৈরভি বাগদিনী বসে দাঁত তুলিয়ে গেল ?"

"যে মহিলাটির এখনই দাঁত তুললাম ? হ্যাঁ, উনি তো এতেই বসেছিলেন—"

"কি দিয়ে দাঁত তুললেন, দেখি ?"

ডেণ্টিস্ট অবাক হচ্ছিলেন। তবু তিনি ফরসেপ্‌গুলো দেখালেন।

"সবার মুখেই ওইগুলো ঢোকান।"

"তাতে হয়েছে কি। প্রত্যেকবার স্টেরিলাইজ করে নি। বসুন। কোন ভয় নেই—"

খুনতি মাসী ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"আমি এখানে দাঁত তোলাব না।"

বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মাতব্বর চন্দ্রকান্ত গাঙ্গুলী অবাক। বোঝাবার চেষ্টা করলেন—"সব ডেণ্টিস্টের ওখানেই এই ব্যাপার। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা চেয়ার, আলাদা আলাদা ফরসেপ ব্যবস্থা করা সম্ভব না কি। তাছাড়া শাস্ত্রেই তো আছে আতুরে নিয়ম নাস্তি।"

খুনতি মাসী কিন্তু অবুঝ। সামান্য একটা দাঁতের জন্য তিনি ধর্ম বিসর্জন দেবেন না। সেই দিনই গ্রামে ফিরে এলেন। কলকাতা থেকে গ্রাম মাত্র সত্তর মাইল।

যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা জানেন 'কেরিজ'-এর ব্যথা সামান্য নয়। মর্মান্তিক। খুনতি মাসী বাড়ী ফিরে এসে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। কিছু খেতে পারতেন না। উপবাস-ক্ষীণ দেহেও দৈনন্দিন কাজকর্ম কিন্তু ক'রে যেতেন ঠিক ঠিক। সেই ভোরবেলা স্নান, ঠাকুরঘরে পুজো—কিচ্ছু বাদ যেত না। ঠাকুর ঘরেই অনেকক্ষণ থাকতেন। ঠাকুরকে বলতেন, "এইবার আমাকে চরণে ঠাঁই দাও ঠাকুর। এত কষ্ট আর সইতে পাচ্ছি না।"

এইভাবে দিন কাটছিল, এমন সময়ে কলকাতা থেকে কায়েত পাড়ার শিবু এল একদিন। কলকাতাতেই চাকরি করে সে। খুনতি মাসীর অসুখ শুনে দেখতে এল সে তাঁকে। তারপর কথায় কথায় বললে—"মাসী তোমার চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হ'ল একদিন

চৌরঙ্গীতে। জীপে ক'রে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে নেবে পড়ল। মিলিটারিতে বড় চাকরি করে। খাকি কোট প্যান্ট, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি। দেখলে চিনতে পারবে না তাকে। তার ঠিকানাটা আমাকে লিখে দিয়েছিল তার বাসায় যাওয়ার জন্য। আমার আর যাওয়া হয়নি।"

খুনতি মাসী বললেন, "যেও একদিন। গিয়ে বলো আমি মরছি, আর বাঁচব না। আচ্ছা, আমি একটা চিঠি লিখে রাখব সেইটে দিও তাকে। তুমি কবে যাবে কলকাতায় ?"

"কাল বিকেলে যাব। পরশু আপিস।"

"কাল সকালে এসে নিয়ে যেও চিঠিটা।"

খুনতি মাসী ছেলেবেলায় সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বানান-ভুলে-পরিপূর্ণ যে চিঠিখানি লিখলেন চঞ্চলকে তার শুদ্ধ রূপ এই—

বাবা চঞ্চল,

তুমি রাগ ক'রে চলে গিয়েছিলে। মনে বড় দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু অভাগিনী বিধবার দুঃখ কেউ বুঝবে, এ আশা করি না। তুমি ভাল আছ, বড় চাকরি পেয়েছ শুনে সুখী হলাম। আশীর্বাদ করি দিন দিন উন্নতি কর। আমি বাবা এখন মৃত্যু-শয্যায়। একটা দাঁতে বড় ব্যথা। কিছু খেতে পারি না। দাঁত তোলাবার জন্যে কলকাতায় বড় ডেন্‌টিস্‌টের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে দাঁত তোলাতে পারলাম না। সেখানে দেখলাম যে চেয়ারে মুচি মেথর হাড়ি বাগদি বসছে সেই চেয়ারে বসেই আমাকেও দাঁত তোলাতে হবে। চেয়ারে না বসিয়ে দাঁত তোলা যাবে না। তারপর শুনলাম, দাঁত তোলাবার সাঁড়াশিগুলোও সব উচ্ছিষ্ট, অশুদ্ধ ! ছত্রিশ জাতের মুখে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে আবার ধুয়ে রেখে দেয়। আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। চলে এসেছি। এখন ভগবান যা করেন। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আশীর্বাদ করি, সুখে থাক। ইতি—নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষিনী

খুনতি মাসী।

এর কয়েকদিন পরেই যা ঘটল, তা শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়— একেবারে চমকপ্রদ। প্রকান্ড একটা মিলিটারি লরি এসে দাঁড়াল খুনতি মাসীর বাড়ির সামনে। তার থেকে নামল একজন লালমুখ সাহেব আর মেজর সি ঘ্যাংগুলি। সাহেবটি রোগা পাতলা. কিন্তু মেজর সি ঘ্যাংগুলির দশাসই চেহারা। মনুষ্য-রূপী পর্বত যেন একটি। প্রকান্ড গোঁফ ফরফর করে উড়ছে. বিরাট ছাতি, হাত দুটো যেন মুগুর। সেই সেকালের দুষ্টু ছেলে চঞ্চল কুমার—সেই 'অচল পয়সা' যে মেজর সি ঘ্যাংগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে, তা আন্দাজ করা সত্যিই শক্ত।

"মাসী— মাসী—মাসী— কোথা তুমি—"

ঘ্যাংগুলি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল খুনতি মাসীর বাড়ির ভিতর।

খুনতি মাসী বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

"কে—"

"আমি চঞ্চল। কোথা তুমি—"

"চঞ্চল এসেছিস ? আয় ঘরের ভিতরে আয়। আমি বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি বাবা —বিছানা থেকে উঠতে পারছি না—"

ঘ্যাংগুলি ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল, আর ঢুকেই যা করল, তা-ও আশ্চর্যজনক।

লোকে যেমন ছোট শিশুকে বুকে তুলে নেয়, তেমনি অবলীলাক্রমে সে খুনতি মাসীকে দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল একেবারে।

"কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে এইবার। ভালো সাহেব ডেন্‌টিস্ট এনেছি। নতুন চেয়ার, নতুন ফরসেপস কিনে এনেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে এইবার।"

তারপর সাহেব ডেন্‌টিস্ট এসে তাঁকে পরীক্ষা করলেন। বললেন—ইংরেজিতে বললেন—"এখন বড় দুর্বল আছেন। একটু খাইয়ে আগে ওঁকে সবল করতে হবে। আমার সঙ্গে এসেন্স অব্‌ চিকেন আর ভালো ব্র্যাণ্ডি আছে—"

হো হো ক'রে হেসে উঠল ঘ্যাংগুলি।

"মাসী ও-সব খাবে না। দেখছ না ওঁর ধর্ম বাঁচাবার জন্যে আমাকে এত টাকা খরচ করে চেয়ার আর ফরসেপস কিনতে হ'ল! দুধ আর মধু খাওয়ালে কেমন হয়? মিল্ক অ্যান্ড হনি?"

"হ্যাঁ, তা-ও খুব ভাল—"

"মাসী, বুধী গাই দুধ দিচ্ছে এখন?"

"দিচ্ছে। সরির মা একটু পরে এসে দুইবে।"

"মধু পাওয়া যাবে এখানে?"

"মধু তো ঘরেই আছে। ভালো সরষে ফুলের মধু—"

"বাঃ তা হলে তো হয়েই গেল! সাহেব বলছে—তুমি আজ দুধ আর মধু খাও —দু' ঘণ্টা অন্তর অন্তর। কাল সকালে তোমার দাঁত তুলবেন।"

সাহেব সে রাত্রে থেকে গেলেন। লরিতে তাঁর খাবার ছিল। কিন্তু খুনতি মাসী সে-খাবার তাঁকে খেতে দিলেন না। যদিও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তবু তিনি উঠলেন কোনক্রমে। গাওয়া ঘি দিয়ে ভেজে দিলেন ফুলকো লুচি, করলেন বেগুন ভাজা, রাঁধলেন আলুর দম, কুমড়োর ডালনা। সাহেব তো চমৎকৃত। বললেন, এমন সুন্দর ভেজিটেবল রান্না তিনি জীবনে কখনও খাননি। ওয়াণ্ডারফুল!

তার পরদিন মহাসমারোহে দাঁত তোলা হ'ল খুনতি মাসীর। গাঁ সুদ্ধ লোক জড় হ'ল এসে। খুনতি মাসী হেসে বললেন—কিছু টের পেলাম না তো!

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি যদু ভৌমিক কিন্তু চঞ্চল কুমারকে আড়ালে ডেকে বললেন— "সামান্য একটা দাঁত তোলার জন্যে তুমি এতোগুলো টাকা খরচ করে ফেললে হে—"।

চঞ্চল কুমার ভুরু দুটো তুলে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করল তাঁকে। তারপর বলল— "আমরা মিলিটারি ম্যান। আমাদের কাজ হচ্ছে দেশ রক্ষা করা। খুনতি মাসীই তো দেশ, খুনতি মাসীই তো আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি সব। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে যা খরচ করেছি, তাতো সামান্য—তাঁর জন্যে সর্বস্বান্ত হ'তেও আপত্তি করতাম না।"

যদু ভৌমিক এর উত্তরে আর কিছু বললেন না, মৃদু হেসে টাকে হাত বুলুতে লাগলেন খালি।

চঞ্চল কুমার খুনতি মাসীকে বললে—"মাসী, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমার ভালো কোয়ার্টারস্‌, কোনও কষ্ট হবে না তোমার। এখানে তুমি বেঘোরে মারা যাবে—"

খুনতি মাসী মৃদু হেসে বললেন—"গাঁ ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না বাবা, এখানে জন্মেছি, এখানেই মরব।"

আফ্জল

যে নদীর ধারে মই চৌধুরীর প্রকাণ্ড বাড়িটা সে নদীর নির্দিষ্ট নাম নেই। কেউ বলে মায়া, কেউ বলে আলেয়া, কেউ বা খেয়ালী আবার কেউ কেউ বলে বেগম। অনেক নাম নদীটার। নানা যুগে ওর নাকি নানা নাম ছিল। যার যেটা পছন্দ সেই নামে ডাকে। পাঠান আমলে একজন বড় মুসলমান জায়গীরদার আলাউদ্দিন খাঁ থাকতেন এই নদীর ধারে। তিনি নাকি এ নদীর নাম দিয়েছিলেন রোশনি, মানে আলো। নানা রকম আলো বিচ্ছুরিত হ'ত নাকি তখন এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে। মই চৌধুরী যে প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়িটার এক অংশে থাকেন, যে বাড়িটা এখন একটা বিরাট ধ্বংস-স্তূপের মতো, যার অবলুপ্ত-প্রায় মিনার মিনারেট গম্বুজ, যার মর্মর পাথরের পালিশ-করা মেঝে, যার ছোট বড় নানা মহল এখনও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে সে বাড়িটা নাকি আলাউদ্দিন খাঁরই ছিল। সেজন্য ওটার নাম আলা-মন্জিল। এই আলা-মন্জিলের সামনে অনেকখানি জমি। তারপর একটা চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুধারে কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি। তার পরই ওই নদীটা। নদীটাকে শতরূপা বা অপরূপা বললেও ভুল হয় না। কারণ ওর নির্দিষ্ট কোনও ছকে-বাঁধা রূপ নেই। আজ হয়তো যা ধু-ধু-বালির-চড়া, শীর্ণ স্রোত বইছে কি না বইছে, কাল সে-ই দুকূল-প্লাবিনী। জল কোন দিন ঘোলা, কোন দিন আবার স্ফটিক-স্বচ্ছ, কোন দিন নীল, কোন দিন গৈরিক। কোন কোন দিন মনে হয় ওটা যেন নদী নয় জঙ্গল, চলমান জঙ্গল। বড় বড় গাছ, বড় বড় ডাল-পালা, অনেক শ্যাওলা পানা, ছোট-বড় ঝোপ-ঝাড় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড় থেকে নেমেছে নদীটা। কোন পাহাড় তা ঠিক কেউ জানে না। অনেকে বলে আড়াল-পাহাড়। যে পাহাড় থেকে ও বেরিয়েছে সেই পাহাড়কে আড়াল করে নাকি দৈত্যের মতো তিন চারটে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। মোট কথা কেউ জানে না কিছু। নদীটা মাঝে মাঝে আলা-মন্জিলের খুব কাছে চলে আসে, তার জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মই চৌধুরী নিজের ঘরে বসে শুনতে পান।

মই চৌধুরীর আসল নাম ছিল মহিমার্ণব চৌধুরী। মহিমার্ণব থেকে মহি তারপর মই হয়ে গেছে। নামের মতো লোকটিও অদ্ভুত। অতবড় বিশালকায় লোক সাধারণত দেখা যায় না। বয়সের গাছপাথর নেই। প্রকাণ্ড মুখ। সে মুখে শাদা দাড়ি, তা-দেওয়া বড় গোঁফ, মাথায় বার্বার করা শাদা চুল, ভুরুও শাদা। মনে হয় যেন সিংহের মুখ। শাদা গোঁফ দাড়ি চুল ভুরু মাঝে মাঝে লালও হয়ে যায়, সেদিন তিনি মেহেদি লাগান। দাঁত পড়েনি। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে। শরীর ভারী বলে বেশী চলা-ফেরা করতে পারেন না। একটা চাকা-দেওয়া চেয়ারে বসে থাকেন আর তার সাহায্যেই চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করেন আজকাল। অমন একটা আধুনিক চেয়ার কে এনে দিল তাঁকে, কি করে সেটা এল তা কেউ জানে না। কারণ যেখানে তিনি থাকেন সেখানে কাছে-পিঠে কোন রেলস্টেশন বা মোটর চলবার রাস্তা নেই। ওই নদীটারই নানা শাখাপ্রশাখা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে জায়গাটাকে সভ্য-জগত থেকে। কিন্তু মই চৌধুরীকে সভ্য-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। আলা-মন্জিলের যে দু-তিন-খানা ঘর নিয়ে তিনি থাকেন সে ঘরগুলি বেশ সুসজ্জিত। দামী কার্পেট, মখমলের তাকিয়াও আছে, আবার সোফা-সেটি-ডিভান-হোয়াটনটও আছে। ট্রানজিসটারও

আছে একটা। মই চৌধুরীর বাবা প্রবল-প্রতাপ চৌধুরী, তাঁর বাবা দিকপাল চৌধুরী, তাঁর বাবা বাঘাম্বর চৌধুরী এ অঞ্চলে বড় জমিদার ছিলেন। পাঠানদের আমলেই তাঁরা জায়গীর-স্বরূপ পেয়েছিলেন অঞ্চলটা। ইংরেজদের আমলে সে জায়গীর ছিল কিছুদিন, তারপর তা রূপান্তরিত হয় জমিদারিতে। বাঘাম্বরের পিতা যোগাম্বর এ অঞ্চলের প্রথম জমিদার। শোনা যায় যোগাম্বর নাকি কাপালিক ছিলেন। এখানে শ্মশান- কালীর কাছে নর-বলি দিতেন।

আমি যাযাবর প্রকৃতির লোক। ইংরেজীতে যাকে বলে "ভ্যাগাবণ্ড"। পৃথিবীতে আমরা নিজের বলতে কেউ নেই। কোথাও ঘর বাঁধতে পারিনি। ঘুরে ঘুরে বেড়াই চারদিকে। আমি সেই সব জায়গায় যেতে ভালবাসি যা অখ্যাত, কিন্তু তবু যা সুন্দর। পাঞ্জাবে ঝিলাম নদীর একটা বাঁকে ছিলাম কিছুদিন। পূর্ণিয়া জেলার বিরাট-নগরের আশে-পাশে কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি বনে-জঙ্গলে। মন্দার পাহাড়ের কাছে বাগডম্বা নামক গ্রামে কাটিয়েছি কিছুদিন। তখন বাগডম্বায় বিশেষ কোনও বস্তি ছিল না। ফাঁকা মাঠে সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াতাম। পাখী দেখতাম নানারকম। বটের ফলকা ওইখানেই প্রথম চিনি। শিকার করা আর ফোটো তোলা এই দুটিই আমার জীবনের অবলম্বন। যেখানেই যাই বন্ধুও জুটে যায়। বাগডম্বার রুয়া মাঝি আমাকে মই চৌধুরীর আর বেগম নদীর খবর দিয়েছিল।

মই চৌধুরীর আলা-মন্‌জিলের কাছেই থাকি আমি। এক প্রৌঢ় নিঃসন্তান সাঁওতাল দম্পতি আশ্রয় দিয়েছে আমাকে। তাদের একটি গরু আছে, সেই গরুর সব দুধ আমি কিনে নিই। তার থেকে খানিকটা ওই বুড়ো-বুড়িটাকেই খেতে দি। বুড়ি আটার মোটা রুটি তৈরি করে দেয় আমার জন্য। আর রাত্রে মাংস। শিকার করে কিছু পাখী যদি আনতে পারি তাহলে সেই মাংস, শিকারে কিছু না পেলে মুরগি। ও অঞ্চলের "শন্ চাহা" পাখীর মাংস অপূর্ব।

মই চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম যেদিন আলাপ হ'ল সেদিনের কথাটা মনে আছে আমার। বুড়ো মাঝি আমাকে বলে দিয়েছিল যে প্রথম গিয়েই মই চৌধুরীকে ঝুকে কুর্ণিশ করতে হবে। তা না করলে তিনি চটে যাবেন আর হেঁকে বলবেন—"আফজল এ অসভ্য লোকটাকে বিদেয় ক'রে দাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর এসে আপনাকে বার করে দেবে। আফজল নয়, আর একটা চাকর। আফজল কখনও বেরোয় না। আমরা কেউ আফজলকে দেখিনি। কিন্তু আফজলই সব করে। চৌধুরী এদিকে লোক খুব ভালো। আপনি চলে যান। বেশ মজার মানুষ। যখন গেলাম চৌধুরী তখন বসে বিরাট একটা গড়গড়ায় ধূমপান করছিলেন। গড়গড়ার নল জমকালো জরি-দেওয়া। অম্বুরি তামাকের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আমি কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াতেই বললেন—"কে আপনি ?"

"আমি আপনার জমিদারিতে বেড়াতে এসেছি। আমি সামান্য মানুষ—"

"জমিদারি ? আমার জমিদারি তো এখন নেই। কারও জমিদারি আর নেই। ভারত সরকারই এখন হিন্দুস্থানের একমাত্র জমিদার। আফজল আছে, তাই কোনক্রমে টিকে আছি। বসুন—"

বসলাম।

"কি খাবেন ? কি খেতে ভালবাসেন ?"

"না না খাওয়ার কি দরকার—"

"অতিথি এলে তাঁকে কিছু খেতে দেওয়াই আমাদের রেওয়াজ। আজকাল অবশ্য কিছু অদল-বদল হয়েছে। অনেকেই আজকাল শুনেছি পরের বাড়ি গিয়ে বেশ খায়, নিজেরা কাউকে কিছু খেতে দেয় না। আমি কিন্তু পুরোনো রেওয়াজটাই বজায় রেখেছি এখনও। কফির সঙ্গে কিছু একটু খান। "আফজল, একজন বাবু এসেছেন. কফি আর কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও—"

একটু পরেই দুটি কালো রং-এর কিশোর বালক দুটি রুপোর ট্রে হাতে ক'রে ঘরে ঢুকল। একটি ট্রেতে কফির সরঞ্জাম আর বিলিতি ভাল বিস্কুট। আর অন্য ট্রে-টিতে আপেল, কালো আঙুর আর হালুয়া। হালুয়া থেকে ঘি গড়িয়ে পড়ছে। কিছু না বলে নীরবে খেতে লাগলাম। বুঝলাম বাদ-প্রতিবাদ করা বৃথা এখানে।

সেই মায়া-নদীটা সেদিন মই চৌধুরীর বাড়ীর কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। শব্দ হচ্ছিল ছলাৎ, ছলাৎ, ছলাৎ।

মই চৌধুরী বললেন—"হারামজাদী আজ আবার এসেছে ?"

"কে ?"

"ওই নদীটা। শব্দ শুনছেন না ? ও নদী নয়, পিওন। আমার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী যাদের ওর গর্ভে বিসর্জন দিয়েছি তাদেরই খবর নিয়ে আসে মাঝে মাঝে। আর আমাকে প্রলুব্ধ করে তুইও আয় না। আমি কিন্তু ওর কাছে যাব না। আমি যাব সমুদ্রে। যতই ছলাৎ, ছলাৎ করুক, ওতে আমি ভুলছি না—!"

অবাক হলাম শুনে। মনে হ'ল মই চৌধুরীর মাথার গোলমাল হয়েছে সম্ভবত।

প্রায়ই যেতাম মই চৌধুরীর কাছে।

সেকালের নানা রকম গল্প বলতেন।

একদিন বললেন তাঁর ঠাকুরদা দিকপাল চৌধুরী নাকি বাঘ পুষতেন। তারা কুকুরের মতো ঘুরত তাঁর পিছনে পিছনে। কিন্তু বাঘ তো, মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠত দু-একটা। তবে ঠাকুরদার সঙ্গে পারতো না। একটু বেচাল হলেই তিনি তুলে আছাড় মারতেন, তারপর চাবকাতেন শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে। সব ঠিক হয়ে যেত।

আর একদিন বললেন—"আমার বাবা প্রবল-প্রতাপ চৌধুরীর গাড়ি-ঘোড়ার শখ ছিল। নানারকম ঘোড়া, নানারকম গাড়ি। একটা অদ্ভুত গাড়ি নিজেই তিনি তৈরি করিয়েছিলেন বাড়িতে মিস্ত্রি ডেকে। সে একটা বৈঠকখানা। চারটে বড় বড় ওয়েলার ঘোড়া সে গাড়ী টানত। তাতে ফরাস পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতেন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। আলবোলা, গড়গড়া সব থাকতো তাতে। এমন কি ছোট একটা টানা পাখা পর্যন্ত। গাড়ির পিছনে ছোট একটা বাক্সের মতো ছিল, সেখানে বসে বাবার পেয়ারের চাকর মতি পাখা টানত আর তামাক সেজে দিত। কি দিন ছিল সে সব। স্বপ্নের মতো মনে হয়।"

"কোথায় গেল সে গাড়ি ?"

"আমি রাখতে পারিনি। কিছুই রাখতে পারিনি। রেস খেলে খেলে সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। কিছু রেস খেলে গেছে, আর কিছু গেছে ময়নার গর্ভে—"

ময়নার ব্যাপারটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভাবলাম পাখী-পোষার শখ ছিল বুঝি।

"ময়না পোষার শখ ছিল না কি ?"

"হ্যাঁ। তবে পাখী ময়না নয়, মানুষ ময়না। ময়না বাঈজী। অদ্ভুত মেয়ে ছিল সে—"

সামনের দেওয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল, সেই দিকে চেয়ে রইলেন মই চৌধুরী। তন্বী রূপসীর অয়েল-পেণ্টিং একটি ! মনে হ'ল জীবন্ত, মনে হ'ল মানুষ নয়, যেন আলো।"

"একজন বড় সাহেব পেন্টারকে দিয়ে আঁকিয়েছিলাম ছবিটা। সে আঁকতে চায়নি, বলেছিল, 'এ রূপকে আমি ছবিতে ফোটাতে পারব না। জেদ ক'রে আঁকিয়েছিলুম আমি।"

আমি নীরব হয়ে রইলাম। কি আর বলব। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আপন মনে হেসে উঠলেন মই চৌধুরী।

"আশ্চর্য জাত এই মেয়েমানুষ। সবাই বলে, আমায় বিয়ে কর ! আরে সবাইকে কি আর বিয়ে করা যায়। যার গর্ভে দিকপাল প্রবল-প্রতাপের বংশধর জন্মাবে তাকে কি আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে আনা যায়। থাকলই বা তার রূপ। বুঝিয়ে বললুম। শুনলে না। ফট্ ক'রে আত্মহত্যা ক'রে বসল।"

আবার চুপ ক'রে গেলেন মই চৌধুরী।

আমিও চুপ ক'রে রইলুম। তারপর একটু হেসে গোঁফ চুমরে বললেন—"বংশধর অনেক হয়েছিল। কিন্তু একটিও টেকেনি। আমারই হিসেব ভুল হয়েছিল। আমি জমির কথাটাই হিসেবের মধ্যে ধরেছিলাম, বীজের কথাটা ধরিনি।"

আবার চুপ করলেন। তারপর হেসে হেসে বললেন, "যাক যা হবার হয়ে গেছে। এবার কিছু খান। কোহিতুর আম এসেছে। আফজল, বীরেনবাবুকে আম ক্ষীর দাও—"

সুদৃশ্য প্লেটে ও বাটিতে আম ক্ষীর এল। মনে হ'ল বহুমূল্য চীনেমাটির প্লেট, বাটি। সেই কালো ছেলে দুটিই নিয়ে এল।

পরে তাদের নাম জেনেছিলাম। একটির নাম 'তিনকু' আর একটির নাম 'ছটকু'।

একটা ব্যাপার কিন্তু ক্রমশই বিস্মিত করছিল আমাকে। মই চৌধুরীর আয় প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু থাকতেন তিনি রাজার হালে। যে খাটটায় শুতেন সেটা রুপোর-কাজকরা মেহগিনি কাঠের খাট। আসবাবপত্র প্রত্যেকটি দামী। যে সব খাবার খেতেন, তা আমাদের দেশে ধনীরাও সচরাচর খান না। মই চৌধুরী মাঝে মাঝে বলতেন আফজলই নাকি ব্যবস্থা করে সব। কে এই আফজল ? ব্যবস্থা করেই বা কি ক'রে ? কলকাতার ভেটকি, ইলিশ, গলদা চিংড়ি এখানে আসে কি উপায়ে ! একদিন আমাকে দুর্মূল্য বিলিতি খাবার ক্যাভিয়ার খাওয়ালেন। মই চৌধুরীর একটা দুর্ভাবনা ছিল কেবল। তিনি যেদিন মারা যাবেন সেদিন কি হবে ? তাঁর ওই ভারী

দেহটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক জুটবে কি ? যদিই বা জোটে তারা কি শেষে ওই নদীর ধারেই তাঁকে পুড়িয়ে দেবে ? যে আফজল তাঁকে সারাজীবন সুখে রেখেছে মৃত্যুর পরও কি সে তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারবে ? আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম আফজল কে। কোনও উত্তর দেননি মই চৌধুরী। একটু মুচকি হেসে-ছিলেন শুধু।

একদিন ও-অঞ্চলের বুড়ো শিকারী পিংলা মাঝির সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। তখন শীতকাল। মায়া নদীতে নাকি 'পিংক ফুট' হাঁস এসে বসেছে একজন খবর দিলে। তারা খুব ভোরে আসে, মানে খুব ব্রাহ্মমুহূর্তে। আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালায়। তাদের মারতে হলে ব্রাহ্মমুহূর্তের আগেই পেঁছিতে হবে সেখানে। আমরা আগের দিনই নদীর ধারে ঘাস-খড়-গাছের ডাল দিয়ে ছোট একটা কুঁড়ে তৈরী ক'রে এসেছিলাম। খাওয়াদাওয়া করে রাত্রি বারোটার পর আমি আর পিংলা গিয়ে সেখানে হাজির হলাম। ঘরের ভেতর খড়ের বিছানা ছিল। কম্বলও নিয়ে গিয়েছিলাম। আরাম ক'রে বসা গেল। একটু পরেই হাঁসের সাড়া পেলাম। পিংলা বেশ পরিষ্কার বাংলা বলে। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—"এইবার এসেছে ওরা। একটু থিতিয়ে বসুক, তারপর আমরা বেরুব।' কিন্তু ওরা থিতিয়ে বসবার সুযোগ পেলে না। হঠাৎ খুব জোরে কলরব ক'রে উঠল সবাই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম আমরা। প্রথমত কিছুই দেখতে পেলাম না। টর্চ ছিল। এদিকওদিক আলো ফেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। কি হ'ল, হঠাৎ ওরা অমন চঞ্চল হয়ে উঠল কেন ? তারপর দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড লম্বা কালো একটা লোক নদী থেকে উঠে আসছে। দুহাতে দুটো প্রকাণ্ড হাঁসের গলা টিপে ধরে আছে। ঝট্‌পট করছে হাঁস দুটো। কোন দিকে না চেয়ে লোকটা তীরে উঠল, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমরা বিস্ময়-বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। পিংলা অস্ফুট কণ্ঠে বলল—"আফজল"।

"আফজল ? আফজলকে চেন নাকি তুমি ?"

"না। কেউ চেনে না। তবে দূর থেকে দেখেছিলাম ওকে আর একবার। আমাদের বাড়ির সামনে যে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছটা আছে তাতে একবার প্রকাণ্ড একটা মৌচাক হয়েছিল। একদিন রাত-দুপুরে মড়াৎ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। শুনে বেরিয়ে এলাম। দেখি লম্বা কালো একটা লোক মৌচাক সুদ্ধ ডালটাকে ভেঙে নামিয়েছে আর প্রকাণ্ড একটা বালতিতে মৌচাক নিঙড়ে মধু বার করছে। আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি বললেন—ও আফজল, সরে এস, ওর কোন কাজে বাধা দিও না। ওরকম কালো আর লম্বা লোক এ অঞ্চলে নেই। ওকে দেখলেই দূরে সরে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু লোকটা কে—"

পিংলা বললে—"তা কেউ জানে না। বাবা যা বলেছিলেন তা অদ্ভুত।"

"কি বলেছিলেন ?"

"ঘরে চলুন। বলছি "

সেই খড়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম আমরা।

পিংলা বললে—"মই চৌধুরীর একজন পূর্ব-পুরুষের নাম ছিল যোগাম্বর চৌধুরী। তিনি নাকি কালীপুজা ক'রে নরবলি দিতেন। পয়সা দিলে আগে মানুষ

কিনতে পাওয়া যেত। একদিন নাকি একটি লম্বা কালো যুবক তাঁকে এসে বলল, "আমি হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু আমাদের মুসলমান জমিদার জোর ক'রে আমাকে মুসলমান ক'রে দিয়েছেন। আমি আর বাঁচতে চাই না। দু'বার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু ভয়ে করতে পারিনি। শুনলাম আপনি কালীপুজোয় নর-বলি দেন। আমাকে হুজুর বলি দিন এবার। মৃত্যুর পরও যদি আমার কোন অস্তিত্ব থাকে তাহলে আপনার বংশধরদের সেবা আমি করব। যোগাম্বর তাকে বলি দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই নাকি আফজলের আবির্ভাব।"

পিংলা চুপ করল। থমথম করতে লাগল চারিদিক।

পরদিন সকালে মই চৌধুরীর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম। যেতেই হেসে তিনি বললেন, আফজল কাল খুব ভাল হাঁস পেয়েছে। রোস্ট করতে বলেছি। আপনিও তো খুব খাদ্যরসিক তাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করলাম।" পিংক ফুট দুর্লভ হাঁস। কিন্তু তার চেয়ে দুর্লভ মনে হ'ল সেদিনকার রোস্ট। অমন ভালো রোস্ট আমি জীবনে কখনও খাইনি।

॥ ২ ॥

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনলাম ভোরবেলা মই চৌধুরী মারা গেছেন। তাড়াতাড়ি গেলাম আলা মনজিলের দিকে। কিন্তু গিয়ে পৌঁছতে পারলাম না। একটু দূরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল। যা দেখলাম তা এতই অপ্রত্যাশিত যে আর এগোতে পারলাম না। দেখলাম মায়া নদীর বাঁকের কাছে প্রকাণ্ড একটা বজরা দাঁড়িয়ে আছে। আর মই চৌধুরীর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি। বড় বড় কালো ঘোড়া। ঘোড়ার সাজসজ্জা রাজকীয়। গাড়িটা সত্যিই একটা বৈঠকখানার ঘর যেন। চকচকে পালিশ। আলো ঠিকড়ে পড়ছে তার সর্ব অবয়ব থেকে। অদ্ভুত আশ্চর্য ফুল দিয়ে সাজানো সে গাড়ি। অমন ফুল আমি কখনও দেখি নি। সমুদ্রের শুভ্র ফেনা যেন পুষ্পরূপ ধারণ করেছে। আর গাড়ির উপর ঘোড়া চারটির রাশ ধ'রে যে ব'সে আছে সে সাধারণ কোচোয়ান নয়—সে একজন অপরূপ রূপসী তন্বী যুবতী। ছবি দেখেছিলাম। ময়না বাঈজিকে চিনতে পারলাম। একটু পরেই দেখলাম চারজন কালো লম্বা বলিষ্ঠ লোক সেই রূপোর-কাজ-করা মেহগিনির খাটটি বয়ে নিয়ে এল। তার উপর শুয়ে আছেন মই চৌধুরী। সর্বাঙ্গে অপরূপ বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত একটা শাল গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

গাড়ির দরজা খুলে খাটটা আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দিলে তারা গাড়ির মধ্যে। তারপর গাড়ি ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল ওই বজরাটার দিকে, যে বজরা মই চৌধুরীকে সাগরে নিয়ে যাবে।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হ'তে লাগল—খপ্ খপ্ খপ্ খপ্...... ।

স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শ্রাবণ-নিশীথে

বর্ষণ-মুখরিত শ্রাবণ রাত্রি।

ঘরের দ্বার খোলা।

গুরু গুরু মেঘের গর্জন, পাগলা হাওয়ার মাতামাতি আর বিদ্যুতের প্রদীপ্ত চমক। আমারই বিরহাতুর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি যেন।

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্।

মনে হইতেছে নিপুণ কোন যন্ত্রী অদৃশ্য সেতারে তন্ময় হইয়া যে রাগিণী বাজাইয়া চলিয়াছে সে রাগিণীর কোনও নাম নাই। সঙ্গীতশাস্ত্র তাহাকে নাম দিয়া চিহ্নিত করিতে পারে নাই। তাহা অনাদি বেদনার অনন্ত রোদন-রাগিণী। এই রোদনের পরিবেশে স্পন্দিত হৃদয়ে বসিয়া আছি।

সে আজ আসিবে।

প্রতিশ্রুতি দিয়াছে আসিবে। রাত্রি এগারোটার সময় যে ট্রেনটা আসে সেই ট্রেনেই আসিবে সে।

বলিয়াছে, তুমি ষ্টেশনে আসিও না। আমি ঠিক গিয়া পেঁছিব।

তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। ধূপাধারে ধূপ নীরবে জ্বলিতেছে। বাতি নিবাইয়া রাখিয়াছি। অন্ধকারেই যেন তাহাকে বেশী কাছে পাই। সে ফুল ভালবাসে। তাহার জন্য একটি ভাল মালা কিনিয়া রাখিয়াছি। আমার হৃদয়ের অসংখ্য অকথিত কামনাই যেন সে মালার পুষ্পে পুষ্পে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

সমাজ?

হাঁ সমাজ আছে। প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো সে আমাদের দুইজনের মাঝখানে দুইহাত মেলিয়া রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম।

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ট্রেনের হুইস্‌ল্ বাজিয়া উঠিল। তাহার পরই গাড়ি আসার শব্দ।

ষ্টেশনের কাছেই আমার বাড়ি। ট্রেনের যাওয়া-আসা শুনিতে পাই। স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই ট্রেনেই সে আসিবে।

কতক্ষণ কাটিয়াছে?

পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট?

কই সে তো আসিল না।

হুইস্‌ল্ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া আবার বাজিয়া উঠিল। ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ...ট্রেন চলিয়া গেল।

ট্রেনে যে দুই চারিজন প্যাসেঞ্জার নামিয়াছিল তাহারাও আমার ঘরের সামনে দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে আসিল না।

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম মনে নাই।

সহসা একটা শব্দ হইল, যেন চাপা আর্তনাদ। আমার মনের বেদনাই কি বাঙময় হইল? বেড্-সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিলাম।

দেখিলাম একটি প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। ঘরের কোণে আর একটা ব্যাঙ্।

...না উহাদের সমাজ নাই।

ফুলের মালাটা উহাদের দিকেই ছুঁড়িয়া দিলাম।

ভদ্রমহিলা ও টিনকি

গলির গলি তস্য গলি। তার দু'ধারে উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের নীচে প্রকাণ্ড নালা। নালার পাশে মিউনিসিপালিটির অক্ষমতার দুর্গন্ধময় নিদর্শন—স্তূপীকৃত ময়লা আর জঞ্জাল। ট্যাক্স নেবার সময় লোক ঠিক আসে, শোনা যায় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানও না কি একজন 'অপসর' (অপ্সরীর পুংলিঙ্গ নয়, অফিসার), কিন্তু মিউনিসিপালিটির চেহারা দেখলে মনে হয় এর চেয়ে বনে বাস করা ঢের ভালো। গলিটা সত্যিই নোংরা, সত্যিই অস্বাস্থ্যকর। যদি কোনও কারণে এই গলিতে ঢুকে পড়েন তাহলে তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে যেতে পারলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন আপনি। কিন্তু আপনার আমার সঙ্গে তফাৎ আছে মনুয়া আর টিনকির। ওদের বংশও যেমন, রুচিও তেমনি। মনুয়ার বাবা কারু জাতে ধানুক, কাজ করে জন-মজুরের। মনুয়ার মা হীরিয়া চাকরানী এক কেরানীবাবুর বাড়িতে। একশ' টাকা মাইনের কেরানীবাবুর স্ত্রী দুখানা বাসন মেজে নিতে পারেন না। ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ির দুখানা ঘর আর একফালি বারান্দাটা ঝাড়ু দেওয়াও এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কেরানী-বধূটি অসমর্থও নন, কিন্তু তবু তিনি তা করতে পারেন না। 'প্রেস্টিজে' বাধে। তাঁর 'প্রেস্টিজ' যে পৌরাণিক কোন তাকে তোলা আছে তা কেউ জানে না কিন্তু তবু সেটা তাঁর হাত-পা বেঁধে রেখেছে। কারু হীরিয়া দুজনেই বেরিয়ে যায় ভোরে।

টিনকি ডোমের মেয়ে। তার বাবা নারান সর্বকর্মে পারদর্শী। ঘর ছাইতে পারে, বাগান কোপাতে পারে, মোট বইতে পারে, রিক্শা টানতে পারে। তাড়িও টানতে পারে বেশ। প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার ধারে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে আছে। টিনকির মা তার দ্বিতীয় পক্ষের 'চুমানা'-করা বউ। শোনা যায় নারান টিনকির দুষ্টুমিভরা মুখখানি দেখেই নাকি টিনকির মাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। টিনকির মা 'ছিপ্লি' ডোম বলে ভদ্র হিন্দুবাড়িতে কাজ পায় না, সে কাজ করে এক সুরকির কলে। নারান আর ছিপলিকে সকালেই বেরিয়ে যেতে হয় কাজে। কারু হীরিয়া নারান ছিপলি কাজে বেরিয়ে গেলেই মনুয়া আর টিনকির স্বরাজ। ওই গলিটায় যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায় তারা। গলিটা যে নোংরা বা অস্বাস্থ্যকর একথা কখনও মনে হয়নি তাদের। বস্তুত গলির নর্দমা, জঞ্জাল তাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেনি কোনদিন। দৃষ্টি আকর্ষণ করত পাঁচিলের ওপারে বাবুদের বাগানের পেয়ারা গাছটা। কিন্তু সে তো পাঁচিলের ওপারে। পাড়ার বড় বড় ছেলেমেয়েরা পাঁচিলের উপর উঠে পেয়ারা

চুরি করে অবশ্য, মনুয়ার দাদা ঘণ্টুয়া এ বিষয়ে ওস্তাদ, কিন্তু সে বদান্য নয় মোটে। নিজে চুরি ক'রে নিজেই খেয়ে ফেলে। বিঠু পেয়ারা চুরি ক'রে বিক্রি করে। মনুয়া টিনকিরা আর একটু বড় না হ'লে ও-পেয়ারার রসাস্বাদন করতে পারবে না। পাঁচিলে উঠতে না পারলে তো কিছুই হবে না। আপাতত তারা এই গলিটা নিয়ে সন্তুষ্ট। এইটেই তাদের রাজত্ব। ছুটি পেলে এইখানেই তারা ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করে, খেলা করে, মাঝে মাঝে গলির প্রান্তে যে ঘোড়া-নিম গাছটা আছে তার তলায় মাটিতে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে তারা। কারণ তাদের বাবা-মারা তো সন্ধের আগে ফিরবে না কেউ। তারা ওই গলির 'জিম্মা'য় তাদের ছেলেমেয়েদের রেখে যায়। সবাই চিরকাল তাই গেছে। মাঝে মাঝে এজন্য আফশোষ করতে হয়েছে কাউকে কাউকে। সীতারামের ছেলেটাকে সাপে কামড়ে দিয়েছিল। কোথা থেকে একটা পাগলা মোষ গলিতে ঢুকে ঘোনুর ছোট ছেলেটাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলেছিল একবার। পাগলা কুকুর তো প্রায়ই কামড়ায় একে একে। গলি যদি মানুষ হ'ত তাহলে ওরা জবাবদিহি চাইত তার কাছে। কিন্তু সে মানুষও নয়, তাদের কাছে মাইনেও নেয় না। সমস্ত পাড়ার দাপাদাপি নীরবে সহ্য করে কেবল। অনেক কান্নার অনেক হাসির অনেক জন্মের, অনেক মৃত্যুর সাক্ষী হ'য়ে ওদেরই একজন হ'য়ে গেছে সে। পরস্পরকে সহ্য ক'রে আসছে বহুকাল থেকে। গলিটার একটা সুবিধে গাড়িটাড়ি বিশেষ ঢোকে না এখানে। ঢোকা যে অসম্ভব তা নয়, চেষ্টা করলে ঢুকতে পারে, গলিটা যে মাঠের মতো জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে গাড়ি ঘোরানোও অসম্ভব নয়। কিন্তু ঢোকে না। মোটর-বিহারী বাবুরা কেন ঢুকতে যাবে এ গলিতে। মাঝে মাঝে দু' একটা রিক্‌শা ঢোকে। তা-ও ক্বচিৎ। মনুয়ার মনে আছে একবার একটা শাদা-দাড়ি-ওয়ালা রিক্‌শা-ওলা ঢুকেছিল। সে তাদের কয়েকজনকে রিক্‌শায় চড়িয়ে গলির ওপার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল টানতে টানতে। মজার লোকটা। কিন্তু আর সে আসেনি।

সেদিন মনুয়া আর টিনকি খেলছিল ওই গলির উপরে বসে। ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দেরই নকলে তাদের খেলা-ঘর পাতে সাধারণত। নকল ঘরকন্নার খেল ই করে তারা। পুতুল ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। ধুলো-কাঁকরের ভাত ডাল রান্না করে, ঘাসের তরকারি বানিয়ে ঘেঁটু পাতার উপর সাজিয়ে নকল স্বামীকে ডাক দেয় নকল স্ত্রী—এস, খাবে এস, আর দেরী করছ কেন।

সেদিন কিন্তু মনুয়া-টিনকি অন্য খেলা খেলছিল। কয়েকদিন আগে পনেরই আগস্টে তারা মাঠে গিয়েছিল 'খেলা' দেখতে। কুচকাওয়াজ হয়েছিল, ড্রিল হয়েছিল, টিলার ওপর ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ানো হয়েছিল, স্বয়ং কমিশনারসাহেব একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অভিবাদন করছিলেন সকলকে, কপালে হাত তুলে সেলাম-করার ভঙ্গীতে। মিলিটারী বাজনা বাজছিল। লোকে লোকারণ্য। বড় ভালো লেগেছিল মনুয়া-টিনকির। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে "গুলাবছড়ি"ও কিনে দিয়েছিল তাদের বাবা-মা।

সেই খেলাই খেলেছিল তারা সকাল থেকে। ধুলো দিয়ে একটা ছোট টিলা বানিয়েছিল তারা। তার উপর গুঁজে দিয়েছিল একটা গাছের সবুজ কচি ডাল। ওটাই হয়েছিল তাদের খেলাঘরে ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতিভু। কয়েকটা ইঁটের উপর গুঁজে দিয়েছিল একটা লম্বা কাঠি। আর কাঠির মাথায় একটা মাটির খুরি। কমিশনার

সাহেব। আর ছোট ছোট ইট পাটকেল সাজিয়ে হয়েছিল সৈন্যদল, আর চারদিকে নালার পাঁক দিয়ে তার উপর ছোট ছোট অনেক কাঠি পুঁতে তারা জনতার একটা হাস্যকর নকল করবার চেষ্টা করছিল। মনুয়া গলা দিয়ে নানারকম শব্দ বার করে মিলিটারী বিউগলের নকলে যা করছিল তা-ও খুব হাস্যকর। কিন্তু ওদের তা মনে হচ্ছিল না। ওরা তন্ময় হ'য়ে খেলছিল দু'জনে।

এমন সময় অঘটনটা ঘটে গেল। যা কোনও দিন হয় না, তাই হ'ল সেদিন। প্রচণ্ড হর্ণ দিয়ে বিরাট একটা মোটর ঢুকে পড়ল গলিতে আর মনুয়া-টিনাকির খেলাঘরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে এগিয়ে গেল খানিকটা দূরে। মনুয়া-টিনাকি গলির দেওয়াল ঘেঁষে তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে গিয়ে দুইজনেই পড়ে গেল নালাটার ভিতর। চীৎকার করে উঠল টিনাকি।

মোটর থেমে গেল। মোটর থেকে বেরুলেন একটা মহিলা। পরনে দামী শাড়ি, মাথার চুলে বাঁকা-সিঁথের আধুনিকতা, চোখে কাজল, গালে রুজ। পায়ে জরি-দেওয়া টুক্‌টুকে লাল নাগরা। কমনীয় আবির্ভাব। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ। কিন্তু নিঃসন্তান। ঘরে কাজ নেই কোন। দেশোদ্ধারের নানা সভায় নানা মজলিশে ঘোরাফেরা করেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রকৃত রূপ কি, তাই জানবার জন্যে আজ বেরিয়েছেন দামী মোটরে চড়ে ক্যামেরা হাতে নিয়ে।

টিনাকির আর্ত চীৎকার শুনে নেমে এলেন তিনি।

"কেয়া হুয়া—?"

মনুয়া সাহস ক'রে এগিয়ে গেল। ছেকা-ছেনি ভাষায় যা বলল, তার মর্ম হচ্ছে—আমরা রাস্তায় বসে খেলছিলাম, আপনার মোটরের তলায় পড়ে আমাদের সব নষ্ট হয়ে গেল।

"কই তোমাদের খেলাঘর?"

এগিয়ে গেলেন মহিলা। দেখলেন সব।

"এই কাদা-ধুলো আর ইট-পাটকেল নিয়ে খেলছিলে?"

"জি হাঁ—"

মহিলা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ক্যামেরা বার ক'রে ভাঙা খেলাঘরের ছবি তুলে ফেললেন একটা।

"চল, তোমাদের ভালো খেলনা কিনে দেব আমি—। ড্রাইভার, ওদের গায়ের কাদাটাদাগুলো মুছে দাও। ওদের নিয়ে বাজারে যাব।"

মোটর-পরিষ্কার-করা তোয়ালে গাড়িতেই ছিল। ড্রাইভার তাদের মুছিয়ে দিয়ে তুলে নিলে গাড়িতে।

একটু পরে যখন তারা ফিরল মোটরে ক'রে, তখন দেখা গেল সত্যিই অনেক দামী দামী খেলনা কিনে দিয়েছেন তাদের ভদ্রমহিলা। বড় বড় দুটো 'ডল', দুটো মোটর-গাড়ি, একটা টেডি বেয়ার, একটা জিরাফ, তাছাড়া ছোট ছোট আরও নানারকম পুতুল।

"কাল আমি আবার আসব"—বললেন ভদ্রমহিলা। "তোমরা যখন এই পুতুল নিয়ে খেলবে, তখন আবার তোমাদের ছবি তুলব। তস্‌বির খিঁচেংগে—হাঁ-হাঁ—"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মনুয়া-টিনাকি।

পরদিন যখন ভদ্রমহিলা আবার এলেন, তখন দেখলেন, মনুয়া-টিনাকি মাঠে বসে

খেলছে। কিন্তু পুতুলগুলো কোথা? সেই ধুলো-কাদা, ইট-পাটকেল, ঘেঁটুপাতা আর কচুপাতা নিয়ে খেলছে তারা ভাঙা টিনের কৌটো আর ভাঙা বাসনের টুকরো নিয়ে।

"পুতুলগুলো কোথা?"

"মা-ই সব ছিনিকে বাক্‌সা মে রাখি দেলকে—" (মা সব কেড়ে বাক্সে রেখে দিয়েছে।)

"কেন?"

আবার তারা ছেকা-ছেনি ভাষায় বললে, মা বলেছে, ওগুলো বেচে তোদের জামা কিনে দেব। ওসব খেলনা বাবু ভেইয়াদের। তারা লুফে নেবে। তোরা যেমন খেলছিলি খেল—।

"আমি তোদের জামাও কিনে দেব।"

টিনকি মেয়েটা সত্যি ভারী সুন্দর দেখতে। তার দিকে হাত বাড়িয়ে মেয়েটি

"চল না, তুই আমার বাড়িতে থাকবি। যাবি? চল?"

দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি।

"নেই—নেই—নেই—"

ছুটে পালিয়ে গেল টিনকি। মনুয়াও পালাল, আরও যে দু-চারটে ছেলেমেয়ে জুটেছিল, তারাও ছুটে পালিয়ে গেল সবাই।

অপ্রস্তুতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বদেশ-হিতৈষিণী ভদ্রমহিলা। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন।

পূর্বপুরুষের কাণ্ড

সাধারণত যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। যদিও আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর এবং অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কিন্তু গিন্নী যখন জেদ ধরলেন এটা করতেই হবে, বললাম বেশ কর।

সমস্যা হনুমান। তাদের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার গোলাপ ফুলের শখ আছে। খানিকটা জায়গা লোহার তার দিয়ে ঘিরে খাঁচার মতো ক'রে তার মধ্যে গোলাপ গাছ লাগিয়েছি কয়েকটা। হনুমানরা আমার চেয়েও বেশী গোলাপ-রসিক। সুযোগ পেলে গোলাপের কুঁড়িগুলিও খেয়ে ফেলে। যতদিন জাল দিয়ে ঘিরতে পারিনি ততদিন অশান্তির অন্ত ছিল না।

কিন্তু সমস্ত বাড়ি ছাদ হাতা, উঠোন এ সব তো আর জাল দিয়ে ঘেরা যায় না তাই সমস্যার সমাধান হয়নি। আমার গিন্নী অনেক মেহনত ক'রে রোদে ব'সে ব'সে বড়ি দিয়েছিলেন, তা হনুমানের পেটে গেছে! রান্নাঘর থেকে তরিতরকারি সুযোগ পেলেই নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে, অজস্র মিষ্টি পেয়ারা হয় তাতে, কিন্তু হনুমানের উৎপাতে তা আমরা একটি খেতে পাই না। ওদের হুড়োহুড়ি আর লাফালাফিতে দুপুরের বিশ্রামটা বিঘ্নিত হয় কেবল। বুড়ী দাই হনুমান তাড়াতে

গিয়ে পিছলে প'ড়ে পা ভেঙেছে। হাতায় আমগাছ আছে দুটো। ভালো জাতের আম। কিন্তু সে সব হনুমানের সম্পত্তি। মুকুল হওয়া থেকে খেতে শুরু করে। একটা শরবতি লেবুর গাছও আছে কিন্তু থাকলে কি হবে, ও-লেবুর শরবৎ খাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয় না—কাঁচ লেবুই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে ওরা।

একজনের পরামর্শে ওদের তাড়াবার জন্যে নানা ধরনের কাক-তাড়ুয়া-জাতীয় জিনিস তৈরি করিয়েছিলাম। ভীষণ-দর্শন মুখোশ কিনে বাঁশে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। কোনও ফল হয়নি।

আমার ষোল বছরের মেয়ে নন্তিকে একদিন একটা "খাটাস্" (পুরুষ হনুমান) দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করেছিল।

আমার অ্যাল্সেসিয়ান কুকুর "রকেট" হনুমান এলেই চীৎকার করে বটে, কিন্তু হনুমানরা গ্রাহ্য করে না তাকে। উচু পাঁচিলে বা গাছে ব'সে তার দিকে মিটমিট ক'রে চাইতে চাইতে মনের আনন্দে লুট-পাট-করা পেয়ারা খেতে থাকে। রকেট শুধু চেঁচিয়ে মরে।

নিমগাছের আমগাছের কাঁচ কাঁচ পাতাগুলোকে পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলে হনুমানরা।

একটিমাত্র উপায় বন্দুক চালিয়ে ওদের মেরে ফেলা। কিন্তু তা করতে ইচ্ছা হয় হয় না। কুসংস্কার আছে। তাছাড়া এদেশে হনুমান মারলে রামভক্ত লোকেরা ক্ষেপে ওঠেন। গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন হনুমানের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবেন। কিন্তু সে আশ্বাস কাগজে-কলমেই নিবদ্ধ থেকে গেছে। কোনও ফল প্রসব করেনি।

এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী হিমাংশুবাবু বললেন একদিন—"একটা উপায়ের কথা শুনেছি। যদি ক'রে দেখতে পারেন কাজ হ'তে পারে।"

"কি উপায় ?"

"খানিকটা মদ কিনে এনে, তাতে ছোলা ভিজিয়ে রেখে দিন সমস্ত রাত্রি। মদে ছোলাগুলো যখন বেশ ফুলে ফুলে উঠবে তখন সেগুলো ছাতে রেখে আসুন। হনুমান-গুলো এসে খাবে সে ছোলা। খেয়ে তাদের নেশা হবে, পা টলতে থাকবে। তাড়া দিলে লাফাতে গিয়ে প'ড়ে যাবে। তারপর দেখবেন আসবে না আর আপনার বাড়িতে।"

"কেন ?"

"লাফাতে গিয়ে কোনও হনুমান যদি পড়ে' যায়, তাহলে সমাজ-চ্যুত হয় সে। অন্য সব হনুমান তাড়া করে তাকে। সুতরাং কোনও হনুমানই এরপর আর আপনার বাড়িতে আসতে চাইবে না।"

হিমাংশুবাবু বহুদর্শী প্রবীণ লোক! তাঁর কথার প্রতিবাদ করলাম না। তিনি চলে যাওয়ার পর গিন্নী বললেন, "করেই দেখা যাক না। খরচ তো খুব বেশী নয়। কতই বা দাম এক বোতল মদের। ছোলা তো বাড়িতেই আছে—"

হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম।

"পাগল হয়েছ!"

তার পরদিন হনুমানরা এসে আমার বাড়ির উঠোনে যে যুঁইগাছটা ছিল সেটাকে মুড়িয়ে খেয়ে গেল। পেঁপেগাছের চারা ছিল একটা। সেটারও ঘাড় মটকে খেয়ে গেল কচি পাতাগুলো।

গৃহিণী জেদ ধরলেন, "আজই মদ নিয়ে এস। আজ রাত্রেই তাতে ছোলা ভিজিয়ে রাখব আমি। হিমাংশুবাবু বাজে কথা বলবার লোক নন।"

অবশেষে আনতে হ'ল এক বোতল মদ। গৃহিণী বললেন, "এক বোতল মোটে ওইটুকু! অনেক হনুমান যে! অন্তত পোয়াটাক ছোলা ভিজাতে হবে তো। আর এক বোতল আন।"

নিয়ে এলাম আর এক বোতল।

পরদিন সকালে মাটির একটি বড় গামলায় মদ্য-স্ফীত ছোলাগুলি ছাতে রেখে এলেন গৃহিণী। হনুমানও এল একটু পরে। তারপর খ্যাক্ খ্যাক্ উপ্-উপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল কতকগুলো হনুমান ভয়ে পালাচ্ছে। গোদা হনুমানের তাড়নায় ছোট হনুমানরা পালায় অনেক সময়। তারপর সব চুপচাপ। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

আমার মনে একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা এল। ডারবিনের মতে হনুমানরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের সহায়তায় সমস্ত প্রকৃতির উপর জবর-দখল জারি ক'রে বসে আছি। নিজেরাই সব লুটেপুটে খাচ্ছি। আর কাউকে কিছু দিচ্ছি না। আমাদের পূর্বপুরুষদের বঞ্চিত করতে কিছুমাত্র সংকোচ নেই আমাদের। এটা কি উচিত……

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে নন্তি এসে বলল,—"সব হনুমানগুলো ওদিকের গাছে বসে আছে। গোদা হনুমানটা খালি নেই। ছাতে গিয়ে দেখে আসি কি হ'ল?"

চলে গেল সে ছাতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম, তা অপ্রত্যাশিত। গোদা হনুমানটাই ছাতে বসেছিল। গামলায় একটি ছোলা নেই। নন্তিকে দেখেই হনুমানটা টলতে টলতে তার দিকে এগিয়ে এল, তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে হাত জোড় ক'রে করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। "ওগো মা গো" ব'লে নন্তি ছুটে পালিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। হনুমানটা কিন্তু পালাল না। সে করুণ-দৃষ্টিতে নন্তির প্রস্থান-পথের দিকে চেয়ে রইল। আমরা তাড়া করলাম। নড়ল না। দেখলাম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

ছোট্ট লেখা

"খোকা, ওরে খোকা, ওঠ না বাবা, র‍্যাশন আনতে যাবি না? দোকান বন্ধ হয়ে গেল যে। কী লিখছিস অত?"

খোকা তবু ঝুঁকে লিখতে লাগল।

"কী লিখছিস অমন ঝুঁকে?"

"কাল পনেরই আগস্ট, আমাদের কলেজে যে মীটিং হবে তাতে আমি একটা লেখা পড়ব। সেইটে লিখে রাখছি, কাল সময় পাব না। অনেক কাজ—"

"পনেরই আগস্ট কতবার এল গেল, কত ধুমধাম হ'ল, অনেক বড় বড় বাণী

শুনলাম কিন্তু আমাদের দুঃখ-কষ্ট তো ঘুচল না বাবা। কী হবে ওসব মীটিং ক'রে। যাই হোক তুই এখন ওঠ। র‍্যাশনটা নিয়ে আয় আগে, তারপর লিখিস। ঘরে কিচ্ছু নেই।"

"কিচ্ছু নেই ?"

"আসবে কোথা থেকে। কতটুকু পাই আমরা। তা-ও গত সপ্তাহে পুরো র‍্যাশন দেয়নি।"

কলমটা থামিয়ে খোকা খানিকক্ষণ চেয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে।

"সত্যি, কী যে হচ্ছে! কতদিন যে মাছ খাইনি। কাল পনেরই আগস্ট, কাল একটু মাছের চেষ্টা করব। কি বল মা। ভোর থেকে গিয়ে 'লাইন' দেব। আমাদের মীটিং তো বিকেলে—"

"আগে তুই যা র‍্যাশনটা নিয়ে আয়। কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। ছ-সাত টাকা সের মাছ কেনবার পয়সাই বা কোথায় আমাদের। মোটা চাল কিনতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওঠ ওঠ, তুই আর দেরি করিস না—"

"এই যে হয়ে গেল—"

খোকন যখন থলি আর কার্ড হাতে ক'রে রাস্তায় বেরুল, তখন রাস্তায় একটা হল্লা উঠেছে। যে যেদিকে পাচ্ছে ছুটে পালাচ্ছে। ব্যাপার কি! আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে। গিয়ে দেখল র‍্যাশনের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সব দোকানই তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিচ্ছে সবাই। সকলের মুখেই একটা ভীত চকিত ভাব। খোকনের বন্ধু পিন্টুর মনিহারীর দোকানটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে ধারধোর ক'রে মনিহারী দোকানটি করেছে পিন্টু। ভালোই চলছে দোকানটা। খোকন এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল কেউ নেই। একটু দূরে ঝক্সু বসে আছে কেবল। ঝক্সু ফলওলা। রাস্তার ধারে ব'সে ফল বিক্রি করে সে। পেয়ারা কলা নাসপাতি আম এইসব সাজিয়ে সে-ই বসে আছে কেবল।

"খোকন, ওখানে কী করছ তুমি? ওপরে চলে এস। লুট হচ্ছে চারদিকে। রাস্তায় থেকো না—"

খোকনের সহপাঠী স্বরেন ডাকল তাকে দোতলা থেকে। রাস্তার উপরেই তাদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। খোকন যাবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় লুণ্ঠনকারীদের গর্জন শোনা গেল।

"ওপরে চলে এস তুমি—"

ওপরেই চলে গেল খোকন। ওপরের ঘর থেকে রাস্তার সবটা দেখা যায়।

উন্মত্ত জনতা রাস্তার দু'ধারে ইট ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে। বাল্‌ব, জানলার কাচ, দোকানের সাইন-বোর্ড চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গরিব ঝক্সুর ফলের দোকানের সামনে এসে নিমেষের মধ্যে দোকানটা লুট ক'রে ফেলল তারা। হায় হায় ক'রে উঠল গরিব ঝক্সু। প্রকাশ্য দিবালোকে এইসব ঘটছে। কোথাও পুলিশ নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখল খোকন, একটি পুলিশ চোখে পড়ল না।

জনতা তারপর পিন্টুর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। দোকানে তালা বন্ধ ছিল। পাশেই একটা কামারের দোকান থেকে হাতুড়ি আর লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এল একজন। দমাদ্দম ক'রে তালা ভাঙতে লাগল সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে। কেউ বাধা দিল না।

বিচলিত হয়ে উঠল খোকন। সুরেনের বাড়িতে ফোন ছিল, সে থানায় ফোন করবার চেষ্টা করল। এক্সচেঞ্জ থেকে খবর এল—থানার লাইন এনগেজ্‌ড। আরও দু'চারবার চেষ্টা করল, সেই এক কথা—এনগেজ্‌ড। তারপর সে ফোন করল এসপি'কে, তাঁকে পাওয়া গেল।

তিনি বললেন, "থানায় ফোন করুন।"

"তিনবার ফোন করেছি। থানার লাইম এনগেজ্‌ড।"

"তাহলে অপেক্ষা করুন।"

"এদিকে যে দোকান ভেঙে ওরা জিনিসপত্র লুটপাট করছে। ব্যবস্থা করুন কিছু—"

ওদিক থেকে আর কোনও উত্তর এল না। লাইনটা কেটে দিলেন তিনি।

খোকনের চোখের সামনে পিনটুর দোকানের জিনিসপত্র রাস্তায় বার করে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগল তারা। কিছু লজেন্স, সেণ্ট, ফুলদানি, ঘড়ি, সাবান পকেটেও পুরল অনেকে।

তারপর সগর্জনে আবার এগুতে লাগল।

একটি পুলিশ নেই কোথাও। লুণ্ঠনকারীদের বাধা দিল না কেউ। একটু পরেই রাস্তা নির্জন হয়ে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

খোকন বলল, "জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, জনতা তো ক্ষেপে উঠবেই। কালোবাজারী আর মুনাফাখোরদের শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু গরিব বেচারী ঝক্‌সুর ফলের দোকানটা ওরা লুট করলে আর পিনটুর মনিহারী দোকানটা চুরমার করে ফেললে— ওদের দোষ কী! পিনটু কি ক'রে যে আবার দাঁড়াবে—"

খোকন নেমে এল রাস্তায়। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কার কি ক্ষতি হয়েছে। বিস্মিত হয়ে গেল সে। কালোবাজারী আর মুনাফাখোরদের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়েছে নির্দোষ গরিব গৃহস্থদের— ওই ঝক্‌সু আর পিনটুদের।

বিমর্ষ হয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল খোকন। ভাবছিল দেশে অরাজকতা শুরু হয়ে গেল নাকি। হঠাৎ পিছনে একটা লরির শব্দ পাওয়া গেল। মিলিটারি লরি।

খোকনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল লরিটা।

"এই এক শালা বদমাসকো মিলা—"

লরি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল একজন বন্দুকধারী পুলিশ।

"চলো—"

হাত ধরে টানতে লাগলো খোকনের।

"হাম্‌ তো কুছ্‌ নেই কিয়া। যো লোক কিয়া উ লোক তো চলা গিয়া—"

হাত ছিনিয়ে নিল খোকন।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের কুঁদোর প্রচণ্ড আঘাত লাগল তার রগে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে রাস্তায়। কান দিয়ে নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। আর্ত চোখ দুটো তুলে সে আকাশের দিকে চাইল একবার! তারপরই তার মৃত্যু হ'ল।

পনেরই আগস্ট কলেজের মীটিংয়ে পড়বে বলে সে যে ছোট্ট লেখাটা লিখেছিল সেটা তার কামিজের বুক পকেটেই ছিল। তার গোড়ার দিকটা এই রকম—

"বহু শহীদের আত্মবিসর্জন, বহু তপস্বীর তপস্যা যে স্বাধীনতাকে সম্ভব করিয়াছে সে স্বাধীনতাকে সুশাসন দিয়ে আমরা যদি রক্ষা করিতে না পারি—"

এর পর আর পড়া যায় না, রক্তে ভিজে গেছে বাকিটা।

সন্দেশ

(না-টক নয় খুব টক)

[একটি দোকানের সম্মুখভাগ। দোকানের উপর সিমেণ্ট-কংক্রিট্ দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে 'সন্দেশের দোকান'। দোকানের সম্মুখে দোকানদার বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। জনৈক খরিদ্দারের প্রবেশ]

খরিদ্দার। আমার কিছু সন্দেশ চাই।

দোকানদার। সন্দেশ তো আজকাল তৈরী হয় না।

খরিদ্দার। কি আছে তাহলে আপনার দোকানে—

দোকানদার। প্যাড়া, খোয়া, ছাতু, রেউড়ি, সোহন হালুয়া—

খরিদ্দার। অথচ দোকানের উপর বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে "সন্দেশের দোকান"—

দোকানদার। ওটা সিমেণ্ট-কংক্রিট দিয়ে আমার পূর্বপুরুষেরা লিখিয়েছিলেন। ওটা ভেঙে ফেলবার হুকুম আসেনি এখনও। এলে ভেঙে ফেলতে হবে।

খরিদ্দার। সন্দেশ তৈরী করেন না কেন!

দোকানদার। আমাদের মন্ত্রীরা ধ'রে ফেলেছেন সন্দেশ ক'রে আমরা দুধের অপচয় করচি। সন্দেশ তৈরী বন্ধ হলে দেশের শিশুরা রোগীরা দুধ পাবে—

খরিদ্দার। কিন্তু প্যাড়া খোয়াতেও তো দুধ লাগে—

দোকানদার। লাগে। কিন্তু ওগুলো যে সর্বভারতীয় খাবার, ও সবে হাত দেওয়া চলবে না। সন্দেশ যে বাঙালী খাবার।

খরিদ্দার। বাংলা দেশে বাঙালী খাবার থাকবে না!

দোকানদার। না, আমরা যে সর্বভারতীয়, আমরা যে অগ্রণী। এককালে আমরাই সর্বপ্রথমে সাহেব হয়েছিলাম। গোলদীঘিতে ব'সে মদ আর গরুর মাংস খেয়েছি। এখন যাঁরা গদিতে বসেছেন তাঁরা বলছেন সর্বভারতীয় হ'তে হবে, "হিন্দী" হ'তে হবে, বাঙালী থাকা চলবে না। তাই হচ্ছি। আমাদের অক্ষর, আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য সব দেখবেন ক্রমশ প্যাড়া, রেউড়ি বা সোহন হালুয়া হয়ে যাবে, সন্দেশ থাকবে না।

খরিদ্দার। আমি বাংলার বাইরে থাকি। সন্দেশের লোভেই মাঝে মাঝে কলকাতা আসি। আপনাদের এই বিখ্যাত দোকান থেকেই কতবার নিয়ে গেছি।

দোকানদার। এ রকম প্রাদেশিক মনোবৃত্তিকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। সর্বভারতীয় না হলে আমরা চীন পাকিস্তান কাউকে ঠেকাতে পারব না। এক ভাষা, এক খাবার, এক পোশাক না হলে একতা হবে না। আর একতা না হলে—বুঝতেই পারছেন—

খরিন্দার। ও সব কথা থাক। সন্দেশ পাব কি না বলুন—

দোকানদার। আজ্ঞে না, মাপ করবেন। সন্দেশ বিক্রি করতে পারব না।

[খরিন্দার পকেট হইতে একগোছা নোট বাহির করিলেন]

খরিন্দার। আসল কথাটা শুনুন তাহলে। আমার তো সন্দেশ খুব ভালো লাগেই, আমার ছেলেও সন্দেশ খুব ভালোবাসে। তার টি-বি হয়েছে, হয়তো বাঁচবে না, সে সন্দেশ খেতে চাইছে, তাই বেরিয়েছি বেশী দাম দিয়েও যদি পাই—

দোকানদার। আমরা নিজেদের খাবার জন্য সামান্য কিছু করেছি। তার থেকেই না হয় দিচ্ছি খানিকটা—তাহলে—আসুন, ভিতরে আসুন—

[একটু পরেই উভয়ে ফিরিয়া আসিলেন। খরিন্দারের হস্তে একটি ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি]

দোকানদার। সন্দেশের উপর কিছু রেওড়ি আর প্যাড়াও দিয়ে দিলুম। সন্দেশটা ঢাকা থাকবে। হেঁটে যাবেন না, ট্যাক্সি ক'রে যান—

খরিন্দার। বেশ—তাই যাচ্ছি।

[খরিন্দার চলিয়া গেলেন। দোকানদারের বাঁ হাতের মুঠোয় নোটের গোছাটা ছিল, উদ্ভাসিত মুখে তিনি সেগুলি গণিতে লাগিলেন]

খোকন দি গ্রেট

দাদু সব শুনে বললেন—"দেশবন্ধু পার্ক তো এখান থেকে অনেক দূর। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—রামও এখনও আসেনি। কে যাবে এখন বল অত দূরে—!"

খোকন বললে—"আমি যাব—"

এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন দাদু। চশমাটা কপালে তুলে বললেন—"তুমি যাবে! এখান থেকে দেশবন্ধু পার্ক? এই সন্ধ্যে বেলা! এক কাজ কর। ওই বাঁ দিকের তাকে যে শিশিটা আছে সেটা পাড়ো তো।"

"কী আছে ওতে?"

"মধ্যমনারায়ণ তেল। মাথায় একটু চাপড়ে চুপ ক'রে বসে থাক গিয়ে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার—"

"মাথা খারাপ হয়েছে তোমার! আমাকে এখনও ছোট মনে করছ কি বলে! এই সেদিন আমার জন্মতিথি হয়ে গেল, চিনু মাসী বললে আমি আট বছর পেরিয়ে ন-বছরে পা দিলাম—আমি ছোট?"

দাদু তার থুতনিটি নেড়ে বললেন, "না তুমি মস্ত বড়, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার একেবারে। এখন ওঘরে গিয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক যতক্ষণ না তোমার বাবা মা ফেরে। আমি কে জান—"

খোকন হেসে ফেললে। সে জানে দাদু কী বলবে। তবু সে জিগ্যেস করলে —"কে—"

"মার্শাল গ্র্যান্ডফাদার-জং গোহা, চীফ বডি-গার্ড টু হিজ এক্সেলেন্সি খোকন দি গ্রেট—"

"সোজা ক'রে বল না!"

"আমি খোকনের পাহারা-ওলা। আমি আদেশ করছি তোর বাবা-মা না ফেরা পর্যন্ত ওঘরে গিয়ে শুয়ে থাক—"

"বাবা মা সিনেমায় গেছে, দশটার আগে ফিরবে না। অতক্ষণ শুয়ে শুয়ে কী করব?"

"ঘুমোও, কিংবা ছবির বই দেখ। জন্মদিনে খুব ভালো একটা বই পেয়েছ তো—"

"ঘুম পাচ্ছে না। ছবির বই পুরোনো হয়ে গেছে। ও আর কতবার দেখব! না দাদু, আমি দেশবন্ধু পার্কে যাব—"

খোকন পা ঠুকে আবদার জুড়ে দিলে।

দাদুর বয়স সত্তরের কাছাকাছি, তবু এখনও ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়েন তিনি। ধর্মগ্রন্থের দিকে তেমন মন নেই। তিনিও বলেন—ওসব বস্তা-পচা পুরোনো গল্প, কতবার আর পড়া যায়। একটা খুব ভালো ডিটেক্‌টিভ নভেলই পড়ছিলেন সেদিন সন্ধে থেকে। খুনী এরোপ্লেনে পালাচ্ছে, ডিটেক্‌টিভ এরোপ্লেনে ছুটেছে তার পিছু পিছু—এমন সময় খোকন বাধা দিলে এসে।

উঠে বসলেন দাদু।

"আচ্ছা দাদু তোমার সঙ্গে একটা প্যাক্‌ট করি এস। বন্দীরা সাধারণত পাহারা-ওলাকে ঘুষ দেয় পালাবার জন্যে, কিন্তু আমিই তোমাকে ঘুষ দিচ্ছি না পালাবার জন্যে,—এই চকচকে আধুলিটি নাও, আর ওঘরে চুপ ক'রে শুয়ে থাক, গোলমাল কোরো না—"

খোকন মুখটি টিপে হাসল একটু। তারপর আধুলিটি মুঠোয় চেপে চলে গেল পাশের ঘরে। দাদু ডিটেক্‌টিভ গল্পে ডুবে গেলেন!

খোকন চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দেখল বৃষ্টিটা থেমে গেছে। নিশ্চিন্ত হল। বেশী বৃষ্টি পড়লে হরি বুড়ো হয়তো চলে যেতো। আশা হ'ল এখনও হয়তো আছে। দেখা যাক!

কিন্তু গলির ভিতর ঢুকেই হকচকিয়ে পড়তে হ'ল খোকনকে। চিৎকার চেঁচামেচি হল্লা হইহই—এ কী কাণ্ড! ইঁট পাটকেলও চলছে। খোকন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়, কিন্তু সামলে নিতে দেরী হ'ল না তার। দেখল সামনেই একটা প্রকাণ্ড ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে প্রকাণ্ড দাড়িওলা পাঞ্জাবী সর্দার একজন। খোকন চট ক'রে উঠে গিয়ে নির্ভয়ে বসে পড়ল তার পাশে।

গম্ভীর কণ্ঠে সর্দার জিজ্ঞেস করলেন, "আপ কৌন হ্যায় বাবুসাহেব?"

"আপকা দোস্ত, খোকন—"

"ও! খোকন? হামারা দোস্ত? কাঁহা সে দোস্ত আ গয়ে! পুরা নাম কেয়া হ্যায়—"

"দাদু বোলতা হ্যায় হামারা পুরা নাম—হিজ এক্সেলেন্সি খোকন দি গ্রেট— !"

"বহত্ লম্বা চোড়া নাম। কঁহা যাইয়ে গা ?"

"দেশবন্ধু পার্ক। পৌছা দিজিয়ে গা ?"

"নেহি বাবুসাব। ময় তো হাওড়া যাউংগা।"

"তব্ ? হাম উতর যায় গা ? রাস্তামে এতনা হাল্লা কাহে ?"

"এক পাকিট্মার পকড়া গিয়া—হাল্লা আভি কম যায়ে গা। আপ বৈঠা রহিয়ে, ময় আপকা বড় রাস্তা পর উতার দুংগা—"

একটু পরে সত্যিই হাল্লা থেমে গেল। সর্দারজি খোকনকে চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর ফুটপাতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঁয়ে সিধা যা কর বিবেকানন্দ স্ট্রীট। বিবেকানন্দ সে সিধা পুরব যা কর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, উঁহা সে সিধা উত্তর যা কর দেশবন্ধু পার্ক—"

বিরাট গর্জন ক'রে সর্দারজীর ট্রাক রওনা হয়ে গেল হাওড়ার দিকে।

চিত্তরঞ্জন এভেন্যুর দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠল খোকনের। মোটর গাড়ির স্রোত বয়ে চলেছে যেন—ঠ্যালাগাড়ি, রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ি, রুটির গাড়ি, দুধের গাড়ি, সাবানের গাড়ি, পুলিসের' গাড়ি এরাও আছে। লোকে লোকারণ্য। এ রাস্তা সে পেরুবে কী করে! ফুটপাতে ছেঁড়া-ময়লা-কাপড়-পরা একদল যেন বসে ছিল কারা। খোকন তাদের একজনকে জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, রাস্তাটা কী ক'রে পেরুব বল তো ?"

ও বাবা, রুক্ষ-ঝাঁকড়া-চুল ওলা একজন হাউমাউ ক'রে কী যে বললে খোকন বুঝতে পারলে না কিছু। কে এরা ? কোন্ দেশী ? বাঙালী নয় নিশ্চয়। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অজস্র লোক চলেছে। খোকন তাদেরও অনেককে জিগ্যেস করলে। কেউ জবাব পর্যন্ত দিলে না। শেষে তার বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল। ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট-পরা, বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ি খেতে খেতে বাঁ হাত তুলে নাচছেও। সে-ই খোকনকে বলে দিলে—"ওই যে ওখানে পুলিস দাঁড়িয়ে আখে দেখছ ? সে একটু পরে হাত তুলবে। দুদিকের 'টেরাফিক' বন্ধ হয়ে যাবে তখন। ঠিক সেই সময়ে জেব্রা লাইন ধরে টুক্ ক'রে পার হয়ে যাও।"

"জেব্রা লাইন ? সে আবার কী ?"

"আরে, কোথাকার মুখ্যু তুমি! ওই সাদা সাদা লাইন দেখতে পাচ্ছ না রাস্তার উপর !"

"ওইগুলো ?"

"হ্যাঁ, ওইগুলো !"

খোকন জেব্রা লাইন ধরে পার হয়ে গেল রাস্তা। কিছুদূর হেঁটেই আর একটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল সে।

"এইটেই কি বিবেকানন্দ স্ট্রীট ?"

জিগ্যেস করলে একজন দোকানীকে। মনিহারির দোকান তার।

"হ্যাঁ, এইটেই বিবেকানন্দ স্ট্রীট।"

দোকানে একটা ঘাড় ছাঁটা লিকলিকে ছোকরা বসে ছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল, "কোন্ গগন থেকে নেবে এলে তুমি চাঁদ! বিবেকানন্দ স্ট্রীট চেন না ?"

কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেল খোকন। কিন্তু মনে মনে লজ্জা হচ্ছিল তার।

সত্যি, কিছুই তো জানে না সে। কিন্তু একটু পরেই আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে। সামনেই একটা সন্দেশের দোকান, থরে থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে। খুব লোভ হতে লাগল তার। সন্দেশই কিনে ফেলবে নাকি? সন্দেশ খেতে এতো ভালো লাগে তার। অথচ বাবা কিছুতেই কিনবে না। কিনে ফেলবে সন্দেশ? কিন্তু তখনই সে ঠিক করে ফেললে, না, কিনবে না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে তাই আগে সফল করতে হবে তাকে। সর্দারজী বলেছিল বিবেকানন্দ স্ট্রীটে গিয়ে পূব দিকে যেতে। কিন্তু কোন্‌টা পূব দিক? কাউকে জিগ্যেস করবে? লজ্জা করতে লাগল খোকনের। একজনকে শুধু জিগ্যেস করল—"রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কোন্ দিকে—।"

লোকটা রিক্‌শাওলা। রিক্‌শার উপরেই বসে ছিল।

"সিধা ডাহিনে চলা যাইয়ে। পেঁছা দেংগে?"

"না।"

হাঁটতে লাগল। কত বাড়ি, কত গাড়ি, কত আলো, কত লোক। প্রত্যেক বাড়িতেই রেডিও বাজছে। মাথার উপর দিয়ে গর্জন করে এরোপ্লেন উড়ে গেল একটা। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে লাগল খোকন। তার চমক ভাঙল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে। ও বাবা, এও যে এক বিরাট ব্যাপার! মোটর, বাস, মানুষের ভিড় তো আছেই, ট্রামও আছে। এখানে জেব্রা লাইন আছে কি? কই, চোখে তো পড়ছে না। আবার জিগ্যেস করবে কাউকে? না, নিজেই যা পারে করবে এবার।

হঠাৎ খোকনের চোখে পড়ল একটা মোটরে চড়ে তার মামা যেন যাচ্ছে।

"মামা—মামা—মামা—"

মোটরটাকে লক্ষ্য করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে।

তারপরেই 'ক্যাঁচ্' করে ব্রেকের শব্দ!

"খুব বেচে গেছে—"

"মারো ব্যাটা ড্রাইভারকে। দেখে চলতে পারো না। পুড়িয়ে দাও গাড়ি—" মারমুখী জনতা ঘিরে দাঁড়াল মোটরটাকে। মাঝখানে খোকন। যদিও সে চাপা পড়ে নি কিন্তু কপালটা কেটে গেছে তার। রক্ত পড়ছে।

খোকন বললে—"ড্রাইভার আমার মামা। ওঁর কোন দোষ নেই। আমি ওঁকে দেখে লাফিয়ে নেবে পড়েছিলাম রাস্তায়—"

"তাই নাকি!"

"কী বোকা ছেলে তুমি!"

"বোকা নয়, বাঁদর।"

"কী কাণ্ড হত এক্ষুণি!"

নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল।

পুলিস এসে ভিড় সরিয়ে দিলে শেষে। মোটরের ড্রাইভার গাড়ির কপাট খুলে দিয়ে বললে—"তুমি ভিতরে এসে বস—"

খোকন কাছে এসেই বুঝতে পেরেছিল ড্রাইভার তার মামা নয়, মামার মতো দেখতে।

"আমাকে হঠাৎ তুমি মামা বললে যে—"

"আপনি আমার মামার মতো দেখতে। আমার মামারও ঠিক এই রঙের মোটর আছে একটা, তাই আমি ভেবেছিলুম মামা—বুঝি—"

"কোথায় যাবে তুমি –"

"এখন যাব দেশবন্ধু পার্কে। সেখানে আমার একটু দরকার আছে। তারপর বাড়ি ফিরব—"

"চল।"

"আপনি পেঁাছে দেবেন আমাকে ?"

"দেব! তুমি আমাকে মামা বলে আমার গাড়িটাকে বাঁচিয়েছ। এখন চল আগে একটা ডিসপেনসারিতে তোমার কপালে একটু ওষুধ লাগিয়ে দিই—"

॥ ৩ ॥

দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে খোকন দেখে হরি বুড়ো নেই। এক জায়গায় কীর্তন হচ্ছে। সেখানে প্রচুর ভিড়।

চানাচুর-ওলা ছেদি বললে—"হরি কীর্তন শুনছে। তুমি চলে যাও না খোকাবাবু, গেলেই দেখতে পাবে ওকে।"

খোকনদের বাসা যখন এ পাড়ায় ছিল—তখন সবাইকে চিনত সে। খোকন ঢুকে পড়ল ভিড়ের মধ্যে। কীর্তন খুব জমে উঠেছে। কিন্তু হরি কই ? খোকনেরও চেনা একটি লোক বসে ছিল, তাকে জিগ্যেস করল, "হরি কই ?"

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। খোকন দেখতে পেলে হরি চোখ বুজে তন্ময় হয়ে কীর্তন শুনছে। দুলছেও একটু একটু।

ও কি এ সময়ে এখন—? সন্দেহ হল খোকনের। তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সে! হরি বুড়োর কাছাকাছি গিয়ে সে কানে কানে বলল—"হরি, চোখ খোল, দেখ কে এসেছে!"

আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

"আরে খোকন নাকি—আবার এ পাড়ায় এসেছ নাকি—"

"না - আমি এসেছি—"

তারপর ফিসফিস করে জানালে সে কেন এসেছে।

অবাক্ হয়ে গেল হরি বুড়ো। খোকনের মতো ছোট ছেলে সিংহিবাগান থেকে এতদূরে এসেছে তার কাছে—? কিন্তু তার চিন্তাধারাটা হঠাৎ অন্য লাইনে চলে যাওয়াতে রোমাঞ্চিত হয়ে খোকনের মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। চোখ বুজে এতক্ষণ সে বাল-গোপালের কথা ভাবছিল—সেই কি ? একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে খোকনের মুখের দিকে। খোকনেরও শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল, মুখে চোখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি—! হরি বুড়ো খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"ওকি হরি বুড়ো, তুমি কাঁদছ কেন—?"

হরি বুড়োর চোখ দিয়ে সত্যিই জল পড়ছিল টপটপ করে। কয়েক মুহূর্ত পরে হরি বুড়ো বললে—"আমি যাব। কিন্তু একটু দেরি হবে। সব ঠিক করে নিয়ে যেতে হবে তো ?"

খোকনের নতুন মামা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাস্তায়। খোকন তাঁকে গিয়ে বললে – "আমার যেতে কিন্তু একটু দেরি হবে। হরি বুড়োও আমার সঙ্গে যাবে তার জিনিসপত্র নিয়ে। আপনার অসুবিধা হবে হয়তো। আপনি বরং চলে যান—"

"আমার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে।"

॥ ৪ ॥

খোকন বাড়ি ফিরে শুনল তার বাবা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। মা কাঁদছেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। দাদু চরম অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছেন, কারণ তাঁর কাছেই খোকন ছিল।

খোকনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন দাদু।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

"দেশবন্ধু পার্কে গিয়েছিলাম। হরি বুড়োকে নিয়ে এসেছি। সে গরম গরম ফুচকা ভেজে দেবে এইখানে। আর নতুন মামাও এসেছেন—"

খোকনের মা উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

"মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন—"

"ও কিছু নয়। হরি, ভাজতে শুরু কর—"

উপরের চাপে

প্রথম যিনি এলেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন হরিহরবাবু। লম্বা চওড়া চেহারা, ঘূর্ণিত-লোচন, হাতে ত্রিশূল। গেরুয়া-পরা ভীষণ-দর্শন এক সন্ন্যাসী।

"কে আপনি"—প্রশ্ন করলেন হরিহর।

এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে সন্ন্যাসী উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—"যে চাকরি করতে পাচ্ছ না, যা করবার ক্ষমতাই তোমার নেই, তা ছেড়ে দাও। সকলের অভিশাপ কুড়িয়ে লাভ কি। ছেড়ে দাও, এক্ষুণি ছেড়ে দাও।"

বলেই অন্তর্ধান করলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের আবির্ভাব ঘটল। তিনিও অচেনা। লম্বা, রোগা, বুকের হাড় গোনা যায়, গালের হাড় উঁচু। কোটরগত চক্ষু দুটি জ্বলন্ত।

কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন—"কুলাঙ্গার! এ কি করছ তুমি। লজ্জা করে না! বেহায়া, বেল্লিক। এখনি তোমার দফা নিকেশ করতে পারি। কিন্তু এখনি কিছু করব না। সময় দিলাম সাবধান হও—"

বলেই অন্তর্ধান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন এসে হাজির। থলথলে মোটা পরনে আচকান পা-জামা আর টুপি। এসেই কয়েকটা ঢেঁকুর তুলে বললেন ঃ

"গালাগালি খেয়ে পেট ভরে গেছে একেবারে। তুমি যে এত অপদার্থ তাতো কল্পনা করিনি। আমাদের বংশে এ রকম অকাল কুষ্মাণ্ড আর জন্মায় নি।"

তারপর হঠাৎ স্বর চড়িয়ে চললেন—"না পার চাকরি ছেড়ে দাও—এ রকম ধাষ্টামি করছ কেন। ছি—ছি—ছি—ছি।"

ইনিও অন্তর্ধান করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশ। লোকটি বৃদ্ধ। মুখময় পাকা গোঁফ দাড়ির জঙ্গল। ভুরু পর্যন্ত পাকা। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, "আর যে পারছি না গো, আর যে পারছি না। কত গালাগালি শুনব আর। মা বাপ তুলে গাল দিচ্ছে, মুখে থুতু ছেটাচ্ছে। আঙুল মটকে মটকে শাপ শাপান্ত করছে। এ কি করছিস তুই টেবিল চেয়ারের সামনে বসে সঙের মতন! আমার বাবাও তো নায়েব ছিলেন জমিদার নৃসিংহ চৌধুরীর। প্রচুর উপরি পেতেন, কিন্তু তিনি তো জমিদারিটা এভাবে লণ্ডভণ্ড করেন নি। সবাই তাঁকে দেবতা বলত। কিন্তু তুই এ কি করছিস? বেসামাল হয়ে ঘুষ খাচ্ছিস। চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে গেছে। তোর জন্যে আমরাও গাল খাচ্ছি—"

"আপনারা কে?—"

"আমরা? তা-ও বুঝি জান না—"

এতক্ষণ কাঁদছিলেন, এইবার হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে অন্তর্ধান করলেন।

টং করে ঘণ্টা টিপলেন দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হোমরা-চোমরা হরিহরবাবু। দারোয়ান ছুটে এল!

"এসব লোককে ঢুকতে দিয়েছ কেন?"

"কেউ ঢোকেনি তো হুজুর।"

"কেউ ঢোকেনি? পর পর চারজন এল, বলছ কেউ ঢোকেনি!"

হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন হরিহরবাবু। বলে কি লোকটা! কেউ ঢোকেনি! অথচ—! তাঁর নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি। অসম্ভব নয়। মিছিল, বিক্ষোভ আর কাগজগুলো যে কাণ্ড করছে।

দারোয়ান তাঁর দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। সে-ও কম বিস্মিত হয়নি।

"বাজে লোককে একদম ঢুকতে দিও না।"

দূর থেকেই দারোয়ানের জবাব পাওয়া গেল—আজ্ঞে না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার প্রান্তে এলেন আর একজন। পাকানো-পাকানো বলিষ্ঠ চেহারা, হাতে তৈলপক্ক একটি প্রকাণ্ড লাঠি। মোষের শিঙের মতো ঊর্ধ্বমুখী ইয়া গোঁফ। মাথায় পাগড়ি। মালকোচা মারা; এসেই গালাগালি শুরু করে দিলেন।

"ঘুষ খাচ্ছ? অ্যাঁ? ঘুষ খাচ্ছ! ঠেঙিয়ে গতরটি চূর্ণ করে দিতে পারি তা জান? কানু লেঠেলের লাঠির একটি ঘায়েই চৈতন্য হ'য়ে যাবে তোমার—"

"কে তুমি!"

"চোপরাও হারামজাদা বংশের ঢেঁকি! আজই ইস্তফা দাও চাকরিতে। ঘুষ? ঘুষের সোয়াদ পেয়েছ? পস্তাটি উড়িয়ে দেব! বুঝলে? ভাল চাও তো এখখুনি

চাকরি ছাড়। তা না হলে—" লাঠিটি আস্ফালন করে অন্তর্হিত হলেন তিনি। যেন ছায়ার মতো মিলিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন আর একজন।

গরদ-পরা চন্দন-তিলক কাটা কণ্ঠি-ধারী সভ্যভব্য পবিত্র চেহারা। মাথায় চকচকে টাক। ভুঁড়ো নাক। গোঁফ দাড়ি কামানো।

বললেন—"পুরাণে পড়েছি, এক মুষল যদুবংশ ধ্বংস করেছিল। মনে হচ্ছে তুমিও একটি মুষল হয়েছ, আমাদের বংশকে ধ্বংস করবে। নীতিকারেরা বলেছেন অত্যুচ্চে পতনায়তে। তুমি অযোগ্য অথচ অনেক উঁচুতে উঠে গেছ, এবার হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে নেবে এস। চাকরিটি ছেড়ে দাও।" অন্তর্ধান করলেন তিনি।

আর একজন এল। এসেই পিচ ফেলল ঘরের কোণে। পান খাচ্ছিল। মুসলমানী ধাঁচের কাপড়-চোপড় পরা। পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো কালো। শৌখীনভাবে ছাঁটা গোঁফ দাড়ি। গায়ে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ ছাড়ছে।

বললেন, "হরুবাবু, বড়ই বদনসিব আমাদের। আমাদের খানদান বড় ছিল, তুমি তাকে বরবাদ করছ। এককালে এক নবাবজাদার খিদ্‌মত্ করে অনেক টাকা কামিয়েছি আমি। অনেক খেলাত্ পেয়েছি, অনেক ইনাম্। ডান হাত দিয়ে বখশিশ নিয়েছি বাঁ হাত দিয়ে ঘুষ। কিন্তু তুমি কমবখতের মতো এ সব কি করছ। এই কি ঘুষ নেবার তরিকা! ঘুষ নিয়ে দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছ? খোশামোদ জিনিসটাও ভালো, কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। তারও একটা সীমা আছে। তুমি এত তেল ঢেলেছ যে, নিজেই পিছলে পড়ে যাচ্ছ! গালি গুফতা শুনতে শুনতে আমাদের কান তো বহেরা হয়ে গেল। তুমি নোকরি ছেড়ে দাও বেটা। তোমার ব্যাঙ্কে যা জমেছে তাতেই বাকি জীবনটা চলে যাবে তোমার। আর লোভ করো না, নোকরি ছেড়ে দাও। তা না হলে পস্‌ত হয়ে যাবে—"

অন্তর্ধান করলেন।

পাগলের মতো আবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালেন হরিহর। দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আবার।

"আবার লোক ঢুকতে দিয়েছ তুমি—"

"না হুজুর, কেউ তো আসে নি।"

"আসে নি? জলজ্যান্ত দেখলাম—"

আরও হয়তো কিছু বলতেন, কিন্তু নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁর চক্ষু কপালে উঠল! দেখলেন ঘরের দেওয়াল ফুঁড়ে ছায়ামূর্তির মতো আরও সাতটা লোক বেরিয়ে এল। নানা রকম চেহারা। কেউ বেঁটে, কেউ মোটা, কেউ লম্বা, কেউ কালো, কেউ বাদামী, কেউ ফরসা। গোঁফ দাড়ি জটা জুলফির বিবিধ সমন্বয়।

"পাজি নচ্ছার, এক্ষুণি চাকরি ছাড়—এক্ষুণি।"

"এত গালাগালি আর সহ্য করতে পারছি না আমরা। জ্বলে যাচ্ছে—বুক জ্বলে যাচ্ছে—"

"এ কি কাণ্ড! এর নাম স্বাধীনতা!"

"সব যে উধাও হয়ে গেল। চাল, ডাল, চিনি, তেল, সন্দেশ, সোনা—মাছ মাংস সব—"

"মোট কথা এত গালাগালি আর বরদাস্ত করতে পারছি না আমরা—"

"অতিষ্ঠ হয়ে পড়েই আমরা—"

"শ্রাদ্ধে খুদি মোটা চাল দিচ্ছে -"

হঠাৎ তাদের মধ্যে হরিহর তাঁর মৃত পিতাকে দেখতে পেলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "তোমার জ্বালায় তোমার ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ অস্থির হয়ে উঠেছে বাবা। ক্ষেপে গেছি আমরা। তাদের হয়ে তোমাকে জোড় হাত করে অনুরোধ করছি ঢের হয়েছে, এবার ক্ষমা দাও! তোমার দৌড় তো দেখা গেল, ঢের কেরদানি দেখিয়েছ আর নয়। চাকরিটি ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও! যদি না যাও সব তছনছ করে ফেলব আমরা। তোমার পুলিস, তোমার মিলিটারি, তোমার ইণ্ডিয়া ডিফেন্স অ্যাক্ট আমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। আজই চাকরি ছাড়—আজই—"

থর থর করে মুক্তকচ্ছ হয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। আকুল কণ্ঠে হরিহরগৃহিণী বললেন—"ওগো, শিগ্গির তুমি বাড়ি চলে এস, কি কাণ্ড যে হচ্ছে—"

পরদিনই হরিহরবাবু কাজে ইস্তফা দিলেন।

হুন্‌ন্‌ন্‌—হুন্‌ন্‌ন্‌

হন্‌ন্‌ন্‌ন্‌ হন্‌ন্‌ন্‌ন্‌—হন্‌ন্‌—

এই তীক্ষ্ণ সুরে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্র কাঁপছিল সেদিন। ও সুর কোনও পাখীর নয়, ও সুর সর্পিনীর, ওই সুরে দয়িতকে সে ডাক দেয়! আমাকে একজন সাপুড়ে কথাটা বলেছিল। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম সেই অদ্ভুত সারং বিহারীগঞ্জের পোড়ো বাড়িটার বারান্দায় বসে। সম্মুখে বিস্তীর্ণ একটা মাঠ ফণীমনসার জঙ্গলে আকীর্ণ। তার ভিতর থেকেই সুরটা আসছিল।

একটু পরেই পাটের দালাল মুকুন্দবাবু আমার মালপত্তর নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আপনি এইখানেই বিশ্রাম করুন, আমি বিকেলের দিকে আসব তখন সব কথা হবে। একটা ঘর খুলে দিলেন তিনি, কুলিটা আমার বিছানা পেতে দিলে মেঝের উপর। বিহারীগঞ্জে আমি পাট কিনতে এসেছিলাম। মুকুন্দবাবু এই বাড়িতেই আমার থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন এক বেলার জন্য। ওখানে তখন কোন হোটেল ছিল না। মুকুন্দবাবু আসতেই শব্দটা থেমে গিয়েছিল। আবার শুরু হলো। জিগ্যেস করলাম, ও শব্দটা কিসের বলুন তো। মুকুন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, কোনও জংলি পাখীপক্ষী শিস্ দিচ্ছে হয়তো। আপনি শুয়ে পড়ুন।

মুকুন্দবাবু চলে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। শব্দটা থেমে গেল। আবার শুরু হল হন্‌ন্‌ন্‌ন্‌—হন্‌ন্‌ন্‌ন্‌—! রৌদ্রতপ্ত বায়ু-মণ্ডলে কার অন্তর্নিরুদ্ধ আকুতি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। আমি কেমন যেন অভিভূত আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজেই অনুভব করলুম যা নাগালের বাইরে তাই বুঝি নাগালের সীমানায় আসছে ক্রমশ। আসছে—ওই এলো বোধহয়!

তারপরই কালো ছিপছিপে লম্বা ভদ্রলোকটি এলেন। আমার মুখের দিকে

হাসিভরা চোখ মেলে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, আপনার আশ্চর্য লাগছে, কিন্তু আমি জানি এ ছাড়া ওদের গতি ছিল না। গল্পটা গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সুজাতারা তখন তাদের এই বিহারীগঞ্জের বাড়িতেই ছিল। আমিও ভেবেছিলাম ছুটিটা এখানেই কাটিয়ে যাব। তাছাড়া বিয়ের ব্যবস্থাটাও করে ফেলব। ওদের বিহারীগঞ্জের বাড়িটা খুব পুরনো। সেকালের নীলকুঠিওয়ালাদের ম্যানেজারের বাড়ি। সাধারণত সাহেবরাই ম্যানেজার হ'ত। কিন্তু সুজাতার ঠাকুরদা বাঙালী হয়েও ম্যানেজারের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। শোনা যায় খুব রাসভারী কাজের লোক ছিলেন নাকি। মনিবদের কাজ উদ্ধারের জন্য নির্বিচারে তিনি 'হয়'-কে 'নয়' এবং 'নয়'-কে 'হয়' করতে পারতেন। তাঁর দাপটে ও-অঞ্চলের সবাই থরথর ক'রে কাঁপত এককালে। অথচ তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। খড়ম প'রে বেড়াতেন। মদ তো নয়ই, মাংসও খেতেন না। চুরুটও না। গড়গড়ার অম্বুরী তামাক খেতেন ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। একবার একাই নাকি একদল বিদ্রোহী চাষীর সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি বন্দুক হাতে ক'রে! বাড়ীর সামনেই ওই চাষীরা থাকত প্রকাণ্ড একটা মাঠে। সুজাতার ঠাকুরদা একাই গুলী চালিয়ে ছত্র-ভঙ্গ করে দিয়েছিলেন তাদের। তারপর আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তাদের ঘরে ঘরে। অনেকে মরেছিল, অনেকে পালিয়েছিল। পালিয়েও নিস্তার পায়নি তারা। মকোদর্মার শমন তাদের পিছু পিছু ছুটেছিল। বিদ্রোহীদের প্রকাণ্ড বস্তি উৎখাত করেছিলেন সুজাতার ঠাকুরদা। তাদের বস্তির জমিটা শেষ পর্যন্ত সাহেবরা ঠাকুরদাকেই বখশিস স্বরূপ দিয়েছিলেন। প্রকাণ্ড মাঠটা ওই যে রয়েছে বাড়ির সামনে। একপ্লটে একশ বিঘে জমি বখশিস দিয়ে দেওয়াটাতে সাহেবদের দিলদরিয়া মেজাজের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সুজাতার মত অন্যরকম। সে বলে, বাঁজা গাই বামুনকে দান করেছিল সাহেবরা। বস্তি উৎখাত হ'য়ে যাবার পর ও জমিতে কোনও ফসল ফলত না। নতুন চাষীদের বসাবার চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুরদা। কিন্তু ওখানে কেউ আর বসতে রাজি হয়নি। সুজাতা বলেছিল ফসল যদিও ফলেনি, কিন্তু আগাছা জন্মেছিল প্রচুর। এখন ওখানে প্রকাণ্ড ফণীমনসার জঙ্গল! সাপের আড্ডা। কিছুতেই পরিষ্কার করা যায় না। বাবা একবার অনেক টাকা খরচ করে পরিষ্কার করিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার যে কে সেই। সুজাতার মুখে যখনই এ সব শুনেছিলাম তখনই মনে মনে আমার কৌতূহল জেগেছিল বিহারীগঞ্জটা একবার দেখে আসতেই হবে।

লোকের নানা রকম "হবি" থাকে।

পুরোনো বাড়ির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা আমার তেমনি একটি "হবি"। যেখানেই পুরোনো বাড়ির, পুরোনো ভিটের সংবাদ পেয়েছি সেইখানেই আমি গেছি। শুধু সে বাড়ির ফোটো তুলিনি, সম্ভব হ'লে সেখানে বাসও করেছি। সে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বাড়ীর ইতিহাস যতটা পেরেছি সংগ্রহ করেছি। সব সময়ে এ সব সম্ভব হয়নি অবশ্য। এমন বাড়ির ফোটো আমার কাছে আছে যা আর বাড়ি নেই, ইঁট পাথরের ভগ্নস্তূপ হয়ে গেছে। সেখানে বাস করা যায় না। এমন গ্রামও দেখেছি যেখানে আগন্তুক বিদেশীর পক্ষে বাস করা শক্ত। হোটেল বা সরাইখানা নেই, কোথাও কোথাও গ্রামের হাটের কাছে কেবল চায়ের দোকান পেয়েছি। কিন্তু সেখানে বাস করা

যায় না। অচেনা আগন্তুককে কোনও গৃহস্থ আশ্রয়ও দিতে চায় না। আগে গ্রামের বড়লোকদের বা জমিদারদের অতিথিশালা থাকত। এখন অবশ্য সে সব স্বপ্ন। গ্রামের ধনীরা এখন কলকাতায় বা অন্য কোনও নামজাদা শহরে গিয়ে চোং প্যান্ট পরে আধুনিক জীবন-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে মাড়োয়ারীদের ধর্মশালায় আশ্রয় পেয়েছি। মাড়োয়ারীরা তাদের ব্যবসার জন্যেই সম্ভবত যে সব জায়গায় বড় বড় গঞ্জ আছে সেখানে ধর্মশালা নির্মাণ করেছে। এই রকম একটা ধর্মশালাতেই বিচ্ছু পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাহার। বিচ্ছু পাঠক ভুতের ওঝা। তার যে রকম খাতির দেখলুম তাতে মনে হ'ল সে বেশ নামজাদা ওঝা। কোনও বাড়িতে ভুতের উপদ্রব হ'লে লোকে তাকে খবর দেয়। আর সে নাকি বাজি ফেলে ভুত তাড়ায়। একশ' টাকার কম সে বাজি ধরে না। ভুত তাড়াতে পারলে তাকে একশ' টাকা দিতে হবে, না তাড়াতে পারলে সেই একশ' টাকা দেবে। শুনলাম বাজিতে সে কখনও হারেনি। ধাড়াপুরের একটা বাড়িতে ভুতের উপদ্রব হচ্ছিল। সব সময় বাড়িতে ঢিল পড়ত। সন্ধ্যের পর মনে হ'ত যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। ধাড়াপুরের কাছেই লক্ষ্মণচক, মস্ত বড় গঞ্জ একটা। সেখানে ধর্মশালা ছিল। লক্ষ্মণচকে খুব পুরোনো একটা বাড়ির খবর পেয়ে আমি গিয়েছিলাম সেখানে। ধর্মশালায় বিচ্ছু পাঠকের সঙ্গে আলাপ হয়। সে তখন দু'শ টাকা বাজি জিতে ডোম চামার বাগদি মেথরদের সন্দেশ খাওয়াচ্ছে। ডোম চামার বাগদি মেথরদের সঙ্গেই তার ভাব ছিল বেশী। তাদেরই সে খাওয়াত। বলত এরাই সব শিবের অনুচর। ভুতনাথকে সন্তুষ্ট না রাখলে ভুত তাড়ানো যায় না। তাঁর অনুচরদের সন্তুষ্ট রাখলেই প্রভু সন্তুষ্ট থাকেন। সবাই বললে, তিন দিন থেকে ধাড়াপুরের বাড়িটাতে আর ঢিল পড়ছে না। এ রকম গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। যদিও তার আকৃতি প্রকৃতি ভদ্র নয়—অশ্রাব্য অশ্লীল শব্দ হরদম মুখ থেকে বেরুচ্ছে, তার সঙ্গে ধেনো মদ আর গাঁজার গন্ধ—চেহারাটা লিকলিকে পাকাটে গোছের, প্রায় উলঙ্গ, কোমরে একটা লাল সুতোর সঙ্গে বাঁধা একটা কৌপীন শুধু—মাথায় বাদামী রঙের জটা, খাবছা-খাবছা কটা জটা দাড়ি গোঁফ, বড় বড় লাল চোখের তারা দুটোও কটা—কিন্তু তবু তার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে যেচে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করলাম। প্রথমেই প্রণাম করলাম গিয়ে।

তুই শালা আবার কি চাস ?

কিছুই চাই না। এই এমনি একটু আলাপ করব বলে এলুম।

কি করিস তুই ?

মাস্টারি—

হো হো করে হেসে উঠল বিচ্ছু।

মাস্টারি ! ওরে শালা, নরাধম তাহলে তুই !

চুপ করে রইলাম।

বিচ্ছু আবার বলল, সেকালে ঋষি মুনি ছিল, ইংরেজদের আমলে মাস্টার হয়েছে। বিদ্যার নামে অবিদ্যা শেখাচ্ছে ছেলেদের। তোরাই তো শালা দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছিস !

বললাম, কেন এ যুগে কি ভালো মাস্টার নেই ?

না। এ যুগে সব জাল। এই আমাকেই দেখ্ না। সবাই জানে আমি রঘু পাঠকের নাতি, নিমু পাঠকের ছেলে বিচ্ছু পাঠক। কিন্তু আমি জানি নিমু পাঠক আমার বাবা নয়, আমার বাবা হেস্টি সাহেব। শালা হারামি নীলকর আমার মাকে ভোগ করেছিল। আমার বাপ শালা টাকার লোভে আর চাবুকের ভয়ে আমার মাকে তার বাংলোয় পেঁছে দিত রোজ রাত্রে······

বিচ্ছু পাঠকের চোখ দুটো ঠিকরে আসবার মতো হ'ল। দাঁতে দাঁত ঘসে সে চীৎকার করে উঠল, কিন্তু এর বদলা আমি নেব। কবে নেব, কিভাবে নেব তা জানি না, কিন্তু নেব। নেবই—

হাত দুটো মুঠো করে আকাশের দিকে তুলে সে এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল যেন আমিই তার শত্রু। লোকটাকে ঘিরে রহস্য ঘনতর হ'য়ে উঠল। আশেপাশে ভীড় জমে গিয়েছিল। একজন চোখের ইশারায় আমাকে বারণ করলে আমি ওকে যেন আর না ঘাঁটাই।

আমি প্রণাম করে একটা দশ টাকার নোট তার পায়ের উপর রেখে বললাম, আমি চলি তাহলে—

দাঁড়া। মদ খাস্ ?

না।

তাহলে তো অতি বাজে লোক দেখছি তুই শালা। এখানে কি করতে এসেছিস ?

এমনি বেড়াতে। ভাগ্যে এসেছিলাম তাই আপনার মতো গুণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—

গুণী ? আমি গুণী ! খুব খোসামোদ শিখেছিস তো ! ওই একটি জিনিসই শিখেছিস তোরা এ যুগে। সব ব্যাটা তেলি হয়ে গেছে, তেল দেয় খালি। তাও খাঁটি তেল নয়, ভেজাল— !

খিক খিক করে হাসতে লাগল বিচ্ছু পাঠক। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সরে পড়লাম। সেইদিন রাত্রে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল। ধর্মশালায় লোকজন বিশেষ ছিল না। আমি দোতলায় একটা ঘরে একাই শুয়ে ছিলাম ঘরে খিল দিয়ে। হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো ঘরের মধ্যে কে যেন ঘুর ঘুর করছে।

কে ?

কোন জবাব এলো না।

তাড়াতাড়ি টর্চ জেবলে দেখি বিচ্ছু পাঠক দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। হাসি উপচে পড়ছে তার চোখ দুটো থেকে।

তুই মাস্টার মানুষ, আমাকে গুণী বলেছিস, পাছে তোর কথাটা মিছে কথা হয়ে যায় তাই এই কেরামতিটা দেখিয়ে দিলুম। তোর খিল-বন্ধ-করা-ঘরে ঢুকে পড়লাম। তোর এই টর্চটা আমার ভারী পছন্দ। দিবি ?

নিন—

আমার প্রকাণ্ড পাঁচ সেলের বড় টর্চটা নিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। টিপে টিপে দেখলে দু' একবার। তারপর বলল, না, নেব না। তোকে পরীক্ষা করছিলাম। তুই শালা লোক নেহাৎ খারাপ নোস দেখছি। যদি কখনও বিপদে পড়িস, মানে

ভুতের পাল্লায় পড়িস, আমাকে খবর দিলে যাব আমি। বিনা পয়সায় কাজ করে দেব তোর!

আপনার ঠিকানা কি—

আমার কোন ঠিকানা নেই। স্মরণ করলেই আমি গিয়ে হাজির হব—

আমার ঘরে ঢুকেছিলেন কেন?

একটু আগে একটা ভুত ঢুকেছিল এ ঘরে। তারই পিছু পিছু এসেছিলাম। এসে দেখলাম একটা নিরীহ বামুনের ভুত। আমি যাকে খুঁজছি সে নয়। তারপর সহসা অন্তর্ধান করল বিচ্ছু পাঠক।

এটা অনেকদিন আগেকার ঘটনা। প্রায় বছর তিনেক বিচ্ছু পাঠককে স্মরণ করবার আর কোনও হেতুই হয়নি। বিচ্ছুর সঙ্গে যখন আলাপ হয় তখন সুজাতাদের আমি চিনতাম না। সুজাতার প্রসঙ্গেই আবার তাকে মনে পড়ল।

সুজাতার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় একটা ট্রেনের কামরায়। ফার্স্ট ক্লাসে। আমি মধুপুর যাচ্ছিলাম। কামরায় আর কেউ ছিল না। একটা স্টেশনে হঠাৎ সুজাতা চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠল এবং হাত নেড়ে কাকে যেন বলল—টা টা গুড বাই। আমি প্রথমে সুজাতার মুখ দেখতে পাইনি। দেখেছিলাম তার অদ্ভুত রংয়ের প্রিন্টেড শাড়িটা। লাল আর কালোর অদ্ভুত সমন্বয় একটা। মনে হল ওকে ঘিরে আগুন আর ধোঁয়া যেন হুড়োমুড়ি করছে। খোলা দরজার কাছে হাতল ধ'রে বা আমার দিকে পিছন ফিরে যে ওকে তুলে দিতে এসেছিল তার দিকে চেয়েই ও দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ। ঝড়ো হাওয়ায় ওর শাড়ির আগুন আর ধোঁয়া আরও উদ্দাম হ'য়ে উঠল। ওর এলো খোঁপাটাও আরও এলিয়ে গিয়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই লাল-কালোর জয়-জয়ন্তী সুর-সমুদ্রে। তারপর যখন ও মুখ ফেরাল তখন যেন একটু হতাশ হ'য়ে গেলাম। মুখখানা নিতান্তই সাদা-মাটা, মাটির তৈরি। চোখ দুটো একটু অসাধারণ মনে হ'য়েছিল। বুলটেরিয়ার কুকুরের চোখের মতো তিব্বতী চোখ। প্রথমে যা মনে হয়েছিল তাই বলছি। পরে অবশ্য ওই মুখেই সন্ধ্যা-উষা-জ্যোৎস্না-অন্ধকার অনেক কিছুই দেখেছি। অনেক পরে যখন ওর সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছিলাম, যখন ওর রহস্যময় চিত্তলোকের দূর দিগন্তে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন ওর মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল। সুন্দরী মনে হয়েছিল ওকে।

সুজাতা আমার দিকে ফিরে একটু অবাক হ'ল।

আপনি কতদূর যাবেন—

মধুপুর।

ও বসল সামনের বেঞ্চিতে জানালার ধারে। সুজাতা জানে না যে মধুপুরে আমার যাওয়া হয়নি। আমার ট্রেন মধুপুরের দিকে এখনও ছুটে চলেছে। মধুপুরে এখনও পেঁছিতে পারিনি।

অবশ্য সুজাতাকে ঘিরে আমার এই কবিত্বময় স্বপ্ন এ গল্পের পক্ষে অবান্তর। ট্রেনেই ক্রমশ তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমি ইতিহাসের অধ্যাপক এ খবর প্রকাশ পেতেই আমার সম্বন্ধে তার আগ্রহ একটু বাড়ল। বলল, আমি এবার হিস্ট্রিতে এম. এ. দিচ্ছি। হিস্ট্রি সম্বন্ধেই আলোচনা চলল খানিকক্ষণ। তাঁরপর তার কলকাতার ঠিকানাটাও জানলাম। আমার কলকাতার ঠিকানাটাও দিলাম তাকে।

পরিচয়ের এইখানেই শুরু, কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি সেটা। পরে কলকাতায় অনেকবার তার বাসায় গেছি, তাদের বিহারীগঞ্জের বাড়ির গল্প শুনেছি, তার ঠাকুরদাদার পৌরুষের অনেক কাহিনী শুনিয়েছে সে আমাকে। তার সঙ্গে পার্কে গেছি, সিনেমায় গেছি, লাইব্রেরীতে গেছি, মিউজিয়মে গেছি। তার জন্য হিষ্ট্রির নানারকম বই জোগাড় করেছি, নোট জোগাড় করেছি, কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করে সুজাতা যেদিন আমাকে প্রণাম করতে এল সেই দিনই বুঝতে পারলাম আমি মধুপুরে পেঁছিতে পারিনি। কোন দিন পারবও না। সুজাতার সঙ্গে একটি সৌম্য দর্শন ধপধপে ফরসা যুবকও এসেছিল। বাঙালীর পোষাক কিন্তু সাহেবের চেহারা। চোখটাও নীল। সেও আমাকে প্রণাম করল এসে।

সুজাতা বলল, "জন আজ এসেছে লন্ডন থেকে। কেম্ব্রিজে হিষ্ট্রি পড়ছিল। ডকটরেট হয়ে এসেছে। বাংলাও পড়েছে ওখানে। রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ—"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুজাতা। অথচ 'জন'-এর খবর এর আগে সে একবারও বলেনি আমাকে। বুঝলাম আমি যদিও তার জন্য এতটা করেছি তবু তার অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। নিজের প্রয়োজনে আমাকে খাটিয়েছে নানাভাবে কিন্তু অন্তরে স্থান দেয়নি। এর জন্য আমার দুঃখ হয়নি তা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে, খুবই হতাশ হয়েছিলাম, কিন্তু ভেঙে পড়িনি, এমন কি সুজাতাকে ঘিরে আমার মনে যে প্রেম পুষ্পিত হয়েছিল আশ্চর্যের বিষয় তাও ঝরে পড়েনি। সুজাতাকে আমি বরাবরই ভালবেসেছি। হ্যাঁ প্লেটোনিক প্রেমই বলতে পারেন। সুজাতা সুখী হোক এইটেই আমার কাম্য হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। একমাত্র কাম্যও বলতে পারেন, কারণ আমার নিজের যে বোনটি ছিল, সেটিও কিছুদিন আগে মারা যাওয়াতে সুজাতাই একমাত্র বন্ধন হয়ে উঠেছিন আমার ছন্নছাড়া জীবনের।

সুজাতার সঙ্গে 'জন'-এর কি করে দেখা হল কেনই বা সে বাঙালী বিয়ে না করে সাহেবকে বিয়ে করতে চাইছে, এসব খুঁটিনাটি খবর জানবার কৌতূহল অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু জিগ্যেস করিনি আমি। কেমন যেন লজ্জা হয়েছিল, মনে হয়েছিল জিগ্যেস করলেই আমার ভিখারীর রূপটা বুঝি ধরা পড়ে যাবে। বরং 'জন' এর সঙ্গে তার বিয়েটা যাতে তাড়াতাড়ি নির্বিঘ্নে হয়ে যায় এর জন্য আমিই যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত।

সুজাতা ধনী কন্যা, আমাদের দেশের হোমরা চোমরা ভি. আই. পি -দের অনেকে তার পিতৃবন্ধু, সংস্কৃতি-অভিযানের নেত্রী হয়ে সে কয়েকবার লন্ডন নিউইয়র্কও ঘুরে এসেছে, তাই আমি ধরে নিয়েছিলাম বিশ্ব-সংস্কৃতির কোন মিলন-ভূমিতে 'জন'-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। আর 'জন'-এর মতো ছেলের সঙ্গে দেখা হবার পর তার প্রেমে না পড়াটাই আশ্চর্যজনক। সত্যিই চমৎকার ছেলে।

সুজাতা তাদের বিহারীগঞ্জের বাড়িতে গিয়েছিল বিয়েরই ব্যবস্থা করতে। সুজাতারও গার্জেন বলতে বিশেষ কেউ ছিল না। বাবার একমাত্র কন্যা ছিল সে, বাবা হঠাৎ বজ্রাঘাতে মারা যান। তারপর তাকে কেন্দ্র করে সেই সব আত্মীয়েরা ভিড় করেছিল যাদের ইংরেজীতে বলে কাজিন। নানারকম তুতো-যুক্ত দাদার দল। কিন্তু সুজাতা আমার উপরই বিশ্বাস করত মনে মনে।

বিহারীগঞ্জ থেকে সুজাতা আমাকে জানাল যে 'জন'-এর নাকি ইচ্ছে বিহারীগঞ্জের

বাড়ি থেকেই তাদের বিয়ে হোক। 'জন'-এর এক পূর্বপুরুষ নাকি ওই অঞ্চলের নীলকুঠির মালিক ছিলেন, সুজাতার ঠাকুরদাদাও নাকি ম্যানেজার ছিলেন তাঁর। সংবাদটা খুবই অদ্ভুত ঠেকল আমার কাছে। সুজাতা লিখেছে আপনি তো পুরোনো বাড়ির সন্ধানে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরেছেন। আমাদের এ বাড়িটাও দেখে যান। আপনি এলে আমি নিশ্চিন্ত হব। আপনার তো এখন ছুটি আছে, চলে আসুন।

আমি ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম, এমন সময় সুজাতা আর তার দাদার দল হঠাৎ সবাই চলে এল বিহারীগঞ্জ থেকে। দাদার দল বলল, ও বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না, ও বাড়ি ভুতুড়ে বাড়ি। সুজাতা কিন্তু মত বদলাচ্ছে না। আপনি ওকে বুঝিয়ে বলুন একটু। ওখানে বিয়ে হলে আমরা তো কেউ যাবো না! বাপস্। খট্ খট্ খট্ খট্ করে খড়ম পায়ে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে চটাস্ চটাস্ ক'রে—অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তাররা হীরুদার করোনারী সাস্পেকট করেছেন। তাঁর এমন প্যাল্পিটেশন শুরু হল—।

সুজাতা একটি কথাও বলল না তাদের সামনে। তারা যখন চা জলখাবার খেয়ে চলে গেল তখন শান্ত কণ্ঠে বলল—ঠাকুরদা চলে এসেছেন ও বাড়িতে। ওরা দেখতে পায়নি, কিন্তু আমাকে দেখা দিয়েছেন তিনি। শুনে নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, তাহলে ওখানে বিয়ে হবে কি করে!

সুজাতা বলল, 'জন' কিন্তু লিখেছে ওই বাড়িতেই বিয়ের জোগাড় করতে। আইনত বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর হিন্দুমতে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে আবার আমাদের বিয়ে হোক ওই বাড়িতে, এইটেই তার ইচ্ছে। জেদও বলতে পারেন। সে বলেছে যেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অত্যাচারী বলে উৎখাত হয়েছিলেন সেইখানেই আমি প্রেমের জোরে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব। ওখানে স্কুল করব, কলেজ করব হাসপাতাল করব, সেবা করব সকলের। ভয়ানক খেয়ালী ছেলে তো। আমি বললাম তবু তুমি ওকে ট্রাংক কল ক'রে জানাও যে বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েছে, ওখানে বিয়ে হবে কি করে। সুজাতা হেসে বলল, ঠাকুরদা, আমার বিয়েতে উপদ্রব করবেন ? নিজেই সম্প্রদান করতে না বসে যান পিসেমশাইকে সরিয়ে দিয়ে। যাই হোক আপনি যখন বলছেন তখন ট্রাংক কল করি একটা। সেই দিনই রাত্রে সুজাতার কাছে গেলাম আবার। সুজাতা বলল, ট্রাংক কল করেছিলাম। জন বললে, নন্‌সেন্স, ওইখানেই বিয়ের ব্যবস্থা কর। তোমার ঠাকুরদার জন্য ভালো কাশ্মিরী শাল আর ইস্পাহানী গড়গড়া নিয়ে যাব। খুশি হবেন তিনি—

হ ন্ ন্ ন্…হ ন্ ন্ ন্…হ ন্ ন্ ন্। আমার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ওই শব্দটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল আবার।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার সেই কালো ছিপছিপে ভদ্রলোকটির কথা ভেসে আসতে লাগল। তারপর তাকে দেখতে পেলাম। এবার মনে হলো একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছেন একটু দূরে।

"বিয়ের দু'দিন আগে আমি আর সুজাতা এসেছিলাম এই বাড়িতে। রাত দুপুরের পর সুজাতা আস্তে আস্তে এসে বললে, শুনতে পাচ্ছেন ?

প্রথমে শ্নতে পাইনি তারপর পেলাম।

ভড়াক—ভড়াক—ভড়াক—ভড়াক—এই ধরনের গম্ভীর আওয়াজ একটা।

সুজাতা আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বললে, জানালাটা আস্তে খুলে বারান্দাটার ওধারে দেখুন। সুজাতাই জানালাটা সন্তর্পণে খুলে দিল। দেখলাম কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ উঠেছে, মনে হলো চাঁদের খানিকটা কে যেন খুবলে নিয়ে গেছে। তবু সে হাসছে। ওদিকের বারান্দায় জ্যোৎস্না পড়েছিল, সেই জোৎস্নায় দেখলাম দশাসই একটি লোক ইজি-চেয়ারে বসে তামাক খাচ্ছেন। প্রকাণ্ড মাথা। বড় বড় চোখ দুটো জ্বলছে। পাশেই দেওয়ালে একটা বন্দুক ঠেসানো। সুজাতার সাহস আছে বলতে হবে। সে নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে গেল বারান্দার দিকে। চেয়ারের সামনে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা ঘাড় ফেরালেন—কে সুজাতা! কোন ভয় নেই তোদের। আমি পাহারা দিচ্ছি বন্দুক নিয়ে। কোন ব্যাটাকে আসতে দেব না এখানে।

সুজাতা বললে, কিন্তু ঠাকুরদা পরশু যে আমার বিয়ে হবে এখানে। জন এইখানেই বিয়ে করবে বলেছে। কিন্তু তুমি থাকলে তো ভয়ে কেউ আসবে না। তুমি দু'একদিনের জন্যে চলে যাও। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি আবার এসো। জন তোমার জন্যে একটা কাশ্মিরী শাল আর ইস্পাহানী গড়গড়া আনবে বলেছে। তুমি একদিনের জন্যে সরে যাও লক্ষ্মীটি—

এর পরেই একটা হাপরের শব্দ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম অবশ্য সুজাতার ঠাকুরদা হাসছেন।

আমি চলে গেলে ওরা এসে পড়বে। তোর বিয়েই হতে দেবে না।...

হন্‌ন্‌ন্—হন্‌ন্‌ন্—হন্‌ন্—তীক্ষ্ন তীব্র শব্দে আবার মুখরিত হয়ে আকাশ বাতাস। ছিপছিপে কালো ভদ্রলোকটির অস্তিত্ব আবার অবলুপ্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণের জন্য। একটা উন্মাদ সুরের ঝঞ্ঝা বইয়ে দিয়ে থেমে গেল আবার শব্দটা।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম।

ঠাকুরদা যখন কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না, তখন সুজাতা কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বললে, কি হবে এখন বলুন তো। ঠাকুরদা খড়ম চট-চটিয়ে সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

হঠাৎ আমার বিচ্ছু পাঠকের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে ডাক এল—কি মাষ্টার তলব করেছ কেন?

বারান্দায় বেরিয়ে দেখি বিচ্ছু পাঠক মুচকি মুচকি হাসছে দাঁড়িয়ে। মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন।

কি দরকার, কোন ভুতের পাল্লায় পড়েছ না কি—হাসতে হাসতে আবার জিগ্যেস করল সে।

বললাম তখন সব খুলে। শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর বলল, ঠিক আছে। গোটা চারেক মালসায় গনগনে আগুন কর। আমি আমার জিনিস-পত্তর জোগাড় করে আনি। অন্তর্হিত হয়ে গেল নিমেষে। আধঘণ্টা পরে নানারকম

শিকড়-বাকড় নিয়ে হাজির হলো আবার। চারটে মালসার গনগনে আগুনে সেইগুলো কুঁচিয়ে ফেলতে ফেলতে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল সে। মাঝে মাঝে মুখ খিস্তি ক'রে গালাগালিও দিতে লাগল। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক।

সুজাতা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুকুরের রানাটার উপর বসে রইল।

হঠাৎ দুম করে একটা আওয়াজ হলো।

উঃ বলে চীৎকার করে উঠল বিচ্ছু।

শালা জখম করেছে আমাকে! কিন্তু তাড়িয়েছি শালাকে। মন্তর দিয়ে বেঁধে দিয়েছি, আর এ বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু বড্ড রক্ত পড়ছে যে-মাস্টার। কাছে-পিঠে কোনও ডাক্তার আছে কি?

একজন হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন গ্রামে। তাঁকে খবর দিতেই তিনি এলেন। বললেন —না, গুলির কোনও দাগ দেখতে পাচ্ছি না তো কোথাও!

অথচ রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। একটু পরেই মরে গেল বিচ্ছু পাঠক···।

হন্‌ন্‌ন্‌—হন্‌ন্‌ন্‌—হন্‌ন্‌ন্‌—সেই শব্দটা আবার উগ্র হয়ে উঠল। মনে হ'ল শব্দের অদৃশ্য আগুন যেন ছেয়ে ফেলছে চারিদিক। আবার থেমে গেল হঠাৎ।

শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, বিয়ের ব্যবস্থা এখানেই হয়েছিল। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ আসেনি। এই ঘরেই বিয়ে হচ্ছিল। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল ফণী-মনসার গাছগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে। শুধু তাই নয় মনে হলো হাত পা গজিয়েছে তাদের। হাত পা নাড়ছে সবাই। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। কি সর্বনাশ। ওরা যে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। আর তাদের সামনে রয়েছে বিচ্ছু পাঠক। হাত তুলে সে বলল, ওই ঘরে হেস্টি সায়েবের নাতির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ম্যানেজারের নাতনীর। ম্যানেজারকে তাড়িয়েছি। চলে আয় তোরা। চলে আয়। চলে আয় সব।

দলে দলে আসতে লাগল সব। পিল পিল করে ঘরে ঢুকল। তারপর সুজাতা আর জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আমার উপর···

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলাম ফণী-মনসার জঙ্গলের ভিতর থেকে বিরাট একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা গায়ে লাল আর কালোর অদ্ভুত ছোপ ছোপ দাগ। যেন প্রিন্টেড শাড়ী পরে আছে।

হন্‌ ন্‌ ন্‌—হন্‌ ন্‌ ন্‌—হন্‌ ন্‌—

তারপর দেখলাম একটা ধপধপে সাদা সাপ সামনের দেওয়ালের পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল ফণীমনসার জঙ্গলে। লাল-কালো সাপটা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

থেমে গেল শব্দটা।

পরিস্থিতি

কবি কবিতা শুরু করেছিলেন একটা। খুব জোরদার একটা ভাব এসেছিল মনে।

দুটি মাত্র হাত আছে
আকাশে উৎক্ষিপ্ত করি তাই
আর বলি
কেন, কেন, কেন এ যন্ত্রণা।
আকাশের দূর প্রান্তে কোনও
ভগবান নামে আছো না কি কেহ।
তুমি দয়াময় ?
প্রমাণ তো নাই।
শত শত শতাব্দী ব্যাপিয়া
যিনি মোর অন্তর্যামী
তুমিই কি তিনি ?
জপিছেন যিনি অহরহ
ক্ষমা ও ত্যাগের মন্ত্র
অহিংসার বাণী
নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মতো
নির্বীর্য বুদ্ধবৎ
পিঞ্জরিত শুক-পক্ষী সম
কহ, কহ, কহ
তুমিই কি সেই ভগবান
সর্বশক্তিমান ?
লক্ষ লক্ষ পশুদের প্রমত্তা লালসা-বহ্নি
গ্রাস করে
দগ্ধ করে
নিঃশোষিত করে
অগণিত অসহায় নিরীহ দুর্বলে
তুমি কি তাদের কথা—
হায়, হায়, হায়
দুটি মাত্র বাহু মোর
থাকিত যদ্যপি কোটি কোটি বাহু
আর তাতে ঝলসিত কোটি কোটি অস্ত্র
খরশান—

ভাবাবেগে বাধা পড়ল। ফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে। সুজিতবাবু এসে বললেন, আপনার ফোন এসেছে একটা। সুজিতবাবু ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা আছে।

তাই তিনি দয়া করে কবিকে তাঁর বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় থাকতে দিয়েছেন। ওইখানে নির্জনে বসে তিনি রোজ লেখেন সকালবেলা। তাঁর পরিবারবর্গ অবশ্য থাকে এক বস্তির খোলার ঘরে। সেখানে বসে কবি লিখতে পারেন না।

"হ্যালো, হ্যাঁ আমিই কথা বলছি। সত্যি? নেবেন আমার কবিতা আপনার কাগজে?" উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল কবির মুখ। কিন্তু পরমুহূর্তেই সব নিবে গেল আবার।

"পাঁচ টাকা? মাত্র পাঁচ টাকা? ও, তাই নাকি! বিনা পয়সায় অনেক কবিতা পান? ঝুড়ি ঝুড়ি! তাতো জানতাম না। আমি যে কবিতাটা শুরু করেছি সেটাকে লিখে রি-রাইট ক'রে আবার সংশোধন ক'রে আবার লিখে ঠিক প্রকাশযোগ্য করতে অন্তত তিন দিন লাগবে। তার বেশিও লাগতে পারে। এর জন্য মাত্র পাঁচ টাকা দেবেন? আজকাল সামান্য মজুরের দৈনিক আয় মিনিমাম তিন টাকা। মানে অন্তত দশ টাকা না দিলে—'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদক ফোনটা কেটে দিলেন। দর কষাকষি করা তাঁর স্বভাব নয়।

"হ্যালো—"

কোনও উত্তর এল না।

কবি বেরিয়ে আসতেই সুজিতবাবু হাসি মুখে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "পাঞ্চজন্য কি বললে—"

"পাঁচ টাকার বেশি কবিতার দক্ষিণা দেবে না। কিন্তু ওতে কি এ বাজারে চলে, আপনিই বলুন—"

"না, চলে না। অনেকদিন থেকেই আপনাকে একটা প্রস্তাব করব ভাবছিলাম কিন্তু আপনি আদর্শবাদী লোক তাই সাহস পাইনি—"

"কি প্রস্তাব বলুন?"

"তাহলে আগে ছবিগুলো দেখাই—" একটা ড্রয়ার টেনে তিনি বড় একটা খাম বার করলেন।

"খামের ভিতর ছবিগুলো আছে, দেখুন—"

ছবিগুলো দেখে শিউরে উঠলেন কবি। নানা ভঙ্গীতে যুবতী উলঙ্গিনী নারীর ছবি সব।

সুজিতবাবু বললেন, "আইনত এ সব ছবি ছাপানো যাবে না। ছাপালে আমার কাজও হত না। আমি শাড়ির ব্যবসা করি। আমি একজন আর্টিস্টকে দিয়ে এ সব ছবির উপর আমার দোকানের শাড়িগুলোর ডিজাইন আঁকিয়ে নেব; এর সঙ্গে প্রতিটি ছবিতে যদি আপনি একটা কবিতা লিখে দেন তাহলে আরও চমৎকার হবে। আমি প্রতিটি কবিতার জন্য আপনাকে পঁচিশ টাকা করে দেব। একশ'টা ছবি আছে, আড়াই হাজার টাকা পাবেন। যদি অগ্রিম চান এখুনি চেক লিখে দিচ্ছি—"

কবির মনে ফুটে উঠল তাঁর খোলার ঘরটা, তাঁর রুগ্ন শীর্ণ স্ত্রীর ছবি, তাঁর হাড় পাঁজরা বের করা রোগা দুটো ছেলের মুখ। মাছ মাংস দুধ কতদিন খাননি, সামান্য শাকভাত জোটাতেই নাভিশ্বাস উঠছে। ওই রুগ্ন স্ত্রীই থলিহাতে র‍্যাশানের দোকানে কিউ দেয়। চাকর রাখবার সামর্থ্য নেই। একটা চাকরি ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি দেশকে জাগাবার কবিতা লিখতেন ব'লে কর্তৃপক্ষেরা সন্দেহের বিষদৃষ্টিতে দেখতে

লাগল তাঁকে। দেশ জাগলে তাঁদের আমদানী-রপ্তানির আপিস থাকবে না। এ কবি তাঁদের সহকর্মী নয়, শত্রু। চাকরিটি গেল। আর চাকরি জোটেনি। মৃণা এক জায়গায় ঝি-গিরিতে বহাল হয়েছে। মৃণালিনী আঁস্তাকুড়ে ব'সে বাসন মাজছে—এ কল্পনা তাঁর মতো কবির পক্ষেও অসম্ভব ছিল। কিন্তু তা ঘটেছে। রুগ্ন মৃণা দু'বাড়িতে বাসন মেজে মাসে চল্লিশ টাকা রোজগার করছে।

"করবেন আমার কাজটা ?"

সুজিতবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে চেয়ে রইলেন। কবির মনে হ'ল কৌতুকও যেন চিকমিক করছে সে দৃষ্টিতে।

একটু ইতস্তত করলেন।

তারপর বললেন—"করবো।"

তখনই চেকটাও দিয়ে দিলেন সুজিতবাবু।

মাসকয়েক পরে।

কবির এক সতীর্থ তাঁকে পত্র দিলেন—"আমি আশা করিনি যে বিজ্ঞাপনের কলমে উলঙ্গিনী নারীদের পাশে তোমার মতো কবির এমন সুন্দর কবিতা ছাপা হবে। এ বাজারে টাকাটাই কি সব ? আমার কাগজ গরীব। তোমাকে কিছু দিতে পারবে না। তাই বলে কি একটি কবিতা পাবে না সে ?"

কবি একটি জ্বালাময়ী স্বদেশী কবিতা পাঠিয়ে ছিলেন তাঁকে। দিনকয়েক পরে কবিতাটি ফেরত এল।

সতীর্থ লিখেছেন—কবিতাটি খুব ভালো। তবু ফেরত দিলাম। আমাদের কাগজের যিনি মালিক তিনি গভর্নমেণ্টকে চটাতে চান না! তা'ছাড়া ভীতু লোক। একটা মামুলী প্রেমের কবিতা লিখে দাও না। আগে তো তুমি চমৎকার প্রেমের কবিতা লিখতে।

কবি স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন। একটু পরে তাঁর মুখে হাসি ফুটল ধীরে ধীরে।

প্রথমা

ছন্দা তার বাপের বাড়ি থেকেই তার এক বান্ধবীকে নিয়ে পিকনিকে যাবে বটানিকাল গার্ডেনে। ভরত তার বন্ধু সুরেনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তার সদ্যবিবাহিতা পত্নী ছন্দার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল। সুরেন বিয়েতে আসতে পারেনি। পিকনিকেও আসতে পারবে না জানিয়েছে। সে ছবি আঁকে। ছবি নিয়েই মেতে থাকে। সুতরাং ভরতকে একাই যেতে হবে। সে একটা হোটেলে কিছু কাটলেটের অর্ডার দিয়েছিল। সেখানেই ফোন করল। কাটলেটগুলো যেন চারটের সময় তৈরি থাকে।

ইতিমধ্যে তার 'বস' মিস্টার চৌধুরী ফোন করলেন। কড়া লোক। ভরত ভয় করে তাঁকে। কলমের এক খোঁচায় চাকরি খতম করে দিতে পারে।

চৌধুরী বললেন—"আপনি একবার আপিসে আসুন। যদিও আজ ছুটির দিন তবু আসুন। আমাকে যে ফাইলটা দিয়ে গেছেন সই করবার জন্য, তাতে মারাত্মক ভুল রয়েছে কয়েকটা। ওগুলো ঠিক ক'রে আবার টাইপ ক'রে দিতে হবে। কালই পাঠানো দরকার। আপনি আসুন একবার। খেয়ে দেয়ে আসুন একটা নাগাদ। আমি যাব সেই সময়।"

"আমি সার একটা এনগেজমেণ্ট ক'রে ফেলেছি চারটের সময়। তার আগে ছুটি পাব তো?"

"তা পাবেন—"

আপিসে গিয়ে ভরত দেখল মিস্টার চৌধুরী আসেননি। চাপরাসী ফাইলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার চৌধুরী একটা চিঠি দিয়েছেন—আমার স্ত্রী একটু অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমি যেতে পারলাম না। আমি যেখানে যা লেখা দরকার তা কেটে লিখে দিয়েছি। আপনি টাইপ করে চাপরাসীর হাতে ফেরত দেবেন।

ভরত চাপরাসীকে জিগ্যেস করল—মেমসাহেবের কি হয়েছে। চাপরাসী বাঙালীর ছেলে। বি. এ. পাশ।

বলল—"বিশেষ কিছু নয়। ফিট হয়েছে—। আপনি এগুলো ঠিক ক'রে রাখুন। আমাকে একবার বেরুতে হবে। বোরখা কিনে আনতে হবে একটা।"

"বোরখা, কার জন্য?"

"মেমসাহেবের জন্য। কালই আনতে বলেছিলেন। চলি আমি। এখখুনি আসছি।"

টাইপ করা যেই শেষ হয়েছে—তখন দুটো—অমনি সুরেনের ফোন এল।

"তোমার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তোমার চাকর বললে তুমি আপিসে। ছুটির দিন আপিসে কেন?"

"মনিবের হুকুম। তুমি আসছ না কি পিক্‌নিকে?"

"না। আমি এখন মশগুল হয়ে বসে আছি। তুমি যদি পিকনিক শেষ ক'রে সন্ধ্যের দিকে শ্রীমতীকে নিয়ে আস তোমাকে একটা ভালো ছবি দেখাব। একটা পোর্ট্রেট এখনি শেষ করেছি! শেষ ক'রে তার দিকে চেয়ে বসে আছি, দেখে দেখে আশ মিটছে না। আসবে?"

"চেষ্টা করব—"

ভরত ইডেনগার্ডেনে গিয়ে দেখল ছন্দা তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে একটু আগে।

"তোমার বান্ধবী কই?"

"আসবে একটু পরে।"

"ও তোমার কি রকম বান্ধবী? কোথায় আলাপ?"

"আলাপ ছেলেবেলায় সেই দিল্লীতে। এখানে সেদিন নিউমার্কেটে হঠাৎ দেখা হল। ওর স্বামী না কি এখানে বদলি হয়ে এসেছেন—"

"কি চাকরি করেন ওর স্বামী?"

"তাতো জানি না। ওর স্বামীর নামটাও জিগ্যেস করা হয়নি।"

একটু পরে ছন্দা বলল—"মেয়েটি একটু খামখেয়ালি-গোছের। আমাকে কি বলেছে জান ? এখানে বোরখা পরে আসবে—"

"বোরখা ! কেন ?"

"খেয়াল। বলেছে তোমাকে মুখ দেখাতে খুব লজ্জা করবে ওর—"

"কেন !"

"কি জানি। এলে তুমিই জিগ্যেস করো··"

একটু পরে সত্যিই ভদ্রমহিলা একটা কালো বোরখা পরে হাজির হলেন।

ভরত সবিস্ময়ে জিগ্যেস করল—"বোরখা কেন ?"

"আপনিও তো বোরখা পরে আছেন, যদিও আপনার বোরখাটা অদৃশ্য।"

"তাই না কি !"

"সমাজে বোরখা পরেই থাকতে হয়। আপনার ছন্দারও হয়তো একটা বোরখা আছে—"

মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে ভরতের সমস্ত সত্তা যেন সঙ্গীতময় হয়ে উঠল। সুরের ঝড়ে বাহিত হয়ে তার সমস্ত অতীতটা যেন মূর্ত হয়ে উঠল মানস পটে। একটা রঙের দোলা যেন দুলতে লাগল চোখের সামনে।

"আসুন, কাটলেটগুলোর একটা সদ্গতি করা যাক। আপনি কি এনেছেন—"

"পীচ কয়েকটা—"

আবার সুরের ঝড়, আবার রঙের দোলা।

লিসি তাকে কত পীচই যে খাইয়েছে।

সন্ধ্যার পর সুরেনের বাড়িতে গেল ভরত। একাই গেল।

"কই, কি ছবি এঁকেছিস দেখি—"

"ওপরে চল-"

ছবি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ভরত।

এ যে লিসির ছবি। যে লিসিকে ভালবেসেছিল অথচ পায়নি। গায়ের রং, কুষ্ঠির বিচার, দেনা পাওনার সহস্র ঝামেলা, তার প্রথম প্রণয়কে কেউ মর্যাদা দেয়নি। সে নিজেও না। লিসি হারিয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ এই ছবিতে সে এল কি করে।

"এ কার ছবি ?"

"বলতো কার"

"কি ক'রে বলব—"

"তোমার 'বস' মিস্টার চৌধুরীর নব পরিণীতা পত্নীর। মিস্টার চৌধুরী শৌখিন লোক। আমাকে এই ফোটোটা দিয়েছিলেন এর থেকেই ছবিটা করেছি আমি—হাজার টাকা রোজগার করেছি।"

সুরেন একটি ফোটো দিল ভরতকে। আর সংশয় রইল না। লিসির পাশে বর-বেশে মিস্টার চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন।

"ছবিটা কেমন হয়েছে ?"

"চমৎকার।"

সৌরভ

ঝন্ ঝন্ করে ফোনটা বেজে উঠল। রাত দুপুরে কে ফোন করছে আবার। বেজেই চলেছে। উঠতে হল বিছানা ছেড়ে।

হ্যালো। হ্যাঁ আমারই নাম্বার। হ্যাঁ আমিই কথা বলছি, কি বলুন। সৌরভ ? না ও নামের কেউ তো এখানে থাকে না। কি আশ্চর্য, আমি বলছি থাকে না। এখানে আমি আর আমার ন'বছরের ছেলে দীপু ছাড়া আর কেউ থাকে না। আর থাকে আমার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর। তার নাম হীরু, সৌরভ নয়। আপনি হয়তো রং নাম্বারে ফোন করেছেন। সিক্স্ ফাইভ্ ফাইভ এ বলেও একটা নাম্বার আছে। আমারটা সিক্স্ ফাইভ্ এইট্। তা যদি হয় তাহলে ভুল খবর পেয়েছেন। এখানে সৌরভ নামে কেউ নেই। আপনি কোথা থেকে কথা বলছেন ? ব্যারাকপুর ? —হ্যালো, কেটে দিচ্ছি তাহলে। আসতে চান একদিন আমার বাসায় ? বেশ তো আসুন। এলে রাত নটার পর ফোন করে আসবেন। আমি সকাল বেলাই আপিসে বেরিয়ে যাই। সন্ধে সাতটা আটটার আগে ফিরি না। দীপু স্কুলে যায়। সেখান থেকে সে চলে যায় আমার এক বোনের বাড়িতে। ওর স্কুলের কাছেই আমার বোনের বাড়ি। আমি ফেরবার সময় ওকে নিয়ে আসি। যদি রবিবার দিন আসেন সুবিধা হয়, ফোন ক'রে আসবেন কিন্তু—"

মেয়েছেলের গলা। লাইনটা কেটে দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। কে ভদ্রমহিলা ? সৌরভই বা কে ? আর আমার সঙ্গেই বা দেখা করতে চাইছেন কেন ! শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখি ঘুমের ঘোরে দীপু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে। কি যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে ওর। টং ক'রে শব্দ হল। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম একটা বেজেছে। তার পরই গন্ধটা টের পেলাম। একটা মৃদু গন্ধে যেন সারা ঘরটা ভরে রয়েছে। আমি কোনও এসেন্স বা আতর ব্যবহার করি না, তিন-তলার ফ্ল্যাটে থাকি, চারদিকে কেবল বাড়ি আর বাড়ি। ফুলগাছ চোখে পড়েনি কখনও। এ গন্ধ এল তাহলে কোথা থেকে। মেয়েটি সৌরভের খোঁজ করছিল—তাহলে কি···দীপু দেখলাম ছটফট করছে···মনে হল স্বপ্ন দেখছে ও, মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। গন্ধটা তীব্রতর হতে লাগল। কিসের গন্ধ ? পরিচিত নানারকম গন্ধের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। হাস্নু-হানা ? রজনীগন্ধা ? গোলাপ ? গন্ধরাজ ? না, একটার সঙ্গেও মিলছে না। কল্পনা করলাম এ পাড়ায় হয়তো কারো দেওয়াল-ঘেরা বাগান আছে আর সে বাগানে হয়ত সুদূর-সৌরভ-সঞ্চারী ফুল ফুটেছে কোনও। গন্ধটা আরও বাড়ল। আশ্চর্য, একটু আগে সৌরভের খোঁজ করছিল মেয়েটা। আফশোষ হল তার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর কিছুই জিগ্যেস করা হয়নি। দীপু ঘুমের ঘোরে কথা বলে উঠল। "হ্যাঁ, মনে আছে বই কি"। দীপুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কি ব্যাপার। ক্রমশই ব্যাপারটা রহস্যময় হয়ে উঠছে যেন। গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। মনে হল চারিদিকে আতরের বৃষ্টি হচ্ছে। দম আটকে আসতে লাগল। শীতকাল। সব জানালা বন্ধ ছিল। খুলে দিলাম জানলা-গুলো। খুলে দিতেই একটা বাঁশির সুর ভেসে এল। অনেক অনেক দূরে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। মিষ্টি করুণ সুর একটা। একটা মোটা কম্বল চাপিয়ে দিলাম দীপুর

লেপের উপর। দীপু দেখলাম একটু শান্ত হয়েছে। পাশ ফিরে শুল। দীপু আর একবার বিড়বিড় করে ঘুমের ঘোরে বলল—আমি এখন ইস্কুলে পড়ি। কারও সঙ্গে কথা কইছে কি? ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল দেখছি। 'শেলফ্' থেকে মোটা একটা সমালোচনা-গ্রন্থ টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম, যদি ঘুম আসে। এল না। বাঁশির করুণ সুরটা গন্ধের সঙ্গে মিশে একটা গন্ধর্বলোক সৃজন করতে লাগল মনে। হয়তো তন্দ্রার ঘোরেই দেখলাম এটা—মনে হল একটা রঙীন কুয়াশাও যেন ঘরের মধ্যে ঢুকছে জানলা দিয়ে। তার আড়ালে কারা যেন নড়া-চড়া করছে অস্পষ্টভাবে। গন্ধ, সুর আর রং জীবন্ত হয়ে উঠল আমার চারিপাশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ময়ের সীমা মাত্রা অতিক্রম করে গেল।

ফিকে সবুজ আর গোলাপী স্বচ্ছ জোব্বা-পরা একটি লোক এগিয়ে এল আমার দিকে। মাথার চুল সোনালি, চোখ দুটি স্বপ্নময়। গোঁফ দাড়ি দুইই আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ওগুলো গোঁফ দাড়ি নয়, মুখের আকাশে ঊষার ছোট ছোট অরুণ মেঘপুঞ্জ স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। পাতলা ঠোঁট দুটি নড়ছে। প্রথমে কিছুই শুনতে পাইনি। তারপর পেলাম। মনে হল অনেক দূর থেকে কে যেন কথা বলছে—ট্রাংক কলে লন্ডন বা আমেরিকা থেকে যেরকম কণ্ঠস্বর শোনা যায়, অনেকটা সেই রকম।

"আপনি কথাসরিৎসাগর বিষয়ে এখুনি পড়ছিলেন, তাই আপনার কাছে আসতে ইচ্ছে হল। গন্ধর্বলোকে আমি এককালে স্বপ্ন-সরিৎ-সাগরের সম্পাদক ছিলাম। কথা আর স্বপ্নে তফাত কি তা নিশ্চয় জানেন আপনি—"

"না। আমি কেরানী। ফাইল ছাড়া আর কিছু বুঝি না। যে বইটা আমি পড়ছিলাম ওটা আমার স্ত্রীর বই। ঘরে পড়ে সে বি. এ পাশ করেছিল, তখন ওই সব বই কিনতে হয়েছিল। ঘুম আসবার জন্যে এখন পড়ছিলাম ওটা।"

একটা প্রচ্ছন্ন হাসি আভাসিত হয়ে উঠল তার মুখে।

"তবু প্রত্যেক লোকেরই জানা উচিত কথা আর স্বপ্নে তফাত কি। কারণ প্রত্যেক লোকই কথা বলে, স্বপ্নও দেখে।"

"কি বলুন। আমি ঠিক জানি না।"

"কথা ফুরিয়ে যায়, কিন্তু স্বপ্ন ফুরোয় না। স্বপ্নের সরিৎ শুকোয় না কখনও। জন্মজন্মান্তরেও বেঁচে থাকে তা। আপনার স্ত্রী কোথা—"

"আমার এই ছেলেটির জন্মের পরই সে মারা যায়।"

দেখলাম তার আশেপাশে আরও নর-নারী ভিড় করেছে। নানা রঙের বেশবাস প্রত্যেকেরই অঙ্গে। সবই স্বচ্ছ, অথচ অশালীনতা নেই কিছু। মনে হল দু'একজনের ডানাও আছে। কি সব ঘটছে আমার ঘরে আজ!

"কি হয়েছিল আপনার স্ত্রীর?"

চুপ ক'রে রইলাম। সে যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল তা এদের সামনে বলতে পারলাম না। জল-তরঙ্গ বেজে উঠল যেন আমাকে ঘিরে। বুঝলাম ওরা সবাই হাসছে। আমার এই নীরবতা ওদের প্রতারিত করতে পারেনি। ওরা জানে আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল!

"উত্তরবাহিনী নদী যেমন দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম বা দক্ষিণবাহিনী হয় স্বপ্নরাও তেমনি দিক পরিবর্তন করে অন্য দিকে প্রসারিত করে নিজেকে। আপনার

স্ত্রীর স্বপ্ন-সরিৎ আপনার মধ্যে সাগর পায়নি, মর‍ুভূমি পেয়েছিল। তাই সে অন্যদিকে চলে গেল, তাই সে আত্মহত্যা করল। পার‍ুলকে মনে আছে আপনার?"

"কে পার‍ুল?"

"আপনার প‍ূর্বজন্মে আপনি তাকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু পাননি। এ জন্মেও আপনার অজ্ঞাতসারেই আপনি তাকে খ‍ুঁজে বেড়িয়েছেন নানা য‍ুবতীর মধ্যে। আপনার স্ত্রী টের পেয়েছিল এটা। তাই সে আপনার কাছে থাকেনি। আপনি পার‍ুলকেও পাননি, যদিও সে বেঁচে আছে এখনও। সে আপনাকে ভালবাসত না। এখনও বাসে না। সে ভালবাসত সৌরভকে। সৌরভকে সে এখনও খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, এখনও খ‍ুঁজে বেড়াচ্ছে—"

ঝাউবনে হাওয়া বইলে যেমন মর্মরধ্বনি ওঠে তেমনি একটা মর্মরধ্বনি শ‍ুনতে পেলাম। দেখলাম ওরা সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

সোজা হয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। টং ক'রে আবার শব্দ হল। দেড়টা বাজল। আধঘণ্টা ধরে কি স্বপ্ন দেখলাম! স্বপ্নই নিশ্চয়। লক্ষ্য করলাম গন্ধটা আর নেই। শীতের কনকনে হাওয়া হ‍ু হ‍ু ক'রে জানলা দিয়ে ঢুকছে। বন্ধ ক'রে দিলাম জানলাগ‍ুলো।

॥ ২ ॥

তার পরদিন সকালে দীপ‍ু স্কুলে চলে গেল। আমিও আপিসে গেলাম। রাত্রের ওই অদ্ভুত কাণ্ডটা যে স্বপ্ন ছাড়া কিছ‍ু নয় এ কথা নিজেকে বোঝাতে চাইছিলাম। কিন্তু মন, মানে অন্তর্যামী, সে কথা ব‍ুঝতে চাইছিল না। সে বলছিল না ওটা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, সত্যি। অন্তর্যামীর কথাকে আমি কিন্তু আমোল দিইনি। আমোল দিলে চলে না। স্বপ্নকে সত্য বলে মেনে নিলে অথৈ জলে পড়ে যেতে হয়। পায়ের নীচে থেকে শক্ত মাটি সরে যায়। তারপর আর কিছ‍ু হয়নি অবশ্য। ফোনও আসে নি। সে ভদ্রমহিলা দেখাও করেন নি। গন্ধটন্ধও পাইনি। আর সমস্ত দিন খেটেখ‍ুটে এসে ঘ‍ুমিয়ে পড়ি, সকাল সাতটায় ঘ‍ুম ভাঙে, রাত একটার সময় কি ঘটে না ঘটে তা জানিও না অবশ্য। একটা জিনিস লক্ষ্য করছিলাম কিন্তু। দীপ‍ু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সর্বদা। স্কুলের শিক্ষক নাগ মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায় একদিন। তিনি বললেন, "আপনার ছেলের আজকাল পড়ায় মন নেই কেন? জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে কেবল। বিড়বিড় ক'রে কি যেন বলেও নিজের মনে। কবি হবে না কি শেষটা!" সত্যিই সর্বদা অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। কেন অন্যমনস্ক জিগ্যেস করলে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥

কয়েকদিন পরে ব্যাপার আবার ঘনীভূত হয়ে উঠল হঠাৎ। অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম একটা। হ্যাঁ স্বপ্নই বলতে হবে, আর কি বলব।

চমৎকার একটা উপবন যেন। মাঝে মাঝে মর্মর বেদী। নানারকম ফুলের গাছ। প্রত্যেক গাছেই ফুল ফুটেছে। অজস্র ফুল। অজস্র মৌমাছি। অজস্র প্রজাপতি। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল। কোথায় ডাকছে পাখীটা। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে বাগানের একটা বেদীতে বসেছিল। আমাকে দেখেই উঠে পড়ল।

"পারুল শোন - শোন—"

পারুল ফিরে চাইল না আমার দিকে।

"শোন পারুল লক্ষ্মীটি - একবার শোন - "

পারুল ছুটতে লাগল। উড়তে লাগল তার রাঙা শাড়ির আঁচল। এলিয়ে পড়ল মাথার খোঁপা। আমিও ছুটতে লাগলাম তার পিছু পিছু। তারপর তাকে ধরে ফেললাম বকুলতলায়। সে চেঁচিয়ে উঠল—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে চাই না, আমি সৌরভকে চাই। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটতে লাগল। আমিও ছুটতে লাগলাম। একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল অনেক পাখী, গুঞ্জন ক'রে উঠল অসংখ্য মধুকর। তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

সোজা হয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। সেই তীব্র সৌরভে আবার ঘর ভরে গেছে। দীপু বিছানায় ছটফট করছে।

॥ ৪ ॥

তার পরদিনই ফোন এল আবার রাত দুপুরে।

"হ্যালো, হ্যাঁ আমি। আপনি রবিবার দিন যেতে বলেছিলেন। কাল যাব আমি।"

"আপনি কে বলুন তো—"

"আমাকে চিনবেন কি করে। এখানকার স্কুলের শিক্ষিকা আমি—"

"নাম কি আপনার? চিনতেও পারি—"

"আমার নাম পারুল।"

এরপর আর কিছু জিগ্যেস করতে সাহস হল না।

পরদিন সকালেই আর একটা টেলিফোন এল।

আমার 'বস্' টেলিফোন করছেন।

"ফাইলে একটা জরুরি চিঠি পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন একবার।"

চাকরি করি সুতরাং ছুটতে হল।

জরুরি চিঠিটা খুঁজে দিয়ে ঘণ্টা দুই পরে ফিরলাম। ফিরে দেখি একটি কালো ছিপছিপে মেয়ে আর দীপু বসে গল্প করছে। মেয়েটির চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু চোখের আলোয় কি জ্যোতি! যদিও প্রৌঢ়া, কিন্তু বয়স যেন আঠারোর বেশী বাড়েনি।

দীপুর চোখ মুখ উদ্ভাসিত।

পারুল বলল—"আমি একে নিয়ে যাই, কেমন?"

প্রশ্ন করলাম—"দীপু, তোমার হোম্‌টাস্ক নেই?"

"আমার নাম দীপু নয়, আমার নাম সৌরভ।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাস্তি

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছিল। তার উপর আকাশে ঘন-ঘোর মেঘ। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টিও পড়ছিল। হাওয়া উঠেছিল একটা। ঝোড়ো হাওয়া। বিরিঞ্চিলাল পদব্রজে গ্রাম্যপথ অতিক্রম করছিলেন একটা বাগানের ভিতর দিয়ে। বেশ বড় বাগান। তাঁর নিজেরই সম্পত্তি হয়েছে এটা এখন। তাঁর জ্যাঠা কুন্দনলাল শখ ক'রে করিয়েছিলেন এটা, পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর। আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা এসব তো আছেই, তাছাড়া আছে লটকান, গোলাপজাম, জামরুল, বিলিতি আমড়া, সপাটুর গাছ। শৌখীন লোক ছিলেন কুন্দনলাল। নাগলিঙ্গ, চন্দন আর হিংয়ের গাছও লাগিয়েছিলেন তিনি। গরীবের ছেলে ছিলেন কুন্দনলাল। কিন্তু বিপুল উদ্যম ছিল তাঁর। পুরুষসিংহ ছিলেন। বিরাট বিষয় ক'রে গেছেন এ অঞ্চলে। সবই স্বোপার্জিত। কিন্তু এদেশে সিংহ হলে যা হয় তাঁরও তাই হয়েছিল। একদল ফেরু-পাল সর্বদাই পিছনে লেগে থাকত। সব আত্মীয়ই ক্রমে ক্রমে শত্রু হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সমাজে কেউ বড় হ'লে তার অনিষ্ট করবারই চেষ্টা করে অধিকাংশ লোক। কিছু করতে না পারলে আড়ালে বানিয়ে বানিয়ে নিন্দে করে। কুন্দনলালের বেলাতেও এ সবই হয়েছিল। কিন্তু তিনি সত্যই সিংহ ছিলেন। এ সব গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর কাছে ভিড়তে সাহস করত না কেউ। একবার তাঁর স্ত্রী কাঞ্চনমালা তাঁর ভগ্নীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। ফিরে এসেই অসুস্থ হ'য়ে পড়েন তিনি। দু'দিন পরেই মৃত্যু হয়। ডাক্তার সন্দেহ করেছিলেন কোনও সাংঘাতিক বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু হয়েছে নাকি। তিনি তাঁর ভাইপো বিরিঞ্চিলালকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। কাঞ্চনমালার খাওয়া-দাওয়ার তদারক-তদ্বিরের ভার তারই উপর ছিল। কুন্দনলাল বিয়ে করেন নি আর। চারটে দৈত্যাকৃতি দারোয়ান রেখেছিলেন আর একটা বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর। সেগুলোও যখন ছ'মাসের মধ্যে একে একে মারা গেল তখন একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কুন্দনলাল। ডাক্তার সন্দেহ করলেন এদেরও বিষ খাইয়ে মেরেছে কেউ। তিনি বললেন, আপনার বাড়িতেই, আপনার খুব কাছেই, শত্রু আছে কেউ। আপনি সাবধানে থাকুন। শুনে কুন্দনলাল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বিরিঞ্চিলালকে ডেকে বললেন—হরিচরণবাবুকে খবর দাও। তাঁর সঙ্গে একটা জরুরি কথাবার্তা আছে। হরিচরণবাবু কুন্দনলালের উকিল। বিশ মাইল দূরে থাকেন। তাঁর জন্যে হাতী পাঠালেন কুন্দনলাল। তিনি এলে বললেন—'আমি এখানে আর থাকব না। দেশভ্রমণে বেরুবো। ইয়োরোপ আমেরিকা দেখে আসবার ইচ্ছা আছে। আমার ব্যাংকে যে নগদ টাকা আছে তাতেই আমার বাকী জীবনটা চ'লে যাবে। আর এখানকার বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যাব। আপনি সেই রকম ব্যবস্থা ক'রে ফেলুন তাড়াতাড়ি।' উকিলের সঙ্গে যখন কুন্দনলালের কথা হচ্ছিল তখন পাশের ঘরে বিরিঞ্চি কপাটে কান দিয়ে শুনছিল সব। হরিচরণবাবু বললেন—আপনার বাড়িতে এতগুলো লোক মারা গেল পর পর। আপনি তো নির্বিকার হ'য়ে ব'সে রইলেন। পোস্টমর্টেম করিয়ে পুলিশ কেস করা উচিত ছিল। এখানকার দারোগা সাহেব আপনাকে খাতির করেন ব'লে কিছু করেন নি। কিন্তু আমার মনে হয় এর প্রতিকার করা উচিত ছিল। কুন্দনলাল

বললেন—ঘরের কেলেঙ্কারির কথা বাইরে চাউর ক'রে লাভ কি হ'ত? যারা মরে' গেছে তারা কি বেঁচে উঠত? প্রতিকার ভগবান করবেন যথাসময়ে। ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনি দান-পত্রের দলিলটা ঠিক ক'রে ফেলুন তাড়াতাড়ি।

হরিচরণবাবু প্রশ্ন করলেন, আপনার ভাইপো বিরিঞ্চিলালকে কিছু দেবেন না?

গুম হয়ে রইলেন কুন্দনলাল। মনে হল তাঁর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বুঝি।

তারপরে বললেন, না দেব না। কিছু দেব না। সব মিশনকেই দেব।

হরিচরণবাবু চ'লে গেলেন।

তার পরদিনই কুন্দনলালের মৃত্যু হল। খাওয়ার পরই অসহ্য পেটের ব্যথা, তারপর রক্ত বমি। ডাক্তার সন্দেহ করলেন আর্সেনিক পয়েজনিং (arsenic poisoning), কুন্দনলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শবদেহকে তাড়াতাড়ি দাহ ক'রে ফেললেন বিরিঞ্চিলাল। টাকার জোরে পুলিশ আর ডাক্তারের মুখ বন্ধ হ'ল।

বিরিঞ্চিলাল কাছারি থেকেই ফিরছিলেন। ন্যায়ত তিনিই যে বিষয়ের উত্তরাধিকারী এই ব্যাপারটা আইনত পাকা করতেই গিয়েছিলেন তিনি। হরিচরণবাবুই সব ঠিক ক'রে দিয়েছেন। তিনি বললেন—কুন্দনবাবু যখন কোথাও উইল ক'রে যাননি, তখন আইনত আপনিই তাঁর উত্তরাধিকারী। কোন গোলমাল হবে না। গোলমাল হয়ও নি। বিরিঞ্চিলাল হরিচরণকে তাঁর 'ফি' ছাড়া আরও অনেক বেশী টাকা দিতে গিয়েছিলেন। হরিচরণ সেটা নেননি। গম্ভীরভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আমি হোটেলের চাকর নই। আমাকে টিপ্‌স্‌ দিতে হবে না।

বিরিঞ্চিলাল বাগানের ভিতর কিছু দূর এসেছেন এমন সময় বৃষ্টিটা চেপে এল। ঝড়ের বেগও বাড়ল। হনহন ক'রে হাঁটতে লাগলেন বিরিঞ্চিলাল। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল হঠাৎ। প্রকাণ্ড একটা আম গাছ ডাল বাড়িয়ে পথরোধ করেছে তাঁর। যেন বিরাট একটা হাত বাড়িয়ে ঝড়ের ভাষায় বলছে—না, যেতে পাবে না। ডালটাকে এড়িয়ে এগিয়ে গেলেন তবু। মনে হল সমস্ত বাগানটাই যেন ক্ষেপে উঠেছে। কিছুদূর যেতেই বিরাট একটা কাঁঠাল গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। আর একটু হ'লে তাঁর মাথাতেই পড়ত। কোনক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে ছুটতে লাগলেন বিরিঞ্চিলাল। শন্‌ শন্‌ শন্‌ শন্‌। ঝড়টা আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তাঁর মনে হতে লাগল চীৎকার করতে করতে কারা যেন তাঁর পিছু পিছু তাড়া করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। অন্ধকারে ভালো দেখা গেল না। তবু মনে হ'ল বাগানের গাছগুলিই ছুটে আসছে তাঁর পিছু-পিছু। লিচু, লটকান, পেয়ারা, লেবু···সবাই যেন ছুটে আসছে। টলতে টলতে মাতালের মতো পাগলের মতো দৈত্যের মতো ছুটে আসছে। না, বাগানটা তাড়াতাড়ি পার হ'তেই হবে। আবার ছুটতে লাগলেন। আঙুরলতার বেড়ার মাথাটা ভেঙে পড়ল, লতাটা যেন জাপটে ধরল তাঁকে। ভাগ্যে পকেটে একটা ছুরি ছিল—বিরিঞ্চিলাল সর্বদা একটা ছুরি রাখেন সঙ্গে—সেই ছুরিটার সাহায্যে কাটতে লাগলেন লতার জাল। একটা অক্টোপাস যেন। জাল কেটে ছুটে বেরুতেই দমাস ক'রে পিঠে বেল পড়ল একটা। ভাগ্যে মাথায় পড়েনি। ছুটতে লাগলেন বিরিঞ্চিলাল। আর রাগে সর্বাঙ্গ তাঁর জ্বলতে লাগল। তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন স্টেশনে যেন হাতী বা

পালকী রাখা হয়। নায়েবটাকে কালই বরখাস্ত করবেন তিনি। স্টেশন থেকে নেমে এই পাঁচ ক্রোশ হে'টে আসা কি সোজা কথা! খবর পাঠিয়েছিলেন, তবু কোন যানবাহন আসেনি। অথচ তাঁর অভাব কিসের? হাতী আছে, ঘোড়া আছে, পালকি আছে, গরুর গাড়ি আছে। অথচ ওঁকে এই দুর্যোগে হাঁটতে হল!

বাগান পার হয়েই মস্ত মাঠ। মাঠের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেইটেরই এক প্রান্তে তাঁর বাড়ি, আর এক প্রান্তে, প্রায় মাইল খানেক দূরে, এ অঞ্চলের শ্মশান। ভূতেশ্বর শিবের বিখ্যাত শ্মশান।

মাঠে পড়েই বিরিঞ্চিলালের মনে হ'ল ঠিক পনেরো দিন আগে এই পথ দিয়েই কুন্দনলাল মহাযাত্রা করেছেন। মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে দান ক'রে পুণ্য অর্জন করবার আর অবসর পেলেন না ভদ্রলোক। একবার দাঁড়িয়ে পথটার দিকে চাইলেন। সোজা শ্মশানের দিকে চলে গেছে। চেয়েই কিন্তু ভুরু কুচকে গেল তাঁর: এই অন্ধকারে পথটা এত স্পষ্ট দেখাচ্ছে কেন! মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট শাদা সাপ এ'কেবে'কে চলে গেছে শ্মশানের দিকে! অদ্ভুত মনে হল।

বাড়িতে এসে যখন উঠলেন তখন বারান্দার ওধার থেকে গোবিন্দ হাউ-মাউ ক'রে কে'দে উঠল। গোবিন্দ তাদের পুরোনো চাকর। পক্ষাঘাত হয়েছে বলে বারান্দার এক কোণে পড়ে থাকে। পক্ষাঘাত হওয়ার পর থেকে কুন্দনলালই তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। বিরিঞ্চি এগিয়ে দেখলেন তার বুড়ী বউটা নীরবে বসে অশ্রুপাত করছে।

বিরিঞ্চি এসে রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "স্টেশনে কেউ যায়নি কেন? নায়েববাবু কোথা?"

গোবিন্দর বউ মাথা হে'ট করেই বলল,—"নায়েববাবু আর আসবে না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন।"

"ঘিস্ন কোথা? হরিয়া?"

"ওরাও চাকরি ছেড়ে চলে গেছে।"

ঘিস্ন হাতীর মাহুত আর হরিয়া ঘোড়ার সহিস।

"পালকির বেয়ারারাও আর আসবে না বলে গেছে। গোবর্ধন গোয়ালাও তাই বলে গেছে।"

"এই তিনদিন হাতী, ঘোড়া, গরু কেউ খেতে পায়নি তাহলে?"

"ওদের ছেড়ে দিয়ে গেছে। ওরা চরে খাচ্ছে—"

চীৎকার ক'রে উঠলেন বিরিঞ্চিলাল।

"তোমরা তাহলে কার পিণ্ডি চট্‌কাবার জন্যে বসে আছ এখানে?"

"আমরাও যাব। আমরাও আর এখানে থাকতে পারব না। আমার ছেলে গাঁ থেকে একটা ডুলি জোগাড় করতে গেছে।"

গোবিন্দর স্ত্রী বলল, "আপনার জন্যে দশখানা রুটি, এক কাঁসি আলুর দম আর এক বাটি ঘন ক্ষীর ক'রে রেখেছি। আপনার শোবার ঘরে সব ঢাকা দেওয়া আছে।"

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিরিঞ্চিলাল। তারপর ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। জ্বালতেই কুন্দনলালের অয়েল-পেণ্টিংটার উপর দৃষ্টি পড়ল। প্রকাণ্ড গোল মুখ। চোখ দুটো বড় বড়, মনে হচ্ছে এখনি ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বুঝি। বিরিঞ্চিলাল

আগে লক্ষ্য করেন নি, এখন করলেন কুন্দনলালের মুখভাবে একটা নির্বাক বিস্ময় মূর্ত হয়ে রয়েছে যেন। আর তার সঙ্গে চাপা একটা হাসির আভা। ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইলেন ছবিটার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর ভাবলেন, ছবিটা কাল এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তারপর ইজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়লেন। সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন কাপড়টা রক্তে ভিজে গেছে। পাঞ্জাবিও ছিঁড়ে গেছে খানিকটা। গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল বোধ হয়—। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

তারপরই বাইরে পায়ের শব্দ—কারা এসেছে? একাধিক লোকের পায়ের শব্দ, আর ফিসফিস কথা। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোও—শিউরে উঠলেন বিরিঞ্চিলাল।

তড়াক ক'রে উঠে পড়লেন। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। একদল লোক এসেছে।

"কে—"

"আমরা গোবিন্দকে নিতে এসেছি—"

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বিরিঞ্চিলাল।

বহুকালের পুরাতন ভৃত্যকে ডুলিতে চড়িয়ে নিয়ে গেল ওরা। গোবিন্দর স্ত্রীও গেল ওদের পিছু পিছু। গোবিন্দর স্ত্রী তাঁকে মানুষ করেছিল। বিরিঞ্চিলাল বলতে পারলেন না, তোমরা যেও না। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন তার টুঁটি টিপে ধরে রইল। গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। হঠাৎ সচেতন হলেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে একটা চাপা গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা সিংহ যেন গজরাচ্ছে। তারপর অনুভব করলেন খুব ক্ষিধে পেয়েছে। সেই কোন সকালে খেয়েছেন—তারপর পাঁচ ক্রোশ হাঁটতে হয়েছে।

ঘরে ঢুকে ঢাকনাটা খুলে গবগব ক'রে খেতে লাগলেন। মেঝেতে উবু হয়ে বসে খেতে লাগলেন। আসন পাতবার তর সইল না।

রাত কত হয়েছে? দেওয়ালঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ঘড়ি চলছে না। চলছে না, কিন্তু হাসছে। অদ্ভুত একটা চকচকে হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওর প্রকাণ্ড ডায়ালটা থেকে। বিরিঞ্চিলাল কুন্দনলালের ছবিটা ঢেকে দিয়েছিলেন একটা তোয়ালে দিয়ে। ওই ছবির দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। যদিও ঘরের সব কপাট জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, তবু বোধহয় ঘরে হাওয়া ঢুকছিল। দুলছিল তোয়ালেটা। বিরিঞ্চির ভয় হচ্ছিল। তোয়ালের আড়াল থেকে কুন্দনলাল উঁকি দেবেন না তো। তিনটে আলো জ্বলছিল ঘরে। একটা পেট্রোম্যাকস্ দুটো জুয়েল ল্যাম্প। তবু যেন ঘরের অন্ধকার কাটছিল না। বরং মনে হচ্ছিল ওটা ঘনতর হচ্ছে। ঘুম আসছিল না বিরিঞ্চির। টেবিলের উপর পাঁজি ছিল একটা। সেইটেই পড়ছিলেন তিনি, যদি ঘুম আসে। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—আজ শনিবার, অমাবস্যা, তারপর লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। চতুর্দিক সচকিত ক'রে একটা বাজ পড়ল। কি হচ্ছে আজ? তারপর দড়বড় দড়বড় ক'রে একটা শব্দ। কিসের শব্দ? চিঁহি চিঁহি চিঁহি—ঘোড়াগুলো ডাকছে। ওরাই ছুটোছুটি করছে বোধহয়। যেদিক থেকে শব্দটা এল সেটা মাঠের দিক। দক্ষিণ দিকের দরজাটা খুললে মাঠটা দেখা যায়। কিন্তু দরজা খুলতে সাহস হল না বিরিঞ্চিলালের। দরজা খুললে শুধু মাঠটা নয় শ্মশানের সেই পথটাও দেখা যায়।

আবার একটা বজ্রপাত হল। আবার একটা। তারপর সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ ক্যাঁক ক'রে শব্দ হল একটা। মনে হল থপথপ করে কে যেন বারান্দার উপর উঠছে। আবার ক্যাঁক ক'রে শব্দ। হাতীটা না কি! তারপরই বিরাট গর্জন। রাবণ রেগে গেলে খুব চেঁচায়। রাবণই উঠেছে বারান্দায়। ঢুঁ মারছে না কি? হ্যাঁ, খুব জোরে জোরে। তারপর বিরাট একটা ধাক্কা দিল। ভেঙে গেল কপাটটা। বিরিঞ্চি সবিস্ময়ে দেখলেন বিরাটকায় রাবণ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে আস্তে আস্তে নেমে গেল। যেন তার যা কর্তব্য তা সে করেছে এখন এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। নীচে নেমে গিয়ে সে শুঁড় দোলাতে লাগল।

বিরিঞ্চিলাল শ্মশানের সেই পথটা দেখতে পেলেন। অন্ধকারে যেন রুপোর পাতের মতো দেখাচ্ছে। তারপর দেখলেন একটা আলো আসছে। একটা মশাল। আর তার পিছনে পিছনে একটা শবাধারকে বয়ে আনছে চারজন। বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল—দ্রুততলে আবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে তারা। কাছে আসতে বিরিঞ্চিলাল চিনতে পারলেন। যাঁর হাতে মশাল তিনি কাঞ্চনমালা, আর যারা শবাধার বহন করছে তারা সেই বরকন্দাজ চারজন। পিছু পিছু অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাও আসছে। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন বিরিঞ্চিলাল। হাতার দেওয়ালটাও ভেঙে ফেলেছে রাবণ। সেই ফাঁক দিয়ে এসে পড়ল সবাই। রাবণ শুঁড়ে তুলে সেলাম করল মশালধারিণী কাঞ্চনমালাকে। ঘরের ভিতর ঢুকতেই অ্যালসেশিয়ানটা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরিঞ্চির উপর।

তোয়ালের ফাঁক থেকে কুন্দনলাল হুকুম দিলেন, ওর ঘাড়টা মটকে, মুখটা পিঠের দিকে করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বরকন্দাজ চারজন লাফিয়ে পড়ল বিরিঞ্চির উপর। নিমেষের মধ্যে হুকুম পালিত হল। তারপর তারা বিরিঞ্চিলালের শবদেহটা শবাধারে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। খুব দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারকে স্পন্দিত করে দ্রুততালে ধ্বনিত হতে লাগল বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল, বল হরি হরিবোল।

পরদিন দেখা গেল, বিরিঞ্চিলাল ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছেন। ঘরের কপাট ভাঙেনি। হাতার দেওয়ালও অক্ষত আছে।

ধূপ

কালো কষ্টিপাথরের টেবিলের উপর ছোট একটি হাতীর দাঁতের চমৎকার বুদ্ধ-মূর্তি। তার সামনে সুদৃশ্য একটি রুপোর ধূপদানী। পাশেই অধ্যাপক তমাল বসুর লেখবার টেবিল। সবুজ রেক্সিনে মোড়া। তার সামনের চেয়ারটা বোধহয় মেহগিনীর। কালো রঙ, পিঠের দিকটা খুব খাড়া উঁচু। তমাল বসু শৌখীন লোক। বিবাহ করেন নি। 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড' চাকর সুখলাল তাঁর দেখাশোনা করে। বিয়ে-করা স্ত্রীও বোধ-হয় অমন সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর সেবা করতে পারত না। বড়লোকের একমাত্র ছেলে। উত্তরাধিকার সূত্রে যে বাড়িটি পেয়েছেন, সেটি শহরের অভিজাত পল্লীতে। বাড়ির

চারিদিকে বাগান-ওলা হাতা অনেকখানি। সবুজ 'লন'টি সবুজ মখমল যেন। তমাল বসু লণ্ডনে, হারর্ভার্ডে, বের্লিনে, প্যারিসে লেখাপড়া করেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বড় ভক্ত একজন, নিজে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু তিনি নিজেকে এবং জগদীশ-চন্দ্রকে কবি মনে করেন। তাঁর ধারণা বড় বিজ্ঞানীরাই কবি আর বড় কবিরাই বিজ্ঞানী। দুজনেই সত্যসন্ধানী, যদিও দু'জনের প্রকাশভঙ্গী আলাদা। ভাস্কর এবং চিত্রকর যেমন আসলে, একজাত। সম্প্রতি তিনি নারীর মন নিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্ময়কর নিদর্শন। তিনি দেখিয়েছেন, কাঠে কাঠে ঘষলে যেমন অগ্নির উদ্ভব হয়, পরা বিদ্যুৎ অপরা বিদ্যুতের সঙ্গে মিলে যেমন আলো জ্বালে পাখা ঘোরায়, আরও অনেক কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটায়—তেমনি নারীর মনের সঙ্গে পুরুষের মনের সংঘাতেই মানবসভ্যতা বিকশিত হয়েছে। সীতা দ্রৌপদী সাবিত্রী থেকে শুরু করে তিনি বহু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে দেখিয়েছেন যে মানব সভ্যতার প্রগতিই হত না যদি এই সংঘর্ষ না হ'ত। জোয়ান অব আর্ক, এলিজাবেথ, মেরি কুইন অব স্কটস, পদ্মিনী, নুরজাহান, লুৎফুন্নিসা এবং আরও অনেক ঐতিহাসিক নারীর মনোবিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এদের মর্মন্তুদ অন্তর্দাহ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, রামমোহন রায় যদি স্বচক্ষে সতীদাহ না দেখতেন তাহলে হয়তো তিনি রামমোহন রায়ই হতেন না। নির্যাতিতা জ্বলন্ত সতীর আর্তনাদই তাঁর মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর মনুষ্যত্ব জেগেছিল বলেই বাংলা-দেশে রেনেসাঁস সম্ভব হয়েছিল। নারীদের নিয়ে আলোচনা করতে করতে তাঁর মনটাই নারী-ময় হ'য়ে গিয়েছিল। নারীদের নানা দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার আলোচনা করতে করতে তাঁর মনে কেমন যেন ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাটাই সৌভাগ্যবতী নারীদের জীবনে বিধাতার বিশেষ দান। যখনই যে যুগে নারীদের উপর নির্যাতন হয়েছে ঠিক তার পরবর্তী যুগেই বিপুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নারীদের যন্ত্রণাই যেন আলোকে রূপান্তরিত হ'য়ে উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে ইতিহাসকে। বর্তমান যুগের নারী-প্রগতির কারণ, তাঁর মনে হয় সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক নারী-নিপীড়ন। আপনাদের হয়তো কৌতূহল হচ্ছে, মনে মনে যিনি সর্বদা নারীদের কথা ভাবছেন তাঁর জীবনে কি কোনও নারী আসেনি? এসেছিল। একাধিক নারী এসেছিল। কিন্তু তাঁর অটল গাম্ভীর্য, বিশাল বিদ্যাবত্তা, তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি, তাঁর সুন্দর জীবনযাত্রার নিখুঁত ছন্দ অনেকের কাছে এমন একটা দুর্লঙ্ঘ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে, অনেকেই তাঁর খুব কাছে আসতে সাহস করেনি। তাঁর মনের দুয়ারের কাছে এসে-ছিল অনেকেই, এসে দাঁড়িয়েও ছিল কয়েক মুহূর্ত প্রতীক্ষাভরে, কিন্তু অনাহূত ভিতরে আসতে সাহস করেনি কেউ। তিনিও ডাকেন নি কাউকে। তিনি কাউকেই ডাকতে পারেন না। তাঁর কেমন যেন আত্মসম্মানে বাধে। ভাবেন—কি যে ভাবেন তাও স্পষ্ট নয় তাঁর কাছে। বেতসীকে তাঁর ভালো লেগেছিল। কিন্তু সে কথা কোনদিন বলেননি তাকে। বেতসী তাঁর সহকর্মিণী। কালো রোগা মেয়েটি। ল্যাবরেটরিতে একটা এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে তার মুখে নাইট্রিক অ্যাসিড পড়েছিল। গালের আর কপালের কিছু কিছু জায়গা পুড়ে আরও কালো কালো দাগ হয়ে গেছে। চোখ দুটো ভাগ্যে বেঁচে গিয়েছিল। ওই চোখ দুটো গেলে—একটা অদ্ভুত উপমা মনে হয়েছিল

তমাল বসুর। তিনি ভেবেছিলেন তাজমহল চুরমার হ'য়ে গেলে হয়তো ওই রকমই শোচনীয় ক্ষতি হত একটা। বেতসীর চোখ দুটি সত্যিই সুন্দর। শুধু স্বপ্নময় নয়, বুদ্ধিদীপ্ত। ওর চোখের দৃষ্টিতে নানা অনুভূতির আভাস পেতেন তমাল বসু। একদিন হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিলেন বেতসী তাঁর দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। চোখে বাঘিনীর দৃষ্টি। তাঁর খারাপ লাগত বেতসী একটা ছোঁড়া ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেণ্টের সঙ্গে মাখামাখি করত ব'লে। আই এস সি পাশ ছোঁড়াটা, দেখতে কিন্তু কন্দর্প-কান্তি। মূর্তিমান রাঙামূলো। কলেজের ছেলেরা নাম দিয়েছিল 'রেড র‍্যাডিশ'। বেতসী বিদুষী মেয়ে, বিলেতের ডিগ্রী আছে। সে ওই কুণালটার সঙ্গে ওভাবে মেশে কেন। একদিন হেসে এমনভাবে ওর দিকে ঢ'লে পড়েছিল যে খুব খারাপ লেগেছিল তমাল বসুর। কিন্তু কিছু বলেননি। বলবার কি অধিকার আছে তাঁর। বেতসী তাঁর সঙ্গেও ঈষৎ ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছে মাঝে মাঝে। একদিন বলেছিল—"আপনি নারীদের নিয়ে এত ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন, অথচ আপনার জীবনে কোনও নারী নেই, এ কথা ভাবলে অবাক লাগে। কোথাও অভাব অনুভব করেন না আপনি ?" বেশ সপ্রতিভভাবে হেসেই জিগ্যেস করেছিল। তমাল বসু উত্তর দিয়েছিলেন—"অভাব মনে করলেই অভাব। হেমিংওয়ে তাঁর বিখ্যাত একটা গল্পে লিখেছেন—মেয়েদের কথা না ভাবলে মেয়েদের অভাব কেউ অনুভব করে না। মেয়েদের কথা ভেবে ভেবেই আমরা মেয়েদের সম্বন্ধে সচেতন হই। ও বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকলেই মন ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।" "তাই নাকি"—হাসি ভরা বিদ্যুৎ-চমকিত দৃষ্টি তুলে বেতসী ব্যঙ্গ ভ'রে চেয়েছিল তাঁর দিকে ক্ষণকাল। সে দৃষ্টির অন্তরালেও বাঘিনীর দৃষ্টি দেখেছিলেন তমাল বসু। অস্বস্তি বোধ করেছিলেন একটু। আর একদিন বেতসী বলেছিল—"আচ্ছা ডক্টর বসু, আপনার কি এটা মনে হয় না নারী-সঙ্গ-বর্জিত মানুষ অস্বাভাবিক মানুষ। তার মনের পরিণতি হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যায় ?" এর উত্তরে তমাল বলেছিলেন, "একটা কথা ভুলে যাবেন না মিস মিত্র, সভ্য মানুষ সত্যিই অস্বাভাবিক জীব। আপনি যদি স্বাভাবিক হতেন তাহলে এতদিন একটা পুরুষ জুটিয়ে সাত ছেলের মা হয়ে ঘরে সংসার করতেন। কেমিস্ট্রি পড়বার জন্যে বিলেত ছুটতেন না, কিংবা বিলেত থেকে ফিরে চাকরি করতেন না। আমরা সবাই অস্বাভাবিক। আগে পুরুষ মাত্রেই একপাল মেয়ে নিয়ে ঘুরত বনে জঙ্গলে, এখন তারা ভদ্র হ'য়ে একটা নারীতেই অভ্যস্ত হয়েছে, কিংবা অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করছে, যদিও সে চেষ্টাটা অস্বাভাবিক চেষ্টা। নারী-হীন জীবন যাপন করছে এ রকম পুরুষের খবরও কম নেই। বিবেকানন্দকেই ধরুন। আপনি অস্বাভাবিক বলতে পারেন, কিন্তু ওই অস্বাভাবিকতার পথেই আমাদের প্রগতি হয়েছে।" মিস মিত্র আবার উত্তর দিয়েছিলেন—"তাই নাকি", ঠিক সেই রকম মোহময় দৃষ্টি তুলে। তমাল বসু কেমন যেন ভয় পেয়ে যেতেন। অথচ আবার একটু যেন আকৃষ্টও হতেন। তাঁর অন্তরের অন্তরতম নিভৃত প্রদেশে কে যেন লোলুপ হ'য়ে উঠত ওই কালো সুঁটকো মুখপোড়া মেয়েটার জন্য, যার চোখের দীপ্তি হীরকের দ্যুতির মতো প্রখর বুদ্ধির জ্যোতিতে ঝলমল করে। বেতসী এ সব প্রসঙ্গ তুলে নিগূঢ় ভাবে কি ইঙ্গিত দিতে চায় তা যে তমাল বসু বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু লাজুক আত্মসম্মানী মানুষ তিনি বুঝেও না বুঝবার ভান করেন। আর একদিন বেতসী মিত্র হেসে বলেছিল—সেইরকম অবর্ণনীয় হাসি হেসে—"আচ্ছা

ডক্টর বোস, আপনি নারীদের দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সত্যি ক'রে বলুন তো নারীদের দুঃখ বোঝেন আপনি ? একটি নারীর সঙ্গেও তো ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ বা দুর্যোগ হয়নি আপনার। ইতিহাসের শুকনো পাতা থেকে জোয়ান অব আর্ক, রিজিয়া, যশোধরা, পদ্মিনীদের যে কাহিনী আপনি সংগ্রহ করছেন তাতে জীবন্ত বেদনার কোনও স্পন্দন আছে কি ? বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক কুন্দনন্দিনী বা আয়েষার গভীর বেদনা যে রঙে এঁকেছেন আপনার ওই সত্য ঐতিহাসিক চরিত্র-গুলোতে সে রঙ ফোটেনি। এর কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, রক্তমাংসের নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীসে' নাটাশা কাল্পনিক হয়েও সত্য, কারণ টলস্টয় নাটাশাকে সত্যি দেখেছিলেন, মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু আপনার প্রবন্ধের চরিত্রগুলো মানবী নয়, সংবাদ মাত্র। আপনি নারীর বেদনা অনুভব করেন নি।" তমাল বসু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন একথা শুনে। বলেছিলেন—"আমি তো, ওই প্রবন্ধগুলোতে সংবাদই সরবরাহ করতে চেয়েছি খালি। কাব্য করতে তো চাইনি। সে ক্ষমতাও বোধহয় আমার নেই!" বেতসী ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে হেসে বলেছিল, "ডক্টর বসু, পুরুষের হৃদয়ে ক্ষমতার উৎস আবিষ্কার করে মেয়েরা। তাদের হাতেই বিধাতা সে রহস্যালোকের চাবিকাঠিটি দিয়েছেন।"

এর পরও তমাল বসু অগ্রসর হ'তে পারেননি। মনে মনে ক্রমাগত ইতস্তত করেছেন। ঠিক কিভাবে কি ভাষায় প্রস্তাবটা করা যায় তা ভেবেই পাননি তিনি।

রোজ যেমন করেন সেদিনও লিখতে বসবার আগে প্রথমেই তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে ধূপ জ্বালিয়ে দিলেন একটি। তারপর একটা দামী এসেন্স স্প্রে ক'রে দিলেন টেবিলের চারদিকে। সুখলাল এসে তাঁর পা থেকে চামড়ার জুতোটা খুলে নিয়ে মখ-মলের ঢিলে চটি পরিয়ে দিয়ে গেল। সেদিন তিনি অগ্নিযুগের কয়েকটি নারীকে নিয়ে লিখবেন ভাবছিলেন। বীণা দাস, প্রীতি ওয়াদ্দেদার এবং আরও কয়েকটি মেয়ের বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন কিভাবে সাজাবেন প্রবন্ধটাকে। চোখ বুজেই বসেছিলেন খানিকক্ষণ। এসেন্স আর ধূপের গন্ধে একটা আবেশময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ম সুর বেজে উঠল। তমাল বসু বুঝলেন, ঘরে যে উচ্চিংড়াটা থাকে সে তার সঙ্গীকে ডাকছে। রোজই ডাকে। তীক্ষ্ন তীব্র আকুল সুর। মনে হল সন্ধ্যার অন্ধকার যেন চিরে যাচ্ছে। চোখ বুজেই বসেছিলেন তিনি। তাঁর মুদিত চোখের সামনে বেতসী মিত্রের মুখটাও ভেসে উঠল একবার। জ্বলজ্বল করছে চোখের দৃষ্টি। ও রকম প্রতিভাময়ী মেয়েকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে পেলে…কিন্তু কি ভাষায় করবেন প্রস্তাবটা, করলে কি ভাবে নেবে সে…।

"ডক্টর বসু—" তমাল বসু চোখ খুলে চাইলেন।

সামনের চেয়ারটায় বেতসী ব'সে আছে। বারান্দায় দরজা খোলা ছিল, কখন সে ঢুকেছে টের পাননি। বেতসীর চেহারাটা দেখে চমকে উঠলেন তমাল বসু। মুষড়ে পড়েছে যেন। চোখের জ্যোতি নিবে গেছে। কালো রোগা মুখটা আরও কালো, আরও রোগা হয়ে গেছে। মানুষ নয়, যেন একটা প্রেতিনী। বেতসী হেসে বললে- "একটা

কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনি ধূপ জ্বালান কেন? আপনি জগদীশ বসুর ভক্ত, আপনার কি কখনও মনে হয়নি যে ওই ধূপটাই জোয়ান অব আর্ক-এর প্রতীক। ও পুড়ছে আর আপনারা গন্ধ উপভোগ করছেন! আপনি এখন লিখতে বসবেন বুঝি? আমি যাই তাহলে, এই চিঠিটা এখানে রেখে গেলাম, সময়মতো খুলে দেখবেন—”

একটা খাম সামনের তেপায়ার উপর রেখে বেতসী বেরিয়ে গেল। তমাল বসুর মনে হ'ল আর দেরি করা উচিত নয়, এখনি ব'লে ফেলি। তবু ইতস্তত করলেন একটু। তারপর উঠে বারান্দায় বেরিয়ে ডাকলেন—“মিস মিত্র—শুনছেন—মিস মিত্র—”

কোনও সাড়া এল না।

ঘরে ঢুকে খামটা খুলে দেখলেন। নিমন্ত্রণ পত্র। আগামীকাল কুণাল ঘোষকে বিয়ে করবে বেতসী মিত্র। কুণাল ঘোষকে!

টেবিলের দিকে চেয়ে দেখলেন—ধূপকাঠিটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মানসী

॥ ১ ॥

সেদিন তার অপেক্ষায় বসে ছিলাম আমার দ্বিতলের নির্জন ঘরে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক ফালি মেঘও স্থির হয়ে যেন কার অপেক্ষা করছে। ঘরের কোণে ফুলদানীতেও অপেক্ষা করছিলো এক গোছা রাঙা গোলাপ। মানসী গোলাপ ভালবাসে। আমি দরিদ্র, তবু ওর জন্যে গোলাপ কিনে এনেছি। আমি জানি ওকে যদি পাই……না, এ অসম্ভব অবিশ্বাস্য স্বপ্ন যে সফল হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।

তবু তারি জন্যে অপেক্ষা করছি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। খট্ খট্ আওয়াজটা যেন আমার সমস্ত আশার উপর দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আসছে মনে হল। ও রকম শব্দ করে মানসী আসে না। তার আসাটা আবির্ভাবের মতো। সহসা সে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় নিঃশব্দে।

জুলফি আর গোঁফ-ওলা লোকটা এল একটু পরে।

“দিদিমণি আসতে পারবেন না। এই চিঠি দিয়েছেন।” একটা খামের চিঠি দিয়ে চলে গেল সে। উত্তরের জন্য দাঁড়াল না। চিঠিটা পড়ে দেখলাম উত্তর দেবার কিছু নেই।

মানসী লিখেছে—ক্ষমা কোরো। কথা দিয়েও যেতে পারলাম না। হঠাৎ মনে হল বিয়ে একটা সামাজিক ব্যাপার। সমাজকে পরিবারকে অগ্রাহ্য ক'রে মা বাবার মনে কষ্ট দিয়ে যদি বিয়ে করি সে বিয়ে সুখের হবে না। বিয়ে না করলেও প্রেম অম্লান থাকবে এ বিশ্বাস আছে বলেই তোমার জীবন থেকে আমার সামাজিক সত্তাটাকে সরিয়ে নিলাম।

একটা লটারির টিকিট কিনেছিলাম। এই সঙ্গে পাঠালাম সেটা। আজ খবর বেরিয়েছে তুমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছ। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা পাবে। হয়তো কোনদিন আবার দেখা হবে, কিম্বা হয়তো হবে না। রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

মানসী এল না।

॥ ২ ॥

দশ বছর পরে।

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এখন বহু লক্ষে পরিণত হয়েছে। শহরের অভিজাত পল্লীতে প্রকাণ্ড বাড়িতে বাস করি এখন। চারখানা মোটর। দুটো আপিস। অনেক চাকর। বাড়িতে প্রতি তলায় ফোন। সেদিন আমার স্ত্রীর আত্মীয় একজন দালালের সঙ্গে জরুরি ব্যবসায় সংক্রান্ত কথাবার্তা হচ্ছিল। ব্যবসাটাতে কয়েক লাখ টাকা লাভ হবার সম্ভাবনা। আমার স্ত্রীও সামনে বসে চা খাওয়াচ্ছিলেন তাঁর আত্মীয়কে।

ফোন বেজে উঠল।

নীচের তলা থেকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস্টার চক্রবর্তী বললেন—"মানসী দেবী নামে একটি বিধবা মহিলা তিনটি ছোট ছোট ছেলে নিয়ে এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

বললাম, "ব্যস্ত আছি, দেখা হবে না এখন।"

দালালের সঙ্গে কথা চলতে লাগল। তারপর হঠাৎ কে যেন একটা চাবুক মারল আমার পিঠে। কথা অসমাপ্ত রেখে তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম নীচে।

দেখলাম মানসী নেই, চলে গেছে।

গল্পের জনক

শেষ পর্যন্ত পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। দেখিলাম ঘরে বসিয়া অ্যাস্‌বেস্‌টাসের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিলে গল্পের প্লট মিলিবে না। পথে যদি কিছু পাওয়া যায়।

প্রখর দ্বিপ্রহর। রাস্তায় জন-মানব নাই। মজুমদার মহাশয়ের বাগানে কয়েকটি হনুমান পেয়ারা গাছগুলি ধর্ষণ করিতেছে। রাগ হইল না। আজকাল ধর্ষণ দেখিলে আর রাগ হয় না। তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য মহাবীরেরাই আজকাল প্রকাশ্য দিবালোকে বহু ফলবান বৃক্ষ ধর্ষণ করিতেছেন, আমরা তাহাদের লইয়া লেখালেখি করিতেছি, কিন্তু তাহাদের তাড়াইয়া দিবার উৎসাহ আমাদের জাগিতেছে না। ধর্ষণটা আজকাল স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং ওই হনুমানদের লইয়া কিছু লিখিতে প্রবৃত্তি হইল না। কিছুদূর আগাইয়া গেলাম। বাগানের গেটের কাছে ধনুসার সহিত দেখা হইয়া গেল। দেখা হইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া ঝুঁকিয়া প্রণাম করিল আমাকে।

"বাবু, এই দুপুরে বেরিয়েছেন যে। কিছু কাজ আছে নাকি"—

ধনুসা দেখা হইলেই আমার সহিত সম্ভ্রমাত্মক ব্যবহার করে। কিছুকাল পূর্বে তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য কিছু টাকা সে 'ধার' বলিয়া আমার কাছে লইয়াছিল। আর শোধ দেয় নাই। আমিও আর তাগাদা দিই নাই তাহাকে।

ধনুসা হাত-জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভাবটা যদি কিছু কাজ থাকে সে করিয়া দিতে প্রস্তুত। বলিলাম, "আমি যা খুঁজতে বেরিয়েছি তা তুই এনে দিতে পারবি না।"

"ঠিক পারব হুজুর। বলুন না কি চাই"—

"গল্পের প্লট। গল্প লিখে পাঠাতে হবে একটা।"

"গল্প ? দুবেজির ধরমশালায় যা হয়েছিল সেইটেই লিখে পাঠিয়ে দিন না।"

ধনুসা এখন দুবেজির ধর্মশালার একজন রক্ষক।

"তুই এই দুপুরে এখানে কেন ?"

ধনুসা কুণ্ঠিত মুখে ঘাড় ফিরাইল, কিছু বলিল না। মনে হইল কোন গোপন ব্যাপার।

"ধরমশালায় কি হয়েছিল তাতো জানি না"—

"সরস্বতী দেবী এসেছিলেন। অনেক লেখক-লেখিকাকে নানারকম পুরস্কার মেডেল এইসব দিয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম হুজুরকেও বোধ হয় সেখানে দেখতে পাবো। হুজুর কি খবর পাননি ?"

"না"—

"চারদিকে তো ঢ্যাটরা দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল খবরটা। আপনি দেখেন নি ?"

"কই না তো"—

"খুব ধুমধাম হয়েছিল দুবেজির ধরমশালাতে।"

"কি রকম ?"

"চলুন তাহলে ওই বাঁধানো বটগাছতলায় বসি। ছায়া আছে ওখানে"—

কাছেই বিশাল একটি বটবৃক্ষ ছিল। তাহারই ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিলাম।

ধনুসা শুরু করিল। ধনুসা যাহা বলিল, তাহার বিশুদ্ধ রূপ এই।

"সরস্বতী দেবী এসেছিলেন দুবেজির ধরমশালায়। সে কি কাণ্ড হুজুর! জমজমাট কাণ্ড একেবারে। দারোয়ান, প্রাইভেট সেক্রেটারি, জেনারেল সেক্রেটারি, দর্শক, পরিদর্শক, লেখক-লেখিকার দল। মোটর, মোটর সাইকেল, রিক্সা—পুলিশ। লোক থই থই করছে চতুর্দিকে। চারটে পাকা-দাড়ি বুড়ো কেবল আলাদা হ'য়ে দেওয়ালের ধারে বসেছিল, ঠেলাঠেলির মধ্যে ঢোকেনি তারা। মুচকি মুচকি হাসছিল কেবল। লেখক-লেখিকার দল গাদাগাদি করে, উঠনে টিনের চেয়ারে বসেছিল কড়া রোদে। মাথার উপর সামিয়ানা একটা ছিল বটে, কিন্তু তাতে রোদটোদ আটকাচ্ছিল না। ওঁরা বসে ঘামছিলেন আর দোতলার সিঁড়ির দিকে সাগ্রহে ভুরু কুঁচকে চেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে চোং প্যান্ট আর রিমলেশ চশমা পরা গোঁফ-দাড়ি-কামানো এক ছোকরা এসে নাম ডাকতে লাগলেন। প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকারা নাম ডাকার সঙ্গে একে একে উঠে চলে গেলেন দোতলায়। তারপর কেউ গলায় মেডেল ঝুলিয়ে, কেউ হাতে চেক নিয়ে, কেউবা সার্টিফিকেট নিয়ে নেমে এলেন একে একে"—

"লেখক-লেখিকাদের নাম তোমার মনে আছে ?"

"হ্যাঁ আছে বই কি। চন্দ্রশেখর পুরকায়স্থ, গোবিন্দ খাঁ, রঘুপতি ঘোষ, নীলিমা বসাক, চন্দ্রাবতী দোকানিয়া, সুরেশ্বর চোবে, রামদীন নস্কর। এঁরা নাকি বাংলা-সাহিত্যের বড় বড় লেখক-লেখিকা। কেউ কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ সমালোচক, কেউ গল্পলেখক। মাঝে মাঝে বন্দুক দাগা হচ্ছিল। 'জয় জয় সরস্বতী দেবীর জয়' শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছিল চারদিক। সে এক জমজমাট কাণ্ড। লেখক-লেখিকারা তারপর চলে গেলেন। ভীড়ও কমে গেল। সরস্বতী দেবী তারপর নেমে এলেন। পায়ে চমৎকার এক জোড়া মখমলের জুতো। পরনে সালোয়ার আর দোপাট্টা। মাথার চুল বব করা। নেমে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর তাঁর বড় ক্রাইসলার গাড়িটা এগিয়ে এল। তিনিও চলে গেলেন। বুড়ো চারটে কিন্তু বসে রইল আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। আমি গিয়ে জিগ্যেস করলাম, "কে আপনারা ?"

একজন বললেন—"ইনি বাল্মিকী, ইনি ব্যাস, ইনি কালিদাস—"

"আর আপনি ?"

তিনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

কালিদাস বললেন—"ইনি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ।"

জিগ্যেস করলাম—"আপনারা কেন এসেছিলেন এখানে ?"

"মজা দেখতে। এইবার চলি—"

দুটো রিক্সা ডেকে চারজন গাদাগাদি ক'রে বসলেন। তারপর চলে গেলেন!"

এই অত্যাশ্চর্য গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

"সত্যি সরস্বতী দেবী এসেছিলেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তেল-ওলা ধনকুবেরের একমাত্র কন্যা সরস্বতী দেবী স্বয়ং এসেছিলেন। সাহিত্যিকদের উৎসাহ দেওয়াই নাকি তাঁর 'হবি'!"

"তুই স্বচক্ষে দেখেছিলি ?"

"স্বচক্ষেই দেখেছিলাম। কিন্তু গল্পটা বানিয়ে ছিলেন অন্য লোক—"

"অন্য লোক!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি।"

কোমরে-গোঁজা গাঁজার কলিকাটা বাহির করিয়া সে দেখাইল। ধনুসার ভালো নাম ধনেশ্বর সেন। ভাল বংশের ভাল ছেলে। এক কালে সাহিত্য-চর্চা করিত। এখন কুসঙ্গে পড়িয়া গাঁজা ধরিয়াছে। বাড়িতে থাকে না, যেখানে যখন খুশি বেড়াইয়া বেড়ায়। আমার কাছেও কিছুদিন চাকর ছিল। তাই আমাকে 'হুজুর' বলে। ছোকরা বেশ বিনয়ী।

রাগিণী

শহরের বাইরে একা একটি ঘরে থাকি। শহরের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে যে পথটি গঙ্গার ঘাটে চলে গেছে সেই পথের শেষ বাড়িটি আমার বাসা। কিন্তু এখানেও আর থাকতে পারব না। তিনমাস ভাড়া দিতে পারিনি। বাড়িওলা নোটিশ দিয়েছে। কি দুর্দশার

জীবন আমার। ছেলেবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছি। মামার বাড়িতে মানুষ। তাঁরাই কিছুদূর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর মামা একদিন বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছ কি অবস্থা। আমার একার রোজগারে আর সংসার চালাতে পাচ্ছি না। তোমাকে আর বেশী দূর পড়াবার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি দিনরাত বসে বেহালা সাধছ, ওসব ছেড়ে একটা চাকরির চেষ্টা কর। বেহালাটি বাবার। উত্তরাধিকারসূত্রে ওই একটি জিনিসই পেয়েছিলাম আমি। বাবা বড় বেহালা-বাদক ছিলেন। এক যাত্রার দলে চাকরি করতেন। তাঁর বেহালার অমর্যাদা আমি করিনি। এই শহরের করিম ওস্তাদের কাছে গিয়ে তার অনেক খোশামোদ ক'রে বেহালাটা বাজাতে শিখেছি। রোজ বাজাই। ওস্তাদ বলেছে রোজ অন্তত একঘণ্টা ক'রে বাজাতে হবে। ওই বেহালা বাজানোর জন্যেই আমার পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি। কোনো ক্রমে পাশ ক'রে গেছি। মামার কথা শুনে চুপ ক'রে রইলাম। তারপর বললাম, আচ্ছা। বেহালার বাক্সটি হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মামার কাছে আর ফিরিনি, কারণ চাকরি জোগাড় করতে পারিনি।

আমার এক সহপাঠি ধীরেন। বড়লোকের ছেলে।

তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার ক'রে শহরের প্রান্তে এই খোলার বাড়িটা ভাড়া করেছিলাম। ছাতু আর মুড়ি খেয়ে সমস্ত দিন চাকরির চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চাকরি পেয়েছিলাম একটা। আপিসে দারোয়ানের চাকরি। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু যেদিন পেলাম সেই দিনই চাকরিটি হারালাম। আপিসের বড় সাহেব (নাম সাহেব, আসলে বঙ্গসন্তান) আমাকে যখন একটা কাজের জন্য তলব করলেন তখন না কি আমি গুন গুন ক'রে গান গাইছিলাম। হয়তো গাইছিলাম। সুরই আমার সমস্ত চেতনাকে ওত-প্রোত করে থাকে। নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো কোনও সুর ভাঁজছিলাম। বড়সাহেব তখনি বিদায় ক'রে দিলেন আমাকে।

তারপর থেকে আবার চাকরি খুঁজছি। মাড়োয়ারির দোকানে, মাদ্রাজির দোকানে, সিন্ধির দোকানে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা আপিসে সর্বত্র খুঁজছি। ক্রমাগত খুঁজে যাচ্ছি। অবাঙালির আপিসে বাঙালির স্থান নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরপেক্ষ সর্বভারতীয় মনোবৃত্তির মানদণ্ডে বার বার ছোট হয়ে যাচ্ছি।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের মিছিলের ভিড়ে যোগ দিইনি। জানি ওদের মানদণ্ডেও আমি নগণ্য বিবেচিত হব। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। ধীরেনের টাকাও শোধ দিতে পারিনি। সমস্ত দিন খাইনি কোন কিছু।

হু হু ক'রে একটা হাওয়া উঠেছে গঙ্গার বুকে। আমার বাড়ির সামনের নিমগাছটা ডালপালা আন্দোলিত ক'রে যেন আমার মনের গোপন অভিপ্রায়টার সঙ্গে সায় দিয়ে বলছে—সেই ভালো, সেই ভালো, গঙ্গার বুকেই সব জ্বালা জুড়োবে।

ঠিক করলাম মরবার আগেই বেহালাটা বাজাব একবার। শেষবারের মতো।

চোখ বুজে বেহাগ বাজাচ্ছিলাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারের বুকে প্রসারিত ক'রে দিচ্ছিলাম আমার সারাজীবনের হতাশা আর ব্যর্থতা ভাষাহীন সুরে সুরে। বেহালাটা উঠে যেন কাঁদছিল। ঘরের কপাট খোলা ছিল। নেড়ির জন্যে খুলে রেখেছিলাম। নিয়ে একটা রাস্তার কুকুর। সে রোজ এসে শোয় আমার ঘরের কোণটিতে। ও-ই

আমার একমাত্র সঙ্গিনী। অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এবার বাচ্ছা দেবে। তারই জন্যে কপাটটা খোলা থাকে।

কপাটের কাছে কার যেন পায়ের শব্দ হল। নেড়ী নিঃশব্দে আসে। চোখ খুলে দেখলাম দ্বারপ্রান্তে এক ফালি জ্যোৎস্না পড়েছে, আর সেই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আছে কে যেন।

"কে?"

"আমি রাগিনী। তুমি এমন করুণ সুরে বেহাগ বাজাচ্ছ যে আমি আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। তোমার মতো শিল্পী এমন ভাঙা ঘরে আছ?"

"আর থাকব না। আজই আমার জীবনের শেষ দিন। দুঃখের বোঝা আর টানতে পাচ্ছি না।"

"শেষ দিন? কেন!"

সব কথা বললাম তাকে খুলে।

"এস আমার সঙ্গে—"

"কোথায়?"

"এস না। বেহালাটা নিয়ে এস।"

ঘাটের কাছেই একটা প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা ছিল। দুকূলপ্লাবিনী গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোৎস্নার প্রলাপ। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাগিণীকে অনুসরণ ক'রে বজরায় উঠলাম। বজরায় আলো জ্বলছিল। দেখলাম রাগিনী অপূর্ব সুন্দরী। সামনে একটি মখমলের আসন দেখিয়ে বলল—"ওইখানে বসে বাজাও তুমি। আমি গাইব তোমার সঙ্গে।" আর একটি মখমলের আসনে বসল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে সুরলোক সৃষ্টি হল তার বর্ণনা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। মনে হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য সব হারিয়ে ফেলেছি যেন। নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়ে যাচ্ছি কেবল—!

তারপর আমার সুখের দিন এল। শ্রদ্ধাভরে আমার সমস্ত অভাব মোচন করল রাগিণী। সে গাইত, আমি বাজাতাম। সুখ কিন্তু নিখুঁত হয় না। আমার সুখেও কিঞ্চিৎ খুঁত ছিল। ভগবান জানেন তার সঙ্গে আমার কেবল সুরের সম্পর্ক ছিল। হয়তো একটু মোহেরও। লোকে কিন্তু বলত আমি রাগিণী বাঈজীর ভেড়ুয়া। আর একটা নোংরা কথাও বলত তা আমি লিখতে পারব না।

যাদুঘর

খোকনের বয়স বছর পনেরো। ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছে। আলাদা বাইরের ঘরে শোয় সে। সেইটে তার পড়ার ঘর শোবার ঘর দুই-ই।

বাইরের বারান্দায় পুরোনো চাকর বিশু শোয়।

বাইরের ঘরের পাশে আর একটি ছোট ঘর আছে, রাস্তার দিকে। সেটির দেওয়াল পাকা, কিন্তু ছাদ টালির। তাতে কেউ শোয় না। বাড়ির পুরোনো ভাঙা জিনিসপত্রে

সে ঘরটি ভরতি। অনেক রকম জিনিস আছে তাতে। খোকন এ ঘরটির নাম দিয়েছে যাদুঘর।

কত কি যে আছে ও ঘরে। সমুদ্রের ফেনা, জন্তু শিলা, ভাঙা শিল-নোড়া, কত কি। অদ্ভুত চেহারা বেঁটে মোটা একটা কালো লাঠি আছে, তার মধ্যে নাকি তলোয়ার থাকত এককালে। ওর নাম লাঠি নয়, গুপ্তি। ঠাকুরদা নাকি ব্যবহার করতেন।

বাবারও যৌবনকালের অনেক স্মৃতি আছে ওখানে। বাবা যৌবনে নাকি অম্বুরী তামাক খেতেন। এখন তামাক খান না, চুরুট খান। পুরোনো ভাঙা গড়গড়াটি কিন্তু এখনও আছে ওখানে।

বাবা যৌবনে মাছ ধরতে যেতেন। একবার একটা ভয়ানক কুমিরের পাল্লায় পড়েছিলেন। মা খুব নাকি কান্নাকাটি করেন। মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর মাছ ধরতে যাবেন না। মায়ের সামনে ছিপটি দু' আধখানা ক'রে ভেঙে ফেলেন। সেই ভাঙা ছিপটি আর মাছ ধরার 'হুইল'টি ওই ঘরের এক কোণে আছে এখনও।

আরও আছে নানারকম জিনিস। একটা কালো পাথরের ভাঙা থালার টুকরো আছে। ওই পাথরের থালায় ঠাকুমা নাকি আমসত্ত্ব দিতেন।

জং-ধরা অদ্ভুত ধরনের চালুনিও আছে একটা। তা দিয়ে ঠাকুমা নাকি তালের মাড়ি বার করতেন। ঠাকুমারই এ সব শখ ছিল। নারকেলের গঙ্গাজলী করতেন, 'চিরা-জিরা' করতেন, মুলোর অম্বল রাঁধতেন পায়েসের মতো করে। কাঁথার ওপর কলকা দিয়ে কাজ করতেন। তিতার ডাল রাঁধতেন।

পূর্ববঙ্গের মেয়ে ছিলেন তিনি। পদ্মা মেঘনার ওপারে তাঁর বাপের বাড়ি ছিল। ময়ূরমুখো নৌকো চড়ে বাপের বাড়ি যেতেন। তিনদিন নাকি নৌকোয় থাকতে হত।

বাবার কাছে এসব গল্প শুনেছে খোকন। খোকন ঠাকুমাকে দেখেনি। তাঁর ফোটো দেখেছে। বেশ মোটা-সোটা কালো কোলো ছিলেন। মাথায় ঘোমটা। মুখে লাজুক হাসি।

মায়েরও নানারকম শখ আছে। আর সে সবের চিহ্নও আছে ওই যাদুঘরে। মায়ের শখ একেলে শখ। কেক, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি, পুডিং বানাতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

যাদুঘরে একটা বিলিতি "বেকিং ওভেন" পড়ে আছে এখনও। তার চারদিকে মাকড়শারা অদ্ভুত জালের দুর্গ বানিয়েছে একটা। আর এক কোণে জমা করা আছে ভাঙা ভাঙা কেকের ছাঁচ, আর সন্দেশের ছাঁচ।

মায়ের ওসব করবার শখ মিটে গেছে। বলেন, ভালো ময়দা, মাখন, দুধ কিছু পাওয়া যায় না, তাছাড়া তোমরা খেতেও চাও না। কত আর বিলিয়ে দেব।

মা আজকাল উল-বোনা নিয়ে মত্ত। নানা প্যাটার্নের আর নানা রঙের স্লিপ-ওভার, কার্ডিগান আর সোয়েটার বুনে চলেছেন। বোনবার দু'চারটে ভাঙা কাঁটাও যাদুঘরে আশ্রয় পেয়েছে একটা নড়বড়ে শেলফের ওপর।

কিছুদিন আগে মায়ের কার্পেটের আসন বোনার শখ হয়েছিল। সে শখও মিটে গেছে। ভাঙা ফ্রেমটা যাদুঘরে পড়ে আছে।

এ ছাড়া আছে কয়েকটা ভাঙা বালতি আর ড্রাম। আর সে সবের ভেতর কত কি যে পোরা আছে তার ইয়ত্তা নেই। পুরোনো পেরেক, ইস্কুপ, ছুরির বাঁট, সেকেলে ক্ষুর,

আসল চিনেমাটির ফাটা নীল রঙের কেতলি, কয়েকটা ভাঙা রবার স্ট্যাম্প, আতরের শিশি, আরও কত কি। শক্ত লোহার জাল দিয়ে মোড়া একটা মোটা কাচের মজবুত শিশিও আছে একটা বালতির মধ্যে, তার মাথায় শিরস্ত্রাণের মতো নিকেলের একটা টুপি। ওটা দিয়ে সোডাওয়াটার তৈরী হত নাকি এককালে।

তাছাড়া বড় বড় দুটো দেওয়াল-ঘড়ি আছে ও ঘরে। একটা ঘড়িতে একটি মাত্র কাঁটা। কাচ নেই। আর একটা ঘড়িতে দুটো কাঁটাই আছে, কাচও অক্ষত। তার পেণ্ডুলাম বক্সে ঘড়ির চাবিটাও আছে। ঘড়ি কিন্তু চলে না। সাহেব বাড়ি থেকে নাকি ফেরত দিয়ে বলেছে এ ঘড়ি সারাতে দেড়শ' টাকা লাগবে। না সারিয়ে নতুন একটা কেনাই ভালো।

খোকন একদিন রবিবার দুপুরে ঘড়িটাকে খুলে একটু নাড়াচাড়া করতে গিয়েছিল। দম দিতেই কর্ র্ র্ ক'রে একটা শব্দ হল, তারপর ঢং ঢং ঢং ক'রে বেজে উঠল। যেন ধমক দিয়ে উঠল খোকনকে। ভাবটা যেন—কেন বিরক্ত করছ আমাকে। তারপর থেকে খোকন ও ঘড়িতে আর হাত দেয়নি।

বালতির ভেতর থেকে কয়েকটা জিনিস কিন্তু সংগ্রহ করেছে সে। একটা তেকোণা জেট-কলের টুকরো, ছোট্ট আতরের শিশি একটা, একটা চমৎকার দোয়াত। ঢাকনিটা যদিও নেই কিন্তু চমৎকার সবুজ রঙের কট্‌গ্লাসের তৈরী।

এক কোণে দুটো তোরঙ্গ আছে। নানারকম বইয়ে ঠাসা। সেকালের বই। খোকন একটারও নাম শোনেনি। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, হরিদাসের গুপ্তকথা, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, কালাচাঁদ, নীলবসনা সুন্দরী প্রভৃতি। খোকন দু'একটা নিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, ভালো লাগেনি। ওসবের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ঢের ভালো লাগে তার। বই ছাড়া মাসিক পত্রও আছে নানারকম। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, সুপ্রভাত, মালঞ্চ—এগুলোও উলটেপালটে দেখেছিল খোকন। ভালো লাগেনি। শক্ত শক্ত প্রবন্ধ কেবল।

এসব ছাড়াও আরও আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস আছে যাদুঘরে। একটা নল-ওলা সবুজ রঙের কুঁজো আছে একটা তাকের ওপর। নলটি যদিও ভেঙে গেছে কিন্তু গায়ে কি চমৎকার কাজ করা!

জরি দেওয়া কালো মখমলের ছেঁড়া টুকরোও আছে খানিকটা একটা বাক্সে। একটা জরির ছেঁড়া টুপিও। বাবা এককালে নাকি থিয়েটার করতেন। নিজেই রামের পোশাক কিনেছিলেন একটা। এই টুকরোটা নাকি তারই স্মৃতিচিহ্ন। খোকন ওটাকে নিজের পড়ার টেবিলক্লথ ক'রে পাততে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনি। প্রথমতঃ ছোট হল, দ্বিতীয়তঃ বেমানান হল। রাজা রামচন্দ্রের গায়ে যা মানিয়েছিল কাঠের টেবিলের ওপর তা মানালো না। তাছাড়া ভয় হল দেখতে পেলে বাবা হয়তো বকবেন।

লক্ষ্মীর সিঁদুর-চুপড়ি ছিল একটা বালতিতে। সেটি সংগ্রহ করেছে খোকন। যদিও তার গায়ের কয়েকটা কড়ি নেই তবু এখনও চমৎকার দেখতে। খোকন সেটি এনে রেখেছে তার বইয়ের আলমারির ভেতর। টুকিটাকি সব জিনিস রাখে তাতে। ছুরি, আলপিন, সেফ্‌টিপিন—এই সব।

অবসর পেলেই ওই যাদুঘরে ঢুকে পড়ে খোকন। একবার একটা বাক্সের ভেতর ময়ূরের পালক পেয়েছিল দুটো। আশ্চর্য, ময়ূরের পালক কি ক'রে গেল ওখানে।

মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আরও অবাক হয়ে গেল সে। মা নাকি ময়ূরের পালক দিয়ে পাখা তৈরী করত এককালে !

কত রকম অদ্ভুত জিনিসই যে আছে ওখানে। একটা পুরোনো বাক্সে গাদা গাদা চিঠি আছে। কত রকমের চিঠি। একটা চিঠিতে দেখেছিল—হাবুল দাদু, তোমার জন্যে বড্ড মন কেমন করছে। তোমার জন্যে নিখুঁতি যোগাড় ক'রে পাঠাব। একটা ভাল দোকানে অর্ডার দিয়েছি। তোমার আবৃত্তি এখনও কানে বাজছে। তুমি রবীন্দ্রনাথের "বন্দীবীর"টাও মুখস্থ কোরো। ওটা তোমার গলায় বেশ মানাবে। এবার গিয়ে শুনব। চিঠির নীচে নাম লেখা ছিল, তোমার বাঁকুড়ার দাদু।

মাকে চিঠিটা দেখিয়েছিল খোকন। মা বললেন—ছেলেবেলায় তোমার বাবাকে হাবুল বলে ডাকত সবাই। বাঁকুড়ার দাদু লোকটিকে কিন্তু চিনতে পারলেন না মা। বললেন, কত সব আত্মীয় কুটুম্ব চারদিকে ছড়িয়ে আছে, সবাইকে কি চিনি ?

বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন। বাবাও ভুরু কুঁচকে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—ও, মনে পড়েছে। বাবার এক পিসতুতো ভাইয়ের কাকা বাঁকুড়ায় থাকতেন। চমৎকার লোক ছিলেন। পায়ে ঘুঙুর পরে বাউলের গান গেয়ে নাচ দেখাতেন আমাদের। আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এসে ছিলেন কিছুদিন।

এই রকম সব অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কৃত হয় ওই যাদুঘরে। বাবার নাম যে হাবুল ছিল কে জানত !

ওই যাদুঘরেই আর এক কাণ্ড হল একদিন।

ঘটনাটা ঘটল দিনে নয়, রাত্রে। মাঝ রাত্রে। সেদিন হঠাৎ খোকনের ঘুমটা ভেঙে গেল। টং টং ক'রে দুটো বাজল পাশের ঘরে। খোকন চোখ বুজে তবু শুয়ে রইল কয়েক মিনিট। যদি ভাঙা ঘুমটা আবার জোড়া লেগে যায়।

কিন্তু লাগল না। পাশের ঘরে—মানে, ওই যাদুঘরে, খুটখুট আওয়াজ হতে লাগল একটা। ইঁদুরের শব্দ ? না। মনে হল কে যেন চলে বেড়াচ্ছে। বিছানায় উঠে বসল খোকন। অবাক হয়ে গেল পাশের ঘরের দরজাটার দিকে চেয়ে। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। জোর আলো। চোর কি ? চোর কি অত আলো জেলে আসবে ? বিছানা থেকে নেমে পড়ল খোকন। কপাটটা খুলে দেখবে ? তার ভয় করছিল না ঠিক। বরং একটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠেছিল সারা বুক। মনে হচ্ছিল অপূর্ব অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটছে ওঘরে কপাটের ওপারে।

কপাট খুললেই হয়তো অন্তর্ধান করবে সব। তারপরই কান্নাটা শোনা গেল। হ্যাঁ, চাপা কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেন কাঁদছে কেউ। কপাট খুলে অবাক হয়ে গেল খোকন।

ঘরের কোণে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে···তার সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না। গায়ের ওড়না, পরনের কাপড় সবই জ্যোৎস্না। মাথার চুলগুলি যেন সাদা রেশমের। তাতে প্রতিফলিত হয়েছে জ্যোৎস্না। টুলটুলে মুখখানি অপরূপ, বরফের মতো সাদা। তাতেও লেগেছে জ্যোৎস্নার স্পর্শ। চোখ দুটি কুচকুচে কালো, তাতে অসহায় দৃষ্টি। ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কাঁপছে।

"কে তুমি—?"

"আমি চাঁদের বুড়ি।"

"বুড়ি ? কিন্তু তোমাকে তো বুড়ো মনে হচ্ছে না। তুমি তো ছেলেমানুষ।"

"সকলে কিন্তু আমাকে বুড়ি-বলে ডাকে। তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা, তার ঠাকুমা, আদ্যিকাল থেকে যত ঠাকুমা হয়েছে সবাই আমাকে বুড়ি বলে। আমার বয়স কিন্তু বাড়েনি। আমি তোমারই বয়সী।"

"এখানে কেন এলে ?"

"চাঁদ থেকে পালিয়ে এসেছি।"

"পালিয়ে এসেছ ! কেন ?"

"ভয়ে। ওরা চাঁদে যন্তর নামিয়েছে। তোমার এই ঘরটিতে আমাকে আশ্রয় দেবে ? তোমার এই যাদুঘরেই আমি সুখে থাকব। দেবে আমাকে থাকতে ?"

এর পরই খোকন দড়াম ক'রে পড়ে গেল। শব্দ শুনে বারান্দা থেকে ছুটে এল বিশু। তুলে আনল তাকে ঘরে। চোখে মুখে জল দিতেই জ্ঞান ফিরে এল খোকনের।

"সে কোথা গেল—"

"কে ?"

"সেই চাঁদের বুড়ি ?"

"চাঁদের বুড়ি ! মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি তোমার ?"

"কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে—"

"তুমি দেখেছ জ্যোৎস্না। আজ বিকেলে বাঁদর লাফিয়ে ও-ঘরের একটা টালি ফেলে দিয়েছে। ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকেছে ঘরে।"

খোকন আবার গিয়ে দেখল। ঘরে কেউ নেই। টালির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না দেখা যাচ্ছে খালি।

খোকন ঠিক করেছে সে বিজ্ঞান পড়বে। বিজ্ঞান পড়ে গবেষণা করবে। সে প্রমাণ করবে যে চাঁদের বুড়ি মিথ্যে কল্পনা নয়। সে পড়েছে চাঁদে বরফ আছে। তুষার-মানবের কথাও শুনেছে। তাহলে তুষার-মানবী তুষার কিশোরীই বা থাকবে না কেন ? এ নিয়ে গবেষণা করবে সে।

মুশকিল হয়েছে তার অসুখটা নিয়ে। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে চলে যায় সে। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন সেরে যাবে !

এখনও মাঝে মাঝে চাঁদের বুড়িকে স্বপ্নে দেখে সে। একদিন এসে বলছিলো—"আমি তোমার যাদুঘরেই আছি এখনও। কোথাও যাইনি।"

তার কালো সরল চোখ দুটি হাসছিল।

তিনটি নীলকণ্ঠ

সেদিন নীলষষ্ঠী। শিবুর মা সেদিন উপবাস করেছিলেন। সন্তানদের কল্যাণে এ উপবাস তিনি বরাবর করেছেন। সেই প্রথম যৌবন থেকে। প্রতি বছরই তিনি শিব-মন্দিরে গিয়ে মহাদেবের মাথায় দুধ ঢেলে ঢেলে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন—বাবা আমার ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রেখো। শিবুটা বড্ড রোগা, আশু বড্ড ডানপিটে,

বিশুর প্রায়ই কেঁপে-কেঁপে জ্বর হয়—ওদের ভালো করে দাও ঠাকুর। জয়ার ভালো বর জুটিয়ে দাও একটি। আমি গরীব, অর্থ সামর্থ্য নেই, কিন্তু তাই ব'লে যার তার হাতে তো মেয়েকে ধরে দিতে পারি না। হরু, কানু, জগু এদের মঙ্গলের জন্যেও প্রার্থনা করতেন তিনি। এরা তাঁর ভাইপো। তারপর পাড়াপড়সীর ছেলেমেয়েদের জন্যেও করতেন। সকলের সব প্রার্থনা পূর্ণ করা শিবেরও অসাধ্য। শিবুর মায়ের সব প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। শিবু, আশু, বিশু—তিনটি ছেলেই মারা গিয়েছিল তাঁর। শিবনাথের যক্ষ্মা হয়েছিল, আশুতোষ জলে ডুবে মারা যায়, আর বিশ্বেশ্বরের হয়েছিল জ্বর, অনেক ডাক্তারবদ্যি দেখেছিলেন। কেউ বলেছিলেন ম্যালেরিয়া, কেউ বলেছিলেন কালাজ্বর, বিষমজ্বর বলেছিলেন পরেশ বদ্যি। কারও ওষুধে ফল হয়নি। তিনজনেই একে একে ছেড়ে চলে গেল তাঁকে। জয়ার অবশ্য ভালো বিয়ে হয়েছে। দিল্লীতে বড় ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। জয়ার বিয়ের পরই স্বামীকেও হারালেন শিবুর মা। তিন-তিনটি পুত্রশোকের বজ্রাঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। শিবুর মার কিন্তু সয়েছে। সব সহ্য ক'রে পাথর হয়ে বেঁচে আছেন তিনি এখনও। স্বামীর ভিটে আঁকড়েই পড়ে আছেন। কোথায় আর যাবেন। জয়াই তাঁকে মাসে মাসে টাকা পাঠায় কিছু, আর জমি থেকে ধান হয় খাওয়ার মতো। বারো মেসে সজনে গাছ আছে একটা রান্নাঘরের কাছে। উঠোনে শাক-সব্জি করেন কিছু। ওতেই চলে যায়। দশ বছরের মেয়ে—পটলি থাকে তাঁর কাছে। পটলি তাঁর সই-এর মেয়ে। সই মেয়েটাকে রেখে মারা গেল হঠাৎ। তিনিই মানুষ করেছেন। মেয়েটাও ডানপিটে। গাছকোমর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় খালি। মাঝে মাঝে এর ওর বাগান থেকে ফলটা-পাকড়টা চুরি ক'রে আনে তাঁর জন্যে। বকলে মুখের উপর চোপা করে। বলে—বেশ করেছি এনেছি। পাখীতে হনুমানে মুড়িয়ে খাচ্ছে, আমি দুটো এনেছি তাতে কি হয়েছে। দস্যি মেয়ে।

শিবু, বিশু, আশু তিনজনেই তাঁর হাতের তৈরি নারকেল নাড়ু ভালবাসত খুব। তাই প্রতি বছরই নীলষষ্ঠীর দিন নারকেল নাড়ু করেন তিনি। শিবের মন্দিরে গিয়ে শিবকেই ভোগ দেন। তারপর বিলিয়ে দেন সকলকে।

সেদিনও নারকেল নাড়ু করছিলেন তিনি রান্নাঘরে বসে। পা টিপে টিপে পটলি এসে ঢুকল। চাপা গলায় বলল, "মাসীমা দেখবে এস। সজনে গাছের যে ডালটা তোমার রান্নাঘরের জানলার দিকে ঝুঁকে আছে না ? তার উপর তিনটি নীলকণ্ঠ পাখী—কেমন পাশাপাশি বসে আছে, বেরিয়ে এস না একটু।" শিবুর মা বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন—হ্যাঁ সত্যিই তো। তিনটি নীলকণ্ঠ পাশাপাশি বসে আছে, যেন তিনটি ভাই। শিবুর মা কবি নন কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত একটা কল্পনার বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর মনে। নীলকণ্ঠ তো মহাদেবের নাম। শিবু, আশুতোষ, বিশ্বেশ্বর এ সবও তো মহাদেবেরই নাম। তিনি রান্নাঘরে বসে নারকেল নাড়ু তৈরি করছিলেন—তাহলে কি—!

পটলি বলল, "কেমন সুন্দর বসে আছে তিনটিতে—!"

শিবুর মা বললেন, "দাঁড়া। চেঁচামেচি করিস নি।"

ত্বরিতপদে তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন। একটি পাথরের রেকাবীতে তিনটি নারকেল নাড়ু নিয়ে এসে চুপি চুপি বললেন—ওদের দিয়ে আসি। এগিয়ে গেলেন তিনি সজনে গাছটার দিকে। তাঁকে দেখেই নীলকণ্ঠগুলো উড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কলকণ্ঠে হেসে উঠল পটলি।

"আচ্ছা, তুমি কি মাসি! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি। নীলকণ্ঠ পাখী কখনও নারকেল নাড়ু খায়!"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শিবুর মা।

তারপর রেকাবীটা গাছতলায় নাবিয়ে দিয়ে বললেন, "ওরা আবার আসবে। এগুলো থাক এখানে। তুই চাটুজ্যেদের বাড়ি থেকে একটু গঙ্গাজল নিয়ে আয়। তামার ঘটিটা নিয়ে যা। এখুনি মন্দিরে যাব। নাড়ুগুলো পাকানো হয়নি এখনও—"

শিবুর মা রান্নাঘরে বসে নাড়ু পাকাতে লাগলেন। পটলি হাসি চাপতে চাপতে গঙ্গাজল আনতে গেল।

একটু পরে পটলি ফিরে এসে বললে,—"এই নাও গঙ্গাজল। পাখীগুলো আর আসেনি। নাড়ু তিনটেও নেই, রেকাবীটা খালি পড়ে আছে—"

শিবুর মা ছুটে বাইরে চলে গেলেন। দেখলেন সত্যিই রেকাবী খালি। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন তিনি। বাবা বিশ্বনাথ সত্যিই কি তাঁর মনের কথা টের পেয়েছেন?

কল্পনা করতে লাগলেন—এ রকম কল্পনা শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস কেউ করতে পারতেন না। তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন আকাশচুম্বী কৈলাস পর্বতে মহাদেবের কাছটিতে তাঁর শিবু, আশু আর বিশু বসে আছে। আর তাঁর নাড়ুগুলো আকাশ বেয়ে তাদের দিকে উড়ে যচ্ছে!

বর্ণমালা

[এ নাটিকার চরিত্রগুলি বর্ণমালা। অভিনয়ের সময় অভিনেতা বা অভিনেত্রী নিজের পোষাকে একটি কাগজে বর্ণের নাম লিখিয়া নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিবেন। যে কোনও বর্ণের যে কোনও লিঙ্গ হইতে পারে। নাটকের কুশীলব সমস্ত পুরুষ অথবা সমস্ত স্ত্রীলোক হইলে নাটকের শোভনতা নষ্ট হইবে না। স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণও অনায়াসে চলিতে পারে।]

স্থান—একটি ক্লাবের সংলগ্ন বারান্দা। বারান্দায় একটি টেবিলের চার ধারে কয়েকটি চেয়ার রহিয়াছে।

ঞ আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একটি ঝাড়ন দিয়া টেবিল চেয়ার ঝাড়িতে ঝাড়িতে গুন গুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল। ঝাড়া হইয়া গেলে বাহিরের দিকে চাহিয়া ডাকিল—ঙ, ঙ, ঙ— [ঙ প্রবেশ করিল]

ঙ। কি বলছ—

ঞ। আজ এখানে মিটিং, অনেক কাপ চা চাই। ব্যবস্থা রেখো।

ঙ। আমার যখন চায়ের দোকান তখন ব্যবস্থা তো আছেই। কিসের মিটিং আজ?

ঞ। পতাকা-মিটিং—

ঙ। তার মানে?

ঞ। 'আগে বাড়ো' ক্লাবের মেম্বাররা ঠিক করেছেন যে ক্লাবের একটা পতাকা থাকা দরকার। সেটা কত বড় হবে, কি কাপড়ের হবে, কি রঙের হবে, তার দণ্ডটা কি কাঠের

হবে, কত মোটা হবে, কত লম্বা হবে, প্রথম দিন সে পতাকা কে উত্তোলন করবে—এই সব নিয়ে মিটিং। প্রচুর চা লাগবে—

ঙ। [মাথা চুলকাইয়া] একটা কথা বলব ?

ঞ। বল না—

ঙ। যেদিন থেকে ক্লাব হয়েছে সেদিন থেকেই আমি সবাইকে চা কেক বিস্কুট খাইয়ে যাচ্ছি। একটি পয়সা কিন্তু পাইনি এখনও। কত বাকি পড়েছে জানো ? আজ খাতা খুলে দেখছিলাম। তিনশ' বাহান্ন টাকা সাড়ে ছ'আনা—

ঞ। কিচ্ছু ভেবো না। আমিও কি এক পয়সা মাইনে পেয়েছি না কি। কিন্তু আমি নির্ভাবনায় আছি। এদের প্রত্যেকেই রুই কাত্‌লা, যে কেউ যে কোনও মুহূর্তে ঝপাৎ ক'রে সব টাকা শোধ ক'রে দিতে পারে। ওই যে 'ট'—টাকার কুমীর একটি—

ঙ। ট-কে বলেছিলাম একদিন। কিন্তু তিনি তো কানই দিলেন না আমার কথায়, অন্যমনস্ক হ'য়ে শিস দিতে লাগলেন খালি।

ঞ। দেখ ঙ, বড়লোকদের টাকার তাগাদা দিতে নেই। ওরা ঠিক সময় সব দিয়ে দেবে। যে সে লোক "আগে বাঢ়ো" ক্লাবের মেম্বার হ'তে পারে না। "ছ" সেন্টারের মিনিস্টারের ডান হাত, "ব" কর্ম্যাণ্ডার-ইন-চিফের চোখ, 'ঈ' কার যেন পা। বড় বড় লোকদের সঙ্গে সবাই জড়িয়ে আছেন—যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে 'ওতপ্রোত'। ওদের সঙ্গে লেগে থাকতে পারলে আমাদের আখেরে ভালো হবে—

ঙ। আর একটা কথা আমার মাথায় ঢোকে না। বাঙালীদের ক্লাব, তার "আগে বাঢ়ো" নাম কেন !

ঞ। ক্লাব হবার আগে ল-এর বাড়িতে এ নিয়ে একটা সভা হয়েছিল। ক্লাবের নাম কি হবে তাই নিয়ে সভা। কেউ বললে 'প্রগতি সংঘ', কেউ বললে 'প্রোগ্রেসিভ ক্লাব', কেউ বললে—'কাঁচ-কেন্দ্র', কেউ বললে—'চঞ্চলা'। মহা ভোটাভুটি ব্যাপার। শেষ কালে ষ উঠে বললে—ভাইগণ, আমরা আশা করছি, আমাদের ক্লাবের জন্য কেন্দ্র থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে। সেই জন্যে আমার প্রস্তাব ক্লাবের নাম রাষ্ট্রভাষায় রাখা। "আগে বাঢ়ো" কথাটি একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর খুব প্রিয়। আমার তাই ইচ্ছে—ক্লাবের পরিণামের কথা ভেবেই এ ইচ্ছে প্রকাশ করছি—ক্লাবের নাম "আগে বাঢ়ো"ই হোক। ইংরেজীতে খুব দামী কথা আছে একটা—হোয়াট্ ইজ ইন্ এ নেম। অনিলবাবু ছেলের নাম রেখেছেন 'দুনিয়ালাল', আর মেয়ের নাম "খপসুরতি"। দুজনেই ভালো চাকরি পেয়েছে। পরিণামের কথা ভেবেই চলতে হবে। ষ একজন জাঁদরেল লোক। তার কথা অমান্য করতে সাহস করল না কেউ।

ঙ। কিন্তু পরশু প বলছিল যে ত নাকি একটা দল পাকিয়েছে ঋ, উ আর অনুস্বর-কে নিয়ে। তাদের ইচ্ছা ক্লাবের নাম যদি রাষ্ট্রভাষাতেই রাখতে হয় তাহলে রাখা হোক 'খোতা', যার বাংলা মানে পাখীর বাসা। ক্লাবের নাম ছোট্ট হওয়া উচিত।

ঞ। (দূরের দিকে চাহিয়া) ওই ওঁরা আসছেন এবার। তুমি চায়ের ব্যবস্থা কর গিয়ে—

[ঙ চলিয়া গেল। খ, ল, শ, জ এবং বিসর্গ প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেকেই অত্যাধুনিক বেশে সজ্জিত]

জ। [ল-কে] আমি বলছি পতাকার রং সবুজ হোক।

ল। আমি পাকিস্তানের নকল করতে চাই না, আমার মতে পতাকার সাতটি রঙই থাকবে। সর্ব ধর্ম সমন্বয় আমাদের নীতি, আমাদের পতাকাও সেই নীতি প্রচার করবে।

খ। আমি শাদা রং চাই, শাদাও সর্ব বর্ণের সম-সম্মিলন।

শ। ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করবার পক্ষপাতী নই আমি। শিবাজীর গৈরিক পতাকা এখনও ইতিহাসের পাতায় পতপত ক'রে উড়ছে, আমাদের ক্লাবেও কেন উড়বে না তা? আমরা বিদ্রোহী--

ঃ। এ যুগে বিদ্রোহের রং লাল। আমি লালের পক্ষপাতী।

খ। লাল চলবে না। কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া যাবে না তাহলে!

ল। তাছাড়া ওদের মতিগতি ঠিক বুঝতে পারি না। লাল চলবে না।

খ। শাদাই হোক না! ধবধবে শাদা মসলিন! বাঙালী সংস্কৃতির প্রতীক।

ল। মসলিন কেন? সাতরঙা গরদ হলেই বা ক্ষতি কি! গরদের ধারে ধারে রুপোর জরি দেওয়া থাকবে। চমৎকার মানাবে। সাত-রঙা গরদের পতাকা গ্র্যান্ড হবে—আমি মনশ্চক্ষে যেন দেখতে পাচ্ছি পতাকাটা—গ্র্যান্ড হবে—গ্র্যান্ড হবে—

খ। শাদা গরদ আরও গ্র্যান্ড—শাদা মানে শান্তি—পৃথিবীতে এখন শান্তি চাই। 'আগে বাঢ়ো' শান্তির বাণী ছড়াবে।

শ। কিন্তু সর্বাগ্রে চা চাই। ঞ, চা—। আর শোন—মাত্র চারটি চেয়ারে কি হবে? আমরা ৪৮ জন মেম্বার—তুমি চারটি চেয়ার এনেছ! কি কান্ড।

ঞ। আর কেউ চেয়ার দিতে রাজি হল না বাবু। পাড়ার মিত্তির মশাইকে অনেক বলা কওয়াতে এগুলো দিলেন—

খ। হটিয়ে দাও তাহলে চেয়ার। আমরা দাঁড়িয়েই মিটিং করব। নিজের পায়ে দাঁড়ানোটাই সর্বাগ্রে দরকার--কে একজন মহাপুরুষ না কি ব'লে গেছেন—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—খুব খাঁটি কথা এটা।

[ঞ চেয়ারগুলি সরাইতে লাগিল। আ, র, ফ, আর ধ প্রবেশ করিলেন]

আ। [প্রসারিত বাম করতলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া নীল, নীল, নীল, নীল—পতাকার রং নীল হবে। আকাশ নীল, সাগর নীল--

ফ। কিন্তু ভাই, আমাদের ব্যাংক ব্যালান্সও যে 'নিল'—মাত্র চার আনা চাঁদা উঠেছে আর সে চার আনা আমিই দিয়েছি।

ধ। এ রকম অপমানিত হ'তে হবে জানলে এখানে আসতাম না। মেম্বার যখন হয়েছি, তখন চাঁদা নিশ্চয় দেব। এ নিয়ে আপনাকে খোঁটা দেবার অধিকার কে দিয়েছে? [খ দু হাত বিস্তার করিয়া]

খ। শান্তি, শান্তি। সব ঠিক হ'য়ে যাবে--

আ। চেয়ার-টেয়ার সব সরিয়ে দিলে কেন?

খ। চার পাঁচটি চেয়ারে ৪৮ জন বসবে কি ক'রে?

ল। আরও চেয়ার ভাড়া ক'রে আনা উচিত ছিল। ফ সেক্রেটারি—ফ-য়েরই উচিত ছিল এ ব্যবস্থা করা।

ফ। প'য়তাল্লিশটি চেয়ার ভাড়া ক'রে আনতে হলে পঞ্চাশটি টাকা খরচ। কিন্তু একটু আগেই তো নিবেদন করেছি, আমাদের ব্যাংক ব্যালান্স "নিল"। কেউ তো চাঁদা

দেয়নি এক আমি ছাড়া। সে চাঁদাও আমার পার্সে আছে, কারণ কোন ব্যাংক বা পোস্টাফিস চার আনা পয়সা জমা নেবে না—

শ। ট্যাক্‌ট্‌ থাকলে বিনা পয়সাতেই সব ম্যানেজ করা যায়। তুমি ওয়ার্থলেস। সেক্রেটারিশিপ ছেড়ে দাও।

ফ। ছাড়ব না। আমি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সেক্রেটারি। তুই বললেই আমি ছেড়ে দেব? বা রে—

ধ। [উষ্মাভরে] যে কাজ পারে না, তার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। যাক্‌ ও কথা। পতাকার রং নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, রঙের কথাই আগে বলি। বর্ণালীর অর্থাৎ স্পেকট্রামের সর্বোচ্চ রং হচ্ছে ভায়োলেট। বেগুনি। ভিবজিওর শব্দটির গোড়াতেই "ভি" অর্থাৎ ভায়োলেট। আমরা সর্বোচ্চে থাকব, আমরা প্রথম হবো, তাই আমার মতে পতাকার রং হওয়া উচিত বেগুনি। তরকারির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট তরকারি বেগুন। ঝোল খাও, ঝাল খাও, চচ্চড়িতে খাও, শুক্‌তোয় খাও, ভেজে খাও, অম্বল ক'রে খাও, যত খুশী খাও—পেট খারাপ হবে না। তাই আমার মতে—

র। [তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া] তোমার মতটা শুনলাম, তোমার দিকেই আমি ভোট দেব। আমার মেয়েটা এবার ক্লাস টেনে উঠল, তোমার ছেলে তো পাশ ক'রে গেছে, তার পুরোনো বইগুলো আমাকে দেবে? ক-য়ের ছেলেও ক্লাস টেনে উঠেছে। সে হন্যে কুকুরের মতো বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরোনো বই জোগাড় করবার জন্যে। তোমার কাছে গিয়েছিল?

ধ। না।

র। তাহলে তোমার ছেলের বইগুলো আমাকে দিও। আমি তোমার বেগুনির পক্ষে ভোট দেব। হ্যাঁ, আর শোন, রামপুরহাটে তোমার ভগ্নীপতি আছে না?

ধ। আছে। কেন?

র। আমাকে সেখানে গিয়ে থাকতে হবে দিন সাতেকের জন্যে। তোমার ভগ্নীপতিকে চিঠি লিখে দেবে একটা? ওর বাড়িতেই গিয়ে উঠব ভাবছি—

ধ। চিঠি আমি দেব। কিন্তু সেখানে তুমি স্বস্তিতে থাকতে পারবে না।

র। কেন?

ধ। তার ভয়ঙ্কর একটা বুলডগ্‌ আছে।

র। ও বাবা তাই না কি? গেরস্ত ঘরে বুলডগ্‌ পোষা কেন?

ধ। তার কুকুরের ভীষণ শখ। অ্যালসেশিয়ানও আছে একটা—নাম কংস। কাউকে ধরলে ধ্বংস ক'রে ফেলে—

র। ও বাবা! তাহলে ওখানে যাওয়া চলবে না। রামপুরহাটে তোমার চেনা-শোনা আর কেউ আছে?

ধ। না।

[ঞ একটি চটা-ওঠা ট্রেতে চা লইয়া প্রবেশ করিল। কাপে নয়, ছোট ছোট মাটির খুরিতে। প্রত্যেকে একটা করিয়া খুরি তুলিয়া লইলেন]

শ। আজ খুরিতে চা কেন?

ঞ। ও বলছে তার এতগুলো কাপ নেই। যে ক'টা আছে তা খদ্দেরদের দিয়েছে, তারা দোকানে বসে চা খাচ্ছে—

ঃ। [চোখ পাকাইয়া] আমরা কি খদ্দের নই !

খ। [চায়ে একটা চুমুক দিয়া] আরে এ যে অখাদ্য ! নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে দিয়েছে না কি !

ধ। তার সঙ্গে কেরোসিন তেলের গন্ধ ! নাঃ, এ খাওয়া যাবে না।

[ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

ল। ও-টাকে শাসন ক'রে দেওয়া দরকার। দাঁড়াও, ওর লাইসেন্স ক্যানসেল করিয়ে দিচ্ছি।

[ঞ সভয়ে প্রস্থান করিল। করিবার পর গলাগলি করিয়া এ, ঐ, ও, ঔ প্রবেশ করিল]

র। এই যে আমাদের বিদূষকরা এসে গেছে—

এ। আপনারা অনুমতি করলে এই মিটিঙের উদ্বোধনী সংগীত আমরা গাইব—

ল। কি সংগীত—'বন্দেমাতরম্' ?

ঐ। না।

ল। 'জনগণমন-অধিনায়ক'—?

ও। না।

ধ। তবে কি "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা"—?

ঔ। না। গান আমরা নিজেরা বেঁধেছি—বলেন তো শুনিয়ে দি—

খ। আচ্ছা, শোনা যাক না—

[এ, ঐ, ও, ঔ গলাগলি করিয়া দাঁড়াইয়া কোরাস গান ধরিল]

"আগে বাঢ়ো" কেলাবের মেম্বার হউ।
গরুকে এবার থেকে বল খালি গউ ॥
লাউকে কদ্দু বল,
যদুকে যদ্দু বল,
"বহু" বা "দুলাহিন্" হোক
আমাদের বউ ॥
'শহদ্' হইয়া যাক
বাঙালীর মউ
"আগে বাঢ়ো" কেলাবের মেম্বার হউ ॥

[হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সকলে। হাসিয়াই কিন্তু বুঝিলেন কাজটা সংগত হয় নাই। ইহা রাজদ্রোহের সামিল। গভীর হইয়া গেলেন অনেক]

খ। এ গান গাইলে কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া যাবে না।

ঃ। চন্দ্রের দিকে যেমন চকোর চেয়ে থাকে কেন্দ্রের দিকে তেমনি আমরা চেয়ে আছি—

ধ। উপমাটা ঠিক হ'ল না। সূর্যকিরণে যেমন কমল ফোটে, কেন্দ্র-কিরণে তেমনি আমরা ফুটি, এইটে বললেই মানানসই হয়।

শ। [এ-ঐ-ও-ঐকে লক্ষ্য করিয়া] ইয়ার্কি নয়। সর্বভারতীয় একতা চাই। প্রত্যেকটি প্রাণের সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রাণ জুড়ে দিতে হবে, আর সে জুড়ে দেবার লেই রাষ্ট্র-ভাষা। ও নিয়ে ইয়ার্কি চলবে না।

খ। কেন্দ্রের সাহায্য পাওয়া যাবে না তাহলে—[হস্ত দন্ত হইয়া অ প্রবেশ করিলে]

এ-ঐ-ও-ঔ। আমরা চলি তবে— (প্রস্থান)

অ। একটা সুসংবাদ আছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের পতাকা-মিটিং উদ্বোধন করবেন।

আ। [উল্লসিত] তাই না কি ! হ্যাঁ, কাল একজন অয়েল মিনিস্টার এসেছেন শুনলাম। কি করে তাঁর নাগাল পেলে !

অ। উ আর হ গিয়ে অনুরোধ করেছিল তাঁকে। উ একেলে পদ্মশ্রী আর হ সেকেলে রায়-সায়েব। ওদের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারেন নি। পারা সম্ভবও নয়। 'হ'-য়ের হাতে ভোট কত ! তিনটি জেলার ভোট উনি কন্ট্রোল করেন। উ-কেও খুব খাতির করলেন দেখলুম। হাজার হোক 'পদ্মশ্রী' তো !

ধ। [জনান্তিকে ক-কে] পদ্মশ্রী না বলে তৈলশ্রী বলাই উচিত। তেলের ব্যবসাও করেন, তেল দিতেও পটু—জাতেও—

অ। আর একটা কথা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমশায় পতাকার ভার থ-এর ওপর ছেড়ে দিতে বলেছেন। থ-কে তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন। আপনারা তো সবাই জানেন তকলি কাটতে কাটতে 'থ' রাস্তা চলেন, 'চরখা' নিয়ে কাব্য লিখেছেন। অনেকে তাঁকে মহর্ষি আখ্যা দিয়েছে। মন্ত্রীমশাই পতাকা কি রকম হবে তা তাঁকেই ঠিক করতে বলেছেন। এ নিয়ে যেন ভোটাভুটি না হয়—

আ। [রুখিয়া] এটা কি রকম কথা ? গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আমাদের—এখানে ডিকটেটারশিপ চলবে না। আমি নীলের জন্য ফাইট করব।

জ্ঞ। আমি সবুজের জন্য।

শ। আমি গৈরিক রংকে 'পুশ' করব।

ঃ। লালই বা হবে না কেন ?

খ। [চীৎকার করিয়া] শাদা হবে, শাদা হবে !

ল। সাত-রঙা গরদের জন্য আমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চষে বেড়াব—ইন্দ্রধনু পতাকা ওড়াব আমি।

খ। (সক্ষোভে) উই কান্‌ট অ্যাফোর্ড সাত রঙা গরদ !

[ই, ঈ, ব, ভ প্রবেশ করিলেন]

ই। কি নিয়ে এত হাল্লা ?

আ। পতাকার রং নিয়ে। আমি বলছি নীল হোক। আকাশ নীল—সমুদ্র নীল—

ই। [হাসিয়া] আমি কিন্তু ভাই কমলা রঙের পক্ষপাতী। কমলা—যা সূর্যোদয়ের সময় দেখা যায়—

ঈ। সূর্যাস্তের সময়ও দেখা যায়। ওটা কোন যুক্তি নয়। শোন ভাইগণ, এ বিষয়ে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখতে চাই—

শ। প্রস্তাব কর না, রাখছ কেন ? হিন্দী-ডেঙ্গুর ছোঁয়াচ লাগল না কি ? কি প্রস্তাব তোমার ?

ঈ। [আবেগ কম্পিত কণ্ঠে] ভাইগণ, বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে ভুললে চলবে না। বাংলার বৈশিষ্ট্য—'বাংলার বাঘ' এই দুটি কথায় নিবদ্ধ। বাংলার বৈশিষ্ট্য, রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এখানে হয়তো Royal Bengal Tiger কেউ আঁকতে পারবে না।

তাই আমার মনে হয় বাংলার বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে আসুন আমরা বাঘের চামড়ার রঙের পতাকা ওড়াই। হলদের উপর কালো কালো ডোরা।

আ। [হাস্য গোপন করিয়া] লোকটা উন্মাদ দেখছি। ওই বেঘো পতাকা কোনও ভদ্র ক্লাবে টাঙানো সম্ভব !

ব। [জনান্তিকে ঈ কে] তুমি Toye সাহেবের Springing Tiger বইটা কিনেছ বুঝি ? আমাকে পড়তে দেবে দু'দিনের জন্য ?

ঈ। না। আমি বই কাউকে দিই না।

ব। [চটিয়া] দেখ ঈ, বই আমিও কিনি—অতটা অহংকার ভালো নয়। চললুম [চটিয়া চলিয়া গেলেন]

ভ। আমার কথাটা ব'লে নি এবার। আমার মতে আমাদের জাতীয় পতাকাই আমাদের ক্লাবের পতাকা হবে। সেইটাই শোভন হবে।

অ। পতাকা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না আপনারা। মন্ত্রীমশাই আচার্য থ-য়ের উপর সে ভার দিয়েছেন। তিনি একটু পরে পতাকা নিয়ে স্বয়ং মিটিংয়ে আসবেন মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে। তিনি যে পতাকা নিয়ে আসবেন সেই পতাকা নিয়েই মন্ত্রীমশায় সভার উদ্বোধন করবেন।

সকলে। [সমস্বরে] এ অন্যায়, এ ঘোর জবরদস্তি।

ধ। আমাদের চাল কন্‌ট্রোল করেছ—আপত্তি করিনি —

আ। মাছ দেশ ছাড়া করেছ তা-ও সহ্য করেছি—

খ। সন্দেশ নেই তা-ও বরদাস্ত করছি—

শ। বেকার-সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, কুছ পরোয়া নেই —

ফ। কালো-বাজারীতে দেশ ছেয়ে গেল, ঘুষ না দিয়ে হাই তোলবারও নিয়ম নেই—তাও মেনে নিয়েছি—

সকলে। [সমস্বরে] কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আমরা ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। আমাদের পতাকা কি হবে তা আমরাই ঠিক করব।

অ। না, তা হবে না। ঠিক করবেন মহর্ষি থ—মন্ত্রীমশায়ের নির্দেশে। বৃথা হাল্লা ক'রে লাভ নেই।

[ক, দ, ঠ, ণ, ঊ, ঋ প্রবেশ করিলেন]

ক। [ঠ-কে] ভাই আমার ছেলেটা ক্লাস টেনে উঠেছে। তোমার মেয়ে তো ম্যাট্রিক পাশ করল, তার পুরোনো বইগুলো দেবে আমাকে ?

ঠ। সে সব তো বেচে দিয়েছি।

ক। কাকে ?

ঠ। কাগজওয়ালাকে।

ক। [দ-কে] তোমার ছেলেও তো—

দ। আরে, এখানে যা করতে এসেছ সেইটে ক'রে নাও আগে। বই কিনে দাও না ছেলেকে ! নানা লোকের পায়ে তেল দিয়ে তো ছেলেটাকে স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়াবার ব্যবস্থা করেছ, বইও ফোকটে চাও। বলিহারি তোমাকে !

ক। দেখ, উপদেশ দেওয়া খুব সোজা। কত ধানে কত চাল হয় তা তুমি জান না। মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই, সাতটি মেয়ে, চারটি ছেলে—

উ। বাপ্‌স্‌, তাই না কি! বার্থ-কনট্রোল কর না ?

ক। আমি বার্থ-কনট্রোলের বিরোধী! আমার স্ত্রীও—

ঋ। বই আপনি ট-য়ের কাছে পেতে পারেন—

ক। [সাগ্রহে] তাই নাকি! ট কি আসবে ?

ঋ। ঠিক বলা যায় না। নানা ধান্দায় ঘোরে তো—

ক। আমি তাহলে ট-য়ের কাছে চলে যাই।

[ক-য়ের প্রস্থান। সকলের মুচকি হাসি]

ধ। পতাকার রং-য়ের কথাটা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে! বেগুনি রঙের কথাটা সবাই ভাবুন ভাল ক'রে।

র। তোমার ছেলের বইগুলো যদি আমাকে দাও, আমি তোমার দিকে ভোট দেব।

ণ। আমার মতটা আমি পেশ করে দিয়েই চলে যাচ্ছি। ট্যুশনি করতে যেতে হবে। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার, জীবনে কোন রং নেই, ভবিষ্যতে কোন আলো নেই। তাই আমাদের পতাকার রং কালো হোক।

ধ। তুমি বাতুল না কি!

ণ। পতাকার রং যদি কালো না হয় তাহলে আমার নাম কেটে দিও। আমি তাহলে আর ক্লাবের সভ্য থাকব না। টা—টা—

উ। শোন—

ণ। আমি কিছু শুনতে চাই না। [চলিয়া গেলেন]

ঋ। পতাকার কি কোনও দরকার আছে ? উলঙ্গ লোকের মাথায় কি টুপি শোভা পায় ? আমাদের বোধ হয় মাথাও নেই। এ যেন মাকুন্দ কোন লোক গোঁফে তা দেবার জন্য কস্‌মেটিক খুঁজছে। সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর। আমাদের ক্লাবের মোট দুজোড়া তাস, চেয়ার নেই, এই একটি মাত্র টেবিল সম্বল, লাইব্রেরি নেই, ছেঁড়া মাদুরে ব'সে তাস খেলতে হয়, আমাদের পতাকার প্রয়োজন কি।

খ। প্রয়োজন আছে। পতাকা হচ্ছে একটা প্রতীক।

ঋ। পতাকাই যে প্রতীক হতে হবে, তার কোনও মানে নেই। দু'আনা দিয়ে একটা কলসী কিনে এনে তাতে জল ভরে রাখুন। সেই পূর্ণ কুম্ভই আমাদের প্রতীক হোক। সামনেই আম গাছ রয়েছে, আম্র পল্লবও নিখরচায় দিতে পারবেন! [হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন] হা হা হা হা—প্রতীক! প্রতীক! লাল, নীল রং—হা হা হা হা—গত তিনমাস চাকরি নেই—পতাকা! অ্যাঁ—হা-হা-হা-হা—পেটে অন্ন নেই—পতাকা প্রতীক—হা-হা-হা—

[হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন]

ই। পাগল হ'য়ে গেল নাকি ?

জ। হ'তে পারে! রোজ চার-পাঁচটা ক'রে আধুনিক কবিতা লেখে—

[স্কন্ধে ক্যামেরা ঝুলাইয়া ভ ও তাহার পিছু পিছু প প্রবেশ করিলেন। প মাঝে মাঝে পেট চাপড়াইতেছেন]

ত। আজ কিসের মীটিং ?

ধ। পতাকার রং কি হবে তাই নিয়ে আলোচনা করছি আমরা—

ত। আমি থাকতে পারবো না। আমাকে এরোড্রোমে যেতে হবে। বর্মার কালচারাল ডেলিগেশন আসছে। ফটো তুলবো। তবে আমার মতটা আমি বলে যাই! পতাকার রং হবে—বাফ্ (buff), সোবার রং। ব্রাউন নয়, গ্রে নয়, বাফ [হাত ঘড়ি দেখিলেন] মাই গড্, আর সময় নেই, চলি।

(চলিয়া গেলেন)

আ। [প-কে] দাদু পেট চাপড়াচ্ছ কেন!

প। [বিরস মুখে] উইন্ড। দিনরাত ভুটভাট্ চলেইছে, চলেইছে। ডাক্তার সেন বলছে অ্যামিবা, কবরেজমশাই বলছেন বায়ু, হোমিওপ্যাথরা কিছুই বলছে না, কেবল ডাইল্যুশন বাড়িয়ে যাচ্ছে! কি যে করব বুঝতে পারছি না।

ঈ। রোজ হিং খান।

জ। রসুন খেলেও ফল পাবেন।

[ঌ প্রবেশ করিলেন। মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাঁহার পিছু পিছু ম, চ এবং ছ। তাঁহারাও উত্তেজিত। সর্বশেষে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ৎ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মালা]

ঌ। ডিস্গাস্টিং। আমরা বামন, আমাদের চন্দ্রে হাত দেবার স্পর্ধা কেন? আমি বিষ্ণুপুরের সুগায়ক যোগেশ রায়কে নিমন্ত্রণ করেছিলাম সভার উদ্বোধন করবার জন্য। তিনি এসেও গেছেন আমার বাড়ীতে। এখন শুনছি মিনিস্টার সভার উদ্বোধন করবেন—! আশ্চর্য!

ম। আমার ইচ্ছে ছিল, এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল সভার উদ্বোধন করুন। ভাগ্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করি নি।

চ। আমি অগ্নিযুগের সুখেনদাকে বলেছিলাম, তিনি রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে শুনছি মিনিস্টার আসবে। আসুন। আমি ও সবের মধ্যে নেই! I wash my hands.

ঌ ও ম। আমরাও নেই! [ৎ-কে] আপনি মশাই মালা এনেছেন কার জন্যে?

ৎ। আমি যদিও খোঁড়া মানুষ, তবু মিনিস্টারের গলায় পরিয়ে দেব বলে সার্কিট হাউসে মালা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে আমাকে ঢুকতে দিলে না। তাই এখানে ছুটে এসেছি। কখন আসবেন তিনি?

ঌ। যখনই আসুন, মালা আপনি পরাতে পাবেন না। মালা পরাবে টাকার কুমীর ওই ট্যারা ট। চল হে, এখানে কোনও ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয় (প-কে, জনান্তিকে) আপনার বাড়িতে বড় বগি থালা আছে? সঙ্গীত-সাধক যোগেশ রায় দু'দিন থাকবেন বলছেন আমার বাড়িতে। প্রচুর ভাত খান ভদ্রলোক। প্রায় তিনপোয়া চালের। আমরা সব প্লেটে খাইতো—

প। হ্যাঁ, বড় থালা আছে আমার। চলুন দিচ্ছি। যাবার আগে আমার মতটা এদের বলে যাই। আমার মতে পতাকার রং হওয়া উচিত পাংশুবর্ণ। পতাকা হবে তিন ফিট লম্বা, এক ফুট চওড়া। পতাকার দণ্ড হবে বটগাছের চৌকোণা নয়, গোল। (ঌ কে) চলুন।

[প পেট চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঌ-কে লইয়া চলিয়া গেলেন। চ-ও অন্তর্ধান করিলেন]

ৎ। আমি এখন মালাটা নিয়ে কি করি বলুন তো ?

ধ। নিজেই প'রে ফেলুন না, মন্দ দেখাবে না।

[দুইটি সুদৃশ্য চেয়ার লইয়া দুইটি কুলি প্রবেশ করিল। তাহাদের সঙ্গে গ, ৎ এবং ঢ়]

জ। এ কি ?

গ। এর জন্যে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। জনমেজয়বাবুর কাছে গিয়েছিলাম—

ৎ। তিনি বাড়ি ছিলেন না, আমি তখন আমার বোনকে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠাই। মিনিস্টার আমাদের ক্লাবে আসবেন শুনে তিনি চেয়ার দুটো দিতে রাজি হলেন—

ঢ়। কিন্তু এত ভারী চেয়ার আনে কে ? তখন আমি আমার সাইট থেকে দুটো কুলি নিয়ে আসি। [জ-কে] আমাদের কাছে খুচরো পয়সা নেই। কুলি ভাড়াটা দিয়ে দিন।

জ। দিতে পারি, যদি পতাকার রং সবুজ হয়।

ঢ়। বেশ বেশ, আমি সবুজ-এর ফরেই ভোট দেব। যদিও আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছে ছিল হলদে—কলকে ফুলের মতো হালকা হলুদ—। বেশ, আমি সবুজের জন্যই ভোট দেব, আপনি কুলি ভাড়াটা দিয়ে দিন। ওরে, চেয়ার দুটো টেবিলের সামনে রাখ।

[কুলি দুইটি চেয়ার যথাস্থানে রাখিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। জ-ই পয়সা দিলেন।]

জ। [সক্ষোভে] এই মূর্খদের বোঝাতে পারছি না যে, সবুজই হচ্ছে বাংলার প্রাণ। বাংলার শ্যামলতাই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য—

ঈ। বাংলার বৈশিষ্ট্য বাংলার বাঘ—Royal Bengal Tiger.

[ট প্রবেশ করিলেন। এক হাতে একটি মোটা কাষ্ঠ দণ্ড, অন্য হাতে একটি কাগজের মোড়ক]

ট। মহীশুর থেকে এই চন্দন কাঠ আনিয়েছি। অনেক টাকা লেগে গেল। এটি হবে আমাদের পতাকার দণ্ড। আর এটি—

[মোড়ক খুলিয়া একটা বহুমূল্য জরি দেওয়া রং-চঙে মালা বাহির করিলেন]

এটি মিনিস্টার মশাইকে পরিয়ে দেব—কি বলেন !

অনেকেই। বাঃ চমৎকার হবে। মিনিস্টার সময় দিয়েছিলেন ক'টায় ?

অ। আটটায়।

[অনেকেই ঘড়ি দেখিলেন]

চ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে—

ট। ওহে আমার মোটরটা নিয়ে তোমরা একবার যাও…ব্যস্ত মানুষ তো—

দ, প, ফ বাহির হইয়া গেলেন]

ট। আমার বিশ্বাস উনি আমাদের ক্লাবে নিজেই একটা ডোনেশন দেবেন। কেন্দ্র থেকে সাহায্যেরও ব্যবস্থা করবেন।

[একটি ফুলের মালা লইয়া ঘ প্রবেশ করিলেন। ঘ কবি]

ঘ। আমি মিনিস্টারকে এই মালাটি পরিয়ে ছোট্ট একটি কবিতা পাঠ করতে চাই। কবিতাটি শুনুন—

হে নরেন্দ্র, হে বরেণ্য, আধুনিক হে মহাসম্রাট,
তোমারে করিব পুজা হেন সাধ্য নাই,
অতি সসঙ্কোচে আজি, হে মহা বিরাট,
অতি ক্ষুদ্র উপহার আনিয়াছি তাই···

[তিনি আরও পড়িতে যাইতেছিলেন, ই কিন্তু তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন]

ই। ব্যস্—ওইটুকুই থাক। বেশী ঘ্যানর-ঘ্যানর করলে হয়তো উনি চটে যাবেন—বাংলায় লিখেছেন।

[ষ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি বাঁধানো ছবির মতো জিনিস]

গ। ওটা আবার কি ?

ষ। অভিনন্দন-পত্র লিখে এনেছি একটা।

ব। রাষ্ট্রভাষায় না বাংলায় ?

ষ। আমি বাঙালী। বাংলাতেই লিখেছি। পড়ব ?

ছ। না থাক। একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি বাঙালী, বাংলা ভাষার প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব—এটা কিন্তু সর্বভারতীয় মনোভাব নয়। মিনিস্টার মশাই হয়তো খুব খুশী হবেন না—

র। [ছ-কে জনান্তিকে] আমি যদি হিন্দী ভাষায় অনুরোধ করি যে আমার মেয়েটাকে বিনা-মাইনেতে পড়াবার বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক—ফল হবে কোনও ?

ছ। বোধ হয় না। তাছাড়া ওসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এখানে না তোলাই ভালো—

[ড, ঢ এবং য প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতে কাগজের ঠোঙা। ঠোঙার ভিতর হইতে কমলা লেবু, আপেল ও আঙুর উঁকি দিতেছে]

ঈ। এসব আবার কি ?

ড, ঢ এবং য। [সমস্বরে] পুজার নৈবেদ্য সাজাবার জন্যে কিছু ফল আনলাম।

ট। খুব ভাল কাজ করেছেন। আমিও কিছু মিহিদানা অর্ডার দিয়েছি। উনি মিহিদানা খুব ভালোবাসেন। আর আমাদের রামু হালুয়াই মিহিদানা করেও ভালো। ওঁর সঙ্গে দিয়ে দেব।

[ড প্রবেশ করিলেন]

ড। আমি ভাই বাজারুয়া হিন্দীতে একটা ভাষণ লিখে এনেছি। শোন তো—মহামান্য মন্ত্রীবর,

ম্যয় ছুদ্র ব্যক্তি হুঁ। মগর মেরি আকাঙ্ক্ষা ছোটি নেহি হ্যয়। আপকা এইসে মহাত্মাকা পুজা করনেকে লিয়ে ম্যয় আয়া হুঁ। ছুদ্র ব্যক্তি ভি হিমালয়কা গোদপর—

[ধ তাহাকে থামাইয়া দিলেন]

ধ। থামুন, আসল কথাটা বাজে কথায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। পতাকা কি রকম হবে তা কি আমরা ঠিক করব না ?

অ। না। পতাকা কি রকম হবে তা ঠিক করবেন আচার্য থ। তিনি পতাকা নিয়েই আসবেন এই মিটিংয়ে—

[ছ, প, ফ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখে হতাশার চিহ্ন]

ছ। মিনিস্টারমশাই ইলেক্‌শন ক্যামপেনে বেরিয়ে গেছেন উ আর হ-কে নিয়ে। আজ বোধহয় ফিরতে পারবে না।

ট। তাহলে—

ছ। আচার্য থ এসেছেন।

[আচার্য থ প্রবেশ করিলেন। শীর্ণকান্তি। হাতে একটি কাগজের থলি]

থ। মিনিস্টার সাহেব জরুরি দরকারে বেরিয়ে গেছেন। আমাকেই বলে গেছেন আপনাদের সভার উদ্বোধন করতে। আমি সামান্য দু'চার কথা বলব। আমাদের দেশ এখন বিপন্ন। চারিদিকে শত্রু। সরকারের তহবিলে অর্থাভাব। আমাদের এক মাত্র কর্তব্য সে তহবিল পূর্ণ করা। আমাদের পতাকা ফান্ডে যত টাকা উঠবে তা দিয়ে আপনারা গভর্নমেণ্ট বণ্ড কিনুন। আপনাদের জন্য সস্তায় একটি পতাকা আমি স্বহস্তে করে এনেছি। সেইটি আপাতত টাঙান আপনারা। সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিস।

[কাগজের থলি হইতে তিনি ছোট একটি চট বাহির করিলেন। তাহার উপর আলকাতরা দিয়া হিন্দী অক্ষরে লেখা "আগে বাঢ়ো"]

সকলে। [সবিস্ময়ে] সে কি!

॥ যবনিকা ॥

খোকনের বন্ধু

খোকন খুব ভোরে ওঠে। ভোরের পাখীর ডাক খোকনের বাবা মা শুনতে পান না, কিন্তু খোকন পায়। ভোরে উঠে আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস দেখতে পায় খোকন। একদিন দেখেছিল—একটা বড় সবুজ গঙ্গাফড়িং আয়নার উপর বসে আছে সামনের পা দুটো তুলে। আর একদিন দেখেছিল—দেওয়ালের উপর একটা সুন্দর ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে, নানা রঙের সুন্দর ছবি একটা। পরে জানা গেল ওটা ছবি নয়, একরকম প্রজাপতি, ইংরেজী নাম "মথ"। আর একদিন ভোরে উঠেই জানলা দিয়ে দেখেছিল—তাদের পুরানো চাকর ব্রজ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, রাত্রের ট্রেনে এসেছে, কারও ঘুম ভাঙায় নি, বাইরের বারান্দায় শুয়েছিল। খোকনের সঙ্গেই দেখা হ'য়ে গেল প্রথমে। ভোরে উঠলে এইরকম আশ্চর্য জিনিস প্রায়ই দেখা যায়। তাদের বাড়ির উঠোনে যে আকন্দ গাছটা ছিল তার ফল হয়েছিল অনেক, অনেকেই দেখেছে তা। কিন্তু একদিন ভোরে উঠে খোকন যা দেখেছিল তা আর কারও চোখে পড়েনি প্রথমে। আকন্দ ফল ফেটে তুলো বেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। কিন্তু সেদিন ভোরে যা তার চোখে পড়ল তা একেবারে—ভাষা নেই তা বর্ণনা করবার।

ইঁদুরের খাঁচায় ইঁদুর ধরা পড়েছে একটা। জ্বলজ্বলে কালো চোখ, ছুঁচলো মুখে চালাক-চালাক ভাব, সরু সরু গোঁফ—মুগ্ধ হ'য়ে গেল খোকন। মা রাত্রে কখন যে খাঁচাটায় রুটির টুকরো বেঁধে রেখেছিল তা খোকন জানতই না। কিন্তু তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন ইঁদুরটা মানুষের মতো কথা ক'য়ে উঠল।

"রুটির লোভে এ ফাঁদে ঢুকে পড়েছি। ভাই খোকন, আমাকে বাঁচাও—"

খোকনের ভুরু কপালে উঠে গেল।—"ও তুমি ধরা পড়েছ! তুমি তো পাজির শিরোমণি! খাবার চুরি ক'রে নিয়ে পালাও, বই খাতা বালিশ কুঁচোকুঁচি কর, দেওয়ালে ক্রমাগত গর্ত ক'রে চলেছ। তোমাকে বাঁচাব? মা উঠেই তোমাকে জলে চুবিয়ে মারবে। সেই হবে তোমার উচিত শাস্তি—"

ইঁদুর পিছনের দিকে ল্যাজটি খাড়া ক'রে উবু হ'য়ে বসল, তারপর হাতদুটি জোড় ক'রে বলল—"ভাই খোকন, বাংলা দেশে তুমিই তো সেরা লোক। বাংলা দেশের আকাশে তুমিই তো একমাত্র সূর্য, বাংলা দেশের পুকুরে তুমিই তো একমাত্র পদ্ম, বাংলা দেশের রাস্তায় তুমিই তো একমাত্র পথিক। তোমাকে প্রণাম করি। সব শুনেও তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলতে চাও, আমি আপত্তি করব না। আমার অনুরোধ, আমার বক্তব্যটা তুমি মন দিয়ে শোন একটু। তুমি মহাপুরুষ, আমায় তুমিই বুঝতে পারবে—"

খোকন গম্ভীরভাবে চাপটালি খেয়ে বসল।

"বেশ বল—"

ইঁদুর বলতে লাগল—"দেখ ভাই খোকন, আমরা চাকরি করি না, ব্যবসা করি না, চাষবাসও করি না। কি ক'রে ওসব করতে হয় তা কেউ আমাদের শেখায় নি। ওসব রেওয়াজই নেই আমাদের মধ্যে। কিন্তু তবু আমাদের খেতে হবে, বাঁচতে হবে, আমাদের কাচ্চাবাচ্চাদের মানুষ করতে হবে। কি করে করব বল? তাই আমাদের দিন-রাত ওই এক চিন্তা কোথায় কি সংগ্রহ করব। যেখান থেকে যা পাই মুখে ক'রে তুলে আনি, কিংবা ব'সে ব'সে খেয়ে ফেলি—"

খোকন গম্ভীর ভাবে বলল, "কিন্তু বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার কর কেন! বই ছিঁড়ে কুচি কুচি কর কেন। তুলো আর কাগজ কি তোমাদের খাবার নাকি!"

ইঁদুর বলল—"বাঃ, ওসব দিয়ে আমার বাচ্চাদের বিছানা তৈরি করি যে। সেই সময় যা যখন পাই মুখে ক'রে নিয়ে যাই। অনেক বাজে জিনিসও জমে যায় গর্তে। তুমি যদি চাও এনে দেব তোমাকে। বিশ্বাস কর, আমাদের বাঁচবার জন্যে যেটুকু দরকার তার বেশী আমরা কিছু নিই না। চাকরি, ব্যবসা বা চাষবাস করলে হয়তো রোজগার করতে পারতুম। কিন্তু ওসব তো আমাদের রেওয়াজ নেই। কি ক'রে বাঁচি বল। সাধারণ লোকে আমার মনের কথা বুঝবে না, কিন্তু তুমি তো অসাধারণ, তুমিও বুঝবে না? তুমিও মৃত্যুদণ্ড দেবে আমাকে?"

খোকন থুতনিতে আঙুল রেখে ভাবল একটু, তারপর খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। সুট্ ক'রে পালিয়ে গেল ইঁদুরটা।

মা উঠতেই মাকে খবরটা দিয়ে দিল খোকন।

"মা, খাঁচায় আজ ইঁদুর ধরা পড়েছিল। ছেড়ে দিলুম তাকে—"

"ছেড়ে দিলি? সে কি রে। মতিভ্রম হয়েছে নাকি তোর!"

"ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ওরা চাকরি করে না, চাষবাস করে না—খাবে কি ক'রে বল—"

মা খোকনের গাল টিপে হেসে বললেন, "খাবে তোমাদের মতো বোকাদের ঠকিয়ে। ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব হয় নাকি? বোকা কোথাকার—"

তার পর দিন ভোরে খোকনের তখনও ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ তার নাকের উপরটা

সুড়সুড় ক'রে উঠল। খোকন উঠে বসল ধড়মড় ক'রে। দেখল ই'দুরটা এসেছে। সে ফিসফিস করে বলল, "অনেক দিন আগে এটা নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা অতি বাজে জিনিস। আমাদের কাজে লাগল না। তুমি যদি চাও নাও—"

দিয়েই চলে গেল ই'দুরটা।

খোকন দেখল বেশ সুন্দর চকচকে দুল একটা।

মাকে দেখাতেই মা বললেন—"ওমা কোথা পেলি এটা! এটা আমার হীরের সেই দুলটা যে! কোথা পেলি!"

খোকন উদ্ভাসিত চোখ দুটি তুলে বললে—"আমার ই'দুর বন্ধু দিয়ে গেছে!"

শালিক পাখীরই সংস্কৃত নাম যে সারিকা, এই শালিক পাখীই হয়তো বিখ্যাত শুক-সারী-সংবাদের সারী, এই শালিক পাখীকেই হয়তো কবি শুকের পত্নীরূপে কল্পনা করিয়াছেন এই সব তথ্য অবগত হইবার পর হইতেই তরুণ কবি শুকদেব বক্‌সীর শালিক পাখী সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা হইয়াছিল। শালিক পাখি দেখিলেই সে নির্নিমেষে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। শালিকপাখী কিন্তু তাহাকে আমোল দিত না। তাহার দিকে চাহিলেই সে "পিড়িং" শব্দ করিয়া উড়িয়া দূরে চলিয়া যাইত।

'আয়, আয়, আয় না আমার কাছে। তোর সঙ্গে ভাব করি।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিত শুকদেব।

শালিক কিন্তু আমোল দিত না।

এইভাবেই চলিতেছিল।

একদিন কিন্তু অঘটন ঘটিয়া গেল।

বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুকদেব একদিন দেখিল শালিক পাখীটা তাহার খাবারের ঘরে টেবিলের উপর বসিয়া পাঁউরুটি ও বিস্কুটের গুঁড়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। কি তৎপর! কি ব্যস্ত!

শুকদেবের মাথায় হ্যাট ছিল। সহসা সে হ্যাটটা খুলিয়া নিপুণতার সহিত ছুঁড়িয়া দিল টেবিলটার উপর। দৈবাৎ পাখীটা চাপাও পড়িয়া গেল। শুকদেব ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলিল তাহাকে। শালিকের কণ্ঠে যে স্বর ধ্বনিত হইল তাহাতে কিন্তু কাব্যের সারীর ব্যঙ্গ-মধুর সুর বাজিল না। ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ—শব্দ করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল শালিকটা। অসহায় বন্দীর আর্তনাদ!

'লক্ষ্মীটি, ভয় কি! আমি শুক, তোমাকে খেতে দেব, সুখে রাখব, আদর করব, চুপ কর—"

শালিকের আর্তনাদ কিন্তু থামিল না।

শুকদেবও একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার শক্ত মুঠোর ভিতর সারীর হয়তো কষ্ট হইতেছে। হঠাৎ পাকিস্তানের নারী-ধর্ষণের একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। আলগা হইয়া গেল মুঠোটা। ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া গেল শালিক। শুকদেবের মনে হইল ভালই হইয়াছে। জবরদস্তি করিয়া কি প্রেম হয়!

কিন্তু উহার সহিত ভাব করিতেই হইবে। পাঁউরুটি আর বিস্কুটের উপর উহার যখন এত লোভ তখন পাঁউরুটি বিস্কুট দিয়াই ভাব করিব।

শুকদেব বক্সী নিজের বারান্দায় ও ঘরে রোজ পাঁউরুটি ও বিস্কুটের টুকরা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাতে কিন্তু অন্যরকম ঝামেলার সৃষ্টি হইল। দেখা গেল কাক, কাঠবিড়ালী এবং চড়ুই পাখীরাও পাঁউরুটি-বিস্কুট ভালবাসে। তাহারাই দলে দলে জুটিতে লাগিল এবং শুকদেবের কাজ হইল তাহাদের তাড়ানো। সে চায় যে শালিকটাকে সে ধরিয়াছিল সে-ই আসুক। কিন্তু কই ? সে তো আসে না। তাহার পর একদিন এক নির্জন দ্বিপ্রহরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল শুকদেব। শালিকটা আসিয়াছে। কাক কাঠবিড়ালী চড়াই নাই—একা শালিকটাই। মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল শুকদেব। ইহার পর হইতে প্রায়ই আসিত। নির্জন দ্বিপ্রহরে আসিত। মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিত শুকদেব। একটা কথা জানিলে শুকদেব কি হতাশ হইত ? যে শালিকটাকে সে ধরিয়াছিল সে শালিকটা আসিত না। আসিত আর একটা শালিক।

দুটি মৃত্যু

ছোট বাগান। কাঠাখানেক জমির উপর। কয়েকটা লেবুগাছ, পেয়ারা গাছ আর পেঁপে গাছ। তার একদিকে দেওয়াল। আর একদিকে বাবুর বাড়ির সবুজ 'লন'টা। দেওয়ালের ওপারে গলির রাস্তা। তার ওপারে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। মাঝে মাঝে ঘন সবুজ দেব-দারু গাছ। বাগানের একধারে ভাঙা তক্তাপোশ একটা। তারই উপর ব'সে থাকে আট বছরের মেয়ে ঝিমুনি একটা বাঁখারি উঁচিয়ে। হনুমান তাড়াবে। হনুমান এলেই লাঠি উঁচিয়ে হারেরেরে ক'রে চীৎকার করে ওঠে সে। ভাঙা কেরোসিনের টিনটা পিটতে থাকে।

কিন্তু এ ছাড়াও বাগানে আরও অনেক কাণ্ড ঘটে। তা ঝিমনির চোখে পড়ে না। পড়ে দোতলার বাবুর চোখে। বাবুটি অদ্ভুত লোক। দোতলায় জানলার ধারে আরাম কেদারায় বসে বসে চুরুট ফোঁকেন আর চেয়ে থাকেন বাইরের দিকে। পাশে একটা টেবিলে কিছু কাগজপত্র আর লেখবার সরঞ্জাম থাকে। মাঝে মাঝে উঠে লেখেনও। ঝিমনি শুনেছে বই লেখেন তিনি। কি বই লেখেন কেমন বই এ সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই ঝিমনির। তবু বাবুর উপর শ্রদ্ধা আছে তার। অন্যমনস্ক লোক, কিন্তু দিলদরিয়া। মাঝে মাঝে হঠাৎ চ'টে চেঁচামেচি চীৎকার করেন বটে, মনে হয় পান থেকে চুন খসলে কুরুক্ষেত্র করবেন এখনি—কিন্তু করেন না। চীৎকার করেই থেমে যান, ভুরু কুঁচকে মাথা হেঁট ক'রে গুম হয়ে চেয়ারে ব'সে পা দোলান খানিকক্ষণ— তার পরই জল হয়ে যায় সব। কিনুয়া চাকরটাকে হাঁক দিয়ে বলেন—কিনুয়া কফি করে নিয়ে আয় এক কাপ। কিনুয়া কফি করে দিয়ে যায়। সেটা খেয়ে আবার চুরুট ধরান—বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে থাকেন আবার। ঝিমনির সঙ্গেও ভদ্র ব্যবহার করেন খুব। তাকে যখন বাহাল করেছিলেন তখন বলেছিলেন, তোর মাইনে পাঁচ টাকা। যত খুশি পেয়ারা খাবি। কিন্তু না বলে চুরি করিস নি কখনও। কিন্তু তবু ঝিমনির চুরি করতে ইচ্ছে হয়। তার দাদাটা পেঁপে খেতে কি যে ভালবাসে। তার রুগ্ন মা

বিছানা থেকে উঠতে পারে না, বৌদি তাকে বার্লি করে দেয়, নুন দিয়ে। মা বলে—নেবু দিলে খাওয়া যেত। এতো অখাদ্য। ঝিমনির ইচ্ছে করে দু' একটা পেঁপে দু' একটা লেবু চুরি ক'রে নিয়ে যেতে। লোভ হয় তার। বড্ড লোভ হয়। মনে হয় বাবুকে চাইলে কি দেবেন না? নিশ্চয় দেবেন। সেদিন তো কিনুয়াকে অমন শৌখীন জামাটা দিয়ে দিলেন। তাকেও কাপড় কিনে দিয়েছেন একটা। কিন্তু চাইতে লজ্জা করে। চাওয়া মানেই তো ভিক্ষে করা। যে বুড়ো ভিকিরিটি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় সকলের গাল খেয়ে তাকে দেখে ঘেন্না হয় ঝিমনির। না, সে ভিক্ষে করতে যাবে না। হঠাৎ লোভটা যেন তার মনশ্চক্ষে রূপ ধ'রে দেখা দিল। তাকে বলতে লাগল আর নিয়ে নে না একটা লেবু, আর একটা পেঁপে! অত তো রয়েছে ওর। অত নিয়ে কি করবে ও। নিয়ে নে তুই দু'চারটে। কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কাণ্ডও হল। আর একটা ছবিও ফুটে উঠল তার মনে। অনেকদিন আগে যাত্রা দেখেছিল একটা। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ হয়েছিল তাতে। তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ। তরোয়াল হাতে সেই ধর্মের ছবিটা জেগে উঠল মনে। আশ্চর্য হল দেখে, লোভও একটা তলোয়ার বার করেছে। সেই ভাঙা তক্তাপোশ, বাঁ পায়ের পাতাটা নাচাতে নাচাতে ঝিমনি এই অদ্ভুত যুদ্ধটা দেখতে লাগল আধ-বোজা চোখে শুয়ে শুয়ে।

দোতলার ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে লেখক বাবুটিও আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছিলেন একটা। প্রত্যক্ষ দেখছিলেন। সূর্যের স্বর্ণকিরণ পেঁপে গাছের ভিতর দিয়ে সবুজ লেবু গাছের উপর পড়েছিল। লেখকের মনে হচ্ছিল আলো-ছায়ার তৈরি একটা শাড়ির প্রান্ত যেন দুলছে। পেয়ারা গাছের ঈষৎ বাঁকা যে ডালটা একটু মাত্র দেখা যাচ্ছে, যার বাকী অংশটা ঢাকা পড়েছে লেবু গাছের ডাল-পালার আড়ালে—সে ডালটা মনে হচ্ছে কার যেন পেলব বাহু। আর কি আশ্চর্য মসলিনের ওড়না জড়ানো রয়েছে হাতের উপরে। সোনার সুতোয় বোনা। মনে হচ্ছে তার থেকে রামধনুর রংও যেন ফুটি ফুটি করছে। মাকড়শার বিস্তৃত জালটার নূতন অর্থ নূতন মহিমা স্পষ্ট হয়ে উঠছে কবির চোখে। ইউকালিপট্যাস গাছের ডালে বসে দোয়েল তান ধরেছে। দোয়েলটাকে দেখতে পাচ্ছেন না কবি। তাঁর মনে হচ্ছে বিরহের ভৈরবী বাজছে ওই পরমাশ্চর্য আবির্ভাবের কণ্ঠ থেকে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। একটা পেঁপের ডাল এসে পড়েছে মুখের জায়গাটায়। কবি উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন হয়তো পেঁপের ডাল সরিয়ে উৎসুক চোখে কেউ চাইবে একবার উপর দিকে—।

কিন্তু হল না কিছু।

ঝিমনি যেই দেখল ধর্ম তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলছে লোভকে সেই মুহূর্তে হনুমান লাফিয়ে পড়ল একটা। হারেরেরে করে চেঁচিয়ে উঠল সে বাঁকারি উঁচিয়ে।

কবির স্বপ্নেরও মৃত্যু হল।

দু' দুটো মৃত্যু হল, কিন্তু কোন হাহাকার শোনা গেল না।

কবি ভুরু কুঁচকে সিগারেট ধরালেন একটা।

ঝিমনি টিন পিটতে লাগল।

আত্মীয়

যে ঘটনাটি লিপিবন্ধ করিতেছি, তাহা অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু আমার কাছে ইহা অসামান্য হইয়া আছে।

আমার মোটরটি যেখানে খারাপ হইল, সেখানে একদিকে জঙ্গল। ড্রাইভার মোটরের 'বনেট' খুলিয়া অনেকক্ষণ ঝুঁকিয়া রহিল, খানিকক্ষণ কি খুটখাট করিল। তাহার পর বলিল—রাম বেগড়ান বিগড়েছে। গাড়ির নীচে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানেও খানিকক্ষণ কি খুটখাট করিল। তাহার পর ধূলি-ধূসরিত দেহে বাহির হইয়া আসিয়া মোটরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, যতই বেগড়াও, আমি তোমাকে শায়েস্তা করবই। যুগলের কাছ থেকে কোন মোটরই আজ পর্যন্ত রেহাই পায়নি। যুগল শুধু ড্রাইভার নয়, মেকানিকও। মাসিক দুই শত টাকা বেতন দিয়া তাহাকে বাহাল করিয়াছি। ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হয় নাই। আমার পুরাতন অস্টিন গাড়িটিকে সে শায়েস্তা করিয়াই রাখিয়াছে। যুগলের ঝোলা কটা গোঁফ, ভুরুগুলিও ঝাঁকড়া। সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া থাকে। এককালে না কি মিলিটারিতে ছিল। মিলিটারি ধরনের খাকি রঙের পোষাক পরিতে ভালবাসে। পায়ে একজোড়া শত-জীর্ণ মিলিটারি বুট। খালি বুট, মোজা নাই।

আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। তবে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগবে। আপনি ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসুন না। জঙ্গলের ওপারে একটা গ্রাম আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার যন্ত্রপাতি সব এনেছ তো—যুগল সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিল। ভাবটা—বলেন কি! যন্ত্রপাতি আনব না!

বলিল—যুগল বাইরে বেরুবার আগে, সব যন্ত্রপাতি মায় ব্ল্যাকটেপ, তার, একটা পাঁউরুটি, এক টিন জল, একটিন মোবিল নিয়ে তবে গাড়ি স্টার্ট করে। আমার সব ঠিক আছে। আপনি একটু ঘুরে-ফিরে আসুন। ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পিচের রাস্তা ধরিয়া কিছু দূরে আগাইয়া গেলাম। তাহার পর অজানা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। জঙ্গলে নানা রকম গাছ, নানারকম লতা, চমৎকার ফুলও ফুটিয়া রহিয়াছে মাঝে মাঝে। আমি তাহাদের একটারও পরিচয় জানি না। কয়েক রকম পাখীও দেখিলাম, প্রায় সবাই আমার অপরিচিত, সবাই অনাত্মীয়। শালিক এবং কাক মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু তাহারাও আমাকে আমোল দিল না। কাছাকাছি আসিতেই উড়িয়া গেল। ঘড়িতে দেখিলাম এগারোটা বাজিয়াছে। রোদের তাত বাড়িতেছে। মনে হইল যেন অজানা অচেনা অপরিচিত একটা পরিবেশের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি। চারিপাশে যাহারা আছে তাহারা আমার আত্মীয় নয়। তাহাদের আমি চিনি না, তাহারাও আমাকে চেনে না। গিরগিটিরা আমাকে দেখিয়া সর-সর করিয়া ছুটিয়া পলাইল। কাঠবিড়ালীরা আমাকে দেখিয়া ঔৎসুক্যভরে এমনভাবে আমার দিকে চাহিল যাহার অর্থ, তুমি আবার কে! তাহার পর তড়তড় করিয়া উঁচু

ডালে উঠিয়া গেল। আমি যেন শত্রু। অনেকক্ষণ হাঁটিয়া বনটা পার হইলাম। মনে হইল যেন একটা রূপকথার অলীক দেশের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলাম—যে দেশের সহিত আমার বুদ্ধির এবং কল্পনার যোগ হয়তো আছে, কিন্তু অন্তরের যোগ নাই। এ বন আমার আত্মীয় নয়। বনের ঠিক ওপারেই দেখিলাম আর একটি পথ রহিয়াছে। পায়েচলা পথ। পথের দুই ধারে দেখিলাম, অনেক ধুতুরা গাছ। কনক ধুতুরা। অনেক ফুল ফুটিয়াছে। ধুতুরা ফুলের সহিত আমার অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। ছেলেবেলায় যখন গ্রামের বাড়িতে থাকিতাম তখন ধুতুরা ফুলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের বাড়ির উঠানেই কয়েকটা ধুতুরা গাছ ছিল। মা ধুতুরা ফুল লইয়া শিবমন্দিরে পূজা দিতে যাইতেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। হঠাৎ মনে হইল মায়ের পুণ্যস্মৃতিই যেন ধুতুরা ফুলগুলিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মা অনেকদিন আগে চলিয়া গিয়াছেন, গ্রামের সে বাড়িও নাই। আমি ইয়োরোপ, আমেরিকা বহুস্থানে ঘুরিয়া এখন বিশ্বমানব পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছি, আমার বাঙ্গালীত্ব অনেকদিন পূর্বে ঘুচিয়া গিয়াছে, নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজন তেমন কেহ নাই, দূর সম্পর্কীয় যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সহিত আত্মিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা আমার কাছে মাঝে মাঝে আসেন বটে কিন্তু আসেন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমার জন্য নহে। আমাকে তাঁহারা ভালবাসেন না, ঈর্ষা করেন। এখনও বিবাহ করি নাই। ক্লাবে ক্লাবে পার্টিতে-পার্টিতে বন্ধনহীন যাযাবরের মতো ঘুরিয়া বেড়াই। আমার এক মাদ্রাজী বন্ধু-পত্নীর নিমন্ত্রণে কলিকাতা যাইতেছিলাম, পথে মোটরটা খারাপ হইয়া গেল। আমার জীবনে এসব ঘটনা নতুন নহে, পথে পথেই জীবন কাটিতেছে, মাঝে মাঝে মোটরও বেগড়ায়, আজ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে অভিনবত্ব কিছু নাই, অভিনবত্বের মধ্যে দেখিতেছি পথের ধারে এই ধুতুরা ফুলগুলি দেখিয়া কেমন যেন সহসা অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার মা, আমার গ্রামের বাড়ি, গ্রামের শিবঠাকুর, আমার বাঙ্গালীত্ব সব যেন ওই ফুলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল।

একটা ধুতুরা গাছের কাছে বসিয়া পড়িলাম। পরনে হাফ প্যাণ্ট ছিল, বিশেষ অসুবিধা হইল না। বসিতে গিয়া অনুভব করিলাম আসিবার সময় বন্ধু-কন্যার জন্য যে লজেন্স আনিয়াছিলাম সেগুলি হয়তো চাড় লাগিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। সেগুলি প্যাণ্টের পকেট হইতে বাহির করিয়া কামিজের বুক পকেটে রাখিলাম।

ধুতুরা ফুলগুলির নিকট আমি কি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম জানি না কিন্তু ফুলগুলির গায়ে হাত দিয়া কেমন যেন হতাশ হইয়া গেলাম। ইহারাও তো আমার সম্বন্ধে উদাসীন! বিশেষ কোন আত্মীয়তার স্পর্শ তো প্রাণে সাড়া জাগাইল না। কয়েকটা খঞ্জন উড়িয়া আসিয়া আমার কাছেই বসিয়াছিল কিন্তু আমাকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল, যেন তাহারা ভুল জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উঠিয়া আবার হাঁটিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরেই সেই গ্রামটায় যখন পেঁীছিলাম তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কোনও গ্রামেরই আর সেকেলে গ্রাম্যভাব নেই। সর্বত্র শহরের এবং আধুনিক সভ্যতার ছাপ পড়িয়াছে। প্রথমেই গ্রামে ঢুকিয়া একটি কোট, প্যাণ্ট, শার্ট পরা লোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহার কাঁধে ট্র্যানজিস্টার, মুখে চুরুট। আমার

দিকে তিনি একবার তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। একটি কথাও বলিলেন না। মনে হইল কোন সাইকেল কোম্পানীর লোক বোধহয়। কারণ নিকটেই যে সাইকেলের দোকানটি ছিল সেখানেই তিনি গেলেন। তাহার পর একটি চায়ের দোকান দেখিতে পাইলাম। দোকানের নাম 'বল্লরী', কিন্তু দোকানটি অতিশয় নোংরা। ময়লা টেবিল, নড়বড়ে টিনের চেয়ার, আর ময়লা কতকগুলি কাপ-ডিশ, দোকানের সামনেই একটা কয়লার উনানে প্রকাণ্ড একটা কালো কেৎলিতে জল ফুটিতেছে। চায়ের খরিদ্দার দুই-চারিজন রহিয়াছে দেখিলাম। কিন্তু আমার প্রতি কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না। আমি যদি একটা সাপ বা নীলকণ্ঠ পাখী হইতাম তাহা হইলে হয়তো ইহারা হৈ-হৈ করিয়া উঠিত। কিন্তু আমার মতো হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-পরা লোক আজকাল মোটেই বিরল নয়। আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডকটরেট, একথা জানিলেও তাহারা আমার প্রতি মনোযোগ দিত কিনা সন্দেহ, কারণ পথে-ঘাটে আজকাল ডকটরেটেরও ছড়াছড়ি। তাছাড়া ডক্টরেট কথাটার তাৎপর্যও অনেকে জানে না। এই নোংরা চায়ের দোকানে ঢুকিয়া আমারও এক কাপ চা খাইবার ইচ্ছা হইল। যদি চা খাইতে খাইতে কাহারও সহিত আলাপ হইয়া যায়। কিন্তু পকেটে হাত ঢুকাইয়া দেখিলাম আমার মানি-ব্যাগটি গাড়িতেই আমার সুটকেশের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং চায়ের দোকানে ঢোকা গেল না। আগাইয়া গেলাম। পথে অনেক লোকের সহিতই দেখা হইল, কিন্তু কেহই আমার সম্বন্ধে তাদৃশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল। বহুকাল আগে অ্যানথ্রপলজির (Anthropology) একটা বইয়ে পড়িয়াছিলাম প্রাগৈতিহাসিক যুগে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে দেখিলে তাড়া করিয়া মারিতে যাইত। তাহার পর কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, মানুষ এখন মানুষকে দেখিলে তাড়া করিয়া যায় না। একটা মেকি মুখোশে নিজেকে তাহারা ঢাকিয়া রাখিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে বা হাবভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখনও বক্র বৈরীভাব সুস্পষ্ট।

······হাঁটিতে লাগিলাম। আরও অনেক লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সকলেই নিজ-নিজ কর্মে ব্যস্ত, রাস্তায় দাঁড়াইয়া অনেকে আড্ডা দিতেছে, আমার প্রতি কেহই মনোযোগ দিবার প্রেরণা পাইল না। কিছু দূরে আগাইয়া দেখিলাম এক জায়গায় খুব ভীড়। বাঁদর এবং ভালুক নাচ হইতেছে। হঠাৎ অনুভব করিলাম ক্ষুধা পাইয়াছে। প্রচণ্ড ক্ষুধা। ঘড়িতে দেখিলাম একটা বাজিয়াছে। দুই ঘণ্টা হাঁটিয়াছি। ঠিক করিলাম কোথাও বিশ্রাম করিয়া আবার মোটরেই ফিরিয়া যাইব। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম করি? হাঁটিতে হাটিতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। দূরে টিলার মতো একটা উঁচু জায়গা দেখা গেল। সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম টিলার ওধারে একটা গাছ রহিয়াছে, গাছের নীচে একটি চার-পাঁচ বছরের ছেলেও বসিয়া আছে। আমিও একটু দূরে গিয়া বসিলাম। মনে হইল গাছপালার অরণ্য এবং মানুষের অরণ্য দুই-ই পার হইয়া আসিলাম। অপরিচিত আগন্তুকের প্রতি সবাই সমান উদাসীন। ঘাড় ফিরাইয়া ছেলেটির দিকে চাহিলাম। সেও আমার দিকে চাহিয়াছিল। চোখোচোখি হইতেই সে হাসিল। তাহার সে হাসিতে কি যে জাদু ছিল জানি না, আমার হতাশ বিষণ্ণ অন্তঃকরণ সহসা যেন সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উঠিয়া তাহার নিকট গেলাম এবং তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি?

মটরু।

এখানে একা বসে আছ কেন ?

আমার মা আমাকে এখানে বসিয়ে কাঠ কুড়োতে গেছে, এখনই আসবে।

তোমাদের বাড়ি কোথা ?

কাছেই।

ছেকা-ছেনি ভাষায় হিন্দীতে কথা হইল।

আমার মনে পড়িল আমার পকেটে কিছু লজেন্স আছে। বাহির করিয়া তাহাকে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব জমিয়া গেল। তাহার বাড়ির সব খবর লইলাম। তাহার বাবা মজুরের কাজ করে। তাহার এক ছোট বোন আছে—কুসমি। অত্যন্ত বদমাস। মাকে খালি জ্বালায়। মা তাহাকে নানীর কাছে রাখিয়া আসে। নানীকেও জ্বালাতন করে খুব। আমার খবরও তাহাকে বলিলাম। বলিলাম যে বড় রাস্তায় আমার মোটর খারাপ হইয়া গিয়াছে। মিস্ত্রী সেটা ঠিক করিতেছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ইচ্ছা হইয়াছিল দোকানে ঢুকিয়া চা খাই, কিন্তু পয়সার 'থইলি'টি মোটরে ফেলিয়া আসিয়াছি। তাই কিছু খাওয়া হইল না। ছেলেটিকে সব লজেন্সগুলিই দিয়াছিলাম। সে তাহা হইতে একটা লজেন্স আমার দিকে তুলিয়া ধরিল।

"ভুখ" লেগেছে ? এটা তাহলে তুমি খাও।

হাসিয়া বলিলাম, আমার খুব জোর "ভুখ" লেগেছে। পরে মোটরে গিয়ে আমি খাব। ওটা তোমার বোন কুসমির জন্যে রেখে দাও।

একটু পরেই তাহার মা আসিয়া পড়িল। মাথায় এক বোঝা শুকনো ডাল। পরনে আড়-ময়লা ছেঁড়া কাপড়। মাথার চুল রুক্ষ। চোখের দৃষ্টি কিন্তু সজীব এবং হাসিমাখা। মাথায় ঘোমটা নাই।

ছেলেকে লইয়া সে চলিয়া গেল। ছেলেটি সোৎসাহে লজেন্স দেখাইয়া আমার সম্বন্ধেই সম্ভবত নানাকথা তাহার মাকে বলিতে লাগিল। ক্রমশ বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহারা। আমার মনে হইল এতক্ষণ পরে একটি মাত্র আত্মীয় পাইয়াছিলাম সেও চলিয়া গেল।

……খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চুপ করিয়া আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চক্রবাল রেখায় খানিকটা শাদা স্তূপ মেঘ নানাভাবে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিতেছিল, তাহারই লীলা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় পিছনের দিকে শব্দ হওয়াতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মটরুর মা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মটরুর মায়ের হাতে একটা পিতলের থালা এবং একঘটি জল। থালাটি সে আমার সামনে নামাইয়া দিয়া কুণ্ঠিতভাবে ঘোমটা টানিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

মটরু সোৎসাহে বলিল—খা বাবু। আমার মা আমার কাকাকে পাঠিয়েছে। সে তোমার মোটরকে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। তুমি খেয়ে এখানেই বসে থাক।

থালায় দুইখানি রুটি ছিল, মোটা রুটি। আর কিছু আলুর "ভুজিয়া"।

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। আমাদের সভ্য চোখে সহজে জল বাহির হয় না। কিন্তু বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

ভারতবর্ষের অনেক শহরে বড় বড় সভায় ভারতবর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছি। শুনিয়াছিও অনেক। কিন্তু সেদিন ওই নিরক্ষর কাঠকুড়ানীর মধ্যে সে আদর্শকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু আমার নিকট আজও তাহা অসামান্য হইয়া আছে।

জন্মান্তরে

॥ ১ ॥

দোষ যে কার তা বলা শক্ত। আসলে দোষ কারো নয়। দোষ পরিবেশের। ওই পরিবেশের মধ্যে শান্তি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। না পারার জন্যও তাকে দোষ দিই না, কারণ সে মানবী, দেবী নয়। দ্বিতীয় পক্ষের বর তাকে বিয়ে করে এনে প্রথম দিনই শোবার ঘরে একটি অয়েল-পেন্টিং ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন—"ওকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার দুরদৃষ্ট তাই ও রইল না। ভেবেছিলাম আর বিয়ে করব না, কিন্তু মায়ের অনুরোধে করতে হল। ওই ছবির নীচে রোজ দুটো ক'রে মহিশূরী ধূপ কাঠি জেলে দি। তুমিও দিও। আর একটা অনুরোধ করব, যদিও তুমি খোকনের মায়ের স্থান অধিকার করতে পারবে না, কিন্তু তবু ওকে কাছে টেনে নিও—।"

এই কথা শোনামাত্র খোকনকে কাছে টানার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শান্তির আর ইচ্ছে হয়েছিল ওই ছবিটাকে টেনে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিতে! তার স্বামী নরেশবাবু শিক্ষিত লোক। তিনি ঠিক প্রথম দিনই যদি ওই কথাগুলো অমন আবেগ-গদ-গদ-কণ্ঠে না বলতেন তাহলে হয়তো শান্তির মনের অবস্থা অন্যরকম হত।

অন্য কারণও ছিল।

নরেশবাবুর মা বিষধর সর্পিণী একটি। যখন কথা বলেন মনে হয় ছোবল মারছেন। বিয়ের পরই তিনি শান্তির রূপের এবং শান্তির বাবা-মায়ের ছোট নজরের যে কড়া সমালোচনা করেছিলেন তাতে শান্তি যদি পাথরের মূর্তি হত তাহলে ফেটে যেত, সে পাথরের মূর্তি নয় বলেই বিদীর্ণ হল না, কিন্তু তার মন বিষাক্ত হয়ে গেল। বাইরে লোক দেখানো-ভাবে খোকনকে সে আদর করতে গিয়েছিল কিন্তু নরেশবাবুর মা 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন। এমন ভাব করলেন খোকন যেন শত্রুর কবলে পড়েছে। খোকনকে নরেশবাবুর মা-ই খাওয়াতেন, নাওয়াতেন, কাছে কাছে রাখতেন। খোকন রাত্রে তাঁর কাছেই শুত। নরেশবাবুর মা এমন একটা ভাব দেখাতেন যেন সংসারের সব কিছুই খোকনের, তার সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি সহ্য করবেন না তিনি, তার সেবা-যত্ন তিনি করবেন নিজের হাতে আর শান্তি কেবল দাসীর মতো সে সেবার উপকরণ জুগিয়ে দেবে—খোকনের জামা-কাপড়ে সাবান দেবে, তার জন্যে ভালমন্দ খাবার করবে—বাস্ আর কিছু না।

খোকনের বয়স মাত্র তিন বছর। কিন্তু কি আদুরে, কি বায়নাদার ছেলে। বাড়ির আবহাওয়ায় তার কান্না চীৎকার চেঁচামেচির ঝড় বইত দিন-রাত্রি।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শান্তি। সে যদি লেখাপড়া জানত—যদি অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবার তার সুযোগ থাকত হয়ত পালিয়ে যেত সে। কিন্তু সে সুযোগ ছিল না তার। একটা অনড় খুঁটিতে বেঁধে সংসার তাকে চাবকাচ্ছিল। চাবুকটা হল ওই খোকন, আর চাবুক চালাচ্ছিলেন তার ঠাকুমা। কিন্তু একটা কথা শুনলে আপনারা হয়তো বিস্মিত হবেন—ওই চাবুকটাকে—ওই খোকনকেই—আদর করবার ইচ্ছা ক্রমশ অঙ্কুরিত হতে লাগল তার মনে। অমন সুন্দর অনিন্দ্যকান্তি ফুটফুটে ছেলে, দেখলেই কোলে করতে ইচ্ছে করে যে, চুমু খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার এ গোপন ভালবাসা প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। তবু খোকনকে প্রায়ই সে আড়ালে ধরবার চেষ্টা করত। একদিন ধরেও ছিল, কিন্তু খোকন তার হাতে কামড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আর চীৎকার করে বলতে লাগল—"ঠাকুমা-ঠাকুমা, লাক্কুসি আমাকে জাপটে ধলেছিল—!" সর্পিণী সংগে সংগে ফণা তুলে তেড়ে এলেন। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু একভাবে চিরদিন চলে না। সর্পিণীরাও অমর নয়। খোকনের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার ঠাকুমা মারা গেলেন। শান্তির মনে হল এইবার বুঝি খোকন তার কাছে ধরা দেবে। কিন্তু দিল না। ঠাকুমা তাকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—শান্তি ডাইনি, শান্তি রাক্ষসী, ওর কাছে খবরদার যাস নি। কিছুতেই সে যেতে চাইত না শান্তির কাছে। বাড়ির পুরোনো ঝি সৌদামিনীই তাকে তেল মাখাত, স্নান করাত, ভাত খাওয়াত। সৌদামিনীর কাছেই রাত্রিবেলা শুত সে। শান্তিকে সে নানাভাবে জ্বালাতন করত কেবল। কখনও তার কাপড় ছিঁড়ে দিত, কখনও তেলের শিশি উল্টে দিত, কখনও সাবানটা ফেলে দিত কুয়োর ভিতর। নরেশবাবু কিছু বলতেন না। শান্তি এক দিন তাঁকে বলেছিল—'ওকে তুমি একটু শাসন কর। কি দুষ্টুমি যে করে, আর, আমাকে কি খারাপ-খারাপ গাল যে দেয়!' নরেশবাবু একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন—'আমার শাসন ও শুনবে না, কারণ আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।'

সেদিন যে ঘটনাটা ঘটল তা সামান্য। কিন্তু তা অসামান্য হয়ে উঠল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। ভাঁড়ার ঘরে শব্দ শুনে শান্তি চীৎকার করে উঠল—কে রে। কোন উত্তর নেই। ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে খোকন নাগরির ভিতর হাত ঢুকিয়ে খেজুরে গুড় খাচ্ছে। মুখে-বুকে-হাতে খেজুর গুড় মাখামাখি।

তবে রে—।

একটা চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল শান্তি। খোকন ছুটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। রাস্তায় বেরিয়ে সে হাসি মুখে চেয়ে রইল খিড়কির দরজাটার দিকে। ঠিক সেই সময়ে একটি ফটোগ্রাফার আবির্ভূত হলেন রাস্তার আর এক প্রান্তে। ইনি সেই জাতের ফটোগ্রাফার যাঁরা ঘুরে-ঘুরে নানা রকম ফটো তুলে বেড়ান এবং দাঁও-মাফিক সেগুলো বিক্রি করেন। অনিন্দ্যকান্তি খোকনের ফটোটা তিনি তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

খিড়কির দরজায় মুখ বাড়িয়ে শান্তি ডাকাডাকি করতে লাগল—আয়, আয়, শিগগির আয় বলছি—

খোকন এল না। হাসতে লাগল।

তবে রে—

তাড়া করে বেরিয়ে এল শাস্তি। খোকন ছুটতে লাগল। বেশীক্ষণ ছুটতে হল না তাকে, একটা প্রকাণ্ড লরী আসছিল, তার তলায় চাপা পড়ে গেল সে।

সন্ধ্যাবেলা নরেশবাবু এসে দেখলেন শাস্তির দেহটা ঘরের আড়কাটা থেকে ঝুলছে। আত্মহত্যা করেছে সে।

॥ ২ ॥

তিরিশ বছর পরে।

কুমোরখালি চেরিটেবল ডিসপেন্সারি। ডাক্তারবাবুর চারিদিকে নানারকম রোগীর ভীড়। সামনের দেওয়ালে একটি ক্যালেণ্ডার টাঙানো। ক্যালেণ্ডারে খোকনের ছবি। খোকনের সেই ফোটোগ্রাফ একটি ঔষধ ব্যবসায়ী কাজে লাগিয়েছেন—মলটু-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, খোকনের হাতে কায়দা করে মলটের শিশিটাও ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। খোকন যেন মহানন্দে মলটু খাচ্ছে—বুকে মুখে চারিদিকে মলটু মাখামাখি। খোকন হাসছে। চমৎকার দেখাচ্ছে।

রোগীর ভীড়ের মধ্যে একটি যুবতী বারবার চেয়ে চেয়ে দেখছে খোকনকে। মাঝে মাঝে নির্নিমেষ হয়ে যাচ্ছে সে।

"তোমার কি চাই—"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাকে।

"আমার শাশুড়ির কোমরে ব্যথা হয়েছে ডাক্তারবাবু—"

"কতদিন থেকে "

"দিন সাতেক হয়েছে—"

"আচ্ছা, একটা মালিশ লিখে দিচ্ছি। রোজ দু'-তিনবার মালিশ কোরো। আর গুলি দিচ্ছি কয়েকটা, চারঘণ্টা অন্তর খাইও—তিনদিনের ওষুধ দিলাম।" প্রেসক্রিপশন নিয়ে তবু বসে রইল মেয়েটি। চেয়ে রইল ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে।

"যাও, ওষুধ নিয়ে যাও"—ডাক্তারবাবু বললেন।

"হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি—। ওটা কার ছবি ডাক্তারবাবু—"

"ওটা ক্যালেণ্ডার—"

"ও"

মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ ছবিটার আশেপাশে ঘুরঘুর করল। আরও বারকয়েক দেখল তারপর ওষুধ নিয়ে চলে গেল।

তারপর দিন আবার এল সে।

চেয়ে রইল ছবিটার দিকে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন আছেন তোমার শাশুড়ি?"

"ভাল আছেন—"

"তিনদিনের ওষুধ দিয়েছি তো, আজ তবে এলে কেন

"না, এমনি—মানে এই ছবিটাকে দেখতে এলাম—"

"ছবিটা খুব ভাল লেগেছে?"

চুপ করে রইল। হঠাৎ ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল তার। চোখে জল ভরে এল।

"কি হল—!"

"না, কিছু নয়—"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে চোখের জল মুছে ফেলল সে। তারপর বলল, "জানি না কেমন করে ওর ছবি এখানে এল—"

"কার ছবি ?"

"আমার খোকনের। পাঁচ বছর বয়সে সে মারা যায়। এ-ছবি আপনি কোথায় পেলেন ? ক্যালেণ্ডার কি ?"

নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে ক্যালেণ্ডার কি তা বোঝানো শক্ত।

"তোমার ছেলে এইরকম ছিল ?"

"অবিকল। সেই মুখ, চোখ, সেই হাসি—"

"আচ্ছা, ছবিটা তুমি নিয়ে যাও—"

"দেবেন আমাকে ? দেবেন ? সত্যি ?"

ডাক্তারবাবু ক্যালেণ্ডারটা পেড়ে তার হাতে দিলেন। ছবিটাকে সে ক্রমাগত চুমু খেতে লাগল।

"আমাকে ছেড়ে কোথা পালিয়েছিলি, কোথা পালিয়েছিলি, চল বাড়ি চল—"

ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। ছবি-জন্মে খোকন যে মাকে পেল সে তার নিজের মা, শাস্তি, না আর কেউ ? কে জানে !

বনফুলের নূতন গল্প

উৎসর্গ

পরম স্নেহাস্পদ
সুবিদগ্ধ সুরসিক সুলেখক
ডঃ শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
পণ্ডিতপ্রবরেষু

একটি কিউরিও

আমি এ গল্পটি লিখতাম না। সকলকে সাবধান করবার জন্যই লিখছি। কোনও অচেনা দোকান থেকে অপ্রচলিত মূল্য দিয়ে কোনও জিনিস কিনবেন না। চেনা দোকান থেকে নগদ টাকা দিয়ে জিনিস কেনাই ভালো।

আমি স্ত্রীলোক। ইচ্ছে করেই আমার নামটা গোপন রাখছি। কেন রাখছি তা গল্পটা পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

আমার বয়স তখন ষোলো। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। বাবা ভারত গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে ভারতের বাইরে যেতে হ'ত। ইয়োরোপের নানা দেশে, আমেরিকায়, এমন কি ইজিপ্টেও যেতেন তিনি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যে ঘটনাটি বলছি সেটি কায়রো শহরে ঘটেছিল। বাবা একদিন আমাকে বললেন—"আমি একটা জরুরী 'কেবল' পেয়েছি। আজই আমাকে লণ্ডনে যেতে হবে। তুই একলা থাকতে পারবি তো?"

বললাম—"খুব পারবো। ক'দিন দেরি হবে তোমার?"

"তিন চার দিনের মধ্যেই ফিরব।"

বাবা চলে গেলেন।

আমি বিকেলে একাই বেরিয়ে পড়লাম। কায়রো শহরের অতীত ইতিহাসে অনেক রহস্যময় কাহিনী আছে। মনে হল এই বিজ্ঞানের যুগে সে রহস্যের কোথাও কি কিছু অবশিষ্ট আছে আর? অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরতে লাগলাম রাস্তায়। কতক্ষণ ঘুরেছিলাম জানিনা। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম অনেক রাত হয়ে গেছে আর আমি একটা সরু গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম সেখানে সারি সারি অনেক দোকান রয়েছে। একটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তাঁকে প্রশ্ন করলাম—"ওগুলো কিসের দোকান?" তিনি বললেন,—"অনেক রকম দোকান আছে। দুচারটে ভাল 'কিউরিও শপ্' আছে ওখানে।" তিনি চলে যাবার পরও আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই গলিটার দিকে চেয়ে। একটা দোকানের একটা উজ্জ্বল আলো মনে হল ইশারায় আমাকে যেন ডাকছে। আমার সঙ্গে টাকা ছিল। ঢুকে পড়লাম গলিতে এবং সোজা সেই দোকানটার সামনে গিয়েই দাঁড়ালাম। দেখলাম দোকানদার একজন রূপবান যুবক। মনে হল ইহুদী। চমৎকার ব্যবহার, ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে! অনেক রকম অদ্ভুত জিনিস দেখাল আমাকে। সে সবের বর্ণনা দিয়ে গল্পকে ভারাক্রান্ত করব না। কিন্তু যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে পছন্দ হল তা তার দোকানে ছিল না। ছিল তার আঙুলে। চমৎকার আংটি একটি। সোনার আংটি আর কমল হীরের তৈরি অপরূপ কমল একটি বসানো তার উপর। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যেন ছোট্ট একটি জীবন্ত পদ্ম।

জিগ্যেস করলাম—"আপনার হাতের ওই আংটি নিশ্চয় বিক্রির জন্য নয়—"

"আপনি নেবেন? কেউ নিতে চাইলে এ আংটি দিতেই হবে, তা না হলে এ আমার আঙুলে ক্রমশঃ এমন চেপে বসে যাবে যে, আমি তখন একে খুলে ফেলতে বাধ্য হব।"

"কি রকম?"

"এ সাধারণ আংটি নয়। এর দামও অসাধারণ, একে কেনবার শর্তও অসাধারণ। এই দেখুন, আপনি চাইবামাত্র আংটি চেপে বসেছে আমার আঙুলে, আর পদ্মটি দেখুন, যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে—"

সত্যই দেখলাম পদ্মটি আরও লাল হয়ে উঠেছে। জিগ্যেস করলাম—"এর দাম কত ? আর কেনবার শর্তই বা কি ?"

লোকটি স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"এর প্রধান শর্ত হচ্ছে আবার কেউ যদি আপনার কাছ থেকে আংটিটি চায় তখুনি তাকে সেটি দিয়ে দিতে হবে !"

"এর দাম ?"

"সেটা বলতে সঙ্কুচিত হচ্ছি।"

"সঙ্কোচ কিসের ?"

"এর দাম হচ্ছে একটি চুম্বন। আপনি আমাকে একটি চুমু খান। তাহলেই এর দাম আমি পেয়ে যাব। আমি এইভাবেই কিনেছিলাম আর একজনের কাছ থেকে—"

শুনে রাগ হল, লজ্জা।

বললাম—"থাক্, তাহলে আমি নেব না।"

"কিন্তু আপনি একবার যখন চেয়েছেন, এটির প্রতি একবার যখন আপনার লোভ হয়েছে, তখন আপনাকে নিতেই হবে। এ আংটি আমার হাতে রাখা যাবে না, ক্রমশঃ চেপে বসছে, এই দেখুন আঙুল আমার ফুলে উঠেছে, হীরেটাও আগুনের মতো জ্বলছে। আপনাকে নিতেই হবে এটি—"

"কিন্তু ওটা খুলবেন কি করে ? ও তো আঙুলে চেপে বসেছে—"

"আপনি চুমু খেলেই আবার আলগা হয়ে যাবে। উঃ, সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে, আর দেরি করবেন না—"

সত্যি দেখলাম ভদ্রলোকের আঙুল ফুলে উঠেছে। সত্যিই কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আর পদ্মটার প্রতি পাপড়িতে যেন আগুনের ফুলকি !

আর দ্বিমত করতে পারলাম না। যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। ভালই লাগল। আর কি আশ্চর্য আংটিটি সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে গেল। খুলে গেল তার আঙুল থেকে। আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন সেটি, আর সেটি আমার আঙুলে এমনভাবে ফিট্ করে গেল যেন ফরমাস দিয়ে আমি ওটি করিয়েছি।

বাড়ি ফিরে বাবার একটি 'কেবল্' পেলাম। জানিয়েছেন তাঁর ফিরতে সাতদিন দেরী হবে। আমি যেন সাবধান থাকি।

সাবধানেই ছিলাম, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুইনি। কিন্তু চতুর্থ দিন রাতে আমার শোবার ঘরেই ঘটনা ঘটে গেল। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। যে আঙুলে আংটিটা পরেছিলাম দেখলাম সে আঙুলটা টনটন করছে। তরপরই আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ভয়ে। অন্ধকারে দেখলাম আমার মশারির পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। বেড্ সুইচটা টিপতেই আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম জোব্বা-পরা মুসলমানী টুপি পরা বিরাটকায় এক শেখ আমার আংটিটার দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষে। তার মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল। লোলুপ চোখ দুটি ছোট ছোট, ভুরু দুটি ঝাঁকড়া, চোখের তারা সবুজ।

প্রশ্ন করলাম, "কে তুমি—"

উর্দুতে উত্তর দিল, যার বাংলা হচ্ছে—"আমি তোমার ওই আংটিটি পেতে চাই।"

অনুভব করলাম আংটি ক্রমশ আমার আঙুলে চেপে বসছে।

বললাম—"সত্যি চান ?"

"বেশক্।"

"কিন্তু এর দাম—"

"এর দাম কি তাও আমি জানি। তোমাকে একটি চুম্বন দিতে আমার আপত্তি নেই।"

আংটি আরও ছোট হয়ে গেল, দেখলাম পদ্মের পাপড়ির আগুনের আভা। ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম আপত্তি করবার উপায় নেই।

শেখ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। মুখে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। আংটি নিয়ে মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল সে। ঘরের কপাট বন্ধ। কি করে ঘরে ঢুকেছিল তাও বুঝতে পারলাম না। ভুত না কি ? জানি না।

এ কথাটা বাবা বা কাউকেই বলিনি। কিন্তু এখন একটু মুশকিলে পড়েছি। মাস দুই আগে আমার বিয়ে হয়েছে। ভাবছি আমার স্বামীকে জানাব কি যে বিয়ের আগে দু'জন পরপুরুষকে আমি চুম্বন করেছিলাম ? তিনি কি বিশ্বাস করবেন আমার গল্পটা ? মনে হচ্ছে না বলাই ভালো। বিবেক কিন্তু দংশন করছে। সত্যি মুশকিলে পড়েছি !

ছুঁড়িটা

হাওড়া স্টেশনের সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে ছুঁড়িটা। একমাথা রুক্ষ চুল। চোখের কোণে পিঁচুটি। পরনের শাড়িটা ছেঁড়া, ময়লা। গায়ে জামা নেই। যৌবনও শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার জন্যেই তার পিছু নেয় এখনও অনেক লোক। হ্যাংলার মতো ঘোরে ছোঁড়াগুলো। দু' একটা বুড়োও। যারা ধনী, যারা মোটরে চড়ে' যাওয়া-আসা করে তারা ওর দিকে ফিরে চায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভিক্ষে দেয়। তার খদ্দের গরীব কুলীরা, পকেট-খালি ছোঁড়ারা, দু'একটা ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানী। কুলীদের কৃপায় সে গুড্‌স্ শেডের একধারে শুয়ে থাকে রাত্তিরে। আর ভোর থেকে উঠে সে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এলেই ছুটে যায় প্ল্যাটফর্মের গেটের পাশে। গেট দিয়ে পিল্ পিল্ করে কত লোক বেরোয় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্টেশনের টিকিট কালেকটার বাবুরা চেনেন তাকে। তাঁরাই তার নামকরণ করেছেন 'ছুঁড়িটা'। ছুঁড়িটাকে অনুগ্রহ করেন তাঁরা। কেউ কেউ হাসি মস্করাও করেন। তার ছেলে মেয়ে নেই। "নিরোধের" যুগে ছেলেমেয়ে হয় না। সে তার ভাঙা যৌবনকে জোড়াতালি লাগিয়ে ফেরি ক'রে বেড়ায় খালি। কোনও শিশুর স্পর্শ পাবার যোগ্যতা নেই তার। অর্থনীতির কড়া আইনে সে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তার স্নেহ কিন্তু আঁকড়ে ধরেছে সোনাকে। সোনা একটা লোম-ওঠা খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা। মোটরের ধাক্কায় তার একটা পা জখম হয়েছিল। ছুঁড়িটা আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। গুড্‌স্ শেডের একধারে যেখানে

সে শোয় সেখানে সোনাও থাকে। রামলগিন্ কুলী একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়েছে তাকে। মধুসূদন দিয়েছে একটা বালিশ। খলা দিয়েছে ছেঁড়া চাদর একটা। শিবলাল দিয়েছিল ছোট একটি হাত-আয়না আর শস্তা একটা চিরুণী। এ দুটো জিনিস সে ব্যবহার করে না বড় একটা। নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। চুল আঁচড়েই বা কি করবে? এমনিতেই তো লোক জোটে। তার থালা বাটি কিছু নেই। আছে একটা টিনের বড় কৌটো শুধু। সে রান্না করে না। যেদিন যেমন পয়সা জোটে দোকান থেকে কিনে খায়। সোনাকেও খাওয়ায় সে। সোনাই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জার দেখা। গেটের পাশে সে রোজ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুড্স্ শেডের একটা পাশ দুপুরের সময় নির্জন হয়ে যায়। একটু ছায়াও পড়ে। সেই ছায়াতেই মাটির উপর শুয়ে থাকে ছুঁড়িটা। গুড্স্ শেডের ভিতর ভয়ংকর গরম। শুয়ে অনেক সময় ঘুমোয়। মুখে চোখের কোণে মাছি বসে ব'লে মুখটা ঢেকে শোয়। যখন ঘুমোয় না, তখন দিবা-স্বপ্ন দেখে। তার সমস্ত অতীতটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তার মানস-পটে।

মনে হয় তার নাম যে অপ্সরী ছিল একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে আজকাল? স্কুলে কিন্তু তার ওই নামই লেখা আছে এখনও। সে স্কুলে ভাল মেয়ে ছিল, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন হেডমিস্ট্রেস তার নামটা কেটে দিলেন। বললেন, তুমি বাড়ি যাও, এ স্কুলে তোমাকে পড়তে হবে না। সে বাড়ি চলে গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল। মা উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কি হবে স্কুলে পড়ে, তোমার পড়ার খরচ আমি টানতে পারব না। আর পড়েই বা হবে কি? শেষকালে গতর বেচেই তো খেতে হবে।

···তার বাবার কথা মনে পড়ে তখন। তার বাবা একদিন দিল্লী চলে গেল। ব'লে গেল সেখানে নাকি ভাল একটা কাজ পেয়েছে। দিন কতক পরে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবা আর ফেরেনি। মাকে চিঠি লিখেছিল একটা। পঞ্চাশটা টাকাও পাঠিয়েছিল মনি-অর্ডার করে। মা সে টাকা ফেরত দিয়েছিল।

তার মা ঝি গিরি ক'রে বেড়াত। অনেকদিন রাত্রে ফিরত না। কোন কোন দিন মদ খেয়ে ফিরত মাতাল হয়ে।···ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারল সে। বুঝতে পারল মা বেশ্যাবৃত্তি করে। পাড়ার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একদিন তাকে বললেন, তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করেনি, 'রাখনি' রেখেছিল। দিল্লীতে তার বউ ছেলে সব আছে। সে এখন মস্ত লোক। তুই যদি আমার বাড়িতে কাজ করিস তোকে মাসে এক'শ টাকা করে দেবে। আমার বউ মরে গেছে। আমার ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাক তুই। তোর কোন অভাব রাখব না!

সে তখন প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। পারা যায় না। একদিকে অভাব আর একদিকে প্রলোভন। না, নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। তারপর···তারপর সব কেমন যেন আবছা হয়ে যায়, মনে পড়ে একটি পশুত্বের হুল্লোড়ের মধ্যে দিনগুলো কেটে গেছে খালি। মাঝে মাঝে ভালো যে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সবসময় ভালো লাগত না। ভালো না লাগলেও ভালো

লাগার ভান করতে হত। তার কাছে একজন কবি আসতেন, মদ খেয়ে বড় বড় কবিতা আওড়াতেন। কি জঘন্য পশু ছিল লোকটা! একটা কুটেও আসত তার কাছে। বড় লোক, কিন্তু কুটে! অনেক টাকা দিত। মদ খেয়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদত। কতরকম লোকই যে আসত। একদিন কিন্তু ওপাড়া ছাড়তে হ'ল, তার মাকে কে খুন ক'রে গেল একদিন। সে সেদিন বাড়ি ছিল না, এক বাবুর বাগান বাড়িতে গিয়েছিল। সকালে ফিরে এসে দেখে তার মায়ের গলাটা কাটা। বুকের মাঝখানেও একটা ছুরি বসানো।

সেই দিনই পালিয়ে যায় সে সেখান থেকে। পালিয়েও নিস্তার পায়নি। পুলিশের কবলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তার যা কিছু সম্বল ছিল ওই পুলিশের গর্ভেই গিয়েছে। কেউ তাকে বাঁচায় নি, সবাই তাকে লুট করবার চেষ্টা করেছে। সবাই মিলে তাকে চুষে, চিবিয়ে, ছিবড়ের মতো ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। এখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। যারা তাকায় তারাও ছিবড়ে। দেশ? আমাদের দেশ নাকি অনেক ভালো, কিন্তু কই সে তো কোন প্রমাণ পায়নি। একটাও ভালো লোক দেখতে পায়নি সে। সত্যি কি ভালো লোক নেই তাহলে? সবাই কি লোলুপ পশু?

গুড্‌স শেডিংয়ের পাশের জায়গাটায় দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে মুখে ময়লা কাপড় চাপা দিয়ে এইসব কথাই রোজ ভাবে ছুঁড়িটা। তার মনে কিন্তু একটা আশা এখনও আছে। তার মনে হয় তার বাবা একদিন ফিরে আসবে। কেন একথা মনে হয় তা সে জানে না, কিন্তু মনে হয় তার বাবা নিশ্চয় আসবে একদিন। তাই সে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেন এলেই গেটের সামনে দাঁড়ায়, প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে নিরীক্ষণ করে দেখে। কিন্তু বাবার দেখা পায়নি আজও। বাবার ঠিকানাও জানে না, জানলে চিঠি লিখত। তবু সে আশা করে, বাবা একদিন আসবেই। প্রতিটি ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের ভীড়ের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে বাবা ওদের মধ্যে আছে কিনা। না, নেই—রোজই হতাশ হ'তে হয় তাকে।

যদিও দুপুরে শুয়েছিল সে মুখ ঢেকে, হঠাৎ একটা কাগজ উড়তে উড়তে এসে তার মুখের উপর পড়ল। ছাপা হ্যাণ্ডবিল একটা। কাগজটা পড়েই উঠে বসল সে তড়াক করে। কাগজে বড় বড় অক্ষরে তার বাবার নাম ছাপা। তিনি নাকি আগামী-কাল এসে মহাজাতি সদনে একটা বক্তৃতা দেবেন। তার বাবা বক্তৃতা দেবেন? কিসের বক্তৃতা?

পরের দিন সে সকালে উঠে দেখল স্টেশনে বেশ ভীড় হয়েছে। অনেকের হাতে মালা। টিকিট কালেকটারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল হ্যাণ্ডবিলে যার নাম ছাপা তাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছেন এঁরা। তার বাবাকে? কি আশ্চর্য!

ট্রেন এলো। গেটের বাইরে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দেখল অনেক লোকের সঙ্গে তার বাবাই তো আসছেন। গলায় ফুলের মালা। মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু গালের কালো জড়ুলটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, তার বাবাই তো। 'বাবা' বলে চিৎকার করে উঠল সে।

"সরো সরো সরো এখান থেকে—"

একদল লোক এসে তাকে সরিয়ে দিল। তবু ভীড়ের পিছু পিছু গেল সে। দেখল তার বাবা প্রকাণ্ড একটা মোটরে চড়ে চলে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইল না।

তারপর দিন মহাজাতি সদনে গিয়েছিল সে। লোকে লোকারণ্য। দেখল তার বাবা গলায় মালা পরে বসে আছেন মঞ্চের উপর। একজন এগিয়ে এসে বললেন—"এঁর পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। দেশের এ দুর্দ্দিনে এঁর অমূল্য উপদেশ আমাদের পথ নির্দ্দেশ করবে।—" বাবা-বাবা-বাবা—তারস্বরে চীৎকার করে সে মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু পারল না। পুলিশের লোক টেনে বার করে দিল তাকে। পুলিশের ব্যাটনের আঘাতে অজ্ঞানও হয়ে গেল সে।

পরদিন কাগজে তার বাবার বক্তৃতা ছাপা হল। তিনি বলেছেন—আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমাদের মূলধন।

ব্যবধান

দশ বছরের টুটুল এসে মাকে বললে—"মা বাইরের ঘরে কে একটা দাড়ি-ওলা বুড়ো এসে বসে আছে। বলছে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। আমি বললাম বাবা নেই বাড়িতে, তবু বসে আছে। বলছে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব।"

টুটুলের মা সুমিত্রা রাজি হল না।

বলল—"আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না। বলে দে বাবা ট্যুরে বেরিয়েছেন, আজ ফিরবেন না। মা আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।"

সুমিত্রার মনে হল নিশ্চয় কোন সাহায্যপ্রার্থী। কালই একজন কন্যাদায়গ্রস্থ বুড়ো এসেছিল দুটো টাকা না নিয়ে উঠল না। দেখা করলেই বিপদ।

টুটুল বেরিয়ে এসে বললো—"বাবা ট্যুরে গেছেন, আজ ফিরবেন না। মা দেখা করবেন না আপনার সঙ্গে।" টুটুল জানে বাবা ট্যুরে গেছে এটি মিথ্যা কথা। তবু মায়ের প্ররোচনায় সে মিথ্যা কথাটি বলল গিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, "ও তাই নাকি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি তাহলে। তুমি কোন ক্লাসে পড় ?"

"ক্লাস ফোরে।"

"তোমার দাদা ?"

"দাদা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তরুণ দলের সেক্রেটারি হয়েছে আজকাল।"

"তরুণ দলের সেক্রেটারি ? তরুণ দলে কি হয় ?"

'ক্রিকেট খেলা হয়, মাঝে মাঝে গান বাজনার জলসা হয়, থিয়েটার হয় পুজোর সময়। চমৎকার থিয়েটার করে দাদারা। গতবারে আলিবাবাতে দাদা আবদালা সেজেছিল। কি দারুণ জমিয়েছিল যে—"

"তাই না কি। তোমার দিদি কি করে ?"

"দিদিকে আপনি চেনেন না কি ?"

"ঠিক চিনি না। তবে তোমার যে দিদি আছে তা জানি। তাই জিগ্যেস করছি—"

"দিদি আজকাল ভি আই পি !"

"ভি আই পি ? তার মানে ?"

"দিদি আজকাল এক মিনিস্টারের মেয়েকে গান শেখায়। দিদিকে নিতে প্রকাণ্ড গাড়ি আসে রোজ।"

"তাই না কি—"

"দিদির জন্যেই বাবার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। আজকাল বাবা যে পোস্টে বদলি হয়েছেন তাতে খুব উপরি—"

"টুটুল শোন—"

ভিতর থেকে সুমিত্রার কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টুটুল ভিতরে যেতেই ধমক দিয়ে তাকে বললেন—"কি সব বকবক করছিস বাইরের লোকের কাছে। বাক্যবাগীশ কোথাকার। ওপর থেকে তোর দাদাকে ডেকে দে।"

টুটুল দাদাকে ডাকতে তিন তলায় চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি মোটর এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। তার থেকে নামল একটি চটুলা তন্বী। মাথার পিছন থেকে লম্বা বেণী দুলছে। পরনে পিঠকাটা ঘাড়কাটা ব্লাউস, কাপড় এমন টাইট করে পরা সর্বাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। চোখে কাজল। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে এসে ঢুকল। বৃদ্ধের দিকে এক নজর চেয়ে দেখল কিন্তু তার পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। হাতে চাবি-বাঁধা রঙীন রুমালটা ঘোরাতে ঘোরাতে ভিতরের দিকে ঢুকল। তার আবদার-মাখা উচ্চ কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ বাইরে থেকে শুনতে পেলেন।

"মা ওমা, কোথা তুমি। আমাকে এখুনি গভর্নরের বাড়ি যেতে হবে পার্টিতে। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে আমাকে। আমি শাড়িটা বদলাতে এলাম। এটা 'ক্রাশড্' হয়ে গেছে—।"

বৃদ্ধ জানলা দিয়ে দেখলেন একটি খালি গ্যারাজ রয়েছে। নিশ্চয় মোটরও আছে এদের। মনে হল—কিন্তু—। চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল তাঁর। ঘরে প্রবেশ করল কালো চোং-প্যাণ্ট পরা একটি ছোকরা। গায়ে একটি হাফশার্ট রয়েছে! মনে হল জামাটা রোঁয়া-ওলা তোয়ালে থেকে তৈরি। মাথায় লম্বা চুল, গালে চওড়া জুলফি, গোঁফ আর দাড়ির সমন্বয়ে মুখের চারদিকে থুতনি পর্যন্ত চুলের একটা আবেষ্টনী। পায়ে চপ্পল। চোখে গগলস্।

"আপনি কাকে চান ?"

"আমি সুরথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"বাবা এখন বাড়িতে নেই।"

"আমি যদি অপেক্ষা করি ?"

"না আপনি এখন কেটে পড়ুন।"

"ও আচ্ছা—"

উঠে পড়লেন ভদ্রলোক এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা তিনেক পরে এলেন আবার ভদ্রলোক। দেখলেন কপাট বন্ধ। ইলেকট্রিক বেলের সুইচটা টিপলেন। টুটুল আবার বেরিয়ে এল।

"আপনি আবার এসেছেন?"

"এই চিঠিখানা দিতে এলাম। তোমার বাবা ফিরেছেন?"

"না—"

"এলে এই চিঠিখানা দিও তাঁকে।"

একটি খামে মোড়া চিঠি দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ঈষৎ মত্ত অবস্থায় রাত্রি দশটা নাগাদ ফিরলেন সুরথবাবু। স্বামীকে মত্ত অবস্থায় দেখে কিছু বললেন না সুমিত্রা। প্রথম প্রথম বলতেন এখন আর বলেন না। মদ খাওয়াটা চা খাওয়ার মতোই এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ এই সত্যটা মেনে নিয়েছেন তিনি।

সুরথবাবু এসেই প্রশ্ন করলেন—"কোন ফোন এসেছিল?"

"এসেছিল। তোমার স্টেনো মিস মাইতিকে তুমি সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিলে?"

"বলেছিলাম।"

"আমি মানা করে দিয়েছি। তোমার আপিসের কাজ তুমি আপিসে কোরো। বাড়িতে স্টেনো-ফেনো আনা চলবে না।"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ লক্ষ্য করে হাত উলটে সুরথবাবু বললেন—"বেশ, রাত বারোটা পর্যন্ত আপিসেই থাকবো তাহলে। চিঠিপত্র এসেছিল?"

"অনেকগুলো বিল এসেছে। মদের বিল এমাসে তিনশ টাকা।"

সুরথবাবু মুখটা সূচালো করলেন একটু।

"ও হ্যাঁ। আর এক বুড়ো তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছিল। দেখা না পেয়ে শেষে টুটুলের কাছে একটা চিঠি রেখে গেছে। কোনও প্রার্থী বোধহয়।"

সুমিত্রা চিঠিখানা দিয়ে উপরে চলে গেলেন।

সুরথবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে খুললেন চিঠিখানা।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমকল্যাণবরেষু

সুরথ, কুড়ি বছর পরে কনখল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম। তোমাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। এসে দেখলাম কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। তোমাদের কাছে আমার যে ফোটোটা আছে সেটা আমার যৌবনের। এখন আমি পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। তাছাড়া গোঁফ দাড়ি রেখেছি আজকাল। চেহারা তো বদলেই গেছে, গলার স্বরও বদলেছে সম্ভবত। আমাকে চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। পেনসন নেবার পরই যখন তোমার চাকরি হল তখনই আমি সংসার ত্যাগ করে কনখলে চলে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি কনখলে আছি। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই তেমন। কিন্তু আজ একনজর দেখেই বুঝলাম যে ছেলেমেয়েগুলি কেমন যেন অসভ্য হয়ে গেছে। ভদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যে ভদ্র নম্র ভাব থাকে তা যেন ওদের মুখে নেই। তোমার বাড়িঘর আসবাবপত্র ড্রয়িং রুমের সোফা সেট তোমার মোটরের গ্যারেজ দেখে মনে হল যে মাসে তোমার অন্তত দুই হাজার টাকা খরচ। কিন্তু তোমার মাইনে তো শুনেছি পাঁচশ টাকা। অসদুপায়ে উপার্জন করছ না কি?

আমি সংসারের হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে চাই না বলেই তোমাদের কোনও খবর নিই নি। একা একা কনখলে সুখেই আছি। হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস কচ্ছি। আর প্রতি বছর লটারির টিকিট কিনি। এ বছর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। দেড় লাখ টাকা পেয়ে গেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে সেইটে নিতেই এসেছিলাম। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অত টাকা নিয়ে আর কি করব? ভেবেছিলাম তোমাদেরই দিয়ে যাব টাকাটা। কিন্তু তোমাদের হাব-ভাব চাল-চলন একটুও ভাল লাগল না। তাই ঠিক করেছি টাকাটা কোনও সৎ প্রতিষ্ঠানেই দান করে যাব আমার মা-বাবার স্মৃতিরক্ষার জন্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের সুমতি দিন। আমাদের দেশের আদর্শকে মলিন করবার চেষ্টা করলে তোমরা নিজেরাই মলিন হবে। আদর্শ ঠিক থাকবে। এই কথাটি মনে রেখো। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীদশরথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাবার চিঠির দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন সুরথবাবু। সহসা একটা ছবি ভেসে এল তাঁর মনে—খুব ছেলেবেলায় বাবা তাঁকে কোলে করে পাঠশালায় পেঁৗছে দিয়ে আসতেন।

মনের এ ভাব কিন্তু পরক্ষণেই কেটে গেল। সহসা তাঁর মনে হল—"এতগুলো টাকা বেহাত হয়ে যাবে? কিছুতেই না। খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে।"

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

নাচ জমলো শেষে

আমার বন্ধু যোগেন ছুটতে ছুটতে এসে আমার বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল। দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, চুলগুলো উসকো খুসকো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত।

"যোগেন? এ সময় হঠাৎ যে। খিল বন্ধ করলি কেন?"

যোগেন খানিকক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল—"তাড়া করেছে—"

—"তাড়া করেছে? কে?"

—"কে আবার, সেই হারামজাদী, এখন সোহাগ জানাতে এসেছে।"

—"কার কথা বলছিস্, বুঝতে পারছি না ঠিক—"

—"দুলারী, দুলারী! সেই ঢঙি বেশ্যা ছুঁড়ি।"

—"কি রকম? সে তো শুনেছিলাম কোন নবাবের দরবারে বাহাল হয়েছিল—"

"—হবে না? নবাবের যে বেশী টাকা। আমি ওকে মানুষ করলাম, নাচগান শেখালাম, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলাম—যেই পাখা গজালো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এখন ঢং করতে এসেছে।"

"হা হা হা" হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে হেসে উঠলো যোগেন। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। যোগেন আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

—"মেয়েটা জিপসির মেয়ে ছিল। জানতে তুমি?"

—"তুমিই তো বলেছিলে একদিন।"

—"রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা ভানুমতীর খেলা দেখাত—রাস্তা থেকেই কিনেছিলাম মেয়েটাকে। এখন ওই আমাকে ভানুমতীর খেলা দেখাচ্ছে। ম্যাজিক। আশ্চর্য ম্যাজিক—"

—"ম্যাজিক?—"

—"হ্যাঁ ম্যাজিক। আশ্চর্য ম্যাজিক—হারামজাদী।"

দাঁত কড়মড় করে থেমে গেল যোগেন।

—"ব্যাপারটা খুলেই বল না—"

—"খুলে বললে কি বিশ্বাস করবে? করবে না।"

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল যোগেন।

—"আরে বলই না শুনি, কপাটটা বন্ধ করে দিলে কেন?"

—"ছুঁড়ি আমার পিছু পিছু ঘুরছে। ওই চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আদর করে ওর নাম দিয়েছিলাম কিন্নরী। এখন কিন্নরী ভয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়িয়েছে—"

—"রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে? কই দেখি—"

কপাটটা খুলতে গেলাম। যোগেন ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরল।

"খুলো না, খুলো না। তুমি কিছু দেখতে পাবে না। আমিই খালি দেখতে পাবো। কপাট খুললে এখনই হয়তো এখানে এসে ঢুকবে। হয়তো না খুললেও ঢুকে পড়বে। সব পারে ওরা। ভানুমতীর ম্যাজিক জানে তো। তোমার রিভলবারটা কোথা?"

—"তোমার পেছনেই সেলফে রয়েছে—"

যোগেন রিভলবারটা নিয়ে ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল।

—"লোডেড আছে তো?"

—"আছে। রিভলবার নিয়ে কি করবে?"

—"যদি ঘরে ঢোকে তো গুলি করব। ওর ম্যাজিককে গুলি করব—"

—"আরে ব্যাপারটা কি হয়েছে বলই না খুলে।"

গুম হয়ে রইল যোগেন খানিকক্ষণ।

তারপর বলল,—"বিশ্বাস করবে? আমাকে পাগল ভাববে না তো?"

—"আরে তুমি বলই না আগে।"

—"তবে শোন। নবাবের দরবারে যদিও চলে গিয়েছিল তবু কিন্নরীর সঙ্গে চিঠির আদান প্রদান ছিল। একদিন হঠাৎ চিঠি পেলাম "আপনি যদি আপনার গিরিডির বাড়িতে যান, নাচ দেখিয়ে আসব আপনাকে। রবিবার ছুটি নিয়েছি, সন্ধ্যেবেলা আপনার বাড়িতে যাব। নাচ দেখাব। ভোরে ফিরে আসব আবার।" আজ তো মঙ্গলবার, রবিবার গিরিডির বাড়িতে ছিলাম সন্ধ্যা থেকে। অপেক্ষা করছিলাম তার জন্যে। রাত বারটা বেজে গেল তবু এল না। জ্যোৎস্না রাত ছিল। বাড়ির সামনের মাঠটা ভরে গিয়েছিল জ্যোৎস্নায়। সে-ও যেন অপেক্ষা করছিল তার। মনে হচ্ছিল ওটা যেন মাঠ নয়, আমারই মন। হঠাৎ দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। ঘড়িতে দেখলাম

একটা বেজে গেছে। ভাবলাম এবার শুয়ে পড়ি আলো নিভিয়ে। তারপরই ঘটনাটা ঘটল। শুরু হল কিন্নরীর ম্যাজিক। দেখলাম দরজা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কি একটা ঢুকছে। দেখি একটা পা, উরুত শুদ্ধ পা। পা-টা ঘরে ঢুকেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগলো।"

—"নাচতে লাগল?"

—"হ্যাঁ নাচতে লাগল। সে কি ভীষণ নাচ। তাণ্ডব নৃত্য। ধপাধপ ধপাধপ নেচেই চলেছে। তখন বুঝতে পারলাম হারামজাদী ম্যাজিক করছে। ওরা গুণ করতে পারে, বাণ মারতে পারে। কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। হিপনোটাইজ করে যা খুশি করতে পারে। জিপসির মেয়ে তো। নিজে না এসে পা পাঠিয়ে দিয়েছে। আর কি সে পা! একটা ছোট কলাগাছের গুঁড়ি যেন। কবিরা যাকে বলেছেন রম্ভোরু, ঠিক তাই। একটা রম্ভোরু আমাকে ঘিরে লম্ফঝম্ফ করতে লাগল। চীৎকার করে উঠলাম—দূর হ হারামজাদী। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ করে বেরিয়ে গেল কপাট দিয়ে। রাগে আমার সর্বাংগ রিরি করছিল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। হেঁটে স্টেশনে এলাম, তারপর ট্রেন আসতেই চলে এলাম কলকাতায়। হাওড়ায় এসে দেখি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের মধ্যে সে রয়েছে। কিন্নরী। কাটা পা-টা কাঁধের উপর। আর একটা পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তারপর থেকে আমার সঙ্গ ছাড়েনি। যেখানে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এক পা-দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আর কাঁধের উপর সেই কাটা পা-টা। বিরিঞ্চির বাড়ি গিয়েছিলাম। সে বাড়িতে নেই। তাই তোমার কাছে চলে এলাম। হারামজাদী ওই মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরুলেই সঙ্গ নেবে। অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেবল আমিই পাচ্ছি। আশ্চর্য ম্যাজিক জানে মেয়েটা—"

—"এটাকে ম্যাজিক বলছ?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিক, ম্যাজিক। জিপ্সি মেয়েরা অনেক রকম ম্যাজিক জানে।"

এমন সময় বাইরে থেকে কপাটে ধাক্কা পড়ল।

—"কে—"

—"আমি বিরিঞ্চি। যোগেন এখানে এসেছে?"

কপাট খুলে দিতেই বিরিঞ্চি এসে ঢুকল। সে-ও আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিরিঞ্চি যোগেনের দিকে ফিরে বলল, "খবরটা শুনেছ? তোমার কিন্নরী রেলে কাটা পড়েছে।"

যোগেন বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—"বাজে কথা। কিন্নরী মরতে পারে না।—She is immortal."

"আরে আমি নিজের চোখে দেখলুম। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েটা চলন্ত ট্রেনে চড়তে গিয়ে পড়ে গেল ট্রেনের নীচে। উরুত শুদ্ধ পা-টা কেটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

দেখা গেল তার ব্যাগে কিছু টাকা, নাচবার ঘুঙুর, আর গিরিডির একটা টিকিট রয়েছে—"

—"বিশ্বাস করলাম না। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

– "আরে স্বচক্ষে দেখলাম—"

—"তুমি মিথ্যুক ! তুমি মিথ্যুক ! তুমি মিথ্যুক ! কিন্নরী মরে নি, মরতে পারে না।"

—"আমি বলছি—"

—"শাট আপ—"

—"বিশ্বাস কর !"

এরপর যোগেন যা করলে তা অবিশ্বাস্য। রিভলবারটা তুলে বিরিঞ্চির বুকে গুলি চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল বিরিঞ্চি। আমি যোগেনকে ধরতে যেতেই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে। আমিও পড়ে গেলাম। তারপর সে নিজেও বোধহয় আত্মহত্যা করেছিল।

কারণ একটু পরেই দেখলাম সম্ভবত পরলোকে আমরা তিনজন একটা নাচের আসরে বসে আছি। সামনে কিন্নরী নাচছে।

বাস্তব-অবাস্তব

উদীয়মান একজন আধুনিক লেখক একটি অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন দেখলেন একদিন। উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন তিনি। যদিও খুব বাস্তবধর্মী লেখক, কিন্তু স্বপ্নটি দেখলেন অদ্ভুত ও অবাস্তব। খোলা জানলা দিয়ে একটি পরী ডানা মেলে এসে প্রবেশ করল তাঁর ঘরে। বলল—"মহাকালের দরবারে আপনার ডাক পড়েছে। যদি যেতে চান এখনই চলে যান।"

লেখক সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন—"মহাকালের দরবার ? সে আবার কোথা ?"

পরীর হাতে একটি চমৎকার মালা ছিল।

বললে—"এই মালাটি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এটি গলায় পরবামাত্র মহাকালের দরবারে গিয়ে উপনীত হবেন আপনি।"

মালাটি টেবিলের উপর রেখে পরী জানলা দিয়ে উড়ে চলে গেল। লেখক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন মালাটি ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে হয়তো একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি মালাটি পরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে যা হল তা আরও বিস্ময়কর। সমস্ত পরিবেশটাই বদলে গেল। লেখকের ছোট ঘরটা লুপ্ত হয়ে গেল যেন। মনে হল তিনি যেন মহাশূন্যে বসে আছেন। ডানদিকে দূরে মণিমাণিক্য-খচিত একটা বইয়ের শেলফ্ রয়েছে। তাতে রাখা আছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসি, প্যারাডাইস লস্ট এবং আরও অনেক বই—সব নাম পড়া গেল না। বাঁদিকে দূরে জ্বলছে একটি অগ্নিকুণ্ড। লক্ লক্ করে শিখা বেরুচ্ছে তার ভিতর থেকে। আর ঘরের মাঝখানে তারই একটি জনপ্রিয় বই নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে। ঘরে কোনও লোক নেই। এই বইটিরই দশম সংস্করণ বাজারে চলছে।

হঠাৎ শূন্য থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এল।

"আপনার এই বইয়ে যৌন ব্যাপার নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছেন কেন ?"

"কে আপনি ?"

"আমি মহাকালের দূত। তাঁর আদেশেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

লেখক কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বললেন, "আমি গোটা মানুষটাকে দেখাতে চাই। তাই কিছু গোপন করিনি—"

"আপনি তো বিজ্ঞানী নন, আপনি রসস্রষ্টা। তাছাড়া গোটা মানুষটাকেও তো আপনি দেখান নি। মানুষের ঘাম হয়, ঘামের কেমন গন্ধ, ঘামে কি কি উপকরণ আছে, প্রভাতে সন্ধ্যায় শৌচকর্ম করবার সময় প্রত্যেক নরনারী যা যা করে এসবের বর্ণনাও তো আপনার পুস্তকে নেই। কেবল ওই যৌন ব্যাপারটা নিয়েই আপনি মাতামাতি করেছেন কেবল। প্রত্যেক মানুষের একটা অদৃশ্য রহস্যময় দিক থাকে সে সম্বন্ধেও আপনি নীরব। আপনি গোটা মানুষ তো দেখাতে পারেন নি। আপনার প্রবণতা কেবল যৌন ব্যাপারের দিকে আর অভব্যতার দিকে, এর কারণ কি?"

লেখক চটে গেলেন।

বললেন—"আমার যা খুশী লিখেছি। তাতে আপনার কি?"

"যা খুশী লিখলে সাহিত্য হয় না।"

যে বইটি শূন্যে ঝুলছিল কোন অদৃশ্য হস্ত সেটি নিয়ে সহসা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। দেখতে দেখতে ভস্মীভূত হয়ে গেল বইটি।

পরমুহূর্তে ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল লেখকের। ঘড়িতে দেখলেন তিনটে বেজেছে। প্রকাশক ফোন করছেন। বললেন—"আপনার বইটির দশম সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে গেল। আমরা আরও দুহাজার ছাপতে চাই—"

লেখক উঠে একটা জামা গায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। প্রকাশকের বাড়ি যেতে হবে। নীচে নেমে একটা ট্যাক্সি ধরলেন। ট্যাক্সিতে চড়ে সিগারেট ধরালেন একটা। ভাবলেন—"কি বাজে স্বপ্ন দেখলাম একটা। মহাকালের দরবার—হ্যাঃ—" ট্যাক্সি হু-হু করে প্রকাশকের দোকানের দিকে ছুটতে লাগল।

নায়ক—১৯২২

বিষয়টি চমৎকার। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়। কবিতা লেখা যায়, নাটকও লেখা যায়। আমি আমার বক্তব্য গল্পে বললাম।

আমরা কবে থেকে প্রেমে পড়তে শুরু করেছি এর নির্ভুল তারিখ আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। প্রেমে পড়া ব্যাপারটার সঙ্গে নানারকম উপমাও দিয়েছেন নানা জাতের লেখক যুগে যুগে। কেউ বলেছেন ওটা যেন নায়াগ্রা প্রপাত সাঁতরে যাওয়ার মতো, কেউ বলছেন দুরারোহ পর্বত-উল্লঙ্ঘন, কারো মতে জটিল অরণ্যে পথ-হারিয়ে ফেলা, কেউ আবার ওর উপমা দিয়েছেন অগ্নি-পরীক্ষার সঙ্গে। সবগুলোই সত্য। কিন্তু হাল আমলের—মোটে পঞ্চাশ বছর আগেকার ছোকরা—বিষ্ণু ভট্টাচার্যের মনে হতে লাগল যেন একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। শলাকাটির রূপক-বিবর্জিত রূপ—মেয়েটি অব্রাহ্মণ। সুশীলা অপরূপ সুন্দরী, বয়স ষোলো, পাশের বাড়িতে থাকে, চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়,

গাল লাল হয়ে ওঠে, তার বাবার সঙ্গে বিষ্ণুর বাবার বন্ধুত্বও খুব, তার হাসি, গান সবই শুনতে পায় বিষ্ণুচরণ, কিন্তু হায় সে কায়স্থের মেয়ে। অত্যন্ত মনোরমা, অত্যন্ত ভালো, কিন্তু নাগালের বাইরে। বিজ্ঞানের ছাত্র বিষ্ণুচরণ কবিতা লিখতে লাগল। বিখ্যাত কাগজগুলো তার কবিতাকে তেমন আমোল দিল না যদিও, কিন্তু মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে ছাপা হতে লাগল তার প্রণয়োচ্ছ্বাস। আর সে কাগজটি যাতে সুশীলার কাছে যায় সে ব্যবস্থাও ক'রে ফেলল বিষ্ণুচরণ। পাশাপাশি বাড়ি, দোতলার জানালায় দেখা হল একদিন সুশীলার সঙ্গে।

"সুশী, 'অর্ঘ্য' কাগজটা পেয়েছ ?"

"পেয়েছি—"

সলজ্জ হাসি হেসে চলে গেল সুশীলা।

সুশীলা সে যুগের হিসাবে শিক্ষিতা মেয়ে। মাইনর পরীক্ষা পাশ। 'অর্ঘ্য' পত্রিকায় মুদ্রিত খঞ্জ-ছন্দের কবিতাগুলি যে তারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অর্ঘ্য' একথা বুঝতে দেরী হয়নি তার। কিন্তু এরপর থেকেই বিষ্ণুচরণকে এড়িয়ে চলত সে। জানালার সামনে আর দেখা যেত না তাকে। কিন্তু খঞ্জ-ছন্দের হলেও কবিতাগুলি তার মনে সাড়া জাগিয়েছিল বইকি। দুরু দুরু অন্তরে একাধিকবার সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল কবিতাগুলি। 'হৃদয়খানি তোমার পায়ে ওগো দেবি করছি সমর্পণ, ওগো নিঠুর দয়া করে কর তা গ্রহণ'—এই লাইনটি খুবই ভালো লেগেছিল তার। গ্রহণও হয়তো করেছিল, কিন্তু মনে মনে। বাইরে কিছু তো করবার উপায় নেই। ও কথা ভাবাও যে অন্যায়। বিষ্ণুদা ব্রাহ্মণ, আর সে কায়স্থ। পারতপক্ষে তাই সে আর বিষ্ণুচরণের মুখোমুখি হত না। 'অর্ঘ্য' পত্রিকাটিও প্রকাশিত হত না নিয়মিত। তাই বিষ্ণুর কবিতাগুলিও আর নিয়মিত পেঁছিত না তার কাছে। বিষ্ণু ভাবল চিঠি লিখবে। গোলাপী রঙের ভালো চিঠির কাগজ আর খামও কিনে আনল। নতুন 'ব্ল্যাক বার্ড' কলমও কিনে ফেলল একটা। কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল—এ চিঠি যদি আর কারো হাতে পড়ে। তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কলঙ্কিনী বলবে সবাই সুশীলাকে! না, না, চিঠি লেখা চলবে না। বিবেকে বাধতে লাগল বিষ্ণুচরণের। চিঠি লেখা হল না। কি করবে ভাবছে এমন সময় তার মা একদিন তাকে বললেন, "বিষ্ণু তুইও মেয়ে দেখবি না কি ?"

"কোন মেয়ে—"

"তোর বাবা পটলডাঙার বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়েকে পছন্দ করে এসেছেন। মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। দেবে থোবেও ভালো—"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"আমি যদি অপছন্দ করি বিয়ে ভেঙ্গে দেবে তোমরা ?"

"অপছন্দ করবি কেন ? তোর বাবার মতো খুঁতখুঁতে লোক যখন পছন্দ করেছেন, তখন তোরও পছন্দ হবে। চমৎকার মেয়ে। দেখতে চাস তো ব্যবস্থা করি—"

"দেখতে গেলে আমি অপছন্দ করে আসব। আমার পছন্দ-অপছন্দের যদি তোমরা মূল্য দাও তাহলে তোমরা ওর মধ্যে মাথা গলিও না।"

"কেন, তুই নতুন আর কি করবি ?"

"ধর যদি অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই ?"

"পাগল হয়ে গেলি না কি তুই! আমরা ব্রাহ্ম, না খৃষ্টান? অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করবি কিরে? তুই কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করবি। ক্ষ্যাপা কোথাকার। লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হয়েছে তোর?"

বিষ্ণুচরণ আর কিছু বলতে সাহস করেনি। কেবল বলেছিল—"তবে তোমাদের যা খুশী কর।"

বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের মেয়ে সুরেশ্বরীকেই বিয়ে করতে হয়েছিল শেষকালে। সুরেশ্বরীর মতই নেয়নি কেউ বিয়ের আগে। সুরেশ্বরীরও ভালো লেগেছিল তার দূর সম্পর্কের দাদা জগন্নাথকে। যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি গানের গলা কিন্তু এক গোত্র যে। তারও ভালোলাগাটা মিলনে প্রস্ফুটিত হ'তে পারেনি। বিয়ের সময় দুজনের মনের নেপথ্যলোকের ইতিহাস নেপথ্যেই থেকে গেল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আশ্চর্য জিনিস হল একটা। দুজনেরই দুজনকে ভালো লেগে গেল। সুশীলাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল বিয়েতে। সে এসে ভালো একটি শাড়ি উপহার দিল সুরেশ্বরীকে, আর চার কপি মাসিক পত্রিকা—'অর্ঘ্য'। হেসে বলল—"বিষ্ণুবাবু খুব ভাল কবিতা লিখতে পারেন। তার প্রমাণ এই কাগজগুলিতে আছে। পড়ে দেখো।" সুশীলা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তারও বিয়ে হয়েছিল একজন ডাক্তারের সঙ্গে কুল-গোত্র-কোষ্ঠি মিলিয়েই। বিয়ের পর সুশীলাকে চ'লে যেতে হল কানপুরে। সুশীলার স্বামী সেখানেই চাকরি করতেন তখন।

•

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। ওদের বিয়ে হয়েছিল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, দেখতে দেখতে ১৯৭২ এসে পড়ল। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব, সুভাষ বসুর নেতাজীতে রূপান্তরিত হওয়া, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলমান, রিফিউজী, বাঙালী-অবাঙালী সমস্যা, বাংলাদেশে বহু যুযুধান রাজনৈতিক দলের হুহুংকার, তাদের অমানুষিক হানাহানি, কালোবাজার, ঘরে ঘরে বেকার ছেলে-মেয়ে, পথে পথে মিছিল আর শ্লোগান, জিনিসপত্রের আতংকজনক মূল্যবৃদ্ধি—চার আনা সের বেগুন চার টাকা সের বিকুচ্ছে—মাছ, মাংস ছোঁবার উপায় নেই। এ সবই দেখেছে তারা, সবই সহ্য করেছে। কিন্তু যেটা সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল সেটা পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের নারকীয় অত্যাচার।

সুরেশ্বরীর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। ছোট ছেলে দীপংকরের বয়স পঁচিশ। জুলফি রেখেছে, গোঁফও রেখেছে জমকালো গোছের। চমৎকার বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে চোং প্যান্ট, হাত কাটা কামিজ, পায়ে চপ্পল, ভারি স্মার্ট। এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছে সম্প্রতি। বিষ্ণুচরণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বিছানায় জড়বৎ পড়ে থাকেন। তাঁর সেবার ভার নিয়েছে তাঁর বড় ছেলের বউ কমলা। বিষ্ণুচরণের মেয়ের সংখ্যাই বেশী, ছেলে মাত্র দুটি। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে বিয়ে হয়েছে, কচিৎ কখনও আসে তারা। কমলাই বাড়ির গৃহিণী এখন। সুরেশ্বরী ওর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছে। সুরেশ্বরীর এখন কাজ সিনেমা দেখে বেড়ানো। তোড়ি তার সঙ্গী। তোড়ি সুশীলার মেয়ে। একমাত্র সন্তান তার। বিধবা হয়েছে সুশীলা। বিয়ের পর অনেকদিন ছেলেপিলে হয়নি সুশীলার। অনেক দিন পরে বুড়ো বয়সে তোড়ির জন্ম।

কানপুরে এক ওস্তাদ ওর নাম দিয়েছিল তোড়ি। তোড়ির বয়স এখন উনিশ। এম-এ পড়ছে। দেখতে মোটে ভাল নয়, কালো রঙ্‌, খাঁদা নাক, চোখ দুটোই ভালো। ছোট ছোট, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। দুষ্টুমিভরা হাসিতে চিকমিক করছে। সুশীলা স্বামীর মৃত্যুর পরই চলে এসেছে কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সে বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল তাই বাড়িটি পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। বিষ্ণুচরণের সম্বন্ধে আর তার মোহ নেই। সে এখন দিনরাত ব্যস্ত পরলোক নিয়ে। ঠাকুর ঘরেই বেশীর ভাগ থাকে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, সুরেশ্বরীকে সে-ও ভালবেসেছে। তোড়ির ভার তার উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত আছে। তোড়ি অনেক সময় ওই বাড়িতে খায়, ওই বাড়িতেই ঘুমোয় পর্যন্ত। তোড়ি সুরেশ্বরীর বন্ধু এখন। তোড়ি সুরেশ্বরীকে নিয়ে কোথায় না গেছে। সিনেমা তো বটেই, কলেজের সাহিত্য-সভা, কফি হাউস, ক্রিকেট ম্যাচ, গড়ের মাঠে ইন্দিরাজীর বক্তৃতা, নানা জায়গায় চিত্র প্রদর্শনী, সব জায়গায় গেছে সুরেশ্বরী তোড়ির সঙ্গে। তোড়ির নানারকম অসঙ্গত আবদার সুশীলা সহ্য করে না, সুরেশ্বরী করে। তোড়ির দামী দামী শাড়ি সুরেশ্বরীই কিনে দিয়েছে। সেদিন একটা দামী ষ্টোল কিনতে সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করতে হল সুরেশ্বরীকে। একটা ছোট্ট পিঠ-ঢাকা র‍্যাপারের জন্যে অত টাকা খরচ করবার ইচ্ছা ছিল না সুরেশ্বরীর। কিন্তু তোড়ি জেদী। ও যখন ধরেছে, কিনবেই। ষ্টোলের কাশ্মিরী কাজ নাকি আশ্চর্য সুন্দর। কাজের মর্ম সুরেশ্বরী বোঝেনি কিছু, কিন্তু কিনে দিতে হয়েছে। আর একদিন তোড়ি অবাক ক'রে দিয়েছিল সুরেশ্বরীকে। কোট প্যাণ্ট প'রে হাজির হল কোত্থেকে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। সুরেশ্বরী চিনতে পারেনি প্রথমে। হকচকিয়ে গিয়েছিল। খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছিল তোড়ি সুর-মার ভয় দেখে। সুরেশ্বরীকে সে সুর-মা বলে ডাকে। বললে—"তোমাকে নিয়ে চীনে হোটেলে যাব। তাই সায়েব সেজেছি। সায়েবি পোষাককে খুব খাতির করে ওরা। আমি হব ছেলে, তুমি হবে আমার মা। ওরা কী সুন্দর চিংড়ি মাছ রান্না করে তোমাকে খাওয়াব।"

সুরেশ্বরী যাননি। সেখানে যাননি বটে, কিন্তু ওদের বটানিক্যাল গার্ডেনের পিকনিকে যেতে হয়েছিল। সেখানে ওদের খিচুড়ি রাঁধবার ভার নিতে হয়েছিল। কি যে জ্বালাতন করে তাঁকে মেয়েটা। সুরেশ্বরীর মুশকিল রাগ করতে পারেন না তিনি মেয়েটার উপর। কি যে একটা মায়া মাখান আছে ওর চোখে-মুখে। আর যখন আবদার করে কি অপরূপ সুন্দরই না দেখায়।

একদিন তোড়ি কিন্তু এমন একটা আবদার করে বসল যে ঘাবড়ে গেলেন সুরেশ্বরী। বিকেলবেলা তর তর ক'রে উঠে এল তোড়ি সিঁড়ি দিয়ে। তার হাতে একটি সিঁদুর কৌটো।

"আমার সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দাও সুর-মা।"

"কুমারী মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরে নাকি কখনও। তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি।"

"আমার বিয়ে হয়ে গেছে আজ সকালে। রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে হয়েছে—"

"সে কি! কোথায়, কার সঙ্গে—"

"দীপুদার সঙ্গে। দীপুদাকে কাল বাংলাদেশের যুদ্ধে যেতে হবে, তাই আজই বিয়েটা সেরে ফেললাম আমরা—সিঁদুর পরিয়ে দাও, হাঁ করে দেখছ কি—"

নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল স্বরেশ্বরী। হঠাৎ তার মনে হল আমি যা পারিনি এরা তা পেরেছে।

সেদিন বিকেলে তোড়ি আর দীপংকরের 'হনিমুন' জমেছিল গড়ের মাঠে একটা ফুচকাওলাকে কেন্দ্র করে। তোড়ি হঠাৎ দীপংকরের দিকে চেয়ে বললে "তোমার আজ অন্তত একটা সিল্কের পাঞ্জাবী পরা উচিত ছিল। হাজার হোক তুমি নায়ক—"

দীপংকর হেসে বলল—"আমি নায়ক নই, নীত"—তারপর হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই।

গল্প লেখা শেষ ক'রে শুয়েছিলাম ইজিচেয়ারে। চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম তোড়ি দীপংকরকে।

হঠাৎ একটি ছোকরা প্রবেশ করল কপাট ঠেলে। ছোকরার গোঁফ, দাড়ি, জুলফি চমৎকার। পরনে একটি চক্‌রা-বক্‌রা ছিটের হাফসার্ট, মনে হয় কোনও পরদা বা টেবিল ঢাকা কাপড় দিয়ে বানিয়েছে ওটা। কালো চোং প্যান্ট আর চপ্‌পল তো আছেই।

"আসুন, কে আপনি—"

"আমি ১৯৭২এর তরুণ একজন। প্রাচীনকে উড়িয়ে দিয়ে নবীনকে স্থাপন করতে চাই। দুটো জায়গায় কিন্তু আটকে গেছি, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এলাম।"

"কোনও নবীনের কাছে যাও, আমিও তো বুড়ো।"

"তবু আপনার পরামর্শটা শুনলে কোনও ক্ষতি নেই। দেবেন ?"

"কি বিষয়ে বল - "

"আমরা দুটো জায়গায় আটকে গেছি। প্রথম, সেকালের মতো খাদ্যদ্রব্য এখনও রেঁধে না খেলে ভালো লাগে না। দ্বিতীয়, প্রেম করতে হলে পুরুষের চাই মেয়ে আর মেয়ের চাই পুরুষ। এই দুটো ব্যাপারে এখনও সেকেলে হয়ে আছি আমরা। কি করি বলুন তো—"

কি উত্তর দিতাম জানি না। কিন্তু ঘুমটা ভেঙে গেল একটা মোটর দাঁড়ানোর শব্দে। স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আমার নাতনী নিজে মোটর-ড্রাইভ করে ফিরল যেন কোথা থেকে। তার টকটকে লাল পিঠকাটা ব্লাউসের নীচে দেখতে পেলাম তার ধপধপে ফরসা রংটা। নাতনী ঘরে ঢুকেই বললে —"দাদু তোমার জন্যে একটা নতুন খাবার এনেছি। তোমরা তো বরাবর মুগীর ঝোল, না হয় বড় জোর মুগীর রোস্ট খেয়েছ। আমি তোমাকে আজ নতুন একটা রান্না খাওয়াব।"

"কি কি ?"

"চিলি-চিকেন।"

শ্রীমতী সীমা

কখন যে কোনদিক দিয়ে কি হয়ে যায় কেমন করে যে ফসকা গেরো শক্ত গিট হয়, শক্ত গেরো আলগা হয়ে যায় আগে থাকতে নির্ণয় করা যায় না তা। ভুসিবাবু (ভালো নাম ভূষণ দে) মালদার লোক। কালো সাদা নানা পথে মালক্ষ্মী তাঁর শ্রীবৃদ্ধি করে আসছেন বহুকাল থেকে। শহরে গোটা তিনেক বাড়ি হয়েছে, ব্যাঙ্কের খাতাতেও জমেছে কয়েক লক্ষ। অনেকে তাঁকে সিনেমা লাইনে নাবাতে চেষ্টা করেছিল, অনেকে বলেছিল ভালো একটা মাসিকপত্র বার করে সাহিত্য জগতে যুগান্তর আনুন, ভুসিবাবু রাজি হন নি। তিনি সুনিশ্চিত পথে চলতে চান। বন্ধকী রেখে সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁর প্রধান ব্যবসায়! মাঝে মধ্যে অবশ্য চোরা-পথে দমকা কিছু টাকা পেয়ে যান তিনি। কিন্তু সেই চোরা-পথেও তিনি আটঘাট না বেঁধে অগ্রসর হন না। ভুসিবাবু লোক খুব খারাপ নন। তাঁর পরিচিত মহলে সকলেই তাঁকে ভালবাসে। ঈষৎ স্থূলকায় ভুসিবাবু এখনও খুব সেকেলে। ফতুয়া পরেন, থান পরেন। পায়ে দেন চীনাবাজারের সেকেলে জুতো। সেকেলে ধরনের দানও করেন। ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারে না। এমন লোকের সুখে থাকার কথা। কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তান মাতৃহীনা কন্যা তাঁকে সুখে থাকতে দিচ্ছে না। অদ্ভুত প্রকৃতির এই মেয়ে হয়েছে ভুসিবাবুর। খারাপ নয় মোটেই, কিন্তু ভুসিবাবু বুঝতে পারেন না তাকে ঠিক। যখন তার বয়স বারো তেরো তখনই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল সে।

বাবাকে এসে বলল—"বাবা, আমার ভালো নামটা বদলে দাও।"

"কেন?"

"ওতে অহংকার প্রকাশ পায়। তাছাড়া আমি আলোর মতো অত সুন্দর নই তো। আমার রং কালো, গড়নও ভালো নয়, আলো নাম আমার মানাচ্ছে না ঠিক। বদলে দাও ওটা—"

"কি নাম মানাবে তাহলে তোকে?"

"এই টুপসি, ঝুপসি যাহোক কিছু দাও না একটা—"

ভুসিবাবু স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কন্যার দিকে ক্ষণকাল। তারপর বললেন—"তুই নিজেই রাখ একটা—"

কয়েকদিন পরে নিজেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—সীমা। ক্রমশ ভুসিবাবু হৃদয়ঙ্গম করলেন যে ও যদিও নিজের নাম রেখেছে সীমা কিন্তু বারবার সীমা অতিক্রম করাই ওর স্বভাব। ভুসিবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয় খুব ছেলেবেলায় ওর যদি বিয়ে দিয়ে দিতেন ভালো হত তাহলে। কিন্তু একমাত্র কন্যাকে এত তাড়াতাড়ি পরের ঘরে পাঠাতে মন সরেনি তাঁর। গোপন ইচ্ছা ছিল একটি ঘরজামাই করবার। ভেবেছিলেন টাকার জাল ফেলে একটি মনোমত জামাই ধরবেন। জালে অনেক ছোকরাই ধরা পড়েছিল কিন্তু মনোমত কাউকে পান নি তিনি। বেশির ভাগই কুৎসিত। কেউ তালগাছের মতো লম্বা, কেউ অতিশয় বেঁটে, কেউ থলথলে মোটা, কারও খেঁকুরে-মার্কা চেহারা। অধিকাংশই লম্বা জুলফিদার চোংপ্যান্ট পরা। সুশ্রী একটিও নয়।

সীমা লেখাপড়ায় খুব ভালো। বি. এ.-তে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে এম. এ. পড়ছে। এ ছাড়াও তার অনেক রকম 'হবি'। ফোটো তোলে। ইডেন গার্ডেনের, চিড়িয়াখানার, কলেজের ছেলেমেয়েদের, রাস্তার ভীড়ের—নানারকম ফোটোতে তার অনেক অ্যালবাম ভরতি। তার আর একটা 'হবি' খবরের কাগজের 'কাটিং' কেটে রাখা। সাহিত্য বিষয়ে, বিজ্ঞান-বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে নানা কাটিং সংগ্রহ করে সে নানা পত্রিকা থেকে। প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা ফাইল করেছে সে। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সর্বদা। আড্ডাবাজ মেয়ে নয়, ঘরেই থাকে। বিশেষ বন্ধু বৃদ্ধ ওস্তাদ গণি মিঞা। তাঁর কাছে সেতার শেখে। মোটরে করে রোজ নিয়ে আসে তাঁকে। ভুসিবাবু টাকার স্তূপের উপর বসে বসে দেখেন মেয়ে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কুপথে গেলে রাগারাগি করতে পারতেন, কিন্তু সীমা তো কুপথগামিনী নয়—অথচ নাগালের বাইরে। তাছাড়া এও তিনি অনুভব করলেন ওর যৌবন যে চলে যাচ্ছে। আর বিয়ে না দিলে কবে বিয়ে হবে। অথচ সীমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইতে ভয় করে তাঁর। তবু মরিয়া হয়ে একদিন প্রস্তাবটা করলেন তিনি।

"এবার তোর বিয়ে দেব ভেবেছি সীমা। আপত্তি নেই তো ?"

ভুসিবাবু ভেবেছিলেন সীমা বুঝি সোজা 'না' বলবে। কিন্তু সীমা সলজ্জ হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

"না, বিয়ে করতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ভালো ছেলে কি ঘর-জামাই হতে রাজী হবে ? বাজে ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।"

ভুসিবাবু নিজের মাথায় একবার হাত বুলোলেন। এ সন্দেহ তাঁরও আছে। ভালো ছেলেকে ঘর-জামাইরূপে পাওয়া সত্যিই শক্ত। গোপনে গোপনে এ চেষ্টা তিনি আগেই করেছিলেন। সফলকাম হন নি। তবু যে ধ্রুব বিশ্বাসকে আঁকড়ে তিনি জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই বিশ্বাসকে আঁকড়েই তিনি এ ব্যাপারে আবার অগ্রসর হবেন মনস্থ করলেন। টাকার টোপ ফেলতে লাগলেন চতুর্দিকে। এবারও অনেক চুনোপুঁটি ধরা পড়ল। ভুসিবাবু তাঁর অভিজ্ঞ মুহুরি বিলটুবাবুকে নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "ভালো ছেলের খবর পেলে আমাকে জানাবেন। টাকা যা লাগে খরচ করব কিন্তু পাত্রটি ভালো হওয়া চাই।"

মাস দুই পরে বিলটুবাবু সৎপাত্রের খবর আনলেন একটি। বললেন—"ছেলেটি ভালো। তবে সীমু মায়ের চেয়ে মাত্র বছর খানেক বড়। গতবার এম. এ. পাশ করেছে। আমাদের খাতক হরিশবাবুর ছেলে। হরিশবাবু তাঁর স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে আমাদের কাছে বছর তিনেক আগে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এখনও শোধ করতে পারেন নি। সুদও দেন নি এক পয়সা। দিতে পারবেন বলেও মনে হয় না। পাঁচটি অবিবাহিতা মেয়ে আর চারটি নাবালক ছেলে। ওই বড় ছেলে সর্বোত্তমই সবে লেখাপড়া শেষ করে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনও জোটে নি কোথাও। আমি প্রস্তাবটা করতেই আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন হরিশবাবু। বললেন—ভুসিবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করা তো মহাভাগ্য। ঘর-জামাই হতে দোষ কি আছে ? কত রাজা মহারাজাই তো হয় ঘরজামাই না হয় পুষ্যিপুত্তুর—না, আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ছেলেরও আপত্তি হবে না। কিন্তু—" থেমে গেলেন বিলটু বাবু।

"কিন্তু কি—"

"ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গেলে যে পাঁচ হাজার টাকা উনি ধার নিয়েছেন সেটা ছেড়ে দিতে হবে। গয়নাগুলোও ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া উনি বলছেন ওই ছেলেটিই এখন ওঁর আশা-ভরসা। তাকে যদি আপনারা ঘর জামাই করে রেখে দেন ওঁর সংসার চলবে কি করে? তাই উনি চাইছেন যে আগামী কুড়ি বছর অন্তত মাসে মাসে পাঁচ শো টাকা করে দিয়ে যেতে হবে ওঁদের। কারণ ওঁর দায় অনেক। মেয়েদের পড়াতে হবে বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে।"

ভুসিবাবু মাথায় একবার হাত বুলুলেন।

তারপর বললেন—"ভালো জিনিস কিনতে হলে ন্যায্য দাম দিতে হবে বই কি। ছেলেটি দেখতে কেমন, নামটি তো জমকালো—"

"দেখতেও ভালো!"

"ভালো মানে, কি রকম?"

বিলটুবাবু তেমন বর্ণনাপটু লোক নন। সংক্ষেপে তাই বললেন, "একটু লালুলালু গোছের। মাথার চুল সিনেমা-নায়কদের মতো ছাঁটা। চোখ দুটি বড় বড়। রং ফরসা—"

"আচ্ছা, আমি একদিন গিয়ে দেখে আসব।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সবচেয়ে ভালো।"

ভুসিবাবু একদিন গিয়ে দেখে এলেন সর্বোত্তমকে। খুব পছন্দ হল তাঁর। হরিশবাবুকে বললেন, "আপনি যা চেয়েছেন তা দেব। আপনারা মেয়ে কবে দেখবেন?"

হরিশবাবু হাত কচলে বললেন—"মেয়ে দেখার আর দরকার কি?"

ভুসিবাবু রাজী হলেন না এতে।

বললেন—"ছেলেমেয়ে দুজনেরই পরস্পরকে একবার দেখা দরকার বিয়ের আগে।"

"বেশ, সর্বোত্তম কালই গিয়ে দেখে আসুক তাহলে—"

সব শুনে সীমা বললে—"আমি কারো কাছে বেরুবো না। তুমি আমার পাশের ঘরে এনে বসিও, আমি আমার ঘর থেকেই খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে নেব। যদি ভাল লাগে, তখন গিয়ে আলাপ করব।"

তাই হল।

ঝোলা পা-জামা আর চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সর্বোত্তম এসে বসল পাশের ঘরে। প্রচুর জলখাবার নিয়ে এল চাকর রসিকলাল।

ভুসিবাবু বললেন—"খাও বাবা খাও। আমি সীমাকে ডেকে আনছি—"

ঘরের ভিতর যেতেই সীমা বলল—"ওর নাম তো টিপুসুলতান। টোকাটুকি করে পাস করেছে। ওকে বিয়ে করব কি। ও তো একটি গবেট। আমার একটা "মস্তান"দের অ্যালবাম আছে। তাতে ছবি আছে ওর। একদিন স্ন্যাপ তুলেছিলাম—দেখবে?"

ভুসিবাবু আবার মাথায় হাত বুলুলেন। বুঝলেন মেয়েটা আবার তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেল।

ঠাকুমার কাণ্ড

পৌত্রের বয়স আট বছর, ঠাকুরদার বয়স ছিয়াত্তর। ঠাকুরমার বয়স ছেষট্টি। ঠাকুমাই বিচারক হলেন সেদিন। নাতি আর ঠাকুরদার প্রায়ই ম্যাচ হয়। কখনও লুডোর, কখনও স্নেক-ল্যাডারের, কখনও ক্যারমের। এ সবের হার-জিত তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন যে ম্যাচটা হচ্ছিল তা একটু অন্যরকম। ঠাকুমা একটা কাল্পনিক গল্পের আরম্ভটা বলে দিয়েছিলেন। কথা ছিল খোকন সেটা নিজের মতো করে শেষ করবে, ঠাকুরদাও শেষ করবেন নিজের মতো করে। দুজনের গল্পই ঠাকুমা শুনবেন। যার গল্প তাঁর বেশি ভাল লাগবে তার গলায় তিনি একটা মোটা জুঁইফুলের মালা পরিয়ে দেবেন।

গল্পের আরম্ভটা হচ্ছে এই ঃ

"অন্ধকার জঙ্গল। বড় বড় গাছ চতুর্দিকে। চাঁদ উঠেছে কিন্তু চাঁদের আলো জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে পারে নি, এত ঘন সে বন। শুধু অন্ধকার নয়, মাঝে মাঝে বাঘ-সিংহের ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল রাজপুত্র একটা গাছের উপর উঠে বসে আছে। তার মাথার মুকুটের উপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে—"

ঠাকুমা বললেন—"এইবার তোমরা ভাব গল্পটা কি করে শেষ হবে। কাল তোমাদের গল্প শুনব।"

ঠাকুরদা ভাবতে লাগলেন।

খোকনও ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ছাতে মাদুর পাতা হল। তার উপর ঠাকুমা বসলেন তাঁর পানের বাটা নিয়ে। ঠাকুরদার ইজিচেয়ারটাও এল ছাতে। অর্জুন গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেল। খোকন বসল ছোট্ট একটা মোড়ায়। ঠাকুমা মুখে একখিলি পান ফেলে দিয়ে বললেন, "তোমরা রেডি ?"

খোকন বললে—"হ্যাঁ রেডি।"

ঠাকুরদাও বললেন—"আমিও রেডি।"

খোকন বললে—"কে আগে বলবে—"

ঠাকুমা তাঁর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুটি তুলে বললে—"একটা ধর।"

খোকন তর্জনীটা ধরতেই ঠাকুমা বললেন—"তুই আগে বল।"

খোকন শুরু করল তার গল্প।

'যে বনে সেই রাজপুত্র ঢুকেছিল তা সাধারণ জঙ্গল নয়। তা মায়া রাক্ষসীর জঙ্গল। জঙ্গলে কিছুদূর ঢুকেই অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরই বাঘ-সিংহ ডাকতে লাগল। রাজপুত্র ধনুকে তীর লাগিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল যদি কোন বাঘ বা

সিংহকে দেখতে পায়। হঠাৎ একটা বাঘকে দেখতে পেল সে। দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। বাঘের মুখের নীচের দিকটা ঠিক যেন বাঘের মতো নয়। মেয়ে-মানুষের মতো। রাজপুত্র তখনও ঠিক বুঝতে পারে নি ওরা সত্যি বাঘ নয়, ওরা মায়া-মাঘ। মায়া-রাক্ষসীই বাঘ সেজে তাকে ভয় দেখাচ্ছে। রাজপুত্র বুঝতে পারে নি প্রথমে, তাই বাঘের বুক লক্ষ্য করে সে তীরে ছুঁড়ল একটা। তীর ঠিক বুকের মাঝখানে বিঁধল, কিন্তু বাঘ পড়ল না। মায়া-বাঘ যে। আবার তীর ছুঁড়ল রাজপুত্র। আবার বাঘের বুকে বিঁধল। বাঘ কিন্তু মরে না। আর একটা বাঘ এল, তারপর আর একটা, তার পর আর একটা। রাজপুত্র পাগলের মতো তীর ছুঁড়তে লাগল। সব তীরগুলোই তাদের গায়ে বিঁধল, কিন্তু পড়ল না কেউ। হঠাৎ একটা বাঘ চেঁচিয়ে মানুষের ভাষায় বলে উঠল—রাজপুত্র তুমি আমাদের বন্দী। তোমায় আমরা মারব না, বন্দী করে রাখব। তুমি এ জঙ্গল থেকে আর বেরুতে পারবে না। ওরে তোরা আয়, আয়, আয়। ঘিরে ফেল রাজপুত্রকে। পিল পিল করে আরও বাঘ-সিংহ আসতে লাগল।

রাজপুত্র দেখলে তার তূণে আর তীর নেই। আর তীর থাকলেই বা কি হত। প্রত্যেক বাঘটার বুকে তীর বিঁধেছে, অথচ কেউ মরছে না। ভয় পেয়ে গেল রাজপুত্র। ঠিক সামনেই বড় একটা গাছ ছিল তাতে উঠে পড়ল সে। একেবারে মগডালের কাছা-কাছি গিয়ে বসল একটা ডালে। ভাবতে লাগল আমি তো কখনও কোনও পাপ করি নি, ভগবান আমাকে এ বিপদে ফেললেন কেন? আমার বাবাকে প্রজারা সবাই ভালবাসে। কিছুদিন থেকে তাঁর রাজত্বে ভয়ানক ডাকাতি হচ্ছে। অনেকে বলছে ডাকাতরা নবরূপী রাক্ষস। এই বনেই কি সেই রাক্ষসদের বাস? আমাদের অনেক সৈন্য নষ্ট করছে এরা। এদের হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই? হে ভগবান, আমাদের বাঁচাও। রাজপুত্র আকাশের দিকে মুখ তুলে হাতজোড় করে বসে রইল।'

এই সময় অশ্বিনী এসে বলল—"মা ফুলের মালা এনেছি, এই নিন।"

কাগজের ঠোঙার ভিতর মালাটি ছিল। ঠাকুমা সেটি পানের বাটার পাশে রাখলেন।

খোকন আবার বলতে শুরু করল।

'রাজপুত্র হাতজোড় করে বসেছিল এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সে দেখতে পেল আকাশের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। নক্ষত্র নীচে আসছে কেন? আলোয় আলোয় ভরে গেল চারিদিক। তারপর রাজপুত্র বুঝতে পারল—ওটা নক্ষত্র নয়, ওটা জ্যোতির্ময় রথ একটা। এরোপ্লেনের মতো দেখতে অনেকটা। কিন্তু এরোপ্লেনের মতো শব্দ নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। খুব কাছাকাছি যখন এল তখন রথের ভিতর থেকে কে যেন বললে, রাজপুত্র, ভয় পেও না। আমি ধর্মরাজ। তুমি কি চাও বল? রাজপুত্র বলল—আমার বাবা বড় বিপন্ন। তাঁর রাজ্যে ক্রমাগত ডাকাতি হচ্ছে। অনেকে বলছে ডাকাতরা ছদ্মবেশী রাক্ষস। আমার বাবাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ধর্মরাজ বললেন—তুমি নিজেও কম বিপদে পড়নি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য কিছু না চেয়ে তোমার বাবার জন্য আমার সাহায্য চাইছ এতে আমি খুব খুশী হলাম! আমি তোমার বাবাকেও সাহায্য করব, তোমাকেও করব। তুমি ওই গাছের কোটরের ভিতর ঢুকে বসে থাক আমি আকাশ থেকে দৈবী অস্ত্র নিক্ষেপ করব এখনই।

বনের সমস্ত রাক্ষসী এখনি মরে যাবে। তারপর মারব ওই ডাকাতদের। তুমি চুপ করে বসে থাকো। সব রাক্ষস-রাক্ষসী যখন মরে যাবে তখন তোমার জন্য রথ আনবে সুমন্ত্র সারথী। সেই রথে চেপে তুমি বাড়ি ফিরে যেও।

রাজপুত্রের রামায়ণ পড়া ছিল। তাই সে প্রশ্ন করল—সুমন্ত্র তো রাজা দশরথের সারথী ছিল।

—হ্যাঁ। এখন সে আমার কাছে আছে। রাজা দশরথের এখন তো আর রাজত্ব নেই, তিনি তাই আর রথ রাখেন না। দরকার হলে আমিই তাঁর জন্য রথ পাঠাই। ধর্মরাজের রথ ক্রমশঃ সরে যেতে লাগল। ক্রমশঃ দূরে, দূরে, আরও দূরে চলে গেল। মিলিয়ে গেল তারপরে। একটু পরেই দুমদাম শব্দ হতে লাগল। আকাশ থেকে অস্ত্র পড়তে লাগল রাক্ষস-রাক্ষসীদের উপর। আর সে কী হাঁউ মাউ চীৎকার। রাজপুত্র কানে আঙুল দিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে থেমে গেল সব! তারপর সমস্ত আকাশ আলো করে রথ এল।

সুমন্ত্র এসে বললেন, রাজকুমার বাড়ি চলুন।

রাজপুত্র বাড়ি চলে গেল।'

ঠাকুমা আনন্দে গদগদ।

বললেন—"চমৎকার হয়েছে গল্পটা। এইবার তোমার গল্প বল।"

ঠাকুরদা চোখ বুজে গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিলেন। কয়েক মিনিট তিনি কোন কথাই বললেন না। তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন—"এইবার শোন। আমার গল্পটা অন্যরকম একটু। শোন—"

বলতে শুরু করলেন ঠাকুরদা।

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণগ্রাস। সবাই গঙ্গাস্নান করছে। চারদিকে প্রচুর ভীড়। একটি ঘাটে কিন্তু ভীড় নেই। চারদিক কানাত দিয়ে ঘেরা। জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে কানাত। রাজবাড়ির লোকেরা এখানে স্নান করবেন। সেই কানাত-ঘেরা জলের মধ্যে জল ছাড়া কিন্তু আর একটি জিনিস ছিল সেটি কারো চোখে পড়ে নি। আকাশের রোহিনী নক্ষত্র প্রতিফলিত হয়েছিল সেখানে। রাজপুত্র যখন সেখানে স্নান করতে এল তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রোহিনী। মানুষের কি এত রূপ হতে পারে? এ যে দেবতার রূপের চেয়েও সুন্দর। যে চাঁদ রূপের গরবে এত গরবী তার মুখেও তো কলঙ্ক আছে। এ রাজপুত্রের মুখ যে নিষ্কলঙ্ক। অবাক কাণ্ড। এই খবরটি রোহিনী চাঁদকে গিয়ে বললে—সেদিন গঙ্গাস্নানের সময় এক রাজপুত্রকে দেখলাম। সে তোমার চেয়েও সুন্দর। চাঁদ হেসে জবাব দিলেন—কেন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ। আমি সাতাশটি রাজকন্যার স্বামী, আমি যদি কুরূপ হতাম তাহলে কি তোমরা আমার গলায় মালা দিতে? মর্ত্যের রাজপুত্র আমার চেয়ে সুন্দর হতেই পারে না। তোমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে, অশ্বিনীকুমারের কাছে যাও। রোহিনী ভ্রূভঙ্গী করে বলল—নিজের চোখে দেখে এস না। অমন রূপ দেবতাদের কারো নেই। দেবতারা সব হোৎকা, কারো চারটে মুখ, কারো পাঁচটা। কারো চারটে হাত, কারো ইয়া গোঁফ। রাজপুত্রটিকে দেখে এস, ভুল ভেঙে যাবে। চাঁদের মনে কৌতুহল জাগল। রাজপুত্রকে দেখতে হবে একদিন। আমার চেয়েও সুন্দর? নিজের

চোখে না দেখলে মানব না এ কথা। দেখতে গিয়ে কিন্তু বুঝতে পারলেন রাজপুত্রের দেখা পাওয়া সহজ নয়। রাজপুত্রকে তার মা রাত্রে কোথাও বেরুতে দেন না। সন্ধ্যের সময়ই রাজপুত্র বাড়ি ফিরে এসে মায়ের কোলে মাথা দিয়ে রূপকথা শোনে। আর রাতের অন্ধকারেই তো চাঁদ ওঠেন। তখন রাজপুত্রকে দেখতে পান না তিনি, তখন রাজপুত্র ঘরের ভিতর মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনে। রোহিনী খবর দিল— রাজপুত্র রোজ বনে স্বীকার করতে যায়। সেই সময় তাকে দেখতে পার। চাঁদ বললেন, কি করে পারব ? দিনের আলোয় আমি দেখতে পাই নাকি ! সূর্যের আলোয় আমার চোখ ধেঁধে যায়।

রোহিনী বলল, তোমার বন্ধু ইন্দ্রধনুকে বল না। তিনি ইন্দ্রকে কোনও অনুরোধ করলে ইন্দ্র তা ফেলতে পারবে না। ইন্দ্র ইচ্ছে করলে মেঘ দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে। আর সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লে অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন তুমি রাজপুত্রকে দেখে নিতে পার। রাজপুত্র প্রায়ই বনে শিকার করতে যায়। তুমি ইন্দ্রধনুকে বল, সে সব ব্যবস্থা করবে।

সব শুনে ইন্দ্রধনু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, আমি তো রাজপুত্রকে রোজ দেখতে পাই। আচ্ছা আমি ইন্দ্রদেবকে অনুরোধ করছি। রাজপুত্র যখন বনে শিকার করতে যাবেন তখন প্রচুর মেঘ এসে ঢেকে ফেলবে সূর্যকে। আর স্বর্গের পরীরা বাঘ-সিংহ সেজে ভয় দেখাবেন রাজপুত্রকে। তখন রাজপুত্র গাছে উঠে পড়বেন। আর সেই সময় চাঁদ দেখে নেবেন তাকে—

ঠিক তাই হল। রাজপুত্র বনে স্বীকার করতে যখন ঢুকলেন তখন দিবা দ্বিপ্রহর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকে ঢেকে দিল পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘে। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। দিন, রাত্রি হয়ে গেল। চারিদিকে ডাকতে লাগল বাঘ-সিংহের দল। সামনেই একটা মস্তবড় শিরীষ গাছ ছিল, তার উপর উঠে পড়ল রাজপুত্র। আকাশের খানিকটা নির্মেঘ ছিল আর সেখানে চাঁদ উৎসুক হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তার এক ঝলক জ্যোৎস্না যেন ধরা পড়ে গেছে কার সাদা উষ্ণীষের মুক্তা-মাণিক্যে। চকচক করছে। রাজপুত্রকে দেখতে পেলেন চাঁদ। একটু ঈর্ষা হল, এ কথা মানতেই হল রোহিনী যা বলেছে তা ঠিক। রাজপুত্র সত্যিই রূপবান।

তারপর আকাশের মেঘ কেটে গেল। অন্তর্ধান করল নকল বাঘ-সিংহরা। আবার রোদ উঠল। রাজপুত্র গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেলেন।'

ঠাকুমা বললেন—"খোকনের গল্পটাই বেশী ভাল হয়েছে। কারণ ওর গল্পে একটা আদর্শ আছে। ধর্মের জয় হয়েছে শেষে।" খোকনের গলায় মালাটা পরিয়ে দিলেন। খোকন দৌড়ে নীচে নেমে গেল মাকে মালাটা দেখাবে বলে।

ঠাকুরদা ঠাকুমার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি তো আর্টের কিছু বোঝ না দেখছি। হঠাৎ বিচারক হতে গেলে কেন ?"

ঠাকুমা হেসে বললে—"রাগ কোর না লক্ষ্মীটি। আর্ট বুঝি না, কিন্তু খোকনের গল্পটাই আমার ভাল লেগেছে। ওইটুকু ছেলে কেমন চমৎকার গল্পটি বানিয়েছে বল তো ? তাই ওকেই মালাটা দিলাম। তাছাড়া ও আমাদের খোকন যে—"

তারপর ঠাকুমা উঠে গিয়ে বুড়ো ঠাকুরদার তোবড়ানো গালে ছোট্ট একটু চুমু দিয়ে বললেন—"তোমারটাও ভাল হয়েছে—।"

আকাশে চাঁদ উঠেছিল তখন। ফুর ফুর করে একটু হাওয়াও বয়ে গেল।

অধ্যাপক সুজিত সেন

অধ্যাপক সুজিত সেন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

গভীর রাত্রি। বিশাল মরুভূমিতে কনকনে হাওয়া বইছে। আকাশে অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্র চেয়ে আছে বেদুঈন ওয়াজিদের দিকে। অশ্বারূঢ় ওয়াজিদ অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছে নূর-এর জন্য। বেদুঈনদের দলপতি জব্বর খাঁ-র অপরূপ রূপসী কন্যা নূর। ওয়াজিদ অভিজাত বংশের ছেলে নয়। তাই জব্বর খাঁ তাকে জামাতৃপদে বরণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ওয়াজিদ নূরকে ভালবাসে, নূরও ভালবাসে ওয়াজিদকে। সুতরাং তারা ঠিক করেছে পালাবে। দূরে তাঁবুর সারি দেখা যাচ্ছে। ওয়াজিদের ঘোড়াটাও অধীর হয়ে উঠেছে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। নূর বলেছিল শুকতারা যখন উঠবে তখন সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু শুকতারা তো অনেকক্ষণ উঠে গেছে—নূর এখনও আসছে না কেন। তাহলে কি আবিদ এসে গেছে? আবিদ ওয়াজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সঙ্গেই নূরের বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন জব্বর খাঁ।

হঠাৎ মরুভূমির বালি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। ওয়াজিদ, আমি এসেছি—

ওয়াজিদ সবিস্ময়ে দেখল মরুভূমির উপর সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে আসছে নূর।

আবিদ এসে গেছে। তাই এ রকম ভাবে আসতে হল। হেঁটে এলে সে দেখতে পেত।

ওয়াজিদ সঙ্গে সঙ্গে নেমে তুলে নিল নূরকে। ওয়াজিদ ঘোড়ায় চড়ল, নূর বসল তার পিছনে তাকে জড়িয়ে।

অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে লাগল ঘোড়া।

একটু পরেই আর একটি ঘোড়া বেরুল। আবিদের ঘোড়া। সে ঘোড়াও ছুটতে লাগল।

তারা এখনও ছুটছে। চিরকাল ছুটছে ইতিহাসের পটভূমিকায়।

রূপ কিন্তু বদলে যাচ্ছে।

যে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছিলেন, আর যাঁর পিছনে পিছনে ছুটেছিল জয়চন্দ্রের সৈন্যরা সে পৃথ্বীরাজ আর বেদুঈন ওয়াজিদের বাইরের রূপটা কেবল আলাদা। ভিতরের প্রেরণা কিন্তু এক। ওয়াজিদের কি হয়েছিল তা জানা নেই কিন্তু পৃথ্বীরাজের পরিণতি ইতিহাসে লেখা আছে। জয়চন্দ্র ডেকে

এনেছিল মহম্মদ ঘোরীকে। একবার নয়, দু'বার। পৃথ্বীরাজকে জীবন দিয়ে প্রেমের মূল্য দিতে হয়েছিল। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তিনি।

খবরের কাগজে একটা খবর প'ড়ে ইতিহাসের অধ্যাপক সুজিত সেনের মনে এই কথাগুলি জাগল। একজন যুবক নাকি একটি মেয়েকে এরোপ্লেনে বোম্বে নিয়ে চলে গেছে। পরদিন আর একটি এরোপ্লেনে মেয়ের বাবা গিয়ে উপস্থিত। তিনি নাকি মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

এ ধরনের আরো নানা কথা তাঁর মনে জাগল।

সেলিম-আনারকলির প্রেমকাহিনী। সেলিমের বাবা আকবর নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সেলিমের। আনারকলিকে নাকি জীবন্ত গেঁথে ফেলা হয়েছিল। পর পর মনে পড়ল নুরজাহান জাহাঙ্গীর আর শের আফগানের ইতিহাস। অনেক কথাই মনে পড়ল তাঁর। মনে পড়ল রাধার অভিসারের কথা, মনে পড়ল আয়ান ঘোষের ক্ষোভ। মনে পড়ল আরও অনেক প্রেমের কাহিনী, ইতিহাসের, পুরাণের, দৈনন্দিন জীবনের। সেদিনই তো ওই বাড়ির মেয়েটা পালাল বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে। সবই সেই ওয়াজিদ আর নুরের গল্প। একটু শুধু রকমফের। আর সবার পরিণতিই দুঃখ। অপরিসীম দুঃখ।

এই সব যখন ভাবছিলেন তিনি তখন দুয়ারের কড়াটা খুব জোরে জোরে বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলেন।

একি সুমিতা, কি খবর। হঠাৎ চলে এলি যে কলকাতা থেকে। ইনি কে?

পায়জামা-আচকান-ফেজ-পরা ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ইনি আমার স্বামী—সাতদিন আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

স্বামী!

লম্বা চওড়া ভদ্রলোকটি আদাব ক'রে হিন্দীতে বললেন, জি হাঁ। ম্যায় আপকা দামাদ হুঁ।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুজিত সেন। সুমিতা যে এমন করতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কোন বাপ ভাবতে পারেন না। মনে করেন তাঁর মেয়ে এমন কাজ করতে পারে না। বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর জিগ্যেস করলেন, বাংলাতেই করলেন, আপনার নাম কি—

সেলাম করে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, বান্দা কা নাম উসমান খাঁ। ম্যয় পাঠান হুঁ।

আবার নির্বাক হয়ে গেলেন অধ্যাপক সুজিত সেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে এতে তিনি খুশী হলেন না। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন মেয়ে আনত চক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মুচকি হাসি।

হঠাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন একটি রিভলবার নিয়ে।

মেয়েকে বললেন, বিবাহে কিছু যৌতুক দিতে হয়। এইটি নাও। যে পথে তুমি পা বাড়িয়েছ সে পথে অনেক বিপদ। বিপদে পড়লে এটি তোমার কাজে লাগতে পারে। রিভলবারটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

তেতলার ছাদে উঠলেন। ছাদ থেকে দেখতে পেলেন নীচে একটি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই উসমান খাঁ এসে তাতে সওয়ার হলেন। আর তার মেয়ে তার পিছনে উঠে বসল। অধ্যাপক সেনের আবার মনে হল সংযুক্তাও পৃথ্বীরাজের ঘোড়ার পিছনে উঠে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হল—সংযুক্তা আর পৃথ্বীরাজ এক জাত ছিল। জাতের মোহ কিছুতেই যেতে চায় না।

হঠাৎ মোটর সাইকেলটা গর্জন করে উঠল। তারপর ভট ভট করে চলে গেল।

আমি কি পাগল?

সর্বনাশ। খবরের কাগজে যদিও ঠাট্টা করে লিখেছে—ভারতমাতা কি কোনও ব্যক্তিবিশেষ যে তিনি পালিয়ে যাবেন? ভারতকে মাতারূপে বর্ণনা করেছেন একদল কবি, হয়তো, আর একদল কবি ভারতকে পিতারূপে আঁকবেন। কবিদের রূপক কাব্যেই মানায়, বাস্তবে নয়। ভারত মাতাও নয়, পিতাও নয়, মাসীও নয়, পিসিও নয়—ভারত একটা দেশ—সে কি পালাতে পারে?

"ভারত-মাতা ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেছেন" এ খবর যে কাগজে বেরিয়েছিল সেটার নাম কি, সে কাগজ আমি কবে পড়েছিলাম তা মনে নেই। যে কাগজে তার প্রতিবাদ বেরিয়েছিল তা-ও কবে পড়েছি স্মরণ নেই।

কিন্তু তবু জানি না কেন খবরটা বেরিয়েছিল, আমার এই কথা ক্রমাগত মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে সর্বনাশ।

সর্বনাশ তো হয়েইছে আমার। মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ওই কথাটা আমার মনে বসে গেছে। ভারত-মাতা পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল। না, আমার মাথার ঠিক নেই। বাবাকে কে যেন খুন করেছে, মা গলায় দড়ি দিয়েছেন, বাড়িওলা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাবা ছ'মাস বাড়িভাড়া দিতে পারেন নি। আমি শুনেছিলাম পাশের বাড়ির ভুপেশবাবুই নাকি বাবাকে খুন করিয়েছেন। তিনি অন্য পার্টির ছিলেন শুনেছি। তাঁর রাগের আর একটা কারণও ছিল। তিনি তাঁর মায়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বাবা রাজি হননি। তখন আমরা একটা বস্তিতে বাস করতাম। অধিকাংশই খোলার ঘর। দু'একটা খড়ের চালও ছিল। ভুপেশবাবুরা খোড়ো ঘরেই থাকতেন। তারপর আমি—না, একথাটা এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় না, না এ ঘটেনি,—কিন্তু তবু—কিন্তু এটাও তো মিথ্যে কথা নয় যে, আমার মাথার ঠিক নেই—কিন্তু তবু যা মনে হচ্ছে তা বলব। আমিই গভীর রাত্রে ভুপেশবাবুর বাড়িতে আগুন দিয়েছিলাম। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। ভুপেশবাবু কি পুড়ে মরেছিলেন? তাঁর মাতৃহীন মেয়েটা? জানি না। আগুন লাগিয়েই পালিয়েছিলাম আমি। সমস্ত বস্তিতেই নাকি আগুন ধরে গিয়েছিল। আমি ছিলাম না। পালিয়েছিলাম। ছুটে পালাই নি, আস্তে আস্তে বড় রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর ছায়ায় ছায়ায় পা টিপে টিপে পালিয়েছিলাম। ছুটলে কেউ হয়তো ধরে ফেলত। কেউ ধরেনি। হেঁটেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছিলাম সেদিন। সেইদিনই প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম রাতের কলকাতার আর একটা রূপ আছে। রাস্তা

নির্জন, হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি জোরে বেরিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কোনও গলি থেকে ঠুন্ ঠুন্ করে রিক্সাওলা বেরুল হয়তো। বড় বড় বাড়ি, নিস্তব্ধ সব। কোন কোনও বাড়ির জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, নীল আলো, চাপা আলো, রহস্যময় ইঙ্গিতভরা আলো। বাড়ির সামনে বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে কত লোক, ফুটপাথেও ঘুমুচ্ছে। এক জায়গায় সারি সারি অনেক রিক্সা, রিক্সাওলারা রিক্সার ভিতরই গুটি মেরে শুয়ে আছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। আলোর শিরস্ত্রাণ-পরা সারি সারি নীরব প্রহরীর দল যেন। মাঝে মাঝে দু'একটা নিবে গেছে। এক জায়গায় হোঁচট খেলাম—বাড়ির অন্ধকারে একটা খেঁকি কুকুর গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল, দেখতে পাইনি। কুকুরটার আর্ত চীৎকার আলোকিতা নগরীর মহিমাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। দাঁড়িয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর যা দেখলাম তা আশ্চর্য। কুকুরটা কুণ্ঠিতভাবে ল্যাজ নাড়াতে লাগল, যেন দোষ তারই, আমার নয়। এগিয়ে গেলাম। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিছুদূরে গিয়ে আবার থামতে হল। রাস্তার ধারে ফুটপাথের উপর কাঁথাজড়ানো কি যেন একটা পড়ে আছে স্তুপীকৃত হয়ে। আর তার ভিতর থেকে উঠেছে ক্ষীণ একটা রোদনধ্বনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি এটা? একবার জিগ্যেসও করলাম—কে! কোন সাড়া এল না। কান্না সমানে চলতে লাগল। তারপর কতক্ষণ হেঁটেছি মনে নেই। অনেকক্ষণ। পা দুটো ব্যথা করছিল। একটা আলোকিত বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম এসে। চারিদিকেই আলো, ইলেকট্রিক আলো, নানা রঙের আলো, সামনে মখমলে সজ্জিত একটা গেট—তার উপরে নহবতখানায় বাজছে শানাই, গেটের উপর ফুল দিয়ে কায়দা করে লেখা 'স্বাগত'। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে দাঁড়িয়ে আছে এ কোন্ রাজপুরী! বিয়ে বাড়ি মনে হচ্ছে। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল। প্রত্যাশা-ভরে দাঁড়িয়ে রইলাম। হয়তো এখানে খেতে পাব কিছু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুব ফরসা হামদো-মুখো একটি লোক বেরিয়ে এলেন, তাঁর পরণে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী আর পায়জামা, হাতে সোনার হাত-ঘড়ি। তাঁর দিকে চেয়ে করুণকণ্ঠে বললাম—"যদি কিছু খেতে দেন—"

"মাফ করো বাবা! এই রঘুবীর, গেট বন্ধ কর দেও। ফালতু আদমি ঘুস যায় গা—"

তিনি ভিতরে চলে গেলেন। রঘুবীর গেট বন্ধ করে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শেষে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘাটে নেমে আঁজলা আঁজলা জল খেলাম। তারপর একটু ছায়া দেখে একটা সিঁড়ির উপরই শুয়ে পড়লাম হাতে মাথা রেখে। ঘুমিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

এটা আমার গৃহত্যাগের পর প্রথম রাত্রির ঘটনা। তারপর অনেক রাত্রি এসেছে। অনেক দিনও। কিন্তু সে সবের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেব না। এক বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখেছি অনেক অদ্ভুত ঘটনা। সব বর্ণনা করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। দু'একটা নমুনা দিচ্ছি। দেখেছি একটা লোককে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলল সবাই। আমরা সব দল বেঁধে দেখলাম, কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলাম না। দেখেছি—একদিন রাত্রে—একটি অর্ধ-উলঙ্গিনী মেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল, তার পিছনে এল গুণ্ডা-গোছের লুঙ্গি-পরা লোক একটা, চুলের ঝুঁটি ধরে' টানতে টানতে নিয়ে গেল।

একটা বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলাম। কিছুদিন সেখানে দেখেছি বাড়ির কর্তা বাইরে হোটেলে রোজ ভাল-মন্দ খেয়ে আসেন, বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা শাকচচ্চড়ি খায় রোজ। তিনি দামী-দামী টেরিলিনের স্যুট পরেন, হাতে সোনার ঘড়ি—স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা আধময়লা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে। স্ত্রীর হাতে শাঁখা আর নোয়া ছাড়া কিছু নেই। ওর ঘড়িটা চুরি করে পালিয়েছিলাম আমি। আমি পেটের দায়ে ভিক্ষে করেছি, চুরি করেছি, ছ্যাঁচড়ামি করেছি—শেষে এক বুড়ি বেশ্যার লালসার খোরাকও জুগিয়েছি কিছুদিন। এইসব আবর্তের মধ্যে কি করে জানি না আমার মনে এই ধারণাটা বসে গেছে যে ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে খবরের কাগজে খুনের খবর আর বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার নারকীয় বর্বরতার খবরের কোন ফাঁকে এ খবরটাও যেন পড়েছিলাম ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেদিন মনে হচ্ছিল বিজ্ঞানীরা কোথায় যেন সূর্যকে নিয়ে ফুটবল খেলছেন। চাঁদকে কোন মাঠে নিয়ে গিয়ে চাঁদমারি করেছেন, মঙ্গলগ্রহ থেকে এক মহাবাঘ 'সসারে' চড়ে এসে নাকি পৃথিবীর নেতাদের ঘাড় মটকাচ্ছে—এই রকম নানা কথা মনে হয়। ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন এটাও হয়তো আমার আজগুবি কল্পনা।

পুলিশের তাড়া খেয়ে মাঝে মাঝে ছুটছিলাম। পয়সার লোভে বোমা ফেলেছিলাম এক জায়গায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটছিলাম। কলকাতার বাইরে। হুগলী জেলার কি একটা গ্রাম যেন। নাম মনে নেই। অন্ধকার রাত্রি। সামনে কি আছে দেখতে পাচ্ছিলাম না ভালো। হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম একটা গর্তে। পায়ে কি একটা যেন বিঁধে গেল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

সকালবেলা যখন জ্ঞান হল—ক'দিন পরে হল জানি না—তখন অনুভব করলাম আমি প্রায় চলচ্ছক্তিহীন আর খুব ক্ষিধে পেয়েছে। পড়ে গিয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটা ভাঙা নালির মধ্যে। আশপাশের সব ময়লা বোধহয় ওই নালিতে এসে জমে। কি বিকট দুর্গন্ধ। আমার গায়ের ছেঁড়া শার্ট আর পরণের প্যাণ্ট আগেই ময়লা হয়ে গিয়েছিল—দেখলাম নালির কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে সেগুলো। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম পায়ের পাতাটা ফুলে পাউরুটির মতো হয়েছে। বেশ একটা বড় কাঁটা বিঁধে আছে। সেটা টেনে বার করে ফেললাম। রক্ত পড়তে লাগল।

অনেক দূরে দেখলাম একটা খোড়ো বাড়ি রয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেইদিকেই এগুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। হামাগুড়ি দিতে লাগলাম শেষে।

তারপর ? না, ঠিক কতক্ষণ কেটেছে মনে নেই।

হঠাৎ অনুভব করলাম মুখে কে যেন জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

জ্ঞান হল।

শুনলাম--"ফটিকদা, ফটিকদা—"

কে-ও ?

তারপর হঠাৎ চিনতে পারলাম।

মল্লিকা। ওদের বাড়িতেই আমি আগুন দিয়েছিলাম। কিন্তু বললাম না যে চিনতে পেরেছি।

ফটিকদা, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ?

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—

তাড়াতাড়ি গিয়ে দুধ নিয়ে এল খানিকটা। বুঝতে পারলাম ভারত-মাতা কোথাও যান নি।

আটকে গেল

অতুল নাগ সাধারণ ছেলে। বি. এ. পাশ। মা-বাবা ছেলেবেলায় গত হয়েছেন। মানুষ হয়েছে সে পিসির কাছে। পিসিও বিধবা। মহিয়সী মহিলা ইনি। দু'বার জেল খেটেছেন। লোকদেখানো পেশা ঝি-গিরি। কিন্তু আসলে ছিলেন তিনি চোরদের সাহায্যকারিণী। যে বাড়িতে চাকরি করতেন, সে বাড়ির সুলুক-সন্ধান জানিয়ে দিতেন চোরদের। কোন্ আলমারিতে গয়না থাকে, কোন্ বাক্সে টাকাকড়ি থাকে, এই সব খবর পাচার ক'রে বেশ রোজগার করতেন বিলু পিসি। নিঃসন্তান ছিলেন। সমস্ত স্নেহটা পড়েছিল অতুলের উপর। নায়গ্রা প্রপাতের মতো পড়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অতুলকে কোলে নিয়ে বেড়াতেন। যে বাড়িতে কাজ করতে যেতেন, নিয়ে যেতেন অতুলকে। অতুলের জুতো জামা সোয়েটার প্যান্ট প্রভৃতির জৌলুষ অবাক ক'রে দিত সকলকে। ধনীর ছেলেদের মতোই কাপড় জামা পরত সে। তার জন্যে আলাদা ভালো ভালো খাবারও কিনতেন বিলু পিসি। বিলু পিসির ঈর্ষা ছিল তাদের সম্বন্ধেই যারা ভদ্রলোক, যারা ফর্সা জামা কাপড় প'রে বেড়ায়, যারা হাকিম, ডাক্তার, উকিল, ইনজিনিয়ার, যারা মোটর চড়ে, যাদের বাড়িতে সে ঝি-গিরি করে। তাই বিলু পিসি চেয়েছিলেন তাঁর অতুলও ওদের মতো হোক। ছেলেবেলা থেকেই পোষাক-আসাকে তাই ভদ্র ক'রে তুলেছিলেন তাকে। একটু বড় হতেই তাকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন। পড়াবার জন্যে মাষ্টারও রাখলেন একজন। অতুল কিন্তু ছেলে ভালো ছিল না। স্কুলের মাষ্টাররা তার নাম দিয়েছিল গবেট, গবাকান্ত এই সব। কোন ক্লাস থেকেই সে একবারে প্রমোশন পায় নি। যে মাষ্টারটি ওকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন, তিনি ওর বোকামির পাল্লায় প'ড়ে নাকানি-চোবানি খেতেন রোজ। একদিন ধৈর্য হারিয়ে চড় মেরেছিলেন। অতুল সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ করে গগন-বিদারী চিৎকার করতে লাগল। বিলু পিসি এসে পড়লেন। এসে দেখেন অতুল গাঁক্ গাঁক্ ক'রে চেঁচাচ্ছে আর হাত পা ছুঁড়ছে।

"কি হল?"

"মেরেছে। শালা মাষ্টার মেরেছে আমায়—" বিলু পিসি মাষ্টারকে বললেন—"ছেলেমানুষকে মেরেছ তুমি? তোমাকে পড়া ব'লে দেবার জন্যে রেখেছি, মারপিট করবার জন্যে তো রাখি নি।"

মাষ্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "আমি চললুম, ভস্মে আর ঘি ঢালতে পারব না।"

"কি বললে! ভস্ম?"

চীৎকার করে উঠলো বিলু পিসি।

"মানিককে ভস্ম বললে তুমি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—"

ঠিক এই সময় ময়দাবাব্ প্রবেশ করলেন।

"কি হয়েছে, কি ব্যাপার!"

অতুল আরও জোরে কেঁদে উঠল। বিল্ পিসি তার-স্বরে বিবৃত করলেন, কি হয়েছে।

ময়দাবাব্ মাষ্টারের চুলের ম্ঠি ধ'রে ঠাস ঠাস করে চাড়িয়ে দিলেন।

"বেরিয়ে যা শ্লা। তোর মতন মাষ্টার অনেক পাব", জীর্ণ শীর্ণ মাষ্টারটি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ময়দাবাব্ ষণ্ডা লোক। তাঁর আসল নাম চঞ্চলকুমার। একটা আটা-পেষাই কল আছে ব'লে সবাই তাকে ময়দাবাব্ ব'লে ডাকে। গ্জব উনি চোরেদের থানাদার একজন। অর্থাৎ চোরাই মাল ল্কিয়ে রাখেন এবং পাচার করেন। বিল্ পিসির সঙ্গে খ্ব দহরম মহরম। তাঁকেই বড় লোকদের বাড়ির অন্ধি সন্ধির খবর এনে দেন বিল্ পিসি। দিয়ে বেশ মোটারকম টাকা পান। অতুলের জন্য আর একটি মাষ্টার এলেন। মাষ্টাররা আজকাল শিক্ষক নেই, কাক হয়ে গেছেন। ভাত ছড়ালেই এসে হাজির হন। এই সব কাকেদের শিক্ষায় যে শিক্ষা মেলে তার ম্ল মর্ম হল আজকাল টাকায় সব হয়। ধরাধরি আর ঘ্ষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। করছিলও। টপটপ ক'রে পরীক্ষা পাশ করছিল অতুল। হায়ার সেকেন্ডারীতে ফার্ষ্ট ডিভিশনই পেয়ে গেল। যিনি গার্ড দিচ্ছিলেন তিনি তার খাতাটা বাইরে পাঠিয়ে একজন প্রফেসারকে দিয়ে টুকিয়ে আনলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় অবশ্য একটু কড়াক্কড়ি হয়েছিল। মিলিটারী প্লিশ পাহারা ছিল, কিন্তু তব্ গার্ড-বেটা হাত সাফাই করতে পেরেছিল তার মধ্যেই। বি. এ. পাশ করেছিল অতুল। অতুলের বাইরের বাহারটাও কম ছিল না। দামী কাপড়ের চোং প্যাণ্ট, দামী হাওয়াই শার্ট, দামী চপ্পল, ইয়া জ্লপি, ইয়া গোঁফ, মাথায় পিছন দিকে শ্যাম্প্ করা চুলের থোকা—সবই ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনে হল এক জায়গায় আটকে গেছি। ব্যাপারটা কিন্তু সামান্য। সে দোকানে একদিন সিগারেট কিনছিল, এমন সময় দেখল পাশের দোকান থেকে ছট্ট্ একটা একসারসাইজ ব্ক কিনছে। ছট্ট্ তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। এবার বি. এ. পরীক্ষা কমপ্লিট করেছে। পরনে সাধারণ একটা পাঞ্জাবী আর কাপড়। পায়ে চটি জ্তো।

"এ কি ছট্ট্ এখানে যে—"

"এখানেই তো আমার বাড়ি।"

"কোথায় ?"

"এই যে পাশের গলিতে। আসবে ?"

অতুলের কৌতূহল হল। গেল তার সঙ্গে।

বাড়িতে ঢুকেই ছট্ট্ বলল – বস। মা, আমার কলেজের একজন বন্ধ্ এসেছে।

অতুল একটা সাধারণ তক্তপোষে বসল। দেখল ঘরে কোনও জাঁকজমক নেই। কোণে একটা কাঠের টেবিল। তার সামনে একটা টিনের চেয়ার। দেওয়ালে কাঠের সেলফে মোটা মোটা বই। এটা ছট্ট্র পড়ার ঘর বোধ হয়। আঁচলে হাত ম্ছতে ম্ছতে হাসি-ম্খে মা এলেন। গায়ে সাদা ব্লাউজ, অতি সাধারণ শাড়ি পরণে। বললেন, "খ্ব খ্শী হয়েছি বাবা। একটু মিষ্টি ম্খ ক'রে যাও। নারকেল নাড়্ করেছি—"

অতুলের মনে হল বিল্ পিসি রগরগে রঙের ব্লাউজ পরে। শাড়িও ডগমগে।

বাড়িতে খাবার করে না, কিনে আনে। হঠাৎ অতুলের মনে হল আমি কিছুতেই ছট্টু হ'তে পারব না। ওর আর আমার মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, টাকা খরচ ক'রে তা পার হওয়া যাবে না। ছট্টু আর ছট্টুর মা তার সঙ্গে যত ভদ্রতা করতে লাগল ততই যেন দ'মে যেতে লাগল অতুল। তার বার বার মনে হ'তে লাগল আমি হাজার চেষ্টা করলেও ছট্টু হ'তে পারব না। আমি হেরে গেছি।

হাবি আর নবু

রাস্তার ডাস্টবিন হাঁটকে বেড়ায় মেয়েটা। পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। মাথার চুল রুক্ষ। গায়েও তেল পড়েনি কতদিন তার ঠিক নেই। বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে। বাপ-মা কেউ নেই। বাপকে সে দেখেও নি কখনও। শুনেছিল বাপ কোথা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন ঝি-বৃত্তি করেছে। কিন্তু অনেক রোগ ছিল মায়ের। বিশেষ করে হাঁপানি। বেশী খাটতে পারত না। শেষে একদিন মরে গেল। পাড়ার ছেলেরাই চাঁদা করে মাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে মুরুব্বি হচ্ছে জিতু। ষণ্ডা গোছের মস্তান। তাকে এড়িয়ে চলত হাবি। সুযোগ পেলেই অশ্লীল কথা বলত, অশ্লীল ইঙ্গিত করত। পাড়ায় ঝি-গিরিও সে নেয় নি ওই জিতুর জ্বালায়। তার মা যে বাড়িতে কাজ করত সেই বাড়িতে সে গিয়েছিল অবশ্য। গিন্নীমাকে বলেছিল—আপনাদের বাড়িতে দিনরাত থাকব। কোনও মাইনে চাই না, আমাকে আর নবুকে খেতে দেবেন খালি। নবু তার চার বছরের ছোট ভাই। বাড়ির গিন্নী হাবির দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে বললেন—না বাছা, আমরা একটি বুড়িসুড়ি গোছের লোক চাই। হাবি যদিও নোংরা হয়ে থাকত কিন্তু তাকে ঘিরে অর্ধস্ফুট যৌবনের মহিমা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে অনেকগুলি সোমত্ত ছেলে, হাবিকে বহাল করতে সাহস পান নি দূরদর্শিনী গিন্নীমা। হাবি পাড়াতে আর কোথাও চেষ্টা করে নি। জিতুর ভয়ে। পাড়াতে থাকলেই জ্বালাতন করবে। তার মায়ের একটা সরু সোনার হার ছিল। সেইটে বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করেছিল সে। তার থেকেই রোজ একখানা পাঁউরুটি কিনে সে নবুকে দিয়ে যেত। বলত—এটা খেয়ে থাকিস। আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। রাস্তায় কোথাও বের হসনি যেন।

খুব ভোরে বেরিয়ে যেত হাবি। অন্ধকার থাকতেই। রাস্তার ভীড়ে হেঁটে বেড়াত আর ভিক্ষে করত। খুব ভোরে গঙ্গার ধারে গিয়ে হাত পাতলে কিছু পেত সে। কোনদিন চার আনা, কোনও দিন বা তারও বেশী। তারপর চলে যেত মাড়োয়ারি পট্টিতে। সেখানে একজন শেঠ রুটি বিতরণ করেন 'গরীব-দুখিয়া'দের। খানচারেক রুটি পেত। দুখানা খেত, দুখানা রেখে দিত নবুর জন্যে। তারপর যেখানেই বড় রকম ডাস্টবিন দেখত সেখানেই দাঁড়িয়ে হাঁটকে হাঁটকে দেখত যদি কিছু পাওয়া যায়। খাবার খুব কমই পাওয়া যেত। মাঝে মাঝে পাউরুটির টুকরো-টাকরা পেয়েছে। কিন্তু খাবার ছাড়াও ওখানে আরও নানারকম শৌখিন জিনিস পেয়েছে সে। ছোট্ট টিনের কৌটো, লেসের টুকরো, একটা ছেঁড়া ব্লাউজই পেয়েছিল একদিন। তাছাড়া টুকিটাকি নানারকম জিনিস, ছুরির বাঁট পেয়েছিল একদিন একটা। তার উপর খোদাই করা

কুমীরের মুখ। ভারী চমৎকার দেখতে। আর একদিন স্নো-এর একটা ডিবে। তার ভিতর স্নো ছিল একটু। সেটা নিজের গালে মেখেছিল। একটা ফিতেও পেয়েছিল একদিন। নোংরা ডাস্টবিনে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়।

বিকেলে কোন বড় রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ায় হাবি। মোটর দাঁড়ালেই সুর করে বলে—একটা পাঁচ নয়া বাবু। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। মিছে কথাও বলে—আমার বাবা মরে গেছে। মা অসুখে পড়ে আছে—দয়া করে কিছু দিন মা। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। যারা দল বেঁধে মেয়ে দেখতে বেরোয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চায়। হাবি মনে মনে ভাবে—বোকা পাঁঠার দল সব। মানুষ নয় ছাগল। প্যাণ্ট-পরা ছাগল। কিন্তু এসব ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষে যখন করতে হবে, ওদের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। দেখুক, মুখপোড়ারা যত খুশী দেখুক। দেখলে গায়ে ফোসকা পড়বে না আমার। পথ চলতে চলতে নানারকম জিনিস দেখে হাবি। মোটরের সারি চলছে তো চলছেই। কতরকম লোক, কতরকম মুখ। মাঝে মাঝে পতাকা নিয়ে ছোঁড়ারা দল বেঁধে চেঁচাতে চেঁচাতে যায়। হাবি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি। একদিন মাড়োয়ারিদের বিয়ের প্রসেশন দেখেছিল। বর চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। সামনে-পিছনে গড়ের মাঠের বাজনা। সারি সারি মোটর চলেছে। এসব দেখলে নবুর জন্যে মন কেমন করে তার। নবুটা কিচ্ছু দেখতে পায় না। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট্ট ঘরে বসে থাকে বেচারা। তবু ভাগ্যে বাবা ওই ঘরটুকু করে গিয়েছিল তাই তো মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছে তারা। সামনে একটা দুর্গন্ধ নালি ভটভট করছে, দূরে একটা জলের কল, পাইপটা ভাঙা, দিনরাত জল পড়ছে তো পড়ছেই। সমস্ত গলিটা তাই স্যাঁতসেঁতে। প্রত্যেক বাড়ির নানারকম ময়লা এসে জমছে গলিটাতে। সর্বদাই একটা দুর্গন্ধ। অধিকাংশ বাড়িই খোলার। তাদের বাড়িটাও। তবু—হাবির মনে হয় ভাগ্যে ওই বাড়িটুকু আছে। নবুকেও কি শেষে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে? লেখাপড়া শেখার তো কোন উপায় নেই। দূরে একটা অবৈতনিক ইস্কুল আছে নাকি। কিন্তু সেখানেও নাকি মাস্টারদের পয়সা না দিলে ভর্তি করে না। ও আশা ছেড়েই দিয়েছে হাবি। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, ভালই হবে—ও আর একটু বড় হলে ওকে নিয়ে ভিক্ষেয় বেরুব। ওকেও ভিক্ষের বাঁধা গৎগুলো শিখিয়ে দেব। রাস্তায় রাস্তায় বড় হোক—যেমন কপাল করেছে। হাবির সবচেয়ে দুঃখ হয়, সে রাস্তায় কত রকম জিনিস দেখে—বাজি, ম্যাজিক, মোটরের সারি, কতরকম পোশাক—যদিও আজকাল বেশীর ভাগই চোং-প্যাণ্ট, তবু সেদিন একটা লম্বা জোব্বাপরা দাড়িতে মেহেদি-লাগানো লোক দেখেছিল পার্কে পার্কে মিটিং হচ্ছে, গান বাজনা বক্তৃতার খই ফুটছে, টগবগ করছে যেন কলকাতা শহর। নবু বেচারা এসব কিছুই দেখতে পায় না। কি যে নিয়ে যাবে তার জন্যে মাঝে মাঝে ভাবে হাবি। সেদিন ডাস্ট-বিন থেকে চমৎকার একটা নীল কাঁচের টুকুরো কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটা চোখে দিয়ে দেখলে সারা পৃথিবীটা নীল হয়ে যায়। কি খুশীই হয়েছিল নবু। রোজ নবুর জন্যে একঠোঙা চানাচুর নিয়ে যায় সে। মাঝে মাঝে গরম জিলিপিও। একদিন একটা সোনালি কাঁচের চুড়ি পেয়েছিল। সেইটে এখনও পরে আছে নবু ডান হাতে। হাবি যত বলে—"তুই ব্যাটাছেলে তুই চুড়ি পরবি কি রে?" নবু তবু শোনে না। সেদিন হাবি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। লোকে লোকারণ্য। প্রকাণ্ড একটা মিটিং

হচ্ছে গড়ের মাঠে। মাইক ফিট করা চারিদিকে। হামদো-মুখো মোটা লোক একজন বক্তৃতা করছেন—আমাদের পণ, আমরা প্রত্যেকের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেব, প্রত্যেকের কাপড় জামার ব্যবস্থা করব, প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি বানিয়ে দেব, সর্বহারারাই সব পাবে আবার, এদেশ কর্ণের দেশ, সত্যি জেলের ছেলে কর্ণই এবার মহারাজা কর্ণ হবে। এবার তাকে মহারাজা করবে দুর্যোধনের দল নয়, যুধিষ্ঠিরের দল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যাবে—

তারপর প্রচুর হাততালি। হাবি মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আহা, সত্যি কি হবে অমন, ঠিক যেন রূপকথা। কোন কৌটোয় কোন ভোমরার ভিতর আছে সেই দুঃখরাক্ষসীর প্রাণ, সত্যি কি কোনও রাজপুত্র টিপে মারবে তাকে একদিন? তারপরই দুম দুম করে বোম ফাটল কয়েকটা। পালা, পালা, পালা—পুলিশও গুলি চালাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে হাবি ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। গলিটাও ছুটে হয়তো পার হয়ে যেত সে। হঠাৎ একটা ডাস্টবিন চোখে পড়ল তার। কানায় কানায় ভর্তি একেবারে। আর তার থেকে সাদা মতন লম্বা গোছের কি একটা বাক্স বেরিয়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কি ওটা! তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে নিলে বাক্সটা। খুলে দেখলে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। একেবারে খালি নয়। দুটো কাঠি আছে এখনও।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

গলির গলি তস্য গলিতে অন্ধকার আরও গাঢ়।

বড়রাস্তার আলোও নিভে গেছে। এ তল্লাটেই ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। হাবির গলিতে অবশ্য ইলেকট্রিসিটি নেই। নির্বিঘ্নে ফিরে এল হাবি রাত্রি ন'টা নাগাত।

নবু—নবু—কপাট খোল—

নবু চিন্তিত হয়ে বসেছিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাছে বেশী তেল খরচ হয়ে যায় তাই সে প্রদীপও জ্বালায় নি। তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে সে।

"এ কি রে! অন্ধকারে বসে আছিস! পিদিমটা জ্বালিস নি এখনও? তাড়াতাড়ি জ্বাল। আজ একটা মজার জিনিস পেয়েছি—"

"কি—"

"আলোটা জ্বাল না আগে—"

প্রদীপের আলোটা জ্বলতেই হাবি বাক্সটা তার হাতে দিল—"বার কর।"

"কাঠির মত কি এটা—"

"এইখানটা ধর—আর ওই দিকটা পিদিমের আগুনের উপর ধর। দেখ না কি কাণ্ড হয়—"

সঙ্গে সঙ্গে ফুলঝুরিতে আগুন ধরে গেল।

অসংখ্য তারার ফুল ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

"বাঃ, ভারি সুন্দর তো। এ কি জিনিস দিদি—"

"এর নাম ফুলঝুরি। তুই হবার আগে মা আমাকে কিনে দিয়েছিল একবার কালী-পুজোর সময়।"

"বাঃ, ভারি চমৎকার। আর নেই?"

"আর একটা কাঠি আছে। ওটা কাল পোড়াস। সব কি একদিনে শেষ করতে আছে?"

মুগুর

"স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে আমাদের সাধারণ লোকের দুর্গতির আর অন্ত নেই। রাস্তা চারদিকে খোঁড়া, এক পশলা বৃষ্টি হলে চারদিকে জলে জলময়। ইলেক-ট্রিক আলো বার বার নিভছে। বাধ্য হয়ে সাবেক লণ্ঠন চালু করেছি। হাতপাখাও কিনেছি খান কয়েক। যথাসর্বস্ব খরচ করে ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলাম। ছেলে চাকরি পায় নি, মেয়ে রূপসী নয় বলে বিয়ে হয় নি। তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। শুনেছি ঘুস না দিলে চাকরি হবে না। মাছ-মাংস খাওয়া ভুলে গেছি। শাকপাতাই খাই। ডিম আলু কালে-ভদ্রে। এ স্বাধীনতা যদি আরো কিছুদিন চলে তাহলে হয়তো শাকপাতাও জুটবে না। রেশনের চাল তো আর খাওয়া যায় না ভাই। ওরকম চাল যে ওরা কোথায় পায় ভগবানই জানে। পচা চাল—রাঁধবার সময় দুর্গন্ধ ছাড়ে। আর সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছি আমার ছোটছেলের জ্বরটা ছাড়ছে না। যে ডাক্তারবাবু দেখেছিলেন তিনি বললেন টাইফয়েড হয়েছে। টাইফয়েডের ওষুধ লিখে দিলেন। ধার করে আকাশছোঁয়া দাম দিয়ে সে ওষুধ কিনে আনলাম, তবু সারছে না। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করছেন ওষুধে ভেজাল আছে। তিনি আর একটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন আর একটা বিশেষ দোকান থেকে কিনতে বলেছেন। তারা কিন্তু যা দাম চাইছে তা আমার সাধ্যাতীত। এখন তাই ভাবছি আমার মা-ঠাকুমা যা করতেন তাই করব। বাবা তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেব।"

বলে যাচ্ছিলেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরখেল ওরফে পচাবাবু, আর শুনছিলেন রামগুরু পাঠক ওরফে মুগুর। শৈশবে ও কৈশোরে রামগুরুর সঙ্গে পঞ্চানন একসঙ্গে পড়ে-ছিলেন কানপুরের এক স্কুলে। তারপর রামগুরু কলকাতাতেই এসে ব্যবসা করে-ছিলেন। রামগুরু যদিও উত্তরপ্রদেশবাসী কিন্তু বাংলা ভাল বলে। উর্দু এবং হিন্দী তো গড় গড় করে বলতে পারেই। বহুকাল পরে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

সব শুনে রামগুরু বললে—"তুমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাও। প্রেসক্রপশনটা দিয়ে যাও আমাকে—।"

"ভাই অত দাম দিয়ে আমি ওষুধ কিনতে পারব না।"

"দাম তোমাকে দিতে হবে না।"

"তুমি দেবে? না, তাও আমি চাই না।"

রামগুরু হিন্দীতে বলে উঠল—"আরে দেও না ভাই। কাহে হাল্লা মাচাতে হো—।"

রামগুরুর গাট্টাগোট্টা চেহারা। বেশ বলিষ্ঠ লোক।

অনেকদিন পরে দেখা তার সঙ্গে। তাকে চটাতে সাহস হল না পচাবাবুর।

প্রেসক্রপশনটা দিয়ে দিলেন তাকে।

তারপর বললেন, "তুই আজকাল কি করিস, কোথায় থাকিস?"

রামগুরু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল—"স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে থাকি।

আমি এখন চললাম। তুই বাবা তারকেশ্বরের কাছে যা। পরে পারি তো দেখা করব তোর সঙ্গে।"

রামগুরু স্বল্পভাষী লোক। "তাহলে চললুম"—বলে চলে গেলেন। পচাবাবু বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখলেন ছেলে চোখ বুজে আছে। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। শুনলেন—জ্বর ১০৫ ডিগ্রি। মাথায় জলপটি দিয়ে স্ত্রী ব্যাকুলভাবে হাওয়া করে চলেছেন। বড়ছেলে, বড়মেয়ে কেউ বাড়ি নেই। দু'জনে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে গেছে। পঞ্চানন স্ত্রীকে বললে—"আমাকে গোটা পনেরো টাকা বার করে দাও। আমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাব। ধর্ণা দেব। বাবার দয়া না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না।"

সে কি!

আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু স্বামীকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তিনি সমস্ত স্থির করে ফেলেছিলেন। চলে গেলেন তিনি। পথে দেখা হল তাঁর আর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। একই আপিসে চাকরি করতেন দু'জনেই।

"পঞ্চাননবাবু, কি খবর?"

"খবর এখনও মরে যাই নি। মর-মর হয়েছি। আপিসের পেন্সন আনতে পারি নি এখনও। বার কুড়ি গেছি। ছেলে-মেয়ের চাকরি হয়নি এখনও। অথচ ওদের চেয়ে অনেক খারাপ ছেলে-মেয়ের চাকরি হয়ে গেল মুরুব্বির জোরে।"

"আপনার ছেলে-মেয়ের মুরুব্বি নেই—?"

"আছেন একজন এম. এল এ.।"

"শুধু এম. এল এ হবে না, মন্ত্রী চাই। আর এ গভর্নমেণ্ট বোধহয় টিকবেও না। সবাই মন্ত্রী হতে চায়। তা কি সম্ভব।"

মুচকি হেসে ট্রাম থেকে নেমে গেলেন ভদ্রলোক। পঞ্চানন হাওড়ায় পেঁছে শেষ বিড়িটি ধরিয়ে তারকেশ্বরের ট্রেনে উঠলেন।

॥ ২ ॥

তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে পাণ্ডার হাত থেকে ফুল-বেল-পাতার আশীর্বাদ নিয়ে শুয়ে পড়লেন পঞ্চানন মন্দিরের চত্বরে।

যতক্ষণ বাবা দয়া না করেন ততক্ষণ জলস্পর্শ করবেন না তিনি—মনে মনে এই শপথ করে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন চুপ করে। প্রথম দিন প্রথম রাত কেটে গেল, কিছু হল না। দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় রাতও কাটল, কিছু হল না। তৃতীয় দিনও দিনের বেলা কিছু হল না, কিন্তু গভীর রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন স্বয়ং মহাদেব যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, বাবা পচা, তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে তোমার ছেলের ওষুধ এসে গেছে, ওষুধ খেয়ে জ্বরও অনেক কমে গেছে, জ্ঞান হয়েছে। ওই ওষুধেই সে ভাল হয়ে যাবে। তোমার ছেলে-মেয়ের চাকরিও হবে। কিন্তু এখনও একটু দেরী আছে। তোমার মুরুব্বি এম. এল. এ.-টি যখন মন্ত্রী হবেন তখন চাকরি পাবে ওরা। ভবিষ্যতে সব এম. এল. এ.-ই মন্ত্রী হবে। প্রত্যেককে মন্ত্রী না করলে এদেশে গণতন্ত্রকে টেকানো যাবে না। অনেক পোর্টফোলিও হবে। পানের পোর্টফোলিও,

চুনের পোর্টফোলিও, সুপুরির পোর্টফোলিও, খয়েরের পোর্টফোলিও, বিড়ির পোর্ট-ফোলিও, তামাকের পোর্টফোলিও, সিদ্ধির পোর্টফোলিও, গাঁজার পোর্টফোলিও—আমাদের যতরকম প্রয়োজনীয় জিনিস আছে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা পোর্টফোলিও হবে আর প্রত্যেকটির জন্যে মন্ত্রী থাকবে। তোমরা যখন পরাধীন ছিলে তখন একটা সাহেবই সব চালাত—কিন্তু এখন তা তো হতে পারে না—স্বাধীন দেশে ঝাঁক ঝাঁক মন্ত্রী আর লাখ লাখ পোর্টফোলিও চাই—।

পঞ্চাননের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হত অত মন্ত্রী হলে তাদের মাইনে হবে কত? সঙ্গে সঙ্গে তার কানে কানে কে যেন বলে গেল—পঞ্চাশ টাকা করে। ওতেই ওরা রাজী হবে।

॥ ৩ ॥

বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন পঞ্চানন।

তার স্ত্রী বললেন—"তুমি চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে একটি ষণ্ডা গোছের লোক এসে হাজির হল। ওষুধ দিয়ে গেল। আর দিয়ে গেল একবস্তা গোবিন্দভোগ চাল আর প্রকাণ্ড রুইমাছ একটা। ডাক্তারবাবুর কাছে ওষুধগুলো নিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু বললেন—'হ্যাঁ এই ওষুধই তো লিখে দিয়েছিলাম। খাওয়ান ওটা।' খাইয়ে খোকা বেশ ভাল আছে। কি ব্যাপার?"

পঞ্চানন বলল—"আমার বন্ধু মুগুর এসেছিল। তাকে বলেছিলাম সব। সে-ই বোধহয় ব্যবস্থা করেছে—"

"পচা ফিরেছিস?"

বাইরে মুগুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পঞ্চানন বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

"খোকা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। ওষুধটার অনেক দাম নিয়েছে, না?"

"অনেক দাম চেয়েছিল। আমি বললাম—দিন, দাম দিচ্ছি। তারপর ওষুধটি পকেটস্থ করে নাকে ঝেড়ে দিলাম এক ঘুসি। বললাম শালা ব্ল্যাক করবার আর জায়গা পাওনি! হৈ হৈ উঠল একটা, আমি তার মধ্যেই ডুবকি মেরে দিলাম।"

"চাল আর মাছ?"

"ওরা আমার বাধ্য লোক! ওদের আমরা রক্ষা করি। আমরা না থাকলে ওদের গুদোম ওদের ভেড়ী লুট হয়ে যেত। আমরাই বাঁচাই ওদের। তাই ওরা আমাদের খাতির করে, ভয়ও করে, যখন যা চাই দেয়। ভাই রে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। সোজা আঙুলে কোন ঘি-ই বেরোয় না এখানে। বার বার আঙুল বেঁকাতে হয়। যাই হোক, তোর কোন ভাবনা নেই। আমি আসব মাঝে মাঝে, তুই পুরনো দোস্ত, সব ঠিক করে দেব তোর।"

"আচ্ছা, তুই কি করিস বল তো?"

"বলেছি তো আমি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ। কেউ বলে মস্তান, কেউ বলে গুণ্ডা—"

হা হা করে হেসে উঠল মুগুর।

অসমাপ্ত গল্প

অনেকক্ষণ ধরে কল্পনাকে ডাকছিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর তবে তিনি এলেন।

"কি চান, আমাকে ডাকছেন কেন?"

"দয়া করে গল্পের একটা প্লট দিন আমাকে।"

"আমার কাছে আজকাল গল্পের প্লট তো কেউই চায় না। গল্পের প্লট তো রাশি রাশি ছড়ানো রয়েছে চারিদিকে। তার থেকেই কোন একটা বেছে নিয়ে লিখে ফেলুন। বাস্তব গল্পই তো লোক আজকাল চায়।"

"কি রকম প্লট?"

"একটি মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে' গেছে, একটি ছেলে তার বুড়ো বাপকে জুতো মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, একটা বেকার আত্মহত্যা করেছে, আর একজন চুরি করেছে, ছাত্ররা শিক্ষকদের উপর হামলা করছে, পরীক্ষা দিতে ব'সে নকল করছে আর বলছে বেশ করছি, খুব করছি, আরও করব। বাজারে জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য কিন্তু খদ্দেরের ভীড়ও কম নয়, একটু দেরী ক'রে গেলে পনেরো টাকা কে. জি. দরের মাছও পাওয়া যায় না। এই সব কোন একটা নিয়ে লিখুন না। ঠাকুরমার রূপকথা বা আরব্য উপন্যাসের গল্প আজকাল চলবে কি? আমি যে প্লট দেব আপনাকে, তা ওই রকমই আজগুবি হবে কিছু একটা। বাজারে চলবে না। আপনি আলু বিক্রি করতে চান তো?"

"হ্যাঁ—"

"তাহলে বিলিতি ডিটেকটিভ গল্প বা পর্ণোগ্রাফী থেকে চুরি করতেও পারেন। খুব কাটবে—"

"না, না—আপনি কিছু একটা বলুন—"

মুশকিলে ফেললেন দেখছি। আচ্ছা, একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ের কথা আমার মনে হয়েছিল সেদিন। তার নাম দিয়েছিলাম সারেগামা। আশ্চর্য মেয়ে। তার সঙ্গে ফুলের উপমা দেব, না জ্যোৎস্নার উপমা দেব, না ভোরের সোনালি আলোর উপমা দেব তা ভেবে পাচ্ছি না। তার এক অঙ্গে যেন বিশ্বের সব রূপ ঝলমল করছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? মেয়েটি যা বলত তা সুরে বলত। ভোরবেলা খাবার চাইত ভৈরবী সুরে গান গেয়ে। দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদের দিকে চেয়ে সারং ভাঁজত, বিকেলে বন্ধুদের ডাক দিত ইমন সুরে, রাত্রে শুতে গিয়ে ঝিকে মশারি ফেলে দিতে বলত কখনও বেহাগে, কখনও বাগেশ্রীতে। চারদিকে কিন্তু সবাই বেসুরো। মুশকিলে পড়ে গেল সারেগামা। সবাই মনে করতে লাগল মেয়েটা পাগল। বিয়ের বয়স হল, কিন্তু পাত্র জুটল না। তার বাবা মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বদ্যি ডাকল। বদ্যি বললে—এ মেয়ে পাগল নয়। এ মেয়ে অসাধারণ। বাবা-মার মনে হল আমরা সাধারণ লোক। আমরা অসাধারণ মেয়ে নিয়ে কি করব। সারেগামাই সমস্যার সমাধান করে দিলে একদিন। গভীররাত্রে ছাতের উপর উঠে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সে অদ্ভুত

একটা সুর ভাঁজতে লাগল। সে সুর কোনও চেনা সুর নয়—তা তার প্রাণের সুর। আকাশের তারারা কাঁপতে লাগল। তারপর আকাশ থেকে—"

এমন সময় পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটা পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

বললাম—"এখন গল্প থাক। আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।"

"কেন—"

"চাকরির জন্য একটা দরখাস্ত করেছিলাম। পেয়ে গেছি। এখুনি যেতে হবে।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলাম।

ঝুমরি

উদীয়মান ঐতিহাসিক লেখক অম্বিকানাথ লেখক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু তাঁহার লেখা সুলভ নহে। কারণ তিনি ফরমাশে লেখেন না, টাকার লোভেও লেখেন না। লেখেন কম। খেয়ালী লোক, মেজাজ ঠিক না থাকিলে লেখার টেবিলে বসেন না। বিবাহ করেন নাই, সংসারে আত্মীয়-স্বজনও কেউ নাই। বিরাট তিনতলা বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। ব্যাংকে প্রচুর টাকা, জমি-জমাও অনেক। অর্থাভাব নাই। ইচ্ছা করিলে নানারূপ বিলাসে গা ভাসাইতে পারিতেন, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু সে-সব দিকে প্রবৃত্তি ছিল না। পারতপক্ষে বাড়ির বাহিরে যাইতেন না। একটু কুনো প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনতলায় ছিল তাঁহার বড় বড় চারখানি ঘর। চারখানি ঘরই বইয়ে ঠাসা। একটিতে শুইবার জন্য একটি খাট, আর একটিতে লিখিবার জন্য চেয়ার-টেবিল। আর সামনে ছিল প্রশস্ত একটা বড় ছাত। ছাতে সারি-সারি গোলাপ ফুলের টব এবং জুঁই-মালতীর লতা। এই পরিবেশ ছাড়িয়া অম্বিকানাথ কোথাও গিয়া স্বস্তি পাইতেন না। বাহির হইতে কোন লোক আসিলেও তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেন। বাহিরের লোক ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য নীচে ঝুমরি থাকিত। ঝুমরি অনুমতি না দিলে অম্বিকাবাবুর সহিত দেখা করা সম্ভব ছিল না।

শুনিয়াছিলাম অম্বিকাবাবু নাকি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীদের লইয়া একটি ভাল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমার মাসিক পত্রিকাটির জন্য সেই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। অম্বিকাবাবুকে একটি পত্র দিলাম। তিনি উত্তর জানাইলেন, প্রবন্ধ লেখা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, আপনি একমাস পরে আসিয়া আমার সহিত দেখা করুন। যে মাসিকপত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিতে চান তাহার নমুনাও সঙ্গে আনিবেন।

একমাস পরে তাঁহার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়ি। হাতার চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। গেটে কেহ ছিল না। গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি চারিদিকে ভুট্টা-ক্ষেত। আমি প্রবেশ করিতেই ভুট্টা-ক্ষেতের ভিতর হইতে একটি প্রৌঢ়া সাঁওতালনী বাহির হইয়া আসিল। কালো রং, তালের মত মুখ, হস্তীমুণ্ডের মত নিতম্ব, সমুন্নত পয়োধর, হাতে একটি লাঠি।

"তুই কে বটিস্ ?"

"আমি অম্বিকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ঝুমরি কোথায় থাকে—"

"আমিই ঝুমরি। ছেল্যার শরীর ভাল লয়। দেখা হবেক নাই।'

"কবে আসব ?"

"আসিস না। তুরা সবাই উয়ার মাথাটা খারাপ করে দিবি। সারাদিন সারারাত খালি পড়ে। ঘুমোয় না। তুরা আসিস না—"

সবিনয়ে বলিলাম—"আমার বড় দরকার। উনিই আমাকে ডেকেছেন।"

"সাতদিন পরে আসিস।"

সাতদিন পরে আবার গেলাম। আবার ঝুমরি ভুট্টা-ক্ষেত হইতে বাহির হইল। এবার সে বাধা দিল না। এবার অম্বিকাবাবুর সহিত দেখা হইল। দেখিলাম তিনি বেহালা বাজাইতেছে। আমি চেয়ারে বসিয়া রহিলাম, তিনি বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। বেহালা বাজানো শেষ করিয়া বলিলেন—"কে আপনি।"

"আমার নাম বসন্ত সেন। আমি আপনার সেই সুফী-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধটার জন্যে এসেছি—"

"আপনার তো সাতদিন আগে আসবার কথা।"

"আমি সাতদিন আগেই এসেছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনার শরীর খারাপ। ঝুমরি বললেন সাতদিন পরে আসতে।"

অম্বিকা একটু হাসিলেন।

বলিলেন—"ঝুমরি সহজে কাউকে আমার কাছে আসতে দেয় না। কই দেখি আপনার পত্রিকাটি কি রকম ?"

পত্রিকাটি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আর্ট-পেপারে ছাপা, ছাপার ভুল নাই, ছবিগুলিও সুন্দর।

বলিলেন—"বেশ আপনাকে প্রবন্ধটা দেব।" পারিশ্রমিক কত লইবেন তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তিনিও কিছু বলিলেন না। কিন্তু আমি একটি লোভনীয় টোপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সেইটি ফেলিলাম।

"আমি কিছু হাতে-লেখা পান্ডুলিপি পেয়েছি। সেটার পাঠোদ্ধার করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আপনি যদি—"

অম্বিকাবাবু আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না।

"হাতে-লেখা পান্ডুলিপি ? নিশ্চয় আনবেন। পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করব। যদি পারি প্রবন্ধও লিখব এ নিয়ে। আপনি নিয়ে আসবেন।"

সসঙ্কোচে বলিলাম—"কিন্তু আপনার ঝুমরি কি আমাকে আসতে দেবে ? আপনি যদি ওকে বলে দেন ভালো হয়। ও আপনার চাকরানী তো—"

"আরে না, না—ও আমার মা।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন অম্বিকাবাবু।

"কি রকম ? আপনার মা ?"

"বছর পাঁচেক আগে ওকে বাহাল করেছিলাম। বাহাল করবার কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম, ও কেবল আমার চারদিকেই ঘুর ঘুর করে। একদিন মশারীর ভিতর শুয়ে আছি, ও দেখি মশারীর ভিতর ঢুকে পড়েছে—বললাম, কিরে এখানে ঢুকছিস কেন ? ও বলল দেওয়ালের দিকের মশারীটা ভাল করে গোঁজা হয় নি, তাই গুঁজে দিচ্ছি। ভারি রাগ হল। বকলাম খুব। জিগ্যেস করলাম—তুই আমার কাছে কাছে

ঘুর ঘুর করিস কেন ? কাঁদতে লাগল। তারপর কি বলল জানেন—আমার যে ছেলেটা মরে গেছে তোর মুখ যেন তারই মতো। আমি তাকেই দেখি তোর মধ্যে। তাই তোর কাছে ঘুর ঘুর করি। তখন আমি বললাম তুই তাহলে চাকরানী হয়ে থাকবি কেন ? আমার মা হ। আমার সব ভার নে। ও জবাব দিলে—হুঁ নিব। সেইদিন থেকে ও আমার মা হয়েছে, সর্বদা আমাকে আগলে আগলে বেড়ায়। আমাকে চান করিয়ে দেয়, আমার চুল আঁচড়ে দেয়, আমার জন্যে রান্না করে। রাত দশটার পর আমার পড়ার ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়। মানা করতে গেলে মাথা খুঁড়তে থাকে। She is a tigress."

আমি অম্বিকাবাবুকে হাতে-লেখা পুঁথিগুলি পেঁছাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম। অম্বিকাবাবু বলিয়াছিলেন একমাস পরে যাইতে। একমাস পরে গিয়াছিলাম, কিন্তু গেট পার হইতে পারি নাই। আমাকে দেখিয়া ঝুমরি রামদা লইয়া ছুটিয়া আসিল।

"বেরা, বেরা এখান থেকে। কি কতকগুলান ছাই-পাঁশ দিয়ে গেলি সেদিন। সেই থেকে ছেল্যাটার ঘুম নাই, খেতেও চায় না। আমার একটা ছেল্যা মরে গেছে, এটাকেও মারবি নাকি তুরা। বেরা এখান থেকে। কারুকে ঢুকতে দিব নাই আমি। বেরা, বেরা," রামদা উঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসিল আমাকে। চলিয়া আসিতে হইল। কয়েকদিন পরে অম্বিকাবাবুর পত্র পাইলাম।

সবিনয় নিবেদন

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনাদের পাণ্ডুলিপি কাল ঝুমরি পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। পাগলীকে লইয়া কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। নমস্কার। ইতি

অম্বিকানাথ।

ভুলির গল্প

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই খুব গরীব। ভুলির স্বামী যোগেশ আরও গরীব ছিল। যোগেশ জমিদারবাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করিত। তাহার বাবা মা আত্মীয় স্বজন বড় একটা ছিল না। প্রথম যৌবনে, মানে কুড়ি বৎসর বয়সে, বিবাহ হইয়াছিল দুর্গার সহিত। এক বৎসর পরে দুর্গা কলেরায় মারা গেল। তাহার পর যোগেশ আর বিবাহ করে নাই। নানা জায়গায় নানা কাজ করিয়াছে সে। ক্ষেত-মজুরের কাজই বেশী করিত। গাছপালাকে ভালবাসিত, তাদের সেবা করিয়া আনন্দ পাইত। তাহার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন জমিদারবাবুর বাগানে মালীর কাজে বহাল হইল সে। সেই সময়ে বাগানের মধ্যে থাকিবার জন্য একটি ঘর পাইয়াছিল। জমিদারবাবুই বলিলেন, তুই আবার বিয়ে কর। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া পাত্রী ঠিক করিলেন পাশের গাঁয়ের ভুলিকে। পিতৃ-মাতৃহীনা ভুলি তাহার দূর-সম্পর্কের মাসীর বাড়িতে অসীম লাঞ্ছনা দুর্গতির মধ্যে মানুষ হইতেছিল। জমিদার পলাশলোচন তাহাকে সেই হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া যোগেশের বধূ করিয়া দিলেন। প্রৌঢ় যোগেশ এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা বধূটিকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া

পড়িল। ভুলি শুধু নবোদ্ভিন্নযৌবনা নহে সে রূপসীও। তাহাকে দেখিলে মুনির মনও টলিয়া যাইবার সম্ভাবনা—এই রমণীরত্নকে লইয়া যোগেশ কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

ভুলি কিন্তু অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। সে লেখাপড়া শেখে নাই। আধুনিকতার ধার ধারে না। তাহার বদ্ধ ধারণা এবং অটুট বিশ্বাস, পতি পরম গুরু, পতি দেবতা। যদিও যোগেশের দেবতা-সুলভ গুণরাশি ছিল না, সে ঘন ঘন বিড়ি খাইত, দুর্মুখ ছিল, গোপনে বাগান হইতে ফুল ও ফুলগাছের চারা বিক্রয় করিয়া অসদুপায়ে মাঝে মাঝে কিছু উপরি রোজগার করিত। ভুলিকে মাঝে মাঝে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া চড়-চাপড় দিত, তবু কিন্তু ভুলির ধারণা বদলায় নাই। সে বিশ্বাস করিত যোগেশ তাহার পরম গুরু, যোগেশই তাহার জীবনে একমাত্র দেবতা।

পলাশলোচন কিন্তু নিগূঢ় অভিসন্ধি লইয়াই যোগেশের সহিত ভুলির বিবাহ দিয়াছিলেন।

পলাশলোচন যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন তখন মাঝে মাঝে তিনি ছিন্নবসন পরিহিতা ভুলিকে পথে গোবর কুড়াইতে দেখিতেন। খোঁজ খবর লইয়া যখন তিনি জানিতে পারিলেন ভুলি যোগেশের পালটি ঘর, তখন তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন তিনি। ভাবিলেন তাহাকে যদি নিজের বাগান-বাড়িতে আনিতে পারেন তাহা হইলে আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। গরীবের মেয়ে তো। অর্থলোভে সহজে ভুলিয়া যাইবে। ভুলি কিন্তু ভুলিল না। বাগানে আসিয়াই সে পলাশলোচনের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল বাবুটি ভাল নয়। একটি অদৃশ্য বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া বাগানবাড়িতে বাস করিতেছিল সে। স্বামীকে সে কিছু বলে নাই। তাহার মনে হইয়াছিল এ কথা বলিলে সে হয়তো চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু এ রকম একটি ভাল চাকরি ছাড়িয়া যাইবেই বা কোথা? এমন চাকরি পাওয়াও সহজ নয়। ভুলি ভাবিয়াছিল নিজেই সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

পলাশলোচন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রথমত তিনি ভুলিকে নিজের খাস কামরার দাসীরূপে বাহাল করিতে চাহিলেন। ভুলি রাজী হইল না। পলাশলোচন তাহার পর তাহাকে টাকার লোভ দেখাইতে লাগিলেন। টাকার অঙ্ক দশ হইতে শুরু হইয়া এক শত পর্যন্ত হইল। তবু ভুলিকে বাগে আনা গেল না। পলাশলোচন তখন আর একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি যোগেশকে দেওঘর পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, তুমি সেখানে গিয়া নিজে দেখিয়া এক শত ভাল গোলাপের চারা কিনিয়া আনো। যোগেশ যেদিন চলিয়া গেল সেই দিন রাত্রেই পলাশলোচন ভুলির ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভুলি সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং ক্রমাগত ছুটিতে লাগিল। তাহার কাতর হৃদয় মথিত করিয়া যে নীরব প্রার্থনা ভগবচ্চরণে আছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহারই ফলে পরবর্তী ঘটনাটি ঘটিল কিনা জানি না কিন্তু ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সত্যই অদ্ভুত। আমাদের টি-ভি দেখিয়া অদ্ভুত মনে হয় না, লন্ডনের কাহাকেও কেবল্ করিয়া তাহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা আমাদের নিকট আশ্চর্য মনে হয় না, রেডিও শুনিয়া আমরা বিস্ময়বোধ করি না কিন্তু ইহার পর ভুলির অদৃষ্টে যাহা ঘটিল তাহা শুনিয়া আপনারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন।

ভুলি ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে একটি জঙ্গলে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। জঙ্গলের ভিতর কিছু দূর ঢুকিয়া ভুলি দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড একটি গাছ দাঁড়াইয়া আছে। ভুলি গাছটির ওপাশে গিয়া গাছটিতে ঠেস দিয়া বসিল। ঠেস দিবামাত্র অন্তর্হিত হইল গাছটি। একজন দিব্যকান্তি যুবা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শুধু দাঁড়াইল না তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আদেশ করুন, কিভাবে আপনার সেবা করব।"

ভুলি সভয়ে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে বাবা ?" যুবক বলিল, "আমি নাগরাজ ফণীন্দ্র। দেবতার অভিশাপে গাছ হয়ে ছিলাম এতদিন। দেবতা বলেছিলেন কোন সতী রমণী যদি তোমাকে স্পর্শ করে তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। আপনার স্পর্শে আজ আমি মুক্তি পেয়েছি, আপনি দেবী। আমি আপনার ভৃত্য, যা বলবেন তাই করব।"

ভুলি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ফণীন্দ্র নিমেষের মধ্যে নিজেকে শংখচূড় সর্পে রূপান্তরিত করিয়া বলিলেন, "ভয় নেই মা, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।" পরদিনই সর্পাঘাতে পলাশলোচনের মৃত্যু হইল।

ভুলির মুখেই গল্পটি শুনিয়াছিলাম। আপনাদের বিশ্বাস হইতেছে না ? এ যুগে না হওয়াই সম্ভব।

জমপেশ

তুনকার মা গরিব। গাঁয়ের বাইরে প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলের ধারে তার ছোট কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তুনকার বয়স বছর কুড়ি। গ্রামে গিয়ে জনমজুরের চাকরি করে। তুনকার মা জঙ্গল থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে আনে। তাই দিয়ে সে রান্না করে। জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। কোন এক রাজার সম্পত্তি নাকি। জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার। সেখানে ঢুকতে সাহস হয় না।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন খুব ঝোড়ো হাওয়া বইছে। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা, চারদিকে আগুনের হালকা ছড়িয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। জঙ্গলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছগুলো ঝড়ের দাপটে এঁকেবেঁকে আর্তনাদ করছে যেন। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য দৈত্য দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

তুনকার মা উনুনে আগুন দেয় নি ঝড়ের ভয়ে। ভাবছিল রাতের জল-দেওয়া পান্তা ভাত আছে, ক্ষিধে পেলে তাই খাবে। ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করে বসেছিল তুনকার মা। বাইরে সোঁ সোঁ ভীষণ শব্দ, জঙ্গল একেবারে তোলপাড়। তুনকা এখন কোথায় ? কখন ফিরবে সে ? এই ঝড়ে জনমজুরের কাজ পেয়েছে কি ? এই রকম নানা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তার মন।

হঠাৎ তার কানে এল—বাইরে কে যেন বলছে—"তিন দিন খাই নি। বাঁচাও আমাকে, খেতে দাও চারটি—"

তুনকার মা জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলে—খুব রোগা জরাজীর্ণ একটি বুড়ী ভিখারিনী তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

তুনকার মায়ের ঘরের সামনে আসতেই তুনকার মা তাকে ডাকলে—"তুমি এখানে এস।"

কপাট খুলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তার মনে হল বুড়ী ঝড়ের ধাক্কায় এখনি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হাত ধরে নিয়ে এল তাকে ঘরের ভিতর।

"তুমি কে মা ?"—জিজ্ঞেস করলে বুড়ী।

"আমি তুনকার মা।"

"তোমার ছেলে তুনকা কোথা ?"

"কাজে বেরিয়েছে। সে জনমজুরের কাজ করে।"

"আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। একটু খাবার কোথায় পাই। তোমার ঘরে আছে কিছু।"

"আছে। পান্তা ভাত আছে। আর কাঁচা পেঁয়াজ।"

"বাঃ, সে তো চমৎকার হবে।"

তুনকার মা পান্তা ভাত নুন তেল দিয়ে মেখে দিলে।

বুড়ী পেঁয়াজ দিয়ে সেগুলি খেয়ে ফেললে চেটেপুটে।

"ভারী তৃপ্তি পেলাম। খুব আনন্দ হল—জম্‌পেশ তোমার ভালো করবে।"

"জম্‌পেশ কে ?"

"সে আছে একজন। ভালো লোকদের সে উপকার করে। যখনই কোন বিপদে পড়বে তখনি বোলো—জম্‌পেশ এস। সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হবে।"

"আপনি তবে তাকে ডাকলেন না কেন। আপনি তো বিপদে পড়েছিলেন—"

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল বুড়ীর মুখে।

"আমার কখনও বিপদ হয় না। পৃথিবীতে অনেক ভালো লোক আছে। যখন বিপদে পড়ি তখন তাদেরই কেউ না কেউ এসে উদ্ধার করে দেয়। এই তো তুমি এখনই দিলে—আমার জম্‌পেশকে ডাকবার দরকার হয় না।"

হাসতে হাসতে উঠে পড়ল বুড়ী। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকল। তুনকার মা কপাটটা বন্ধ করতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। বুড়ীকে আর দেখতে পেল না। একটু আশ্চর্য হল। এত অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল কি করে।

কপাট বন্ধ করে দিয়ে তুনকার মা একটু চিন্তায় পড়ল। যে ক'টা ভাত ছিল বুড়ীকে দিয়ে দিলাম। তুনকা যদি ফিরে এসে খেতে চায় কি দেব তাকে। ভেবেছিলাম আমি নিজে না খেয়ে ওর জন্যে রেখে দেব ভাতগুলি। ঘরে চাল বাড়ন্ত। তুনকা জানে এ কথা। সে যদি চাল কিনে আনে, ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেব। ঘরে দুটো আলু আছে।

রান্নাঘরে গিয়ে কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে খাবার সাজানো থরে থরে। হাঁড়ি ভরতি ভাত, গামলা ভরতি ডাল, নানারকম তরকারি, তাছাড়া অনেক মিষ্টি।

তুনকার মায়ের গা ছমছম করতে লাগল।

মনে হল কে এসেছিল আমার ঘরে…।

॥ ২ ॥

সেইদিনই রাত্রে আর একটা ঘটনা ঘটল।

রাত্রে তুনকা তার মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হল তার বিছানার চারিপাশে কি একটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠল সে। সাপ! প্রকাণ্ড মোটা একটা ময়াল সাপ। জঙ্গলে ময়াল সাপ থাকে সে শুনেছিল। বোধ হয় ঝড়ের চোটে বেরিয়ে পড়েছে বন থেকে।

মা-মা ওঠ—ওঠ—সাপ—ময়াল সাপ ঢুকেছে ঘরে। আলো জ্বালো—

লণ্ঠন জেলে শিউরে উঠল তার মা। সত্যি বিরাট একটা ময়াল সাপ। দরজার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই। সাপটা গলা বাড়িয়ে তুনকাকে ধরবার চেষ্টা করছে। একবার যদি ধরতে পারে পিষে মেরে ফেলবে। হঠাৎ মনে পড়ল সেই বুড়ীর কথা। সে জম্পেশকে ডাকতে বলেছিল। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তুনকার মা।

জম্পেশ এস—জম্পেশ এস।

জানালাটা খুলে দিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল না একটুও। হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু মেঘ উঠল একটা। শুধু উঠল না, এগিয়ে আসতে লাগল তার বাড়ির দিকে। তার বাড়ির কাছে যখন দাঁড়াল তখন মনে হল মেঘ নয় পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের যেন দুটো বড় বড় পা রয়েছে থামের মতো। আকাশ থেকে যেন আকাশবাণী হল। "আমি জম্পেশ এসেছি। কি দরকার, তোমাদের—"

চিৎকার করে উঠল তুনকার মা।

"আমাদের ঘরে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ ঢুকেছে। বাঁচাও আমাদের।"

"তোমাদের ঘর যে বড্ড ছোট, আমি ঢুকব কি করে।"

"যেমন করে পার ঢোক। সাপটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—"

প্রচণ্ড এক লাথিতে ভেঙে পড়ল ঘরের দেওয়াল। এক হেঁচকা টান দিয়ে ঘরের চালটা কে যেন দূরে ফেলে দিলে—।

তুনকার মা আর তুনকা দেখল এক বিরাটকায় মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

ময়াল সাপটা ঘরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। ঘরের দেওয়াল তার উপর ভেঙে পড়াতে আর পালাতে পারে নি। সোঁ সোঁ শব্দ করছিল শুধু। একটু পরেই কিন্তু ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তার মুণ্ডটা। দেখা গেল লকলক করে জিভ বার করছে। চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

জম্পেশ হাঁক দিলেন—"গরুড় গরুড়—শীগ্গির চলে এস তুমি—ময়াল সাপটাকে নিয়ে যাও—"

আকাশ থেকে ডানা ঝটপট করতে করতে নেমে এল পক্ষীরাজ গরুড়। নিমেষের মধ্যে ময়াল সাপটাকে নখে করে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে। যেন ময়াল সাপ নয়, সামান্য একটা খড়কুটো।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুনকা আর তুনকার মা।

"আর কি চাই তোমাদের ?"

"আমাদের ঘর তো ভেঙে দিলেন। কোথায় এখন থাকব আমরা ?"

"এখনই ঘর করে দিচ্ছি।"

আকাশের দিকে চেয়ে চিৎকার করলেন—"বিশ্বকর্মা, দু'জন ভালো মিস্ত্রী পাঠাও—"

দু'জন দেবদূত এসে হাজির হল সঙ্গে সঙ্গে। মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন।

জম্‌পেশ বললেন—"এদের জন্যে এখুনি ভাল বাড়ি তৈরী করে দাও। তোমরা এদিকে একটু সরে দাঁড়াও। এখুনি বাড়ি হয়ে যাবে তোমাদের।"

তুনকা আর তুনকার মা সরে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চতুর্দিক। অন্ধকারের ভিতরেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। ভয় করতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে ? অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ অন্ধকার চলে গেল, জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারিদিক। তখন তারা দেখতে পেল তাদের কুঁড়ে ঘর নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার একটি মর্মর প্রাসাদ। যারা প্রাসাদ তৈরি করেছিল তারা কেউ নেই। জম্‌পেশ কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—"তোমাদের ঘর হয়ে গেছে। ওই ঘরে গিয়ে বাস কর তোমরা।"

"আমরা গরিব। আমরা কি অত বড় বাড়িতে থাকতে পারব ?"

"গরিব কেন, ব্যবসা কর, বড়লোক হয়ে যাবে। তোমার ছেলে কি কাজ জানে—"

"ও জনমজুরের কাজ করে। কিন্তু খুব ভালো পুতুল গড়তে পারে ও। ওর বাবা ভালো প্রতিমা গড়ত—"

"বেশ তো পুতুলের ব্যবসাই কর।"

"কিন্তু তা করতে গেলে টাকা চাই বাবা। আমরা গরিব, কোথায় পাব টাকা—"

"টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করলেন—"কুবের, কুবের শুনে যাও—"

জরির পাড় দেওয়া মিরজাই গায়ে বেঁটে মোটা একটি লোক এসে হাজির হলেন।

"দেখ কুবের, এরা বড় ভাল লোক। মায়ের ইচ্ছে এদের ভাল হোক। এরা গরিব, আমি এদের ব্যবসা করতে বলেছি। তুমি টাকা দেবে তো—"

"দেব।"

"কি করে দেবে ?"

"কাছাকাছি কোন বটগাছ তলায় গিয়ে টাকা চাইলেই টাকা পাবেন। গাছের উপর থেকে টাকার থলি পড়বে। কিন্তু টাকাটা যেন সৎকার্যে ব্যয় হয়। এক পয়সাও যদি অসৎ কার্যে খরচ হয়, তাহলে আর টাকা আসবে না।"

জম্‌পেশ বললেন—"এরা ভালো লোক। এরা তা করবে না।"

"তাহলে টাকা পাবে।"

বলেই কুবের অন্তর্ধান করলেন।

নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তুনকা।

তুনকার মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

"আপনি কে বাবা। আপনার পরিচয় দিন।"

জম্‌পেশ বললেন—"আমি ? আমি মায়ের ছেলে।"

"কে আপনার মা।"

"শক্তি। তাঁর অনেক নাম। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী শক্তিরই নাম। আরও অনেক নাম আছে তাঁর। অনেক সময় তিনি ভিখারিনীর বেশেও ঘুরে বেড়ান। তিনি সন্ধান করে বেড়ান কোথায় ভালো লোক আছে। ভালো লোকেরা যখন বিপদে পড়েন তখন তিনি আমাকে খবর পাঠান। আদেশ দেন ওদের দুঃখ দূর কর। আমি তাঁর আদেশ পালন করি মাত্র।"

"আপনার নাম জম্‌পেশ কেন।"

কারণ আমার মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। আমি যা করব ঠিক করি, তা করে তবে ছাড়ি। মা-ই এ নাম দিয়েছেন আমাকে—"

বলেই জম্‌পেশ অন্তর্ধান করলেন।

ছবি

গ্রহশান্তির জন্য একটি ভালো বৈদূর্য মণির সন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না। নকল মণি-মুক্তায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে। আসল জিনিস পাওয়া শক্ত। আমি নিজেই একজন জহুরি তাই নকল জিনিস সহজেই ধরিয়া ফেলি। আমার একমাত্র পুত্রটি ভীষণ অসুস্থ, ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গিয়াছেন। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলিয়াছেন যদি দশ রতি ওজনের আসল বৈদূর্য আমার ছেলেকে ধারণ করাইয়া দিই আমার ছেলে ভালো হইয়া যাইবে। কিন্তু অত বড় আসল বৈদূর্য পাওয়া যাইতেছে না।

একজন বলিলেন—"রত্নাকর শর্মার বাড়ি যান। সেখানে পাবেন। তিনি মণি-মুক্তার একজন বড় সংগ্রাহক। তবে ব্যবসায়ী নন। সেখানেই চেষ্টা করুন।" তিনিই আমাকে ঠিকানাটা দিলেন। আমি রত্নাকর শর্মার নাম শুনি নাই। রত্ন-সংগ্রাহকের নাম রত্নাকর শর্মা শুনিয়া একটু কৌতুক-বোধ করিলাম।

একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। গলির গলি তস্য গলির শেষ-প্রান্তে তাঁহার ত্রিতল বাড়িটি। স্থানটি বেশ নির্জন। মোটর সেখানে ঢোকে না। পাশেই একটি মজা পুকুর। নিচের বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে শুইয়া তাঁহার ভৃত্যই সম্ভবত ঘুমাইতেছিল। লোকটি খুব বুড়া, মুখে দাঁত নাই, চুল পাকা। চোখের কোণে পিঁচুটি। মনে হইল সর্বদাই ঘুমায়।

সে বলিল—বাবু কাহারও সহিত দেখা করেন না।

বলিলাম, আমার বিশেষ প্রয়োজন, দেখা করতেই হবে। আপনি একটু সাহায্য করুন আমাকে—

সঙ্গে সঙ্গে একটি পাঁচ টাকার নোটও তাহার হাতে দিলাম।

"আমি তাঁর বেশী সময় নষ্ট করব না। একটি জরুরি খবর জানতে এসেছি কেবল। দেখা হয়ে গেলে আপনাকে আরও পাঁচটি টাকা দেব।"

কাজ হইল।

লোকটি বলিল—তাহলে ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে যান। বাবু তিনতলায় আছেন।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম অনেক ছবি, কোনটা সমাপ্ত, কোনটা অর্ধ সমাপ্ত। ছবি আঁকিবার নানা সরঞ্জাম চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। মনে হইল কোনও আর্টিস্টের স্টুডিওতে ঢুকিয়াছি। তিনতলায় উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির সামনেই একটি ঘরে তিনি বসিয়া আছেন। চেহারা দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। সৌম্যকান্তি, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, গৌরবর্ণ, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, গোঁফ দাড়ি কামানো। দেখিলাম তিনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

"কে—"

"নমস্কার। আমার নাম পঞ্চানন দে। একটি বিশেষ দরকারে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—"

"ও, কি দরকার বলুন। ভিতরে আসুন, বসুন।" ঘরে ঢুকিয়া আমি একটি চেয়ারে বসিলাম।

"কি দরকার আপনার।"

"শুনেছি আপনি নানারকম মণি সংগ্রহ করেন। আমার দশ রতি ওজনের একটি আসল বৈদূর্য্য চাই। যা দাম লাগে দেব। বাজারে কোথাও পাচ্ছি না। অথচ আমার দরকার খুব।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "দশ রতি ওজনের ভালো বৈদূর্য্য আছে আমার একটি। কিন্তু সেটা তো দিতে পারব না। সেটি আমার ফ্রেমে লাগাতে হবে! মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি কাল আসবে।"

"ফ্রেম? কিসের ফ্রেম?"

"ছবির ফ্রেম। আমি সারা জীবন ধরে যে সব মণি সংগ্রহ করছি তা লাগিয়েছি একটি চন্দন কাঠের তৈরি ফ্রেমে। আমি নিজের হাতেই তৈরি করেছি ফ্রেমটি। ভেবেছিলাম তার ছবি এঁকে ওই ফ্রেমে বাঁধাব। কিন্তু ছবি আঁকা হল না। হঠাৎ একদিনেই দু-চোখ অন্ধ হয়ে গেল।"

"কার ছবি—"

"তা বলব না।"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "বলা যায় না। ওটিই বোধহয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি হ'ত।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর বলিলাম, "ছবি যখন হয় নি তখন ফ্রেম নিয়ে আর কি হবে।"

"ছবি হচ্ছে। রোজই হচ্ছে। মনে মনে আঁকছি, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। আবার নতুন ছবি এঁকে পরাচ্ছি ওই ফ্রেমে। ছবি আঁকা বন্ধ নেই। ফ্রেমের তিনদিকে তিনটে বৈদূর্য্য লাগিয়েছি, একটা দিক খালি আছে সেখানেও লাগাব।"

বললাম, "আপনাকে একটি বড় বৈদূর্য্য আমি এনে দিতে পারি। কিন্তু সেটি আসল নয়, নকল—"

"না, ও ফ্রেমে কোনও নকল জিনিস চলবে না। আপনি ও ঘরে গিয়ে ফ্রেমটা দেখে আসুন।"

পাশের ঘরে গিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। প্রকাণ্ড একটা খালি ফ্রেম দেওয়ালে

ঝোলানো রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে মণি-মাণিক্যের উৎসব। হীরা, মুক্তা, প্রবাল, নীলা, চুণী, পান্নার চমকপ্রদ প্রদর্শনী যেন একটি। দেখিলাম ফ্রেমের তিনদিকে তিনটি বড় বড় বৈদূর্য্য রহিয়াছে। একদিকে নাই।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম—"অপূর্ব জিনিস দেখলাম। আমি আপনাকে যে বৈদূর্য্যটা দিতে চাইছি, সেটাও ওখানে বেমানান হবে না। যদিও সেটি নকল।"

"না, কোনও নকল জিনিস চলবে না ওখানে। আপনি আসল বৈদূর্য্য নিয়ে কি করবেন?"

"আমার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন। একজন জ্যোতিষী বলেছেন দশ রতি ওজনের আসল বৈদূর্য্য ধারণ করালে ও ভালো হয়ে যাবে। আপনি যদি দয়া করে—"

আর বলিতে পারিলাম না, আমার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

তিনি চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—"বেশ, দেব আপনাকে—"

তাহার পরই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

"ছবি হয়ে গেছে। আমার ছবি হয়ে গেছে। অপূর্ব দেবী মূর্তি। মুখের কি ভাব, চোখের কি দৃষ্টি। এ যেন কমলা, মূর্তিমতী কমলা—"

তাহার পর আবার চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া গেলেন। সমস্ত মুখে তন্ময় সমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

খড়ের টুকরা

তিনুবাবু অবশেষে হৃদয়ংগম করিলেন যে ছোট ভাই বিনুর কাছেই তাঁহাকে এবার যাইতে হইবে। গত্যন্তর নাই। ক্রিকেট খেলিতে গিয়া একটি পা আগেই খোঁড়া হইয়াছিল। যে চাকরিটি করিতেন সেটি হইতেও অবসর লইয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। মাসে প্রায় একশত টাকা করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। তাহাতে কোনক্রমে তাঁহার চলিয়া যাইতেছিল। তিনু মূর্খ নন। তিনি সেকালের বি. এ পাশ। তাঁহার মা-ই তাঁহাকে জোর করিয়া স্কুল কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে জমিজমা কিছু বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। নিজের গহনাগুলিও তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলে বাপের মতো পণ্ডিত হোক। তিনু ও বিনুকে লইয়া যৌবনেই তিনি বিধবা হন। তিনু মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া বি. এ. পাশ করিলেন, কিন্তু বিনুর লেখাপড়া বিশেষ কিছু হইল না। সে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনর পরীক্ষাটাও পাশ করিতে পারে নাই। তিনু লক্ষ্ণৌ শহরে চাকুরি করিতে লাগিলেন, বিনু গ্রামেই মায়ের কাছে রহিয়া গেল পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি লইয়া। তিনু বিবাহ করেন নাই। একটু শোখীন গোছের লোক তিনি। গিলা করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিতেন, গোঁফে আতর লাগাইতেন, নাগ্রা পায়ে দিতেন, ব্যবহার করিতেন নানারকম শোখীন জিনিস। মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহাকে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া নিয়মিত

পাঠাইয়াছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর আর নিয়মিত পাঠাইতেন না, মাঝে মাঝে পাঠাইতেন। মায়ের মৃত্যু কুড়ি বছর আগে হইয়াছে। এ কুড়ি বছর তিনি দেশেও যান নাই। মাঝে মাঝে বিনুর সহিত পত্রালাপ অবশ্য হইয়াছে। চাকুরি হইতে অবসর লইবার পরও তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা করেন নাই। আয় কমিয়া যাওয়াতে বিনুকে মাঝে মাঝে যে টাকা পাঠাইতেন তাহাও আর পাঠানো সম্ভব হইতেছিল না। বিনু বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ছেলে মেয়ে হয় নাই। বউটি বন্ধ্যা। বিনুর আর একটি বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল তিনুর। কিন্তু সেজন্য টাকা দরকার। সেই টাকাটা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনু একটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছিল। এই টিউশনিই তাহার কাল হইল। যে বাড়িতে টিউশনি লইয়াছিলেন সেখানে যাইবার একটি শর্টকাট রাস্তা ছিল রেললাইন পার হইয়া। সেই রেললাইন পার হইতে গিয়া একদিন তিনি রেলে চাপা পড়িলেন। প্রাণ গেল না হাত দুইটি গেল। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া তবে তিনি বিনুকে খবর দিলেন—আমি বড় বিপন্ন আমাকে আসিয়া লইয়া যাও। হৃদয়ঙ্গম করিলেন, যে কয়দিন বাঁচিবেন বিনুরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার হৃদয়টা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল! এতদিন যে স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা সহসা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। লক্ষ্ণৌ শহরে এতদিন বাস করিয়াছেন, বাংলাদেশের সেই স্যাঁত স্যাঁতে পাড়াগাঁয়ে কি এখন বাস করিতে পারিবেন? বাড়িতে মা নাই। মা-ই ছিল বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। বিনুর বউ তাহার উপর বিরূপ, বিনু সমস্ত দিন মাঠে থাকে। সেখানে তাহার সেবা করিবে কে? সঙ্গী হইবে কে? ক্রাচের উপর ভর করিয়া কতদূর তিনি বেড়াইতে পারিবেন? একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাঁহার চোখের সামনে ঘনাইয়া উঠিল। মায়ের মুখটাই তিনি বারবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে তিনি কোন আশার আলোক দেখিতে পাইলেন না। তখন পাইলেন না, কিন্তু পরে পাইয়াছিলেন। তাহা লইয়াই গল্প।

ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ি বাহিত হইয়া তিনি যখন তাহার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে। "এদিকে ইলেক্‌ট্রিক এসেছে না কি!"

বিনু সহাস্যে বলিল—"এসেছে। আমি নিয়েছি—।" গাড়োয়ানের সাহায্যে বিনু তিনুকে লইয়া ঘরে একটি চৌকির উপর বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। "যাঃ লোড শেডিং হ'য়ে গেল। ইদানিং বড্ড বেশি লোড শেডিং হচ্ছে। ওগো কোথা গেলে। দাদা এসেছে—তুমি একটা আলো আন—"

বিনুর স্থূলকায়া পত্নী বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি কেরোসিনের আলো লইয়া প্রবেশ করিল এবং তিনুর পায়ের কাছে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। মুখে ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনু তাহার মুখটা ভালো করিয়া দেখিতে পাইলেন না। প্রণাম করিয়া বিনুর বউ চলিয়া গেল। বিনু আবার একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল—"দাদাকে একটু মোহনভোগ করে দাও। আমি ছিয়া জেলের বাড়ি যাচ্ছি। ভাল কিছু মাছ রাখতে বলেছিলাম। দাদা, তুমি বিশ্রাম কর, আমি মাছটা নিয়ে আসি—"

বিনু বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনে বোধহয় তেল ছিল না। কয়েক মিনিট পরে সেটিও নিবিয়া গেল।

একা অন্ধকার ঘরে বসিয়া রহিলেন তিনু। তাঁহার মনে হইল, যে অন্ধকারে ভবিষ্যতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে তাহাই যেন মূর্ত হইয়াছে তাঁহার চোখের সামনে। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। বিনু বা বিনুর বউ কাহারও দেখা নাই। খানিকক্ষণ পরে পদশব্দ শোনা গেল। বিনুর বউ একটা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। ছোট মাটির প্রদীপ। সেটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া সে আবার চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক দমকা হাওয়া ঢুকিল ঘরে। প্রদীপটাও নিবিয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন তিনি। হতাশার সমুদ্রে একেবারে তলাইয়া গেলেন যেন। এমন সময় আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটিল। সহসা আতরের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিল। যে আতর তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মাখিতেন সে সেই আতর। তাহার পর মনে হইল কে যেন তাহার মুখটিতে হাত দিতেছে, কাহার বাহু যেন তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ইলেক্‌ট্রিক আলোটা আবার জ্বলিয়া উঠিল, দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। সহসা দেখিতে পাইলেন সামনের দেওয়ালে মায়ের ফটো টাঙানো রহিয়াছে। মায়ের মুখ যেন উদ্ভাসিত। চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। তিনুর বুকটা ভরিয়া গেল। অলৌকিক? অসম্ভব? হোক্‌—তবু তাঁহার মনে হইল আর ভয় নাই। মা আছেন। এই অলীক খড়ের টুকরাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মজ্জমান তিনুর মনে আবার আশা জাগিল।

অতি-বিজ্ঞানীর গল্প

"আমার তো ঘড়ি-ফড়ি নেই জানিস, আমার সম্বল বাড়ির পিছনের তালগাছের ছায়াটা। সেটা যখন ছাতের উপর থেকে সরে যায় বুঝতে পারি সূর্য অস্ত গেল। এইবার আড্ডায় যেতে হবে। সেদিন কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড হ'ল। দেখলাম ছাতের ছায়াটা অনড় হয়ে আছে। বেরিয়ে দেখি সূর্যটা আটকে গেছে আকাশে—"

"আটকে গেছে?"

"হ্যাঁ। অস্ত যাচ্ছে না, থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়। চারিদিকে হই-চই পড়ে গেছে। আমাদের বাড়ির পিছনের পুকুরটায় অনেক পদ্মফুল আছে। তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা ভাবছে সূর্য তাদের দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে আর নড়তে পারছেন না। আকাশে দেখলাম অনেক এরোপ্লেন উড়ছে, অনেক বিজ্ঞানীরা বেরিয়েছেন ঠিক কারণটা নির্ণয় করবার জন্যে। রেডিওতে শুনলাম একদল বিজ্ঞানী নাকি সূর্যের দুটো চোখ দেখতে পেয়েছেন। আর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন—মহাকর্ষ ও পারমাণবিক শক্তি নিয়ে কিছু বিজ্ঞানী experiment করছিলেন, তার ফলেই এই কাণ্ড। এদিকে সন্ধ্যা হয় না; নিশাচর পশু পাখীরা বেরুতে না পেরে চীৎকার জুড়ে দিল। পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজতে লাগল। মিলিটারীরা বন্দুক আর কামান উঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগল সূর্যকে। সূর্য কিন্তু অনড়। আমি তখন আমাদের গুরু

পাঁড়েজির কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি বম্‌ হয়ে বসে আছেন। সূর্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবরই রাখেন না। তাঁকে বললাম সব। তিনি বললেন আন্দাজ করবার দরকার কি, তুই নিজে সূর্যের কাছে গিয়ে জেনে আয় না। আমি বললাম, যাব কি করে। পাঁড়েজি বললেন—হাঁ কর। পাঁড়েজি কি একটা গুলি টুপ করে ফেলে দিলেন মুখের মধ্যে। গিলে ফেললাম সেটা। পাঁড়েজি বললেন—এইবার যা। আশ্চর্য কাণ্ড ভাই, বললে বিশ্বাস করবি না, হু হু ক'রে উড়ে চলে গেলাম আকাশে। সূর্যের মুখোমুখি হলাম একটু পরে। জিগ্যেস করলাম—কি ব্যাপার, অস্ত যাচ্ছেন না কেন।

সূর্য মুচকি হেসে বললেন—সিনেমা দেখব। দেখলাম সত্যিই তাঁর দুটো চোখ গজিয়েছে। বললাম, এতদূর থেকে সিনেমা দেখা যাবে না। আপনি মানুষের বেশ ধরে আমার সঙ্গে আসুন। টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢুকতে হবে। আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। সূর্য মানুষের বেশ ধরতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁকে একটি হিট্‌ করা সিনেমার টিকিট কেটে ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলুম। তারপরই হল আর এক কাণ্ড। কয়েক মিনিট দেখার পরই হো হো—হো করে হেসে উঠলেন সূর্য। তারপর হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। আর চাপা পড়লেন একটা ডবল ডেকার বাসের তলায়। একটা হৈ হৈ উঠল। কিন্তু সূর্যের দেহটা কেউ খুঁজে পেল না। তা ছাতু হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তার পরদিন সকালে আবার সূর্য উঠেছে দেখলাম। কিন্তু ও আসল সূর্য নয়। আসল সূর্য মারা গেছে। জোড়া-তাড়া দিয়ে ব্রহ্মা একটা-কাজ-চলা-গোছ মেকি সূর্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেখছিস না এ সূর্যের কোন উত্তাপই নেই? শীতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে—"

গল্পটি শুনে বন্ধু তার পিঠ চাপড়ে বললে—"বাঃ বেশ জমিয়েছিস তো। নে আর এক ছিলিম সাজ—"

সুরমা

"একি তুমি এসেছ? এ যে প্রত্যাশার অতীত!"

সত্যিই সুরমা নামল একটি রিক্‌শা থেকে। রিক্‌শাতে আর একটি লোক বসেছিল। ময়লা কাপড় জামা পরা, কুণ্ঠিত, লজ্জিত। সুরমা একটি থলি নিয়ে নেমে এল।

"এস, এস, বস। চল ভিতরে যাই।"

"না, আমি বসতে আসিনি। এইটি ফেরৎ দিতে এসেছি।"

"কি ওটা?"

সুরমা জবাব দিল না। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

"কি আছে ওই থলিতে—"

"তুমি যে গয়না আর টাকা পাঠিয়েছিলে আমার জন্যে। তুমি বেহায়া নির্লজ্জ তাই টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে চাও। আর আমার স্বামী ভীতু, ভাল মানুষ, ভদ্রলোক তাই তোমাকে জুতোপেটা করেনি। এই নাও—"

থলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল সুরমা। উঠে বসল রিকশাতে। ময়লা কাপড় পরা কুণ্ঠিত লজ্জিত যে লোকটা রিক্‌শায় বসেছিল তার মুখে তখন হাসি ফুটল।

সে ওর স্বামী।

বাইজোভ

সুনীলার নাম সুকালো হলেই ঠিক হত। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় অপ্রিয় সত্যকে ক্রীম পাউডার মাখিয়ে আমরা প্রিয় করবার চেষ্টা করি। তাই ওই বার্ণিস করা কালো মেয়েটার নাম সুনীলা। সুনীলা কালো হলেও তার চোখ মুখ চমৎকার, তাকে সুন্দরীই বলা যায়। তার উপর লেখা পড়া শিখেছে, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। ভালোই লাগে তাকে। সুনীলার এবং সুনীলার বাবা মায়েরও ইচ্ছা ছিল গৌরবর্ণ সর্বাঙ্গ সুন্দর এমন একটি জামাই হবে যে সিনেমা-ওলাদের চোখ এড়িয়ে তাদের খপ্পরে পড়ে প্রতিবেশীদের ঈর্ষার আগুনে ভাজা ভাজা করে তুলবে। তার আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা জার্মানীতে যদি বেশী মাইনের চাকরি থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কিন্তু হল না। সব সাধ কি পূর্ণ হয়?

সুনীলার বিয়ে হ'লো এমন একটি ছেলের সঙ্গে যার রূপ তো নেইই, চমক-লাগানো গুণও নেই। বি. এ. পাশ। গ্রামে বসে সাহিত্য-চর্চা করে। থলথলে চেহারা, মুখখানা ঘুঁটের মতো। ছোট ছোট চোখ, থ্যাবড়া নাক, টেবো গাল, মেটে রং। জমি জমা অবশ্য অনেক, পায়ের উপর পা দিয়ে বিরাট একান্নবর্তী পরিবার খাচ্ছে। গরু আছে, মোষ আছে, পুকুর আছে। কিন্তু মোটর নেই। স্টেশন থেকে বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। কিছুদূর বাসে কিছুদূর গরুর গাড়িতে যেতে হয়। জামাইর নামটাও অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। গোবর্ধন।

গোবর্ধন প্রথম শ্বশুর বাড়ি বালীগঞ্জে এসেছে। তাকে দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে একটা বুকবন্ধ জিনের কোট, পায়ে রং-চটা ডার্বি শু। মাথার চুল কদম ছাঁট। সে সাবান মাখে না, গন্ধ তেল মাখে না, পাউডার ব্যবহার করে না। টুথপেষ্টের বদলে দাঁতন ব্যবহার করে। সর্ষের তেল মাখে রোজ আধঘণ্টা ধরে। এই জানোয়ার দেখে সবাই তো অবাক।

গোবর্ধন বললে—"একটু বেড়িয়ে আসি।"

সুনীলা বললে—"না, ওই বেশে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যেতে হলে ভদ্র বেশে যাও।"

"বেশ, ভদ্র বেশ তুমিই পছন্দ কর। যা পরতে বলবে তাই পরব।"

সেই দিনই সুনীলা আবিষ্কার করল যে গোবর্ধন লেংটিও পরে। পালোয়ানদের মতো।

বলল,—"ছি ছি লেংটি বড় ভালগার। ও পরতে হবে না।"

"ওটা না পরলে আমার কেমন যেন স্বস্তি হয় না।"

"কেন আণ্ডারউয়ার পর না।"

"না লেংটিই থাক। ওটা তো ঢাকা থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না।"

গোবর্ধন লেংটির উপর কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরল, সিল্কের গেঞ্জি পরল, সিল্কের পাঞ্জাবী চড়াল, হাতে পরল সর্বাধুনিক সোনার রিস্টওয়াচ। আঙুলে হীরের আংটি।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোবর্ধনকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই। নতুন জামাইকে সম্বর্ধনা করবার জন্য এসেছিলেন মিস্টার গোহ, মিস্টার চাকরাভারটি, মেজর গাগা, ডকটর তরফদার। সবাই স্যুট পরা আধুনিক ভদ্রলোক। আধুনিকা মহিলাও ছিলেন কয়েকজন। রাত দশটার পর গোবর্ধন এল।

পরিধানে লেংটি ছাড়া আর কিছু নেই।

কি ব্যাপার।

"সব কেড়ে নিয়েছে। ভাগ্যে লেংটিটা পরেছিলাম, তা না হলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হ'ত।"

মেজর গাগা সবিস্ময়ে বলে উঠল—'বাইজোভ।'

তা এবং না

অতি-দূর ভবিষ্যতের পটভূমিকায় এই গল্প।

মানুষ বিজ্ঞান-চর্চায় আশ্চর্যরকম অগ্রসর হয়েছে। সব রকম অগ্রগতির বিস্তৃত বিবরণ এ গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলব। সে যুগে পৃথিবীর স্থলে, জলে, ভূগর্ভে সর্বত্র মানুষ বসবাস করছে বিজ্ঞানের জোরে। অন্তরীক্ষেও চলন্ত বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোপ্লেনের মতো। মাটিতে থাকবার জায়গা নেই, শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে। মাটিতে নামবার যখন ইচ্ছা হয় তখন বাড়িটাকে শূন্যে থামিয়ে যন্ত্রযোগে নেমে আসে তারা কোনও বড় শহরের পার্কে, কখনও কাশ্মীর, কখনও জাপান, কখনও আমেরিকা, কখনও বা আর কোথাও, যখন যেমন খুশি। তবে বেশির ভাগ তারা উড়ে উড়েই বেড়ায়। আর একটা নতুন জিনিস হয়েছে। নাম সব এক অক্ষরে। সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এসব নাম একেবারে অচল। পোষাক পরিচ্ছদও খুব সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ সময়ই উলঙ্গ হয়ে থাকে। এখন আমরা সমাজ বলতে যা বুঝি সে রকম সমাজও নেই। রোজগারের সমস্যা নেই। বিরাট এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই যন্ত্রে প্রত্যেক মানুষের দেহ থেকে সর্বক্ষণ শক্তি নিষ্কাষিত করে নিচ্ছে। আর সেই শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে, খাদ্যে বস্ত্রে আর মানুষের বিবিধ প্রয়োজনে। বিতরিত হচ্ছে বিনামূল্যে। এও হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। বোতাম টিপলেই 'ফোন' আবির্ভূত হচ্ছে শূন্য থেকে, ফোনে কি চাই বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাচ্ছে সে সব। যন্ত্রযোগেই আসছে। মানুষের আধিভৌতিক প্রয়োজনও কমে গেছে। মানুষ তৈরী হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে। এর ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা, এমন কি শারীরিক যৌন চিহ্নগুলোও লোপ পেয়েছে। নারীদের স্তন নেই, নিতম্বও প্রায় পুরুষের মতো। সন্তান উৎপাদন করবার শক্তি কারো নেই। জন্মের কিছু পরেই স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই যন্ত্রের সাহায্যে বন্ধ্যা করে দেওয়া হয়। তবে কিন্তু প্রেম হয়। মানসিক বিনোদনই এখন প্রেমের আকর্ষণ। নাচ, গান, ম্যাজিক দেখানো, আলাপ

কুশলতা, অভিনয় পারিপাট্য অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ ঘুচেছে, সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু কিন্তু মানুষের মনে সুখ নেই। কি একটা নামহীন অজানা দুঃখে সবাই পীড়িত। কেউ কেউ মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়। পাগল হয়ে গেলেই বৈজ্ঞানিক কৌশলে তার বাড়িটা বর্ণপরিবর্তন করে। হয়ে যায় লাল। তখন চিকিৎসকরা এসে সেই উন্মাদকে পাগলা গারদে নিয়ে যান। উড়ন্ত বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার উপায় নেই। লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেই কপাট জানালা আপনি বন্ধ হয়ে যায়, খোলা বারান্দার উপর শূন্য থেকে আবির্ভূত হয় লোহার জাল। আগেই বলেছি বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে। এখন মানুষ বিব্রত কেবল মন নিয়ে। মনকে ভোলাবারও বহু রকম আয়োজন করেছেন বিজ্ঞানীরা। নানারকম শব্দ, সুর, গান, কবিতা, গল্প, চিত্রময়, আলোর বৈচিত্র্য ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। রেডিও, টেলিভিশন পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন একরকম জিনিস বেরিয়েছে যার নাম পাস্‌টোস্কোপ (Pastoscope)। বাংলায় বললে বলতে হয়—'অতীত-বীক্ষণ'। দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটি কাচ আর তার চারদিকে নানারকম বোতাম ফিট করা। একটা বোতাম টিপে দিলেই শাদা কাচটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর তার উপরে ছবি ফুটবে নানারকম। অতীত যুগের পাহাড়ের ছবি, নদীর ছবি, সাগরের ছবি। ইজিপ্টের ফারাওদের ছবি, নেবুচেদনাজারের ছবি, উরের ছবি, ব্যাবিলনের ছবি—কতরকম ছবি। সে ছবির পরিচয়ও দেবে পাস্‌টোস্কোপ আর কটা বোতাম টিপলে। যে, যে ভাষাতেই শুনতে চায় সেই ভাষাতেই কথা বলবে পাস্‌-টোস্কোপ। কোন অজ্ঞাত কারণে মাঝে মাঝে অসম্ভব কাণ্ড হয়। কোন কোনও ছবি নিজেই কথা বলতে আরম্ভ করে—তুমি যে ভাষা জান, সেই ভাষাতেই আত্মপরিচয় দেয় সে। কি করে এ অঘটন ঘটে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের প্রচুর গবেষণা চলছে। কিন্তু স্থির কোনও সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পারেন নি তাঁরা। এ রকম অঘটন কিন্তু মাঝে-মাঝে ঘটে। সেদিন অন্তত ঘটেছিল।

তা এবং লা ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি উড়ন্ত বাড়িতে। 'তা' পুরুষ 'লা' স্ত্রীলোক। 'তা' চমৎকার ম্যাজিক দেখাতে পারে, 'লা' প্রথম শ্রেণীর নর্তকী। সে যখন ঝড়ের নাচ নাচে মনে হয় সত্যিই ঝড় উঠেছে যেন, জ্যোৎস্নার নাচ নাচবার সময় অঙ্গের মৃদু হিল্লোলে এমন স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করে যা শুধু জ্যোৎস্নালোকেই হওয়া সম্ভব। 'তা' এবং 'লা' ভালবাসে পরস্পরকে। 'তা' 'লা'-কে ভুলিয়ে রাখে যাদুবিদ্যা দিয়ে আর 'লা' 'তা'-কে ভুলিয়ে রাখে নাচ-গান দিয়ে। দুজনেই খুব ছিপছিপে রোগা। কারো মাথায় চুল নেই, কারণ প্রকৃতি যে প্রয়োজনে চুল সৃষ্টি করেছিল সে প্রয়োজন অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে। তবু তারা সুন্দর। একটা অপার্থিব দীপ্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে। চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে, মনের অসীম ঔৎসুক্য মূর্ত হয়েছে চোখের দৃষ্টিতে, তার সঙ্গে মিশে আছে নামহীন একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আকুতি। দীপ্তিমান গন্ধর্বলোকবাসী যেন ওরা। একটু আগেই চন্দ্রলোক পরিক্রমা করে এসেছে তা এবং লা। আমরা যেমন সহজেই শহরের এক পার্ক থেকে আর এক পার্কে যাই ওরাও তেমনি গ্রহ-উপগ্রহে ঘুরে বেড়ায়। নক্ষত্রলোকে যাওয়া কিন্তু তখনও সহজ হয়নি। মাঝে মাঝে দুই একজন হুহু করে নক্ষত্রের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু আর ফেরে না। 'লা'-এর এক বান্ধবী 'কি' তার প্রণয়ী 'নু'-র সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল

স্বাতী নক্ষত্রের দিকে, সৌরজগৎ একঘেয়ে মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। পাঁচ বছর আগে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। চন্দ্রলোক থেকে ফিরে এসে 'লা' বললে—"কাছে গিয়ে চাঁদকে ভালো লাগে না। কতকগুলো খসখসে পাহাড় খালি। আর চাঁদের উপর অদ্ভুত পোশাক-পরা যে লোকগুলো বাস করছে তাদের মানুষ বলেই মনে হয় না। মনে হয় নানা আকারের সিন্দুক। ওখানে ওই পোশাক পরে নাচা তো অসম্ভব। কিন্তু 'তা' এবার কিছু কর একটা। ভাল লাগছে না।"

'তা' বললে, "তুমি নাচ না একটু।"

"আমার নাচ কতবার দেখবে? একঘেয়ে লাগে না তোমার? ম্যাজিক দেখাও তুমি বরং—"

"আমার ম্যাজিকও তো একঘেয়ে হ'য়ে গেছে। আবার দেখবে?"

"থাক। ওই পাসটোস্কোপটা খোল তাহলে অতীতের পৃথিবী দেখা যাক। ভারী সুন্দর লাগে আমার অতীতকে দেখতে!"

'তা' পাসটোস্কোপের বোতামটা টিপে দিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুগ্ধ-ধবল কাচটা। তারপর তার উপর ছবি ফুটতে লাগল। বড় বড় সাগরের ছবি, পাহাড়ের ছবি, যে স্থলপথ দিয়ে এককালে আমেরিকার সঙ্গে এশিয়ার যোগ ছিল সেই স্থলপথটাও দেখা গেল, প্রাচীন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান, ঘন চাপদাড়িওলা অসুরদের ছবি একে একে ফুটতে লাগল পাসটোস্কোপে। তারপর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল সব। আপনি নিবে গেল পাসটোস্কোপের আলোটা। সাধারণত এমন হয় না। তারপরই শোনা যেতে লাগল বাজনা। বিরাট গম্ভীর একটা আওয়াজের পটভূমিকায় ফুটে উঠতে লাগল কত রকম বাজনার সুর। কত রকম বাজনা, কত দেশের বাজনা। তারপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল বিরাট একটা স্বর্ণময় প্রাসাদ। কাঠের তৈরী প্রাসাদ কিন্তু সোনার পাত দিয়ে মোড়া। চারদিকেই অলিন্দ, প্রত্যেকটি অলিন্দে দুলছে নানারঙের পরদা। প্রত্যেক অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে সুবেশা সুন্দরী ক্রীতদাসীরা। বিরাট প্রাসাদকে বেষ্টন করে আছে বিরাট বাগান। বাগানে কতরকমের গাছ, কত রকমের ফুল, কতরকমের পাখি! মাঝে মাঝে শ্বেত মর্মরের গভীর পুষ্করিণী, তাতে অজস্র পদ্ম আর তার ভিতর থেকে কারুকার্যখচিত রুপোর দণ্ডের উপর ফুলের তোড়ার মতো উৎস, সে সব উৎসমুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সুগন্ধি জলধারা। প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে কৃপাণ হস্তে প্রহরী, কোনটা মিশরীয়, কোনটা কাফ্রি, কেউ গ্রীক, কেউ বা ভারতীয়।

পাসটোস্কোপ ঘোষণা করল, প্রাচীনকালের একটা পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ এটি।

প্রাসাদ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেল। তারপর রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হলেন স্বয়ং সম্রাট। পোশাক বেগুনি আর সাদার এক অপূর্ব সমন্বয়। পরিধানে লাল মখমলের পায়জামা। কোমরে একটা স্বর্ণখচিত কটিবন্ধন। মাথায় টায়রা। তার উপরে নীল রঙের পাগড়ি। চোখ দুটি স্বপ্নময়। চিবুকে ছোট একটু দাড়ি, সরু গোঁফ। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি সোনার দোলনা। দোলনার উপর মণি-মুক্তার ঝারা দুলছে। দোলনার চারিধারে ফুলের মালা জড়ানো। একজন রূপসী ধীরে ধীরে দোলনাটি দোলাচ্ছে। সম্রাট এসে দাঁড়ালেন প্রকাণ্ড একটি ছবির সামনে। তন্বী যুবতীর ছবি একটি। ছবিকে সম্বোধন করে সম্রাট বলতে লাগলেন—"রায়না তুমি কোথায়? তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম পথের ধারে। আমি যখন শোভাযাত্রা করে

যাচ্ছিলাম তখন পথের ধারে অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে ছিলে তুমি। প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলাম তোমায়। যদিও আমি পারস্যের সম্রাট, যে কোনও নারীকে কামনা করবামাত্রই তাকে পাবার রাজকীয় অধিকার আমার ছিল। কিন্তু রাজকীয় নিয়ম অনুসারেই সঙ্গে সঙ্গে পাইনি তোমাকে। তোমাকে নিয়ে একবছর সহবৎ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল সম্রাটের উপযুক্ত সঙ্গিনী হবার জন্য। এক বছর পরে তোমাকে পেয়েছিলাম। তিনশত রানী ছিল আমার। রাজকীয় আইন অনুসারে প্রত্যেকের কাছেই পালা করে যেতে হত আমাকে। কিন্তু রায়না, তুমি ছিলে আমার প্রিয়তমা। সর্বক্ষণ তুমি আমার কাছে থাকতে। তোমাকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারতাম না আমি। একটি ছেলেও হয়েছিল আমাদের। সেই ছেলে হতে গিয়েই মারা গিয়েছিলে তুমি। সত্যিই কি তুমি আর নেই ? ছেলের কথা কি একবারও মনে পড়ে না তোমার—"

সম্রাট ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন দোলনাটার দিকে। তারপর দোলনার ভিতর থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন আবার ছবির সামনে। লা সাগ্রহে দেখছিল শিশুটিকে। কি চমৎকার ছেলেটি। লা-য়ের সমস্ত অন্তর দৃষ্টিপথ দিয়ে ছুটে গেল ওই শিশুটির দিকে, ঘিরে ধরল তাকে। জাপটে ধরে আদর করতে লাগল। চুমুতে চুমুতে ভরে দিল তার সর্বাঙ্গ। থর থর করে কাঁপতে লাগল লা।

সম্রাট অধীর ভাবে বলতে লাগলেন ছবিটির দিকে চেয়ে—"একে কি একবারও মনে পড়ে না তোমার ? কোথায় তুমি ? আর কি তোমায় পাব না ?…"

শিশুর ধাত্রী ছেলেটিকে নিয়ে গেল সম্রাটের কাছ থেকে। পদচারণা করতে লাগলেন সম্রাট। তারপর হঠাৎ ছবিটার সামনে থেকে বললেন—"ব্যাবিলন থেকে এক জ্যোতিষী এসেছিল। সে কিন্তু আশা দিয়ে গেছে। বলেছিল অতিদূরে ভবিষ্যতে আবার আমাদের মিলন হবে। কিন্তু অদ্ভুত সে মিলন। সে আমাকে এই জিনিসটা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল এর মধ্যেই আবার মিলিত হব আমরা—কিন্তু আমি এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি নি।"

সম্রাট জামার পকেট থেকে একটি তালা বার করলেন। তারপর ছবির দিকে সেটি তুলে ধরে বললেন, "এই তালার মধ্যে কি করে আমাদের মিলন সম্ভব ?"

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল তা এবং লা। পরমুহূর্তেই দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল তারা।

দুম করে একটা শব্দ হল।

পাস্টোস্কোপটা থেমে গেল।

নক্ষত্র ও প্রেতাত্মা

আকাশে অপূর্ব দ্যুতি বিকিরণ করিয়া একটি নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। প্রেতেরাও শূন্যে সঞ্চরণ করে। নক্ষত্রটিকে দেখিয়া একটি প্রেত সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। আরও আশ্চর্যের বিষয় প্রেতটিকে দেখিয়া নক্ষত্র বলিয়া উঠিল—"অ, আপনি এসে গেছেন ! কি ক'রে এলেন—"

"স্বদেশী-ওলারা আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।"

"আমি জানতাম এ শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরা কখনও রেহাই পায় না—"

"আপনি কে! আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক। আপনাকে ঘিরে এত জ্যোতি কেন।"

"জ্যোতি আছে না কি, বুঝতে পারছি না তো।"

"আমার গা দিয়ে কি কোন জ্যোতি বেরুচ্ছে?"

"না আপনি ছায়ার মতো।"

"কিন্তু আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।"

"আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। আপনিই তো পুলিশ ডেকে আমাকে মোকামা স্টেশনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু ধরা দিই নি, রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। আপনি এত রকম ফন্দী ফিকির করেও আমাকে ধরতে পারেন নি। মা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন—"

"মা? কোন মা—"

"দেশমাতৃকা।"

"ও! আপনি প্রফুল্ল চাকী নাকি?"

"হ্যাঁ—"

"ও হো হো হো হো—"

একটা তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকারে চতুর্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেতাত্মা আর্তনাদ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিশু আর ননী

একমাত্র ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ। বাবার চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি নেই, খাওয়াই জোটে না দুবেলা। কিন্তু ছেলের এই অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা দেখে চুপ করে বসে থাকা যায় না। গ্রামে ডাক্তার নেই। কারণ কোনও ভদ্রলোকের বসবাস করার ব্যবস্থাই নেই গ্রামে। একজন ডাক্তার এসেছিলেন। দিন পনেরো থেকে চলে গেছেন তিনি। পনেরো ক্রোশ দূরে না কি বড় সরকারি হাসপাতাল আছে। দশ বছরের ছেলেকে কোলে করে সেই হাসপাতালের উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়ল বিশু চাষা অবশেষে। দু'দিন পরে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন পৌঁছল তখন অবাক হ'য়ে গেল সে। সত্যিই বড় হাসপাতাল। বড় বড় থাম—সারি সারি বাড়ি। গিজ গিজ করছে লোক। মোটর যাওয়া আসা করছে ক্রমাগত। ছেলেটিকে নিয়ে সে হাসপাতালের বারান্দার উপর উঠল। সবাই কোট প্যান্ট পরা। ডাক্তার কে! অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে একজন ডাক্তারের নাগাল পেল সে অনেক ঘোরাঘুরি করে। ডাক্তার বললেন—বেড নেই। বেড নেই মানে? বুঝতেই পারল না বিশু। তারপর আর একটা ধূর্ত গোছের লোক এল। সে-ও কোট-প্যান্ট পরা। বলল, গোটা পঁচিশেক টাকা যদি ছাড়তে পার আমি ভরতি করিয়ে দেব। বিশু কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বল্লে—পঁচিশ টাকা! আমার তো অত টাকা নেই। "তাহলে রাস্তা দেখ" বলে চলে গেল লোকটি। আর একজনকে বিশু

ধরল, তাতেও কিছু হল না। তখন আর একজনের পা জাপটে ধরে "হাউ হাউ করে" কেঁদে সে বলল—"এত বড় হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে কি আমার ননী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। দয়া করুন, দয়া করুন ডাক্তারবাবু—।" ডাক্তারবাবু বললেন —"আচ্ছা চল দেখি। বেড নেই। বারান্দাতেও জায়গা নেই। মাটিতে শুয়ে থাকতে হবে একধারে। আপত্তি নেই তো?"

"তাই শুয়ে থাকবে ডাক্তারবাবু। ওকে ওষুধ দিন।"

ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা ক'রে চলে গেলেন। নার্স এল, দুটো বেয়ারা এল। কিন্তু ওষুধ এল না। ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে বলল—"বিনি পয়সায় চিকিৎসা হয় না। পয়সা দাও কিছু কম্পাউন্ডারকে—"

"পয়সা তো নেই। পরে না হয় ভিক্ষে সিক্ষে করে এনে দেব। এখন ওকে ওষুধ দিতে বলুন।"

দু' ঘণ্টা কেটে গেল। ওষুধ এল না।

হঠাৎ বিশু লক্ষ্য করল, ননী খাবি খাচ্ছে।

"ওরে বাবা ননীরে—।"

একটা লরির আর্তনাদে তার আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

পরদিন খবরের কাগজে ছাপা হল—স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবার দেশের লোকের সুচিকিৎসার জন্য নাকি কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

সত্য

গুলি চলছিল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, পালাচ্ছিল দলে দলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছিল ওরা। ব্যর্থ হয়েছে। অন্যায়ের প্রতিকার পায় নি, ন্যায়ের আশ্বাসও পায় নি। পেয়েছে গুলি। গুলির সামনে কে দাঁড়াতে পারে? হুড়মুড় করে পালাচ্ছিল সবাই, মনে হচ্ছিল ঝড়ের দাপটে একরাশ ধুলো যেন উড়ে যাচ্ছে। একটা অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছিল চারদিকে। মনে হচ্ছিল অন্যায়ের কাছে ন্যায় বুঝি হেরে গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সেই ধুলোর রাশির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে। ধুলো নয় মানুষ। চীৎকার করে উঠল—পালিও না দাঁড়াও।

সেই চীৎকারের মধ্যে কি ছিল জানি না, যারা পালাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝড়ের মুখে রুখে দাঁড়াল ধুলোরা।

"এস আবার সঙ্গে।"

চেঁচিয়ে উঠল সত্য।

বীরবিক্রমে এগিয়ে গেল সে। জনতা চলতে লাগল তার পিছু পিছু। গুলি আবার শুরু হল। মরল অনেকে, কিন্তু থামল না, পালালও না। একটু পরে সত্যও পড়ে গেল! ভাবলাম সত্য বুঝি মরে গেল। কিন্তু দেখলাম মরে নি। গুলি লেগে তার হাঁটুটা চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু জিতেছে ওরা। ন্যায়ের কাছে অন্যায়কে নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

॥ ২ ॥

অনেক দিন পরে।

আবার যুদ্ধ বেধেছে। সেই চিরন্তন যুদ্ধ। ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের।

অন্যায় এবারও প্রবল। তার গুলি গোলা সেনা-সামন্ত অনেক এবারও পালাতে লাগল অসহায় ভীতুর দল। মনে হচ্ছিল এবার বুঝি ওদের পরিত্রাণ নেই, মেরে পিষে চ'ষে ফেলবে এবার।

হঠাৎ আবার বেরিয়ে এল সে।

দুই বগলে ক্রাচ্ (crutch)···

খটাস্—খটাস্—খটাস্—কাছে এগিয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টিতে আগুন।

"পালিও না, এস আমার সঙ্গে।"

তার বজ্রনির্ঘোষে কম্পিত হয়ে উঠল দিকদিগন্ত।

"এস।"

দুই বগলে ক্রাচ্, তবু সে অগ্রণী !

খটাস্—খটাস্—খটাস্—খটাস্—খটাস্।

সোজা ঢুকে পড়ল শত্রুসৈন্যের মধ্যে।

জনতা ছুটল তার পিছু পিছু। জনতা নয় যেন সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ তারপর আবার ঢেউ।

এবার গুলি এসে বিঁধল সত্যর বুকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, হায় হায় করে উঠল জনতা তার মৃতদেহটা ঘিরে। কিন্তু দেখলাম, না, সে এবারও মরে নি। তার মৃতদেহ থেকে যে সত্য বেরিয়ে এল তার শির আকাশচুম্বী, তার দেহ আলোকময়, তার দৃষ্টি জ্বলন্ত সূর্য, তার বাণী অভ্রান্ত, তার নেতৃত্ব তুলনা-হীন। কোন গুলি আর তাকে মারতে পারবে না। চিরকাল সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে এবং জিতবে। সত্য অমর।

আমার পরিচয় জানতে কৌতূহল হচ্ছে ?

আমার নাম ইতিহাস।

রবারের হাতী

চার পাঁচ দিন থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছিল। কলকাতার রাস্তা সব নদী হয়ে গেছে। সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে দমকা এলোমেলো হাওয়া। বৃষ্টি কখনও ঝির ঝিরে কখনও ইলশে গুঁড়ি, কখনও আবার মুষল ধারা। যারা চাকরি করে তারা প্যাণ্ট গুটিয়ে রবারের জুতো পরে ছপ ছপ করে যাচ্ছে, যাদের পয়সা আছে তারা ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়েছে। নেহাত দায়ে না পড়লে বাড়ি থেকে কেউ বেরুচ্ছেই না। দু'একটা ছোট ছেলে-মেয়ে অবশ্য বেরুচ্ছে কাগজের নৌকো ভাসাতে কিম্বা এমনি ছপ ছপ করে বেড়াবার জন্যে। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই।

গৌতম ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ঠিক করে ফেলল তাকেও আজ বেরুতে হবে। বেরুতেই হবে। কারণ সে তুফানীকে কথা দিয়েছে। তুফানী কোন লাট-বেলাট নয়। চার বছরের মেয়ে একটি। বিশেষ করে সেই জন্যেই—গৌতমের মনে হল—কথাটা রাখতে হবে। লাট-বেলাটরা তোমার কথার দাম দেয় না, তুফানী কিন্তু দেয়, লাট-বেলাটরা তোমার প্রত্যাশায় বসে থাকে না, তুফানী কিন্তু থাকবে। তুফানী বিশ্বাস করে বসে আছে এই রবিবার গৌতমদা নিশ্চয় আসবে রবারের হাতীটা নিয়ে।

তুফানীরা এককালে গৌতমদের পড়শী ছিল। ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকত। তুফানীর বাবা একদিন অপিস থেকে ফিরল না। শোনা গেল সে 'বাস' চাপা পড়েছে। মারা যায় নি। হাত দুটো কাটা গেছে। কেরাণী-গিরি করত, সুতরাং চাকরিও গেছে। তুফানীর মা খাইয়ে দেয় তাকে। এ পাড়ায় থাকতে পারল না তারা। চাকরি নেই, অত টাকা বাড়ি ভাড়া গুনবে কি করে। তুফানীর মাকে রাঁধুনি-বৃত্তি করতে হবে। কিন্তু যে পাড়ায় সে নিজেই কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর রেখেছিল সে পাড়ায় সে নিজে রাঁধুনি বৃত্তি করবে কি করে। তুফানীরা তাই চলে গেছে হাওড়ায়, তাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে। সেখানে তুফানীর মা চাকরী পেয়েছে। একটি বৃদ্ধের তত্ত্বাবধান করতে হবে। খাওয়া-পরা ছাড়া মাইনে পাবে ষাট টাকা। বুড়োর কেউ নেই। যে মেয়েটি তাঁকে দেখা শোনা করত সে কিছুদিন আগে মারা গেছে। তুফানীর মা সেই কাজটা করবে এখন।

বস্তির মধ্যে একটা দোতলা পুরনো মাটির বাড়ির একতলায় একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে। এই সুযোগকে স্বর্ণ সুযোগ বলে গণ্য করল সবাই। তুফানীর বাবা যতীনবাবু তাঁর নুলো হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে বললেন, "ভগবান আছেন। জীবনে কখনও পাপ করি নি। ভগবান দুঃখ দেবেন না আমাকে।"

তুফানীরা হাওড়া চলে যাওয়াতে গৌতমের খুব কষ্ট হয়েছিল। তুফানীকে বড্ড ভালবাসত সে। তুফানী খুব সুন্দরী ছিল না। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল তার। চোখ দুটো ছিল জীবন্ত। আর অনর্গল কথা বলত। কত রকম গল্প যে বলত সে গৌতমকে। এত অনর্গল বলে যেত যে তার গল্পের খেই ধরতে পারত না গৌতম। বুঝলে গৌতমদা—একটা গল্প শোন। এক ছিল রাজা। কি সুন্দর চেহারা। আর কি ভীষণ ভাল সে। তার একটা এরোপ্লেন ছিল—আর সে এরোপ্লেনে পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলেদের তুলে নিত। কি মজা হত যে। এই ধরনের গল্প সব। গৌতম একটা মোটরের গ্যারেজে কাজ করত। সন্ধ্যার পর যখন ফিরে আসত তখন মাঝে মাঝে তুফানী আসত। একদিনের কথা মনে আছে। এসে বাইরের খাটটায় শুয়ে আছে সে সন্ধ্যাবেলা। তুফানী এসে হাজির হল।

"শুয়ে আছ কেন গৌতমদা, লুডো খেলবে না ?"

"বড্ড ক্লান্ত আজ আমি। সমস্ত দিন মোটরের তলায় শুয়ে শুয়ে কাজ করতে হয়েছে। হাত-পা ব্যথা করছে ?"

"টিপে দেব ?"

তুফানী ছোট ছোট হাত দিয়ে পা টিপে দিয়েছিল তার। এমনি নানারকম মধুর স্মৃতি জমা হয়ে আছে গৌতমের মনে। আর একটা যে স্মৃতি তার মনে আঁকা আছে তার কথা সে কাউকে বলে না। তার ছোট বোন রূপোর কথা। বাংলাদেশ থেকে যখন

পালিয়ে আসছিল তখন পথেই মারা যায় রুপো। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছিল তার। বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। রিফিউজি ক্যাম্পে এসে তার বাবা মা-ও মারা গেল কলেরায়। তারও কলেরা হয়েছিল। সে মরে নি। হরিবিলাস বাবু তার দেশের লোক। তিনিই আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে। মোটর কারখানায় কাজও জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেখানেই সারাদিন কাজ শেখে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে হরিবিলাস বাবুর বৈঠকখানায় (মানে, বাইরের ছোট ঘরটায়) শুয়ে পড়ে।

না, গৌতমও বড়লোক নয়। অতি কষ্টে দিন চলে তার। তবু সে তুফানীকে বলেছিল, তোমাকে আমি খু-উ-ব সুন্দর একটা রবারের হাতী কিনে দেব। এখনও কিনে দিতে পারে নি। খু-উ-ব সুন্দর রবারের হাতীর দাম আড়াই টাকা। অত টাকা জমিয়ে উঠতে পারে নি গৌতম।

তুফানীরা চলে যাবার পর একদিন গিয়েছিল সে তুফানীদের বাড়ি। অতি জঘন্য বস্তি সেটা। হাওড়া থেকে বেশ দূরে। হাওড়া ময়দান থেকে প্রায় মাইল তিনেক হবে। সে গিয়েছিল তবু একদিন। বড্ড মন কেমন করত তুফানীর জন্যে। যাওয়া মাত্রই তুফানী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল—"গৌতম দা আমার হাতী আন নি ?"

"যাঃ, ভুলে গেছি। আসছে রবিবার আমি আসব। তখন নিয়ে আসব ঠিক।"

সেই রবিবার সমুপস্থিত কিন্তু ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে। হাতীও কিনতে পারে নি গৌতম। পয়সা জোটে নি।

তবু সে ঠিক করে ফেলল—যাবে। তুফানীকে যখন কথা দিয়েছে নিশ্চয় যাবে সে।

গৌতম থাকে দমদমে। যেতে হবে হাওড়ায়। ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে, খালি গায়ে একটা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট প'রে বেরিয়ে পড়ল গৌতম। যা থাকে কপালে!

রাস্তায় বেরিয়ে দেখে সি. আই. টি. রোডে এক হাঁটু জল। আর সারি সারি অচল মোটর দাঁড়িয়ে গেছে। মোটরের ডিস্ট্রিবিউটারে জল ঢুকলে মোটর থেমে যায় এটা সে জানে। দেখলে রাস্তায় কয়েকটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে গেছে। ডিস্ট্রিবিউটার পুঁছে মোটর স্টার্ট করে দিচ্ছে আর মোটর পিছু এক টাকা করে রোজগার করছে। গৌতমও লেগে পড়ল। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই পাঁচ টাকা রোজগার করে ফেলল সে। বৃষ্টি-বাদল করেছিল বলে এতক্ষণ সে ভগবানকে গাল দিচ্ছিল। এবার মনে মনে প্রণাম করতে লাগল। বৃষ্টি না হলে তো হাতী কেনবার টাকাটা রোজগার করতে পারত না। ছুটল সে মানিকতলা বাজারের সেই দোকানটার উদ্দেশ্যে যেখানে রবারের হাতীটা আছে, যার পেট টিপলেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ হয়, যার পেটের ছ্যাঁদায় গোল ধরনের একটা বাঁশী আছে।

সেখানে গিয়ে কিন্তু হতাশ হল গৌতম।

দোকান বন্ধ। আজ রবিবার।

দোকানের ঠিক নীচেই একটা আম-ওলা বসেছিল। তার রবিবার সোমবার নেই, রোজই সে দোকান খুলে বসে থাকে। পাটনায় বাড়ি। তাকেই জিগ্যেস করলে গৌতম—দোকানটা কখন খুলবে ?

"সোমবার বেলা তিন বাজে।"

সত্যিই বড় হতাশ হয়ে পড়ল গৌতম।

"দোকানদার কোথায় থাকে জান ?"

"দুতলা মে।"

দুতলায় যাবার সিঁড়িটা কোনদিকে তাও বাতলে দিলে আম-ওলা।

দোতলায় উঠে কড়া নাড়তে লাগল গৌতম।

বেরিয়ে এল একটি ছোট ছেলে।

"আমি তোমাদের দোকান থেকে রবারের হাতী কিনব একটা—"

"আজ দোকান বন্ধ। কাল এসো। বিকেলে—"

"আমার আজ এক্ষুনি চাই—"

"কি ব্যাপার —"

স্যান্ডাল টানতে টানতে বেরিয়ে এল এক ছোকরা। আর তার পিছনে তার মা। সব শুনে ছোকরা বলল—"আজ তো দোকান খোলা ইম্‌পসিবল্‌। আইন নেই।"

গৌতম দেখলে মিথ্যা ভাষণ ছাড়া উপায় নেই। সে বড় একটা মিথ্যা কথা বলে না। তবু বানিয়ে বললে—"আমার বোন আজ চলে যাবে। কাল আর থাকবে না। তার ঐ রবারের হাতীটা কেনবার খুব ইচ্ছে। দয়া করে আজই দিন ওটা—"

মা সুপারিশ করলেন।

"দে না বাবা। বোনকে দেবে বলেছে—দে। হলই বা রবিবার। কর্তা যখন ছিলেন তখন তো রোজ দোকান খুলতেন।"

"চলুন, চলুন।"

অনিচ্ছা সহকারে নেমে এল ছোকরা। বার করে দিলে রবারের হাতীটা। উৎফুল্ল হয়ে পেটটা টিপে দিল গৌতম। শব্দ হল—ক্যাঁক্, ক্যাঁক।

কি খুশীই যে হবে তুফানী।

বেরিয়ে দেখল বাস নেই। হাঁটতে হাঁটতেই এগুতে লাগল হাওড়ার দিকে। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পেল একটা জিপ গাড়ি জল ছিটোতে ছিটোতে এগিয়ে আসছে। ড্রাইভার চেনা। তাদের গ্যারেজেই নিয়ে যায় গাড়িটা সারাতে। হাত তুলতেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কোথা যাচ্ছ—"

"স্ট্র্যান্ড রোড।"

"আমাকে হাওড়া পেঁছে দেবে ভাই।"

"হাওড়া ব্রীজের মুখে নামিয়ে দিতে পারি।"

"বেশ তাই দাও —"

সেখানে পেঁছে রিক্সা পেল একটা। সে-ই তাকে কদমতলা পর্যন্ত পেঁছে দিল। তারপর আর যেতে চাইল না। চারিদিকে জল আর কাদা। আবার হাঁটতে শুরু করল। কাদায় আর জলে মাখামাখি হয়ে গেল বেচারা।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সে যখন তুফানীদের বস্তিতে পেঁছিল তখন বিকেল হয়ে গেছে। দেখে চারিদিকে জল আর জল। যেন একটা বান এসেছে। তারপর যা শুনল তাতে তার শরীরের রক্তও যেন জল হয়ে গেল।

তুফানীদের মাটির ঘরটা না কি বর্ষায় পড়ে গেছে। তার তলায় চাপা পড়েছে

তুফানী আর তুফানীর বাবা মা। মাটি আর ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে একটা। আর তার চারিদিকে জল। পুলিশ এখনও আসে নি।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গৌতম।

তারপর হাতীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেই স্তূপটার দিকে। সেটা জলে পড়ে ভাসতে লাগল। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। ডুবে গেল হাতীটা।

রবারের হাতী, ডোববার কথা নয়। কিন্তু ডুবে গেল। হয়তো তার ঠোঁটের ছ্যাঁদা দিয়ে তার মধ্যে জল ঢুকল—কিম্বা হয়তো আর কিছু—কিন্তু ডুবে গেল হাতীটা।

গৌতমের মনে হল তুফানীই যেন নিয়ে নিলে ওটা।

গুল-গল্প

[দৃশ্য ফুটপাথ। ফুটপাথের উপর বসে আছে গুল। কুচকুচে কালো রং, থলথলে মোটা, প্রৌঢ়া। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরণে টকটকে লাল ঘাগরা, ঘোর নীল ব্লাউস। পায়ে একজোড়া রংচঙে স্যাণ্ডেলও পরে আছে সে। চোখ দুটি জ্বলন্ত ভাঁটার মতো। সর্বদা ঘুরছে। পাশে একটি ঝাঁটা।

লাঠিতে ভর দিয়ে কুব্জ গল্পের প্রবেশ। সে এসে ধপাস করে গুলের গা ঘেঁসে বসে পড়ল। শুধু বসল না, আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হেসে চাইল গুলের দিকে।]

গুল। আ মর মুখপোড়া, কে রে তুই! সরে বোস।

গল্প। (আর একটু ঘেঁসে বসল এবং গান গেয়ে উত্তর দিল—)

আমি সরব বলে আসিনি সই
মরব বলে এসেছি,
সোজা হয় না আমার কোমর
তবু ভালবেসেছি।
মানে, দারুণ ভাবে ফেঁসেছি!

গুল। তাই না কি! ক'ঘা ঝাঁটার বাড়ি খেতে পারবি? আমার সঙ্গে অনেক ড্যাকরাই পীরিত করতে এসেছে, কিন্তু ঝাঁটার চোটে পালিয়েছে সবাই। কেউ টিকতে পারেনি, তুইও পারবি না। সরে বোস। ঘেঁষে বসছিস কেন?

গল্প। এইবার কাজের কথা শোন। সিনেমায় নায়িকা হবি? নগদ দশহাজার টাকা দেবে তারা।

গুল। (সবিস্ময়ে) আমাকে?

গল্প। হ্যাঁ, তোমাকে। আমি ছুঁলেই প্রেমময়ী নায়িকা হয়ে যাবে তুমি, হয়ে যাবে রাজনর্তকী। তুমি যখন নাচবে তখন আমার কেরামতিই সঙ্গৎ করবে তোমার সঙ্গে। তুমি যখন হাসবে তখন সবাই তোমার হাসির মাণিক কুড়ুবে আঁজলা ভরে ভরে, তোমার চোখের জল যখন ফোঁটা ফোঁটা পড়বে তা দিয়ে মুক্তোর মালা বানাবে কাঞ্চননগরের রাজপুত্র। আমি তোমাকে ছুঁলেই এই অসম্ভব সম্ভব হবে। আমি গল্প, আমি কি না করতে পারি—

গুল। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে? তবে রে মুখপোড়া—(ঝাঁটা তুলল)

গল্প। আরে, আরে তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। আমি এখখুনি তোমার ঝুলবদনকে গুলবদন করে দিচ্ছি। দেখ না—

[গল্প নিজের তর্জনী আঙুলটি গুলের কপালে ঠেকিয়ে দিতেই অদ্ভুত পরিবর্তন হল তার। আবলুস রং হয়ে গেল গোলাপী রং, বুড়ী হয়ে গেল ছুঁড়ি। গোল গোল ভাঁটার মতো চোখদুটো হয়ে গেল পদ্মপলাশলোচন আর তাতে এমন কটাক্ষ ফুটে উঠল যে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে গেল তার কাছে]

গুল। এ কি কাণ্ড করলে তুমি! আমার যে নাচতে ইচ্ছে করছে।

গল্প। নাচ না। রাজনর্তকী হয়ে তোমায় নাচতেই তো হবে। একদিন কতো দাঁতের ছেতো পরিষ্কার করেছ, কত উনুনে আঁচ দিয়েছ, কত লোককে ধাপ্পা দিয়েছ। এবার নাচ।

গুল। তুমি নাচবে না?

গল্প। আমার কোমর দোমড়ানো, আমি কি নাচতে পারি?

গুল। ভুরু তো দোমড়ানো নয়। ভুরু নাচাও।

গল্প। বেশ, তাতে রাজি আছি।

গুল। কোথায় যাব এবার?

গল্প। প্রডিউসারের কাছে। সেই তো টাকা দেবে।

গুল। চল তাহলে নাচতে নাচতে যাই।

গল্প। বেশ।

[গুল নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল। আর গল্প চলল তার পিছু-পিছু ভুরু নাচাতে নাচাতে। এরপর পরদা ধীরে ধীরে নেমে এল]

পট পরিবর্তন

একটি সিনেমার সম্মুখ ভাগ। ঠেলাঠেলি ভীড়। হাউস ফুল, বাইরে তবু প্রচণ্ড ভীড়। সিনেমার সামনে গুলবদনীর বিরাট রঙিন ছবি। তার নীচে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা—রাজনর্তকী।

আলো-আঁধারিতে

দীপার চিঠি পেয়ে গেলাম। লিখেছে আজ সন্ধ্যের পর আমার বাসায় আসবে। দর্শন ওর এম. এ. পরীক্ষার বিষয়। আমি ওর দাদার বন্ধু। দর্শনশাস্ত্রে বছর পাঁচেক আগে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম ওই অপরাধ। সুতরাং দীপাকে পড়াবার ভার নিতে হয়েছে। এতদিন ওর বাড়িতে গিয়েই পড়াতাম। আজ লিখেছে আমার বাসায় আসবে। সেরেছে। ওই পেত্নীটি আমার ঘাড়ে চাপবে নাকি। কুচকুচে কালো, দাঁত উঁচু, চোখ-বসা, বিয়ের বাজারে প্রত্যাখ্যাত ওই মালটি শেষে আমাকে ডোবাবে না তো! বারবার ঘুজঘুজ করে আমার কাছে আসছে, ওর মতলবটা কি? আমার বাসায় আসবে? আমার বাসা মানে ওয়ানরুম ফ্ল্যাট একটি। হঠাৎ আমার টেবিল ল্যাম্পটার দিকে চেয়ে দেখলাম রং-চটা একটা এনামেলের 'শেড' রয়েছে। কেন জানিনা মনে হল দীপা এটা দেখলে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। আমার নিজের

দৈন্য ওর কাছে প্রকাশ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। জানি ও আমার সব খবর রাখে—তবু সোখীন 'শেড' কিনে আনলাম একটা। পয়সাটা বৃথা খরচ হল। সন্ধ্যাবেলা ইলেকট্রিক আলোই জ্বলল না আমাদের অঞ্চলে। দীপা এল। মোমবাতি জ্বালালাম একটা। বললাম, তোমার জন্যে একটা ভাল 'এসে' (essay) বেছে রেখেছি। টুকে নাও সেটা। মোমবাতির আলোর সামনে বসে দীপা টুকতে লাগল। আমি অন্ধকারে ঘরের কোণের ক্যাম্প চেয়ারটায় শুয়ে দেখতে লাগলাম তাকে। আনত নয়নে একাগ্র হয়ে টুকে যাচ্ছে, অধরে নয়নে না-বলা অভিমান যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারির পটভূমিকায় এক দীপ্তিময়ী দীপা যেন নীরবে বলতে লাগল আমার চেহারার জন্যে আমি দায়ী নই, আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী। আমি কখনও বিপথে যাইনি, কোনও পরীক্ষায় সেকেণ্ড হইনি। মোমবাতির আলোয় এই নূতন দীপার দিকে চেয়ে অনুকম্পায় আমার মন ভরে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সেরেছে !

রামসেবক

রামসেবক রায় শেষকালে একটা অসাধারণ কাজ করিয়া ফেলিলেন, যদিও তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে, বাঙালী সমাজের সুসংস্কার-কুসংস্কার, ভালো-মন্দের মধ্যেই মানুষ তিনি। তাঁহাদের বাড়িতে নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পিতলের যে মূর্তি ছিল তাহার নিত্য পূজা হইত এবং রাম-সেবক সে মূর্তিকে নিত্য প্রণাম করিতেন। নারায়ণে ভক্তিও ছিল তাঁহার। নারায়ণের সম্মুখে বসিয়াই তিনি প্রত্যহ দুই বেলা ভক্তিভরে আহ্নিক করিতেন। যৌবনে একটি বিষয়ে কেবল তিনি সামান্য একটু বিপথে গিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বে তিনি মণ্টুর প্রেমে পড়িয়াছিলেন। মণ্টু অবশ্য পাড়ারই মেয়ে, স্বজাতি এবং পাল্‌টি ঘর ছিল। সুতরাং বিশেষ অসুবিধা কিছু হয় নাই।

রামসেবক বিদ্যালয়ের ভাল ছেলে।

তখন ইংরেজের আমল। একটি ভালো চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই। ঠাকুর-দেবতাকে মানত করিয়াও পান নাই। সাহেব তাঁহার এক মোসায়েবের ছেলেকে সে কাজে বাহাল করিলেন।

কেরানীগিরি করিতে করিতে কোনরকমে ঘসটাইয়া ঘসটাইয়া শেষ জীবনে তাঁহার বেতন দুইশত টাকা হইয়াছিল। গৃহ-দেবতা নারায়ণকে বহু স্তব-স্তুতি করিয়াও তিনি তাঁহার অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। আটটি ছেলে-মেয়ে হইয়াছিল। তিনটি মারা গিয়াছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নাই, নারায়ণকেও বহু আরাধনা করিয়াছিলেন। তবু তাহারা বাঁচে নাই। একজন মারা গেল ধনুষ্টংকারে, আর একজন কলেরায়, তৃতীয়টি টাইফয়েড জ্বরে। ডাক্তারদের চিকিৎসা ব্যর্থ হইল, নারায়ণও কোন দয়া করিলেন না।

চাকরি হইতে রিটায়ার করার পর আর একটি বাসনা রামসেবকের মনে জাগিয়াছিল। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনার হইবার জন্য ভোট যুদ্ধে তিনি

অবতরণ করিয়াছিলেন। বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল, একজন পুরোহিত নিয়োগ করিয়া নারায়ণকে প্রত্যহ তুলসী দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জিতিতে পারেন নাই। মাতাল এবং দুশ্চরিত্র গোলকবাবুই নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

অবশেষে রামসেবকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। প্রথামতো পুত্রকন্যারা তাঁহার বিছানায় বসিয়া তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল।

সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন রামসেবক—"চোপ্ রও।"

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল—"বাবা নারায়ণের মূর্তিটা কি আপনার চোখের সামনে ধরব।"

"চোপ্ রও"।

ছেলেরা হকচকাইয়া থামিয়া গেল।

মণ্টু তাঁহার শিয়রে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। রামসেবক বলিলেন—"তুমি সামনে এস। তুমি সামনে এস—"

মণ্টু সামনে আসিতেই তাহার হাতটা তিনি চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহার চোখে চোখ রাখিয়াই শেষ নিশ্বাসটা ফেলিলেন।

স্থানীয় সংবাদপত্রে অবশ্য বাহির হইল রামসেবক রায় সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

তুচ্ছ ঘটনা

চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যা বেলায় আলো জেলে, চতুর্থ বিজ্ঞাপনটির খসড়াটা লিখছিলাম। দ্বার প্রান্তে খুট করে শব্দ হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে গেলাম। মাথায় ঘোমটা নেই, চুলগুলো রুক্ষ। মনে হল তেল পড়েনি অনেকদিন। না, শ্যাম্পু করেছে? বুঝতে পারলাম ঠিক। ঘাড়টা জেদী ঘোড়ার মতো বাঁকানো। চক্ষু আনত। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরেছে। নাকের পাতা দুটো কাঁপছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কানে দুল দুলছে। সেই প্যাটার্নের দুল।

"একি ইল্শি, কি কাণ্ড, এতদিন কোথা ছিলে।"

ওর আসল নাম সুশীলা। ইলিশ মাছ খুব ভালবাসে তাই আমি ওর নূতন নামকরণ করেছি—ইল্শি।

ইল্শি ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে এসে বসল। এই ঘরেই ছ'মাস আগে আমরা নূতন সংসার পেতেছিলাম।

"কোথায় গিয়েছিলে ইল্শি—"

ইল্শির ঘাড় আর একটু নত হল।

"রংপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বন্ধু বিলুদি কাজ করেন। তিনি একমাসের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন, আমি তাঁর জায়গায় কাজ করছিলাম।"

"দুল কিনেছ দেখছি।"

"হ্যাঁ, নিজের রোজগারে কিনেছি। তুমি তো দিলে না। আমার এ সামান্য শখটাও মেটাতে পার নি।"

"তখন হাতে টাকা ছিল না যে। সাতদিন পরে প্রকাশক টাকা দিলে। টাকাটা পেয়েই কিনেছি—এই দেখ—।"

টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুলের বাক্সটা বার করলাম।

"দুল নিয়ে এসে দেখি তুমি অন্তর্ধান করেছ। ভাবলাম বিমানের কাছে গেছ বোধহয়। সে বড় লোক, তুমি আবদার করলে—।"

"তুমি একথা ভাবতে পারলে!"

"হ্যাঁ, মনে হয়েছিল বইকি। ইচ্ছে হয়েছিল তাকে একবার ফোন করি। কিন্তু করবার প্রবৃত্তি হল না। উপর্যুপরি তিনটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম কেবল—।"

হঠাৎ দেখলাম ইলুশির চোখে জল টলমল করছে। তারপরই সে ভেঙে পড়ল। টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদছ কেন—।"

"তুমি কি করে ও কথা ভাবতে পারলে—"

আমার মনে হল এখন—কিন্তু ওই হাই পাওয়ার বাল্‌বের আলোটা যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কি করি?

এমন সময় ইলেকট্রিক কম্পানি দয়া করলেন। আলোটা নিবে গেল।

শতাব্দীর ব্যবধান

১৮৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেন রাত্রি দশটার সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। কাপড় জামা ছাড়িয়া খাইতে বসিবেন এমন সময় বাহিরের দুয়ারে আর্তকণ্ঠে কে যেন হাঁক দিল—

—"ডাক্তারবাবু"—

বাহির হইয়া দেখিলেন রামপুরের গোপীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

"আমার ছেলেটি জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, দয়া করে যদি—"

"যাব বইকি, চলুন—"

তখন গরুর গাড়ী চড়িয়া প্র্যাকটিস করিতে হইত। রামপুর গ্রাম এক ক্রোশ দূরে।

গরুর গাড়ী চড়িয়া ডাক্তার সেন যখন রোগীর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন, রোগী তখন মারা গিয়াছে।

ডাক্তারবাবু "ফি" লইলেন না।

১৯৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেনের পৌত্র ডাঃ পি সেন বিদেশী বহু ডিগ্রী অর্জন করিয়া মহা সমারোহে কলিকাতায় প্র্যাকটিস করিতেছেন। তাঁহার চেম্বারে একদিন উক্ত গোপীবাবুর পৌত্র আসিয়া হাজির।

বলিলেন—"আমার স্ত্রী মর-মর। আপনাকে ডাকতে এসেছি। আপনার ঠাকুরদা নিত্যানন্দবাবু আমাদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন—আমাদের বড় আপনজন ছিলেন তিনি—"

ডাক্তার পি. সেন ডায়েরি দেখিয়া বলিলেন, "আমি সাতদিনের আগে আপনাকে সময় দিতে পারছি না।"

"আমার স্ত্রী যে মর-মর—"

"সরি, কান্‌ট হেল্‌প। অন্য কাউকে নিয়ে যান।"

শ্রাগ করিলেন।

মহারাজা মহীপতি

তোমরা গল্প শুনতে চাও?

গল্প একটা বলতে পারি কিন্তু সেটা তোমরা বিশ্বাস করবে না বোধহয়। তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা, বড্ড বেশী চালাক-চতুর হয়ে গেছ। তোমরা বলবে এ অসম্ভব, এরকম হয় নাকি। অসম্ভব গল্পই বলতে হবে? বেশ শোন তবে।

অনেক-অনেক দিন আগে মহীপতি নামে এক রাজা ছিলেন। বিরাট তাঁর সাম্রাজ্য। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর বিশাল প্রাসাদ অপরূপ স্ফটিক দিয়ে তৈরী। দিনের আলোয় তার এক রূপ, রাতের অন্ধকারে আর এক রূপ। তাঁর মহীসাগর দীঘি সাগরেরই মতো। কূল দেখা যায় না। অসংখ্য তাঁর কর্মচারী, পাত্র মিত্র, সেনাপতি, উপমন্ত্রী মন্ত্রী—তাঁর ভয়ে তটস্থ। যখন কাউকে দণ্ড দেন, তখন তাকে প্রাণদণ্ড দেন। দিনের বেলায় যখন বিচারাসনে বসেন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপে অপরাধীরা। কারণ তাঁরা জানে অপরাধ প্রমাণ হলেই শূলে চড়তে হবে। মিথ্যাবাদী, চোর, প্রতারক, চরিত্রহীন—সকলেরই এক দণ্ড। তিনি বলতেন মন্দকে মুছে ফেলো। ওর সঙ্গে আপস কোরো না। এই মহীপতি রাত্রে কিন্তু অন্যরকম মানুষ হয়ে যেতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে এই দোর্দণ্ড প্রতাপ নিষ্ঠুর রাজা করুণাময় কবি হয়ে যেতেন। তখন তিনি নিজের বাগান বাড়িতে একা বসে থাকতেন। কখন গান করতেন, কখনও কবিতা লিখতেন, কখনও চুপ করে বসে থাকতেন। বিয়ে করেন নি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনেই পূর্ণ ছিল তাঁর রাজপুরী। তাদের খাওয়া পরার সমস্ত খরচ তিনিই দিতেন, রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। নিরাপদ একক জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন তিনি। বেশীর ভাগ সময়ই থাকতেন তাঁর বাগানবাড়িতে প্রভাতবর্মার তত্ত্বাবধানে। প্রভাতবর্মা ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

সেদিন পূর্ণিমা।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিগদিগন্ত। গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। উদ্যানের বেলি-কুঞ্জে এক মর্মর আসনের উপর চুপ করে বসে আছেন মহীপতি আকাশের দিকে চেয়ে। প্রকাণ্ড একটা সাদা স্তূপ মেঘ বিরাট মহিমায় রূপায়িত হয়েছে তাঁর চোখের সামনে। মেঘের সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন বেল ফুলের পর্বত একটা। মহীপতির মনের নেপথ্যে একটা বাসনা জাগল, আহা, আমি যদি মেঘ হতে পারতাম। তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলেন তিনি মেঘের দিকে। এমন সময় এক তীক্ষ্ণ তীব্র

চীৎকার বিঘ্নিত করল সেই নিস্তব্ধতাকে। মহীপতি উঠে পড়লেন। দৌবারিককে ডেকে বললেন—দেখে এস কে চীৎকার করছে। যদি তার দেখা পাও ডেকে নিয়ে এস এখানে।

একটু পরে দৌবারিক যাকে সংগে করে নিয়ে এল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মহীপতি। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার একটি বৃদ্ধা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, মাথার চুল রুক্ষ।

"কে তুমি ?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধা।

তারপর প্রশ্ন করল—"আপনি কে ?"

"আমি মহীপতি।"

"ও আপনিই মহারাজ মহীপতি! আমি আপনার কাছেই এক আর্জি নিয়ে এসেছি মহারাজ।"

"কি আর্জি ?"

"আমাকে শূলে দিন। আমার স্বামীকে আপনি শূলে দিয়েছেন, তিন ছেলেকেও শূলে দিয়েছেন। আমাকেও শূলে দিন। আমি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না—"

"আমি নিরপরাধকে শাস্তি দিই না।"

"আমি গরীব। এইটাই আমার অপরাধ। আমার স্বামীও গরীব ছিল, মূর্খ ছিল, সৎপথে থেকে সে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে পারে নি। তাই ডাকাতি করত। আমার ছেলেরাও ডাকাত হয়েছিল। আমাদের মতো গরীবরা আপনার রাজত্বে সৎপথে থেকে উপার্জন করতে পারে না। সবাই অসৎ, কেউ ধরা পড়ে, কেউ পড়ে না। আমি অসমর্থ, তাই আমি চুরি ডাকাতি করতে পারি না। তবু আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজা, আমি এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।"

মহীপতি বললেন—"তোমাকে আমি প্রচুর ধনসম্পত্তি দিচ্ছি। তোমার কোনও কষ্ট থাকবে না।"

"কিন্তু আপনার প্রচুর ধনসম্পত্তি কি আমার মনের আগুন নেবাতে পারবে ? অশান্তির আগুন, শোকের আগুন জ্বলছে আমার মনে। এখন বেঁচে থাকা মানেই কষ্টভোগ করা, আমাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজ। দোহাই আপনার - "

মহীপতির পায়ের উপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল বুড়ীটা। মহীপতি বললেন—"না, আমি কিছুতেই নির্দোষকে শাস্তি দিতে পারব না।"

"তাহলে আমি আপনার সামনেই আত্মঘাতী হব।" এই বলে বুড়ী সেই মর্মর-বেদীর উপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে লাগল। মহীপতি দৌবারিককে আদেশ দিলেন—"এই বুড়ীকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।"

বুড়ী কিন্তু এত জোরে জোরে মাথা ঠুকছিল যে তার মাথা ফেটে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হল তার। একটু পরেই লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে গেল তা।

মহীপতি নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন।

নির্নিমেষে চেয়ে দেখছিলেন আকাশের সেই বিরাট স্তূপ মেঘটার দিকে। সেটা আর সাদা ছিল না, কুচকুচে কালো হয়ে গিয়েছিল। আর তার ভিতর থেকে ক্ষণেক্ষণে

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারা যেন মহীপতিকে বলছিল—"মহীপতি তুমিও পাপী। তোমারও শাস্তি দরকার।"

প্রস্তরমূর্তিবৎ বসেছিলেন মহীপতি।

তাঁরও মনে হচ্ছিল—তিনি শুধু পাপী নন, মহাপাপী। তিনি প্রজাদের সুখী করতে পারেন নি, কেবল শোষণ ও শাসন করেছেন। তাঁরও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য।

ঠিক করে ফেললেন তিনিও আত্মঘাতী হবেন। তিনি মহা অপরাধী। নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেকেই দেবেন।

মহীসাগরের যে অঞ্চলে প্রচুর কুমুদ ফুল ফোটে সেই অঞ্চলে জলের ধারে কতকগুলো পাথরও পড়ে আছে ইতস্তত। মহীপতি একটা থলি নিয়ে সেইখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঠিক করেছিলেন একটা বড় পাথর থলিতে পুরে গলায় বাঁধবেন সেটা, তারপর জলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মহীসাগরের জলে ডুবে মরবেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সাতরঙের সাতটা মেয়ে মহীসাগরের কুমুদ বনে জলকেলি করছে। কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ জরদা, কেউ হলুদ, কেউ সবুজ, কেউ শ্যামলা, কেউ বেগুনী। অপরূপ সুন্দরী সাতটি কিশোরী। মহীপতিকে দেখেই এগিয়ে এল তারা।

"এ কি মহারাজা, আপনিও এসেছেন! আসুন, আসুন। ও কি আপনার হাতে থলি কেন?"

মহীপতি জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা কে?"

"আমরা সাতটা রং। দিনের বেলা সূর্যালোকের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। জ্যোৎস্নারাত্রে মাঝে মাঝে আপনার এই দীঘির কুমুদ বনে চলে আসি। চমৎকার এ জায়গাটি। আপনি থলি নিয়ে এসেছেন কেন, ফুল তুলবেন?"

মহীপতি তখন সব কথা খুলে বললেন তাদের।

তারা সমস্বরে বলে উঠল—"আত্মহত্যা করবেন, সে কি! কেন?"

"আমি মহাপাপী।"

"আপনার যখন অনুতাপ হয়েছে তখন পাপ তো আর নেই। মিছিমিছি আত্মহত্যা করবেন কেন। বরং আপনি বেঁচে থেকে প্রজাদের মঙ্গল করুন।"

"প্রজাদের মঙ্গল করা শক্ত। কারণ আমার কর্মচারীরা বেশীর ভাগই অসাধু। তারাই আমার রাজ্যশাসনের যন্ত্র। এদের নিয়ে প্রজাদের মঙ্গল করা যায় না।"

"এদের তাহলে দূর করে দিন। ভালো লোক বাহাল করুন!"

"তাতে বড় হাঙ্গামা! অত ঝক্কি পোয়াতে আমি পারব না। তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও, আমার শাসনভার তোমাদের হাতে দেব। যাবে?"

"আমরা? আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছি। আমরা কি আপনার রাজপুরীতে আটক থাকতে পারি?"

মহারাজ আবার অনুরোধ করলেন।

"না, না চল তোমরা। আমার মেয়ের মতো থাকবে আমার কাছে।"

কিন্তু গেল না তারা। হঠাৎ সাতটি রঙীন পাখীতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল তারা আকাশের দিকে।

মহীপতি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর থলিটি গলায় বেঁধে একটি বড় পাথর তার ভিতর পুরে জলে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি দিব্যকান্তি পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"মহীপতি তুমি মরতে যাচ্ছ? কেন?"

"আপনি কে?"

"আমি বরুণ দেব। তোমার মহীসাগরে আমি প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে আসি। কিন্তু তুমি এ কি করছ!"

"আমার সংসারে থাকবার ইচ্ছে নেই। রাজ্য শাসনে অপারগ। এখনি সাতটি পরী দেখলাম, তাদের সাহচর্যে ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তারা রইল না।"

বরুণদেব বললেন—"তারা তো সাতটি রং। মহাশিল্পী ভগবানের চিত্রশালায় তাদের অহরহ দরকার। তারা তোমার কাছে থাকবে কি করে? তুমি যাও ভালভাবে রাজ্যশাসন কর গিয়ে—।"

"আমি পারব না। আমার মনে হয় প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করবে ভবিষ্যতে। আমি সরে থাকতে চাই। আমাকে একটি বর দিন প্রভু।"

"কি বর চাও?"

"আমি ওই সাতটি রঙের কাছে থাকতে চাই—"

"বেশ। তাহলে আকাশের খানিকটা অংশ হও। ওরা যখন রামধনু হয়ে ফুটবে, তুমি ওদের কাছে থেকো।"

সেদিন থেকে মহীপতি আকাশের সঙ্গে মিশে গেলেন। রামধনুর ঠিক পিছনে যে আকাশ আছে—সে-ই মহীপতি। মহারাজা মহীপতি এখন মহাশূন্যের একটা অংশ।

মুন্না সাহেবের গল্প

মুন্না সাহেব বৃদ্ধ লোক। মুখে মন-মহেশ পাকা দাড়ি। কিন্তু দাড়ির রং সাদা নয়। কখনও সবুজ, কখনও মেহেদি, কখনও কুচ্‌কুচে কালো। দাড়িতে রং মাখান তিনি। পরেন লম্বা জোব্বা আর পায়জামা। সেগুলোও রঙিন। বড়লোক। বিয়ে-থা করেন নি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ নেই। দেশ ভ্রমণ করে বেড়ান। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় গেছেন। আর গল্প বলতে পারেন খুব ভালো। এদেশে তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ শহরের এক প্রান্তে। প্রকাণ্ড মন্‌জিলের মতো বাড়ি। বাড়ির চারদিকে মস্ত হাতা। হাতার চারদিকে মস্ত উঁচু দেয়াল। শোনা যায় মুন্না সাহেবের সঙ্গে নবাব ওয়াজেদ আলির কি একটা সম্পর্ক ছিল যেন। তাঁর বসবার ঘরে প্রকাণ্ড একটা সোনার গড়গড়া একটা গ্লাস-কেসে সযত্নে রাখা আছে। এটা নাকি ওয়াজেদ আলি তাঁর পূর্বপুরুষ আবিদ আলমকে উপহার দিয়েছিলেন। গড়গড়াটির নিচে প্রকাণ্ড একটি হীরে ছিল। আলম সাহেব কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছিলেন সেটি। এই রকম নানা কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় ফুকন মিঞার কাছে। ফুকন মিঞা মুন্না সাহেবের বাল্যবন্ধু। মুন্না সাহেব যখন বিদেশে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁর মুর্শিদাবাদের বাড়িটার দেখাশোনা করেন ফুকন মিঞা।

সেবার দেশভ্রমণ করে ফিরতে প্রায় বছর খানেক হয়ে গেল মুন্না সাহেবের। ফুকন মিঞা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কি হল মুন্নার, কোন খবরই পাচ্ছিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন ফিরে এলেন মুন্না সাহেব।

"কি ব্যাপার, কোথায় গিয়েছিলে মুন্না ?"

"জায়গাটার নাম ঠিক বলতে পারব না ফুকন। তবে মনে হয় জায়গাটা আফগানিস্তানের কাছাকাছি কোনও পাহাড়ের উপত্যকা। চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় মাঝখানে খানিকটা সমতল। পাহাড় বেয়ে নেমে ছিলাম, নামতে খুব কষ্ট হয়েছিল। ভেবেছিলাম নেমে কোন গ্রাম বা শহর পাব। কিন্তু খালি মাঠ, সবুজ মাঠ। মাঠের উপর হাঁটলাম খানিকক্ষণ। তারপর বসে পড়লাম। পা ব্যথা করতে লাগলো। চারিদিকে চেয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। একটু বেকায়দায় পড়ে গেলাম। অন্য অন্য জায়গায় যখন যাই তখন একটা ঘর ভাড়া করি, চাকর বাহাল করি। কিন্তু এখানে এই নির্জন জায়গায় কি করব ! ক্ষিদে পেয়েছিল, কিছু খাবার পেলে হ'ত, পা দুটো ব্যথা করছিল একটু তেল মালিশ করে দিলে আরাম পেতাম। আমার পকেটে টাকাকড়ি ছিল প্রচুর, কিন্তু এ নির্জন স্থানে মোহর আর খোলামকুচির তফাত কি। নিরুপায় হয়ে শেষে খোদা-তালাকে ডাকতে লাগলাম। হাতজোড় করে চোখ বুজে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কে যেন বললে—বান্দা হাজির আছে, কি করতে হবে বলুন। চোখ খুলে চমকে উঠলাম। দেখি সামনে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটির মতো লোক। তার মাথায় একটা টুপি।" ফুকন মিঞা জিগ্যেস করলেন—"গিরগিটির মতো লোক ? কি রকম ?"

"আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। মানুষের মতো হাত পা মুখ সব, জামা-পাজামাও পরে আছে। কিন্তু কেমন যেন লম্বা গোছের। অনেকটা ছোট কামানের মতো। কিন্তু তাতে চাকা নেই, হাত পা আছে। মুখও আছে। মানুষেরই মুখ। আর মাথায় একটা টুপি পরা। সামনের হাত দুটো বড়, পা দুটো ছোট। হাতের উপর ভর করে ঘাড় তুলে কথা বলে—"

এমন সময় মুন্না সাহেবের জিনিসপত্র নিয়ে কুলিরা এল। ফুকন দেখলেন মুন্না সাহেবের বাক্স বিছানা ছাড়া একটা ছোট লোহার বাক্স রয়েছে।

"বাক্সটা কিসের মুন্না ?"

"পরে বলব। আগে এই লোকটার কথা শুনে নাও। আশ্চর্য লোক ও। ওকে দেখে আমি প্রথমটা ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু ওকেই শেষে বললাম—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবার পাওয়া যাবে এখানে ? "এক্ষুনি এনে দিচ্ছি" বলে লোকটা তরতর করে চলে গেল গিরগিটির মতো। তারপর দেখি একটি ছিমছাম ছেলে এসে হাজির হল। তার হাতে একটি চমৎকার ট্রে। আর তাতে নানারকম খাবার সাজানো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছেলে এল হালকা টেবিল চেয়ার নিয়ে। টেবিলের উপর ট্রেটি রাখলে, আমি চেয়ারে বসে খেতে লাগলাম। ছেলে দুটি অন্তর্ধান করল। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র আবার এসে হাজির হল তারা। টেবিল চেয়ার ট্রে সব নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—কে তোমরা। কোনও জবাব দিল না। একটু পরেই সেই গিরগিটির মতো লোকটা এল। এসে জিগ্যেস করলে—"খাবার পেয়েছেন ?" বললাম—"পেয়েছি। বড় চমৎকার খাবার। খুব তৃপ্ত হয়েছে আমার। এসব জিনিস

এখানে পেলে কোথা থেকে।" সে হেসে বলল—"বিশ্বকর্মার দরবার থেকে এসেছে খাবার।" আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—"বিশ্বকর্মার দরবার থেকে? কি রকম?" তখন সে বললে—"সব বলতে হলে, অনেক কথা বলতে হয়। আপনি শুনবেন?" বললাম—"নিশ্চয়ই শুনব। ভারী কৌতূহল হচ্ছে আমার। তোমার নামটি কি জিগ্যেসই করি নি।" সে বললে—"আমার নাম গর্ত। আগে এই মাঠেরই একটা অংশ ছিলাম। কিন্তু একদিন বাজ পড়ল। ছিলাম মাঠ, হয়ে গেলাম গর্ত। বজ্রাঘাতে আমার আর একটা উপকার হল। আমি মানুষের মতো কথা কইতে শিখলুম। যতদিন গর্ত ছিলাম, অনেক কষ্ট পেয়েছি। এ অঞ্চলের যত ময়লা জল আর শুকনো পাতা আমার ভিতরে ঢুকে পচত। নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। এমন সময় ভগবান একদিন দয়া করলেন। দেখলাম একটি দিব্যকান্তি পুরুষ এসে আমার ধারে দাঁড়িয়েছেন। আমি বললাম, আপনি আর এগুবেন না। আমি গর্ত। আমার ভিতরে যদি পড়ে যান কষ্ট পাবেন।" দিব্যকান্তি পুরুষটি সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তুমি গর্ত? গর্ত হলেও ভাল লোক তুমি। আমাকে সাবধান করেছ। তোমারও আমি উপকার করব।" জিগ্যেস করলাম—"আপনি কে?" বললেন, আমি বিশ্বকর্মা। এই মাঠের ওপারে সুন্দর একটি সরোবর আছে। তার তীরে শচীদেবীর জন্য একটি আপাত-অদৃশ্য-নৃত্যশালা তৈরি করতে হবে। গন্ধর্ব লোকের রূপসীরা জ্যোৎস্নারাতে সেখানে এসে নাচবেন। জ্যোৎস্নারাতেই মূর্ত হবে সেটি। যাই হোক আমার থলিতে মানুষ তৈরির কিছু মাল-মশলাও আছে। তোমাকে একটা মানুষ তৈরি করে দিচ্ছি। আমার এই চেহারা তৈরি করে দিয়ে বললেন—ঠিক মানুষের মতো হল না। যাইহোক এতে কাজ চলে যাবে। তোমার মাথাও পুরো করতে পারিনি। একটা ফুটো থেকে গেল। ওর উপর একটা টুপি করে দিচ্ছি। আর বর দিচ্ছি ওই ফুটো দিয়ে তোমার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে। কোনও দরকার যদি হয় আমার কাছেও যেতে পার। তোমার প্রার্থনা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব। আপনার খাবার আমি বিশ্বকর্মার দরবার থেকে আনিয়েছি।" আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম সব। বললাম—"রাত্রে শোব কোথায়?" "সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি"—সঙ্গে সঙ্গে গর্ত চলে গেল। একটু পরেই কয়েকজন লোক একটি সুদৃশ্য তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে গেল মাঠের মাঝে। পালঙ্ক বিছানাও এলে হাজির হল। এমন কি একটি গড়গড়া পর্যন্ত। আমি বললাম—"তাঁবুটি চমৎকার। কিন্তু এখানে তো সারা জীবন থাকা যাবে না। বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।" গর্ত তৎক্ষণাৎ বলল, "যেদিন আপনি বাড়ি ফিরতে চাইবেন, সেইদিনই আপনাকে পাহাড়ের ওপারে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু যাবার আগে আপনি গন্ধর্ব-পরীদের নাচ দেখে যাবেন। পূর্ণিমার রাতে ওই মাঠের ওপারে অদ্ভুত এক ইন্দ্রপুরী তৈরি হয়। সেখানে পরীরা এসে নাচে। সেটা আপনাকে দেখতেই হবে।" থেকে গেলাম সেখানে দিন কয়েক। আর কি যে দেখলাম ফুকন তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। পান্নাপরী, চুনীপরী, হীরেপরী, মুক্তোপরী এই চারিটি পরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর বাড়ি ফেরার সময় যখন এল তখন গর্তকে বললাম যে এ চারটি পরীকে তো জীবনে আর দেখতে পাব না। তবু বাড়ি ফিরে যেতে হবে। গর্ত বলল—"পাবেন। আমি সে ব্যবস্থাও ক'রে দিচ্ছি। একটি স্ফটিকের আয়না দেব

আপনাকে আর একটি মন্ত্র বলে দেব। আয়নার সামনে মন্ত্র পড়লে স্ফটিকের আয়নার চেহারা বদলে যাবে। স্ফটিকের আয়না কখনও হবে পান্নার আয়না, কখনও চুনীর আয়না, কখনও হীরের আয়না, কখনও মুক্তোর আয়না—আর তার ভেতর আপনি দেখতে পাবেন কখনও পান্নাপরীকে, কখনও চুনীপরীকে, কখনও হীরেপরীকে, কখনও মুক্তোপরীকে। ওই লোহার বাক্সটায় সেই স্ফটিকের আয়নাটা আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান ফুকন, দীর্ঘপথ আসতে আসতে আরবী-ফার্সির সেই মন্তরটা আমি ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছি না—আমার স্মৃতিশক্তি তো বরাবরই খারাপ। এখন কি করি বল তো ফুকন।"

ফুকন বললে—"কি আর করবেন, যা হারিয়ে গেছে তা আর পাবেন কি করে।"

"পেতেই হবে –"

মুন্না সাহেব এখন আরবী আর ফারসী অভিধান ওল্টাচ্ছেন দিনরাত, যদি মন্ত্রটা মনে পড়ে যায়, কিন্তু পড়ছে না।

পরদিন বোঝা গেল

অবশেষে খোদ বিধাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। বিধাতা প্রশ্ন করলেন—"কে তুমি।"

"আমি দিবাকর।"

"দিবাকর? আমার সৃষ্টি দিবাকর সহস্রকিরণ, অমিত-তেজপুঞ্জ। তুমি তো দেখছি সুঁটকো। কালো। এ নাম তোমায় কে দিল?"

"আমার ঠাকুর্দা—"

"কি চাও—"

"চাকরি।"

"কি পাশ করেছ?"

"বি. এ.।"

"কি কি বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করেছ।"

একটু থতমত খেয়ে গেল দিবাকর। ভাবল বিধাতাকে ভাঁওতা দেওয়া যাবে না! তিনি সর্বজ্ঞ।

বলল, "আজ্ঞে কোন বিষয়েই আমি জ্ঞানলাভ করিনি। বরাবর টুকে পরীক্ষা পাশ করেছি।"

"এরকম করতে গেলে কেন?"

"আজ্ঞে চাকরির বাজারে জ্ঞানের দরকার নেই, ডিগ্রির দরকার, তাই ডিগ্রির দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি। অনেক টাকা খরচ ক'রে তাই ডিগ্রী জোগাড় করেছি একটা। কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না। আপনি যদি একটা চাকরি জোগাড় করে দেন দয়া করে।"

"আমার তো কোন পোর্টফোলিও নেই। পোর্টফোলিও না থাকলে চাকরি দেওয়া যায় না।"

দিবাকরের মাথা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ।

সে ভুলে গেল কার সঙ্গে কথা কইছে।

হাতের 'পাইপ গান'টা উঁচিয়ে বলল—"চাকরি যদি না দেন তো খুন করব আপনাকে।"

বিধাতার মুখে স্মিত-হাস্য ফুটে উঠল।

বললেন, "কেন একটা গুলি নষ্ট করবে। আমি অমর। অনাদিকাল থেকে বেঁচে আছি, অনন্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব। তুমি আকুলভাবে ডাকছিলে বলেই তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি এমন জিনিস চাইছ যা আমি দিতে পারব না। পোর্ট-ফোলিও না থাকলে চাকরি দেওয়া যায় না।"

"তাহলে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন আমার।"

"ব্যবস্থা আর কি করব। তুমি যখন মূর্খ তখন জানোয়ারদের মতো খাও দাও আর ঘুরে বেড়াও।"

"কিন্তু খাব কি। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। দু'দিনই খাইনি।"

বিধাতার ডান হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল।

"বেশ, হাঁ কর। কিবু খাবার দিচ্ছি।"

"কি আছে ওতে?"

"সুধা। এতে দেবতাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, এ খেয়ে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।"

দিবাকর হাঁ করল, বিধাতা তার মুখে সুধা ঢেলে দিলেন। দিবাকর সন্তুষ্ট হল না কিন্তু। বলল, "কিছুই বুঝতে পারলাম না তো। কোনও স্বাদও পেলাম না, গন্ধও পেলাম না। বুঝতেই পারলাম না যে কিছু খেয়েছি।"

"ওই সুধা।"

বিধাতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন বোঝা গেল দিবাকর মানুষ, দেবতা না। কারণ সুধা খেয়ে তার ক্ষিদেও মিটল না, সে অমরত্ব লাভও করল না। দেখা গেল পরদিন তার মৃতদেহটা বাগানে পড়ে রয়েছে। বুকে পাইপগানের গুলির ক্ষত।

কয়ালবাবুর ডায়েরি থেকে

পাঠক মশায়ের মনে এমন যে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা লুকিয়েছিল তা আমিও জানতাম না। অথচ আমি এতকাল ওঁর সঙ্গে আছি! পাঠক মশাইয়ের চেহারা যে খুব সুন্দর তাও বলা যায় না। গ্যাট্টা-গোট্টা প্রৌঢ় লোক তিনি। মাথার সামনের দিকে একটু টাক। আজানুলম্বিত বাহু। মুখটি চার-কোণা। শক্ত চোয়াল, থ্যাবড়া নাক। যখন কথা বলেন মনে হয় হাঁড়ির ভিতর থেকে কথা বেরুচ্ছে। জগন্ময় পাঠকের নাম অনেকেই শোনেননি। কারণ অনেকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুপুরি ব্যবসা যাঁরা করেন, লোহার ব্যবসাতে যাঁরা দিকপাল, কাঁকরের ব্যবসাতে, হাড়ের ব্যবসাতে যাঁরা কর্ণধার তাঁরা সবাই চেনেন জগন্ময় পাঠককে। কৃতী লোক। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান মানে আধুনিক জগতের তীর্থস্থানগুলি কয়েকবার ঘুরে এসেছেন তিনি। জীবনকে চুটিয়ে ভোগও করেছেন। সে ভোগের বিশদ বিবরণ দিলে হয়তো শালীনতার সীমা অতিক্রম করবে তাই তা আর লিখছি না। কিছুদিন আগে পাহাড়

থেকে একটি পাণ্ডা কিনে এনে পুষেছেন। একজন বিখ্যাত গুরুর কাছে মন্ত্রও নিয়েছেন সেদিন। আমার ধারণা ছিল তাঁর জীবনের সব সাধ-আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি—আমি তাঁর বশংবদ ভৃত্য কৃষ্ণকান্ত কয়াল—এতদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকেও তাঁকে পুরো চিনতে পারিনি। হাঁ, আমি তাঁর বশংবদ ভৃত্যই। তিনি আমার সব ভার নিয়েছেন, আমিও তাঁর সব ভার নিয়েছি। প্রয়োজন হলে আমি তাঁর পা-ও টিপি আবার বড় বড় ব্যবসার ব্যাপারে মন্ত্রণাও দিই। ব্যবসার ব্যাপারে তদ্বির করবার জন্যই আমাকে তিনি দিল্লি পাঠিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস আমি কাছে থাকলে এ কাণ্ডটা ঘটত না। দিল্লিতে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম—পাঠক-মশাইকে পুলিশে ধরেছে, অবিলম্বে চলে আসুন। এসে যা শুনলাম অবাক হয়ে গেলাম তাতে। পাঠক মশাই দিন-দুপুরে চৌরঙ্গীতে গিয়ে একটি যুবতী মেয়ের উপর না কি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেষ্ট করেছে তাঁকে। এ বয়সে পাঠক মশায়ের এ দুর্মতি হওয়ার কথা নয়। কি হল বুঝতে না পেরে পুলিশ গারদে গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে।

দেখা হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে বললেন, "এই বিশ্বম্ভরটাকে দূর করে দাও। অপদার্থ একটা—"

বিশ্বম্ভর নামক ছোকরাকে তিনি আমার সুপারিশেই বিজ্ঞাপন লেখার চাকরিটা দিয়েছিলেন। ছোকরার আসল গুণ অবশ্য ছোকরা ভালো ফোটোগ্রাফার। কথাটা শুনেছিলেন পাঠক মশাই; শুনে বলেছিলেন—আচ্ছা, দরকার হলে ওকে দিয়ে ফোটোও তোলাব।

আমি বুঝতে পারছিলাম না। এ ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের অপরাধ কোথায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাঠক মশাই বললেন—"তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না কিছু—"

"আজ্ঞে না।"

"আমি চাই না আবার আমার পুনর্জন্ম হোক। কিন্তু কোনও আকাঙ্ক্ষা যদি অতৃপ্ত থাকে তাহলে আবার জন্মাতে হবেই। আমার সব সাধ আকাঙ্ক্ষা মোটামুটি মিটে গেছে। একটি কেবল মেটেনি। এখনও খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়নি আমার। এম-এল-এ হবার চেষ্টা করলুম, পারলাম না; সিনেমাতে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলাম টাকাও দিতে চেয়েছিলাম, কোনও ডিরেক্টার আমাকে হিরো করতে চাইল না। এতবার বিলেত গেলাম, জাপানে গেলাম, তবু আমোল দিলে না আমাকে খবরের কাগজ-ওয়ালারা। কেউ ছবি ছাপালে না!—"

গুম হয়ে গেলেন পাঠক মশাই।

তারপর বললেন—"তারপর আমি ঠিক করলাম, খবরের কাগজে আমি ছবি ছাপাবই। গুণ্ডারূপেই ছাপা হোক, কিন্তু ছাপা হোক। বিশ্বম্ভরকে বললাম, তুমি ক্যামেরাটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। আমি একটা মেয়ের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার একটা ছবি তুলে নেবে। তারপর তুমি নিজে সব খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে ছবিসুদ্ধ খবরটা দিয়ে আসবে। বিশ্বম্ভর কি করল জান? ঠিক সেই সময়টিতে পা পিছলে পড়ে গেল দড়াম করে। হতভাগা ওয়ার্থলেস—"

একটু থেমে আবার বললেন—"যে রকম হৈ-হৈ হয়েছিল পুলিশ আমাকে না আগলালে আশেপাশের লোকগুলোই আমাকে ছাতু করে দিত।"

বললাম—"একটা কাগজে খবর একটা বেরিয়েছে। আপনার নাম দেয়নি। লিখেছে এক দুর্বৃত্ত চৌরঙ্গীতে এক তরুণীর ওপর লাফিয়ে পড়েছিল। ছবিও বেরিয়েছে একটা।" সোৎসুকে পাঠক মশাই প্রশ্ন করলেন—"কার ছবি?"

"সেই মেয়েটির।"

"সবই অদৃষ্ট।"

পাঠক মশাই কপালের উপর তর্জনী স্থাপন করলেন।

ভূতের গল্প

হঠাৎ মাখন সিং এসে হাজির হল অনেক দিন পরে। শিকারী মাখন সিং। কাঁধে বন্দুক, হাতে একজোড়া মরা পিনটেল। পিনটেল অতি সুস্বাদু বুনোহাঁস। মাখন অনেক বুনোহাঁস খাইয়েছে আমাকে। প্রায়ই হাঁস মেরে আনত। হরিণের মাংস, বুনো শুয়োরের মাংস, সজারুর মাংস, ফ্লরিকানের মাংস ওর দৌলতেই খেয়েছি। আমার ঘরে বাঘের যে চামড়াটা দেওয়ালে টাঙানো আছে সেটাও মাখনের দেওয়া। খুব বড় শিকারী ও। পরণে খাকি হাফ্ শার্ট, হাফ্ প্যাণ্ট। কাইজারি গোঁফ। মাথার চুল কদম ছাঁট।

অনেক দিন পরে এল আজ।

"কি মাখনলাল, এস এস। এতদিন কোথায় ছিলে?"

নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। ভাবলাম অনেকদিন দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি, দেখা করে আসি। আজ ভাগ্য ভালো দুটো পেনটেলও পেয়ে গেলাম।"

"বেশ, বেশ। বস। চা খাবে, না কফি?"

মাখন রহস্যময় হাসি হেসে বলল—"না, কিছু খাব না। আপনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে আছেন মনে হচ্ছে—"

"হ্যাঁ। মনে মনে কল্পনার দরবারে ধন্না দিয়েছি। একটা ভৌতিক গল্পের প্লটের জন্য।"

"আমার একটা অদ্ভুত ভূতের গল্প জানা আছে। শুনবেন?"

"বেশ বল।"

মাখন সিং বলতে লাগল।

"গৌড়ের কাছে একটা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলাম। একজন খবর দিয়েছিলেন সেখানে ভোরের দিকে বড় বড় কালো তিতির পাওয়া যায়। খুব ভোরে বেরোয় তারা। আমি ঠিক করলাম রাতে গিয়ে বনের ধারেই শুয়ে থাকব। আমার ছোট একটি বিলিতি খাটিয়া আছে। সর্বত্র নিয়ে যাওয়া যায় প্যাক করে। তার মাপে মশারিও আছে আমার একটা। ঠিক করলাম জঙ্গলের ধারেই মশারি খাটিয়ে শুয়ে থাকব রাত্রে।

খাওয়া দাওয়া করে চলে গেলাম রাত দশটার পর। সন্ধ্যা থেকেই আমার চাকর শুকুল বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। আমি গিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। সে বাসায় চলে গেল। আমি লোডেড্ বন্দুকটি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও চাঁদ ওঠে নি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। কিন্তু বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা ফোঁস করে শব্দ হল। মনে হল সাপ নাকি। সঙ্গে টর্চ ছিল। জেবলে দেখি—ও বাবা সাপ নয়, হাতি। বিরাটকায় একটা হাতি। ঠিক সেই সময়েই আকাশের মেঘটা সরে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চতুর্দিক। দেখলাম হাতি শুধু বিরাটকায় নয়, বেশ সুসজ্জিতও। পিঠে হাওদা রয়েছে। আমার মশারির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়ছে, কান নাড়ছে আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে মাঝে মাঝে। আর কিছু করছে না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। চুপটি করে বসে রইলাম। ভাবলাম কোথা থেকে এসেছে, আপনিই চলে যাবে। এ বুনো হাতি নয়, পোষা হাতি। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল। হাতি কিন্তু নড়ে না। ক্রমাগত শুঁড় দোলাচ্ছে আর কান নাড়ছে। আরও মিনিট দশেক কেটে গেল। কি করব ভাবছি। এমন সময় হাতিটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সে আকাশের দিকে শুঁড়টা তুলে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শুঁড়টা নামিয়ে আমার মশারির ভিতর শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিল। শুঁড়ে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল, সে মালাটি পরিয়ে দিল আমার গলায়। শুঁড়ের ভিতর থেকে টক্ করে কি একটা পড়ল আমার কোলের উপর। তুলে দেখি শ্বেতপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ একটি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক আর এটি হচ্ছে আমার প্রিয় হস্তী মৈনাক।

বললাম, "মৈনাক, কি খবর ?"

সঙ্গে সঙ্গে মৈনাক হাঁটু গেড়ে বসল। আর তার শুঁড়টি বেঁকিয়ে ধরল। আমি তার শুঁড়ে পা রেখে হাওদায় গিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল সে। গজেন্দ্রগমন নয়,—ছুটতে লাগল মৈনাক। কত মাঠ বন নদী গিরি পার হয়ে গেলাম। রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। মৈনাক তবু থামে না। দিনের আলোয় দেখলাম চমৎকার এক দেশ। চারিদিকে প্রাচুর্য, চারিদিকে সৌন্দর্য। কত মন্দির, কত হর্ম্য, কত জলাশয়, কত বাগান পার হয়ে গেলাম। মৈনাককে দেখে রাস্তার লোক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়, জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়—জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে লাগল চারিদিক। মৈনাক কিন্তু এক নিমেষের জন্য থামে নি। সে ছুটে চলেছে। সমস্ত দিন ধরে সে ছুটল। তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, অন্ধকার রাত্রি নামল তখন বিরাট এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল মৈনাক। শুঁড় দিয়ে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলল জঙ্গলের ভিতর। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম একটি পরিষ্কার জায়গায় চিতা জ্বলছে। আর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যশ্রী। আমি রাজ্যশ্রীকে ভালবাসতাম কিন্তু তার ভাই রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধনের সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল তাই তাকে পাই নি।

বললাম—"রাজ্যশ্রী এখানে কি করছ ?"

"আমি জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করব। তুমি আমাকে বাধা দিও না।"

"নিশ্চয় দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি মৈনাকের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বরশা এসে বিঁধল আমার বুকে। দেখি রাজ্যবর্ধনের প্রেত দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ভ্রূকুটিল, চোখে আগুন।"

ঠিক এই সময়ে আমার পৌত্র হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল।

"দাদু আজ আমাদের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন ছিল। দেখ, আমি কি সুন্দর রামায়ণ পেয়েছি।"

প্রকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণটা সে রাখল টেবিলের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে মাখন সিং যেন উবে গেল। মরা পিনটেল দুটো যেখানে পড়ে ছিল, দেখলাম সে দুটোও নেই সেখানে।

পরদিন খবর পেলাম শিকার করতে গিয়ে মাখনলালের মৃত্যু হয়েছে। একটা বনের ভিতর তার মৃতদেহটা পড়ে ছিল।

মিনির চিঠি

সেদিন ভয়ানক গরম। গাছের পাতাটি নড়ছে না। ভনভন করছে মশা চতুর্দিকে। বিছানায় খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে নগেনবাবু শেষে ছাদে বেরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তখন রাত্রি একটা। নগেনবাবু মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করেন। বিবাহ করেন নি। একাই একটি বাড়ি-ভাড়া করে থাকেন। একটি কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর আছে। সে সকাল সন্ধ্যা এসে তাঁর কাজ কর্ম করে দিয়ে চলে যায়। রাতে নগেনবাবু একাই থাকেন।

নগেনবাবু ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে বেশ একটা বড় 'ডাকবাক্স' ছিল। হঠাৎ তিনি দেখলেন, ডাকবাক্সটা খুব নড়ছে। যেখান দিয়ে চিঠি ফেলা হয়—সেখানকার ঢাকনাটা খটখট করে শব্দ করছে। তারপর সেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাক-বাক্সের ভিতর থেকে সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হতে লাগল একটা। মিনিট খানেক পরে থেমে গেল। নগেনবাবু দেখলেন একটি লম্বা শীর্ণ লোক ডাকবাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আবির্ভূত হল যেন শূন্য থেকে। অবাক হয়ে গেলেন নগেনবাবু।

আলসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বললেন, "কে তুমি?" লম্বা শীর্ণ লোকটা মুখ তুলে চাইল।

কাছেই একটা ল্যাম্প-পোষ্টও ছিল। তার আলোয় নগেনবাবুর মনে হল একটা মনুষ্যরূপী কঙ্কাল তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

"ওখানে কি করছ এত রাতে?" লোকটা অন্তর্ধান করল। নগেনবাবু অবাক হওয়ার অবসর পেলেন না, ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ পর মুহূর্তে লোকটা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

"আমাকে কিছু বলছেন?"

"ওখানে কি করছিলে এত রাতে ?"

"দেখছিলাম ঐ ডাকবাক্সে মিনির চিঠি আছে কিনা।"

"ডাকবাক্সের মধ্যে চিঠি আছে কি-না দেখবে কি করে ?"

"আমি ওর ভিতর ঢুকে ছিলাম যে।"

"ঢুকেছিলে ? কি করে ?"

"বাতাস হয়ে।"

নগেনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। লোকটি বললে, "আমি দিন পনেরো আগে মারা গেছি। মাসখানেক আগে মিনিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। রোজই আশা করতুম উত্তর আসবে। কিন্তু হঠাৎ মরে গেলাম। উত্তর পেলাম না। যে বাসায় আমি থাকতাম সেখানে রোজই গিয়ে দেখে আসি একবার। আমার লেটার-বক্সে কোন চিঠি নেই। তখন রাস্তার ডাকবাক্সগুলো খুঁজে খুঁজে দেখি—মিনির চিঠি কোথাও আছে কিনা।"

অবাক হয়ে শুনছিলেন নগেনবাবু।

"কাছাকাছি আর কোথায় ডাকবাক্স আছে বলতে পারেন ?"

নগেনবাবু এ কথার উত্তর দিলেন না।

প্রশ্ন করলেন, "আপনি মারা গেছেন ?"

"হ্যাঁ, পনেরোদিন আগে। হঠাৎ হার্ট্-ফেল ক'রে। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। এ বাজারে বেঁচে থেকে সুখ কী বলুন ? কিন্তু আমার দুঃখ মিনির উত্তরটা আমি জানতে পারলাম না। মিনির বাড়িও আমি গিয়েছিলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। কলসা গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় মিনি আর তার মা থাকত। গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে। দানাপুরে তার মামা থাকে শুনেছিলাম।"

"আপনি মরে গিয়েও ওই দেহ ধারণ করতে পেরেছেন ?"

"পেরেছি। সবাই পারে না। মনের খুব জোর চাই। যতক্ষণ দেহধারণ করে থাকি খুব কষ্ট হয়। অধিকাংশ সময়ই হাওয়া হয়ে থাকি আমি। চললুম, আরো অনেক ডাকবাক্স খুঁজতে হবে আমাকে। মিনি নিশ্চয় উত্তর দিয়েছে। কোথাও না কোথাও আছে, সেই উত্তরটা খুঁজে বার করতে হবেই আমাকে।"

"আপনার নামটি কি ?"

"এখন নাম ভূত। আগে ছিল শিবেন।"

শিবেনের প্রেতাত্মা নিমেষে অন্তর্ধান করল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নগেনবাবু।

ঠিক করলেন বাড়িওয়ালাকে 'নোটিশ' দেবেন কাল। এবাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

॥ ২ ॥

না, সব প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু যারা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মরে, তারা নানাভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা বুঝতে পারি না সবসময়। নিতাই বুঝতে পারছিল না। নিতাই সেদিন রাত্রে খোলা জানলার সামনে বসে

পড়ছিল, জানলার দু'পাশ বেয়ে বেড়ে উঠেছে মালতীলতার ঝাড়। সেই মালতী লতার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে যে আকুলতা জাগলো—যে শিহরণ বয়ে গেল, যে দোলা লাগল, তা নিতাই-এর মনে কোনো সাড়া তুলল না। সে বুঝতে পারল না—মিনি কথা বলছে। সে ভাবল, হাওয়ার জন্য মালতী লতাটা দুলছে। সে যদি লক্ষ্য করত—তাহলে দেখতে পেত অন্য গাছের পাতা নড়ছে না। মালতী লতার সেই আকুল আলোড়ন নিতাইকে বলতে চাইছিল, 'ও নিতাই দা, তুমি শিবেনবাবুকে লিখে দাও আমি তার চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর দেবার সময় পাইনি। তুমি তা জানোই কী হয়েছিল। তোমরা তো কেউ আমাদের বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এলে না। গুণ্ডার দল আমাকে আর মা-কে নিয়ে চলে গেল। আমার উপর, মায়ের উপর যে অত্যাচার তারা করেছে—তা অকথ্য। তাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমি মরেছি। আমি মরে গেছি এই খবরটা তুমি শিবেনবাবুকে শুধু জানিয়ে দাও। আর জানিয়ে দাও—যে কথাটা লজ্জায় তাকে জানাতে পারি নি, সেই কথাটা এখন বলেই বা কি হবে। এখন বলে তো কোন লাভ নেই। আমি যে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি, আমি মরে গেছি। এ কথাটা তাকে জানিয়ে দাও। তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন।"

নিতাই কিন্তু তন্ময় হয়ে 'ডিটেকটিভ' বই পড়তে লাগল। মালতীলতার এই আকুলিবিকুলি তার নজরে পড়ল না। মিনি আর তার মা-কে যে গুণ্ডারা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—তা সে জানত। কিন্তু এ নিয়ে সে তেমন উত্তেজিত হয়নি। উত্তেজিত হয়েছিল সেদিনকার ক্রিকেট খেলার ফলাফল নিয়ে। গ্রামের কোন লোকই গুণ্ডাদের খোঁজে বেরোয় নি। সবাই গা বাঁচিয়ে ঘরে বসেছিল। নিতাইও ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। মিনিরা নিতায়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তবু ঘামায় নি। মালতীলতাটা রোজই কিন্তু আন্দোলিত হচ্ছিল তার চোখের সামনে নিতাই-এর মনে সাড়া জাগল না। একদিন দেবতা কিন্তু সদয় হলেন। রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠল একটা। মালতী গাছটার ফুল, লতা-পাতা ঝড়ের বেগে ছিঁড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল শিবেনের ওপর। শিবেন তখন আর একটা ডাকবাক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। মালতী-লতার ছেঁড়া ডালপালা আর ফুলগুলো তাঁকে ঘিরে ঘিরে ঘুরতে লাগল আকুল হয়ে। শিবেন কিন্তু বুঝতে পারল না যে তার উত্তর এসেছে।

পাকা আমটির বুকে তীক্ষ্ন ছোরার মতো যখন দাঁড়কাকের ঠোঁটটা প্রবেশ করল তখন আম যন্ত্রণায় শিউরে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না, কারণ তার ভাষা নেই।

পরমুহূর্তেই দুম্ করে শব্দ হল একটা।

গুলি খেয়ে পড়ে গেল দাঁড় কাকটা।

আম ভাবল—যাক্ ভগবান আছেন তাহলে।

ন্যায়বিচার এখনও হয় পৃথিবীতে।

পরদিন কিন্তু ন্যায়বিচার এবং ভগবান আর একরূপে দেখা দিলেন।

একটি লোক গাছে উঠে আমটিকে মুচড়ে ছিঁড়ে নিল বোঁটা থেকে। পুরল একটি থলের ভিতর। সেখানে আরও অনেক ছিন্নবৃন্ত আম রয়েছে। একটু পরে তাদের নিয়ে গিয়ে স্তূপীকৃত করা হল পাকা মেঝের উপর।

কে একজন বললেন—"যে আমগুলোকে কাকে ঠুকরেছে সেগুলোকে আলাদা কর। ওগুলো রস নিঙড়ে নিঙড়ে রাখ এই পাথরের বাটিতে। ওগুলো দিয়ে আমসত্ত্ব হবে—"

পরদিন আমের রস প্রখর রোদে পুড়তে লাগল।

আমের আইন, কাকের আইন আর মানুষের আইন এক নয়।

আইন বহুরূপী।

ভাটিয়ালী

কবি কাঁকনকুমারের পঞ্চাশতম জন্মদিবসে ঘটনাটি ঘটিল।

কিছুদিন আগে তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'তন্বী' প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি কাঁকনকুমার তেমন খ্যাতিমান হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার জন্মদিনে বাহিরের লোক বড় একটা আসিত না। সেদিন কিন্তু একটি লম্বা-চওড়া স্থূলকায়া মহিলা তাহার 'তন্বী' কাব্যটি লইয়া উপস্থিত হইল।

"আমাকে চিনতে পারছ ?"

"না"

"আমি রেণু—যাকে নিয়ে তুমি এই কবিতাগুলি এককালে লিখেছিলে—!"

"তোমার স্বামী এখন কোথা—"

"বম্বেতে। চামড়ার ব্যবসা করেন।"

রেণু সামনের নড়বড়ে চেয়ারটি টানিয়া বসিল।

ক্যাঁচ করিয়া শব্দ হইল একটা।

কাঁকনকুমারের বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। চেয়ারটি যদি ভাঙিয়া যায় দ্বিতীয় চেয়ার কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার আপাতত নাই।

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অদূরদর্শী নিমাই

বেপরোয়া লোক ছিল নিমাই সামন্ত। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে অদূরদর্শী। সে ভবিষ্যৎ ভাবত না, বর্তমানই তার কাছে সব ছিল। বর্তমান মুহূর্তের আনন্দের শিখরে চড়বার জন্যে সে সদা উৎসুক হয়ে থাকত। আনন্দও নানা রকম। একবার এক

খোঁড়া বুড়ি তরকারির ঝুলি নিয়ে অতি কষ্টে পথ চলছিল। তাকে দেখে নিমাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

"মা, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?"

"হচ্ছে বই কি। কিন্তু কি করব বল। সবই অদেষ্ট—"

"আমি একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি, আপনি তাতে চড়ে চলে যান।"

"আমি গরিব মানুষ বাবা। রিকশার পয়সা কোথা পাব।"

"রিকশার পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

একটা রিকশা থামিয়ে তাতে জোর করে তুলে দিয়েছিল সেই বুড়িকে। ভাড়াও দিয়ে দিয়েছিল রিকশার।

একদিন হঠাৎ এক ঠোঙা জিলিপি এনে উপস্থিত আমার বাড়িতে।

"কি রে কি ব্যাপার ?"

"জিলিপি এনেছি। অনেকদিন পরে ছকু জিলিপি ভেজেছে আজ। খেয়ে দেখ, অপূর্ব—"

"এত আনলি কেন ?"

"সবাই মিলে খাওয়া যাবে।"

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিল নিমাই। কিন্তু সে ছিল দিলদরিয়া লোক। সুতরাং চতুর্দিকে ধার ছিল তার। তার এই স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ধার দিতও।

হঠাৎ একদিন এসে বললে—"চল্ তাজমহল দেখে আসি। পরশু পূর্ণিমা। আজই চল।"

"অত টাকা কোথায় পাব ?"

"আমি আমার পুরনো সেকেলে পালং-খাটটা বিক্রি করে শ' দুই টাকা পেয়েছি—"

"অমন সেগুন কাঠের খাটটা বেচে ফেললি মাত্র দু'শ টাকায় ! ওর দাম অন্তত হাজার টাকা—"

"আরও বেশি। ও খাটে হাজার হাজার ছারপোকাও আছে। সেগুলো কি একেবারে মূল্যহীন ? যত দামই হোক, আমার দরকার ছিল দুশো টাকার। চল্ আগ্রা ঘুরে আসি—"

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে।

সেদিন আমরা দুজনে বাজারে গিয়েছিলাম মাছ কিনতে। নিমাই দেখলাম এক জোড়া চমৎকার পাম্-শু পরে এসেছে।

"এটা কবে কিনলি ?"

"কাল বিকেলে। দাম নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। অনেকদিন থেকে পরবার শখ ছিল। শখটা মিটিয়ে নিলাম কাল। বাঃ—ওই ইলিশটা তো চমৎকার—"

সত্যিই মাছটি চমৎকার। প্রকাণ্ড চওড়া পেটি, মাথাটি ছোট, লেজটিও ছোট। চকচকে রুপোর মতো রং সর্বাঙ্গে। পিঠটি ঈষৎ কালো। একেবারে টাটকা মাছ। কান্‌কো দুটি টকটকে লাল, চোখ দুটি উজ্জ্বল।

নিমাই বললে—"এটাই আমরা নেব। ওজন কর—"

ওজন হল দু' কেজি। দাম চাইল কুড়ি টাকা। আমার কাছে দশ টাকা ছিল। নিমাইয়ের কাছে পাঁচ টাকা।

নিমাই প্রশ্ন করলে—"ডিম নেই তো ? কেটে দেখাও—"

মেছুনি মাছটা কেটে দেখিয়ে দিলে ডিম নেই। এর পর মাছ না নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু টাকা যে কম পড়ছে। কি করা যায় ?

হঠাৎ নিমাই বললে, "মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে কুটে ফেল। আমি একটা থলি নিয়ে আসি—"

নিমাই চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে মাছ কোটাতে লাগলাম। আমি ভাবলাম নিমাই বুঝি কারো কাছে ধার চাইতে গেল। হয়তো কাছে-পিঠে তার চেনাশোনা কেউ আছে। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে নিমাই ফিরল থলি নিয়ে। মাছের দাম মিটিয়ে দিয়ে যখন আমরা বাজার থেকে বেরুচ্ছি তখন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল নিমাইয়ের খালি পা। পামশু পায়ে নেই।

"তোর জুতো কোথা গেল ?"

একমুখ হেসে নিমাই বললে—"পাশেই পুরনো জুতোর একটা দোকান আছে। পাঁচ টাকায় বিক্রী করে দিলাম। পয়সা হলে আবার কেনা যাবে। এমন গ্র্যান্ড ইলিশটা ছাড়া যায় নাকি !"

নিমাইয়ের মুখ দেখে মনে হল সে আনন্দের শিখরে চড়ে বসে আছে। মনে পড়ল যখন জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহলের দিকে সে চেয়েছিল তখনও তার মুখে এই ভাব দেখেছিলাম।

নিমাই বিয়ে করেনি। বয়স তিরিশের কোটায়। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান লোক।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"বিয়ে করিসনি কেন এখনও ? তোর বাবা মা কেউ নেই, নিজেই তো তুই নিজের মালিক। রোজগারও করিস, বিয়ে করিসনি কেন ?"

"অঙ্কে মিলল না। তবলাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু সে বামুনের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তাই তার ভুগী হতে পারলাম না আমি। তবলার বিয়ে হয়ে গেছে, আমি আর বিয়ে করিনি।"

"মেয়ের নাম তবলা ?"

"ভাল নাম তমালিনী। আমি তবলা বলে ডাকতুম। বাড়িতে সবাই বলত পুঁটি। তবলাটা ছিল আমার আড়ালের আদরের নাম।"

এর প্রায় মাস দুই পরে একটা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে হাজির হল নিমাই।

"বিয়ে করছি ভাই। তবলাই সম্বন্ধ করেছে। ঠিক তার শ্বশুরবাড়ির পাশেই মেয়েটির বাড়ি। খুব গরিব নাকি। আমাদের স্বজাতি। তবলা লিখেছে তোমাকে জীবনে কখনও কোনও অনুরোধ করিনি। এই অনুরোধটি করছি। গরিবের দায়টি উদ্ধার কর। খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তবলার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তার একটি খোকা হয়েছে। তোকে বরযাত্রী যেতে হবে ভাই।"

বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

বিবাহ-বাসরে তবলাও এসেছিল। পাশেই তার বাড়ি। তার খোকাটিকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের ভিতর শুইয়ে শিকল তুলে দিয়ে এসেছিল সে। নিমাইকে বলছিল, "এবার আর খামখেয়ালীপনা করা চলবে না তোমার। লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে—"

নিমাই হেসে উত্তর দিয়েছিল—"মেয়েরাই লক্ষ্মী হয়। পুরুষরা বড় জোর নারায়ণ হতে পারে। নারায়ণের কিন্তু সমুদ্রে শয্যা—"

বিয়ের লগ্ন এসে গেল। বর-কনেকে পিঁড়িতে বসান হল। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে যাবেন এমন সময় হই-হই শব্দ উঠল বাইরে—আগুন—আগুন—আগুন লেগেছে।

তবলার বাড়িতেই আগুন লেগেছিল। তাদের খড়ের চাল। যে ঘরে তবলার খোকা ছিল সেই ঘরটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

তবলা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"আমার খোকন যে ওই ঘরে রয়েছে—"

নিমেষের মধ্যে নিমাই উঠে পড়ল বরের আসন থেকে। ছুটে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। হায় হায় করে উঠল সবাই।

অনেকক্ষণ পরে জল দিয়ে যখন আগুন নেবানো হল তখন দেখা গেল অঙ্গার স্তুপের নীচে নিমাই উপুড় হয়ে তবলার খোকাটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। খোকা বেঁচে আছে, কিন্তু নিমাইয়ের মাথা পিঠ গা সব পুড়ে গেছে। সে আর বাঁচল না।

খোকনের বন্ধু

খোকন যখন খুব ছোট ছিল তখন একটা বাঘের বাচ্চা পুষেছিল সে। খোকন যখন তার সঙ্গে খেলা করত তখন তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ। তার দেখাদেখি বাঘের বাচ্চাটাও ঠিক ওই রকম তিনবার বলত—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ। এইটে তাদের প্রধান খেলা ছিল। বাঘের খাঁচার সামনে খোকন হামাগুড়ি দিয়ে বাঘ সেজে বলত গাঁউ গাঁউ গাঁউ। বাঘটাও উত্তর দিত গাঁউ গাঁউ গাঁউ। খোকনের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল বাচ্চাটার। খোকন তার নাম রেখেছিল বাচ্চু। বাচ্চু কিন্তু একদিন পালিয়ে গেল। খাঁচার দরজাটা ভালো বন্ধ ছিল না। পালিয়ে গেল বাচ্চু। রাত্রিবেলা কখন পালিয়ে গেছে টের পায় নি কেউ। সকালে উঠে দেখা গেল বাচ্চু নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। বাচ্চুকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না।

এর পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে।

বাচ্চু যখন পালিয়েছিল তখন খোকনের বয়স ছিল বারো। এখন সে বাইশ বছরের যুবক। এম. এ. পাশ করেছে। খুব ভালো শিকারীও হয়েছে একজন।

খোকন বড়লোকের ছেলে। তাদের মোটর তো আছেই। হাতী ঘোড়াও আছে। একদিন শোনা গেল পাশের জঙ্গলে নাকি বাঘ এসেছে। গরু বাছুর বা মানুষ মারে নি কিন্তু তার হুংকারে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। খোকন একদিন হাতীতে হাওদা কষে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এর আগে সে বাঘ শিকার করে নি। ভালুক মেরেছে, শুয়োর মেরেছে, বাঘ মারে নি। তার মনে হল এবার যখন বাড়ির কাছেই জঙ্গলে বাঘ এসেছে চেষ্টা করে দেখা যাক! বাড়ির কাছে মানে খুব কাছে নয়, প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। জঙ্গলটি খুব ছোটও নয়। খোকন সঙ্গে জন পঞ্চাশেক 'বীটার'ও নিয়ে গেল।

বীটাররা চারদিকে হৈ হল্লা করে চারদিকের জঙ্গলে লাঠি-পেটা কোরে বাঘটাকে ঝোপ-ঝাপের ভিতর থেকে ফাঁকায় বার করে। বাঘটাকে দেখতে না পেলে তো গুলি করা যাবে না।

'বীটার'রা হইহই করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তবু বাঘের দেখা নেই। খোকন হাতীর উপর হাওদায় ব'সে ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা ঝোপের ভিতর বাঘটা লুকিয়ে ব'সে আছে। বাঘের গায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে ঝোপের ফাঁক দিয়ে। সেইটে লক্ষ্য ক'রে খোকন 'দুম্' ক'রে গুলি ছুড়ল একটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হল—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ আর বাঘটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপের ভিতর থেকে। গুলিটা ঠিক লাগে নি। সামনের একটা থাবায় ছ'ড়ে গিয়েছিল একটু।

ঝোপের বাইরে এসে সেই থাবাটা তুলে বাঘটা আবার চেঁচিয়ে উঠল—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ।

খোকনের মনে পড়ে গেল সব।

"কে বাচ্চু—?"

কি আশ্চর্য—বাচ্চুও উত্তর দিলে মানুষের ভাষায়।

"হ্যাঁ আমি বাচ্চু। আমাকে তুমি মারলে খোকন!"

আবার থাবাটা তুলে দেখাল সে।

"তুমি বাংলা শিখলে কি করে?"

"একজন বাঙালী সাধুর বরে। আমি তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলাম। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই এই জঙ্গলে এসেছি। আর তুমিই এসে আমার উপর গুলি চালিয়ে দিলে। আশ্চর্য কাণ্ড!"

খোকনও বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। বললে—"আমি বুঝতে পারি নি। অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমাদের বাড়ি চল।"

"বেশ চল—"

"তুমি হাতীতে চড়তে পারবে? হাওদায় আমার পাশে এসে বস।"

"আমার আপত্তি নেই।"

হাতীটা কিন্তু ঘোর আপত্তি করতে লাগল। সে বাচ্চুকে দেখে তেড়ে গেল এবং শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারবার চেষ্টা করতে লাগল। মাহুতটা অনেক কষ্টে সামলে রাখলে তাকে। খোকন তখন হুকুম দিলে, বাচ্চুকে পালকি ক'রে নিয়ে এস।

খোকন হাতী চড়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর প্রকাণ্ড একটা বড় পালকি আর আটজন বেহারা পাঠিয়ে দিলে বাচ্চুকে আনবার জন্য। বেহারাও সহজে যেতে চায় কি? অত বড় একটা জাঁদরেল বাঘকে পালকি ক'রে আনা সহজ না কি! প্রথমে কেউ ভয়ে যেতে চায় নি। শেষে খোকন বলল, "বেশ চল আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। ও আমার বন্ধু, তোমাদের কিছু বলবে না।" খোকন ঘোড়ায় চ'ড়ে গেল তাদের সঙ্গে।

জঙ্গলে গিয়ে দেখে বাচ্চু থাবা তুলে তার অপেক্ষায় ব'সে আছে আর মাঝে মাঝে থাবাটা চাটছে।

"রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না ভাই।"

"ছিদাম ডাক্তার সব ঠিক ক'রে দেবে, তুমি পালকির ভিতর ঢোক। বেহারাদের ভয় দেখিও না যেন।"

বাচ্চু লক্ষ্মীর মতোই ঢুকল পালকিতে।

বেহারারা তাকে হুমব্রো হুমব্রো ক'রে নিয়ে এল খোকনের বাড়িতে।

নীচের হলটাতে ভালো একটা পালং খাট ছিল। তার উপর ভালো বিছানা ক'রে শোয়ানো হল বাচ্চুকে। খোকন বাচ্চুর পিঠের দিকে একটা বড় তাকিয়াও দিয়ে দিলে। বাচ্চু তাকিয়া ঠেস দিয়ে থাবা উঁচু ক'রে বসে রইল।

একটু পরে ছিদাম (শ্রীদাম) ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে তাঁর চক্ষু তো চড়ক-গাছ। ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। বললেন—"ঐ রুগীর আমি চিকিৎসা করতে পারব না।"

বাচ্চু হেসে উঠল ঘাঁউ ঘাঁউ ক'রে। তারপর বললে—"ছি, ছি এত ভীতু আপনি। আপনি শুধু দেখে দিন হাড়টাড় ভেঙেছে কি না! হাড় যদি না ভেঙে থাকে আমি চেটে চেটেই সারিয়ে ফেলব আমার ঘা। আপনি শুধু দেখুন হাড়টা ঠিক আছে কি না।"

থাবাটা আর একটু বাড়িয়ে দিল বাচ্চু। ছিদাম ডাক্তার অতি ভয়ে ভয়ে গিয়ে সামান্য নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করলেন সেটা। তারপর বললেন—"না হাড় ভাঙে নি। চামড়ার ওপরটা একটু জখম হয়েছে। আমি একটা ভাল মলম দিচ্ছি সেইটে দিয়ে বেঁধে রাখুন, ভালো হয়ে যাবেন—"

ভয়ের চোটে ছিদাম ডাক্তার বাচ্চুকে 'আপনি' বলতে লাগলেন। তারপর বাইরে গিয়ে খোকনকে বললেন—"আমি একটা মলম আর ব্যাণ্ডেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমিই লাগিয়ে বেঁধে দিও। আমি ওই প্রকাণ্ড বুনো বাঘের থাবায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারব না। তুমি বলছ, ও তোমার বন্ধু। তুমিই ব্যাণ্ডেজটা করে দাও—"

ছিদাম ডাক্তার কিছুতেই আর বাচ্চুর কাছে গেল না। খোকনই ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিল।

তারপর খোকন প্রকাণ্ড এক গামলা মাংসের কোর্মা এনে যখন বাচ্চুকে খেতে বলল তখন বাচ্চু মাথা নেড়ে গাঁউ গাঁউ গাঁউ ক'রে উঠল।

"আমি ও মসলা দিয়ে রান্না মাংস খাব না। ছেলেবেলায় তোমার কাছে যখন ছিলাম তখন মসলা দেওয়া মাংস খেয়ে খেয়ে আমার অর্শ হয়ে গিয়েছিল। জংগলে পালিয়ে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভালুককে ধরলাম। সে কিছু গাছগাছড়া খাইয়ে আমাকে ভালো ক'রে দিয়েছে—আর বলেছে খবরদার আর কখনও মসলা দেওয়া কোন জিনিস খেও না। আমাকে খানিকটা কাঁচা মাংস এনে দাও।"

খোকন তখন তার জন্যে রোজ একটা খাসি বন্দোবস্ত ক'রে দিল। বাচ্চু রোজ প্রায় সাত আটসের কাঁচা মাংস খেত। খোকন বাচ্চুকে খুব আরামে রেখেছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। বাচ্চুর মাথার উপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরত। খোকনের বাথরুমে প্রকাণ্ড একটা স্থান করবার চৌবাচ্চা ছিল। তাতে রোজ ঠাণ্ডা জল ভ'রে দিত চাকররা। বাচ্চু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে জল খেয়ে আসত সেখানে। থাবার ঘা যখন ভালো হয়ে গেল তখন সে চৌবাচ্চার ভিতর নেমে স্নানও করত। খোকন ছাড়া আর কেউ কিন্তু যেত না তার কাছে। খোকনের বিয়ে হয়েছিল। বাচ্চু একদিন বললে—তোর বৌকে নিয়ে আয় না আমার কাছে, একটু আলাপ করি। বউ কিন্তু ভয়ে এল না।

বাচ্চু মাসখানেক ছিল খোকনের কাছে। তার থাবা যখন বেশ সেরে গেল তখন সে একদিন খোকনকে বললে, "ভাই এবার আমি বনে ফিরে যাব।"

"বনে যাবে কেন। এখানেই থাকো। বনে তো নানা কষ্ট।"

বাচ্চু বললে—"কিন্তু বনে স্বাধীনতা আছে। বনে সত্যিই অনেক কষ্ট। অনেক দিন খাওয়া জোটে না। অনেক সময় শিকারীরা তাড়া করে। কিন্তু বনে স্বাধীনতা আছে। আমি মাঝে মাঝে তোমার খবর নেব। তুমি হরিণের মাংস ভালবাস ?"

"খুব। কিন্তু এখানে পাই না তো।"

"আমি তোমাকে মাঝে মাঝে দিয়ে যাব। এখন চললুম—"

বাচ্চু এক লাফে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় দিন পনেরো পরে খোকন একদিন রাত্রে শুনতে পেল তার বাড়ির গেটের সামনে বাচ্চু গাউ গাউ গাউ করছে। খোকন গিয়ে দেখে বাচ্চু নেই একটা মরা হরিণ পড়ে আছে।

বাচ্চু মাঝে মাঝে এমনি ভাবে লুকিয়ে হরিণ দিয়ে যেত খোকনকে।

খোকনকে অনেক হরিণ খাইয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। এক বছর কেটে গেল, বাচ্চু আর আসে না।

একদিন সকালে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এলেন। এসে বললেন—আমি খোকন-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

খোকন বেরিয়ে এল।

সন্ন্যাসী বললেন—"আপনার বন্ধু বাচ্চু আপনার স্ত্রীর জন্য এই উপহার

তিনি তাঁর ঝোলার ভিতর থেকে হাঁসের ডিমের মতো একটা মুক্তো বার করে খোকনের হাতে দিলেন।

"কি এটা ?"

"আসল গজমুক্তা।"

"বাচ্চু কোথা পেলে ?"

"জঙ্গলে এক হাতীর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছিল। বাচ্চু হাতীর মাথায় চড়ে মাথাটা ফেড়ে ফেলেছিল। তার ভিতর এই মুক্তাটা ছিল। বাচ্চু ওটা মুখে ক'রে তুলে এনে দিল আমাকে, আর বলল আপনি এটা আমার বন্ধু খোকনের বৌকে দিয়ে আসুন। সেইজন্য আমি এসেছি।"

"বাচ্চু কোথায় ?"

"দাঁতাল হাতীটা তার পেটে দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মুক্তোটা আনবার পর বেশীক্ষণ সে আর বাঁচে নি।"

"আপনার পরিচয় দিন।"

"আমিও বাচ্চুর বন্ধু একজন। বনে তপস্যা করি। একবার একটা ময়াল সাপ আমাকে জাপটে ধরে। বাচ্চু বাঁচিয়ে ছিল আমাকে। তাই ওকে বর দিয়েছিলাম—তুমি বাংলায় মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে। বাচ্চু বড় ভালো ছিল—"

"আপনি ওকে বাঁচাতে পারলেন না ?"

"ওর পরমায়ু ফুরিয়েছিল। পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে আর বাঁচানো যায় না।"

বারান্দা

প্রসন্নবাবু সেদিন প্রথমে চুপ করেছিলেন। হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সবাই থেমে গেল।

প্রসন্নবাবু বললেন—এই বারান্দারই উপর পঞ্চাশ বছর আগে ও এসে দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। পরণে লাল চেলি, মাথায় সিঁদুর, হাতে রুপোর কাজল-লতা, পায়ে রুপোর মল আর পাঁয়জোর। আমার বোনরা এক কলসী জল এনে তুলে দিয়েছিল ওর কাঁখে। হাতে ধরেছিল একটা জীবন্ত ন্যাটা মাছ। উলুধ্বনি হচ্ছিল, শাঁখ বাজছিল। আমার মা বরণ করছিলেন ওকে। ও ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

এই বারান্দাতেই ও গরীব দুঃখীদের বসিয়ে খাওয়াত। আমার বড় ভাগনা বিবলু যখন মারা গেল, তখন এই বারান্দাতে তার খাট বিছানো হয়েছিল।

এই বারান্দা দিয়েই আমার বড় মেয়ে শ্যামা নেমে চলে গিয়েছিল একদিন। কোথায় গিয়েছে আজও জানি না। এই বারান্দাতেই ও রাত্তিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত শ্যামার আশায়। শ্যামা আর ফেরেনি।

এই বারান্দাতেই দীনুর বিয়ের সময় শানাই-ওয়ালারা বসেছিল। চমৎকার পূরবী আর ইমন বাজিয়েছিল তারা। এই টম—রাস্তায় নেড়ী কুত্তোর বাচচা—এই বারান্দাতেই উঠে বসে কুঁই কুঁই করছিল। টমকে তাড়িয়ে দেয় নি ও।—মানুষ করেছিল।

বারান্দার ওপাশে হাস্নুহানা গাছটা ওই লাগিয়েছিল। বেল ফুলের গাছ লাগিয়েছিল বারান্দার নীচে। ওপাশে পুঁতেছিল বেগুন চারা, শিমগাছ।

এই বারান্দায় রোদ এসেছে কত। জ্যোৎস্নাও এসেছে। ফুলের গন্ধ নিয়ে কত হাওয়া এসেছে গেছে। ও তাদের উপভোগ করবার সময় পেত না। সংসার নিয়ে বড্ড ব্যস্ত থাকতে হত সর্বদা। কারো পান থেকে চুনটি খসতে দেয়নি।

এই বারান্দার এই দড়িতে ওর কত শাড়ি শুকিয়েছে। এই বারান্দায় বসে ও বড়ি দিয়েছে।

ছেলেদের সরস্বতী পুজোর সময় আলপনা দিয়েছে।

কত আর বলব ? স্মৃতি কি একটা ? অজস্র। নাও, এবার তোমরা ওঠাও।

বল হরি হরি বোল—

প্রসন্নবাবুর স্ত্রীর শব দেহকে নিয়ে চলে গেল পাড়ার ছেলেরা।

প্রসন্নবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

টমু কুকুরটা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

এর পর ছ'মাসও কাটল না। আর একটি শেষ শয্যা পাতা হল ওই বারান্দার উপর। প্রসন্নবাবু তার উপর শুয়ে মহাযাত্রা করলেন। তারপর ? তারপর ওই বারান্দায় কিছুদিন রাতের বেলা শুয়ে ছিল মাতাল দীনু, মুক্তকচ্ছ আলু থালু বেশে। দিনের বেলা ওই বারান্দা দিয়েই আনাগোনা করেছিল দীনুর বন্ধুরা রেসের নানা রকম টিপস নিয়ে। তারপর একদিন গিয়ে শুনলাম বাড়িটা বিক্রি হয়েছে। বারান্দাটা ভেঙে দোকান হয়েছে। একটা মুখোশের দোকান। নানা রকম মুখোশ পাওয়া যায় সেখানে।

এখন সে দোকানও নেই। বাড়িটাই নেই। ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেটা কিনে নিয়ে রাস্তা বানিয়েছে সেখানে। ওই জনাকীর্ণ রাস্তাটার অন্তরালে সেই বারান্দাটা হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যি হারিয়ে গেছে কি ? কিছু কি হারায় ?

ঘটনা সামান্য

অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা স্কুলে পড়ি। আমাদের বাড়ির কাছে আমাদের একটা আমবাগান ছিল। বেজদা ছিল সেই আমবাগানের রক্ষক। বেজদার আসল নাম ছিল ব্রজবিহারী। সেটা ক্রমশ ব্রজ তারপর 'বেজো'তে রূপান্তরিত হয়। আমরা তাকে বেজদা বলতাম। বেজদার বয়স কত ছিল জানি না। মুখে বড় বড় হলুদ রঙের দাঁত ছিল। চোখ দুটি ছিল বড় বড় এবং লাল। চোখের কোণে প্রায়ই পিঁচুটি থাকত। বলিষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিল বেজদা। বাগানে সে একটি বাঁশের লগি কাঁধে করে ঘুরে বেড়াত, লগির ডগায় থাকত একটি ঠুলি। আম পাড়বার জন্য। কোনও গাছে ডাঁশা বা পাকা আম দেখলে বেজদা পেড়ে নিত সেটি। বেজদার ভয়ে বাগানে কেউ ঢুকত না। একদিন কিন্তু এক সাহেব এসে ঢুকে পড়ল। তার কাঁধে বন্দুক। আমাদের বাগানে 'সিঁদুরে' নামে একটা আম ছিল। মনে হত আমটির সর্বাঙ্গে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। খুব টক কিন্তু। জোঁদা টক। দেখতে কিন্তু অতি সুন্দর।

সাহেব বেজদাকে এসে বলল—"ওই লাল আম পেড়ে দাও আমাকে।"

"খাবে ?"

"হ্যাঁ ?"

"ও আম খুব টক। চল তোমাকে ভালো মিষ্টি আম দিচ্ছি।"

বেজদা কয়েকটি কেলোয়া, নাকি আম নিয়ে এল। কোনটাই সিঁদুরে আমের মতো সুদৃশ্য নয়। কেলোয়া কালো, নাকি ঈষৎ হলদে রংয়ের। দুটো আমই কিন্তু খুব মিষ্টি। সাহেব লাথি মেরে আমগুলো ফেলে দিলে।

"আমি ওই লাল আম চাই।"

"ও আম দেব না। ও আম দিয়ে আচার আমসি চাটনি—এইসব তৈরি হয়। ও আম দেব না।"

"আচ্ছা তোমাকে একটা টাকা দিচ্ছি—"

পকেট থেকে একটা টাকা বার করে টং করে ফেলে দিল বেজদার সামনে।

"আম আমরা বেচি না।"

সাহেব তখন বন্দুক উঁচিয়ে বললে—"না দাও তো গুলি করব—।"

বেজদার হাতে ছিল বাঁশের লগি। সটান বসিয়ে দিলে সেটা সাহেবের মাথায়।

তার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল। বেজদা চীৎকার করে উঠল—"ওরে কে কোথায় আছিস আয়—একটা সাহেব এসে আমাকে গুলি করছে—"

আশ-পাশের মাঠ থেকে হৈ হৈ করে এসে পড়ল অনেক লোক। সাহেব বন্দুকটি তুলে নিয়ে দে দৌড়।

আমার বাবা ছিলেন ওখানকার হাসপাতালের ডাক্তার। একটু পরে দারোগা সাহেবের চিঠি নিয়ে এক কনষ্টেবল সহ সেই সাহেব এসে হাজির হল বাবার কাছে। দারোগা লিখেছেন, 'এই সাহেবকে একটি লোক মেরেছে। সাহেব এসে থানায় ডায়েরি করিয়েছে। কপাল কেটে গেছে। আপনি এ সম্বন্ধে আপনার মেডিক্যাল রিপোর্ট পাঠিয়ে দিন। বাবা ক্ষতটি পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। কনেষ্টবলের হাতে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটও দিলেন একটি।

তারপর সাহেবকে বললেন- "তুমি আমার বাগানে ঢুকেছিলে। বন্দুক তুলে আমার চাকরকে মারতে গিয়েছিলে বলেই সে তোমাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে। বেশী কিছু হয়নি। কপালের চামড়া কেটে গেছে একটু। তুমি আম খেতে ভালবাস ?"

"খুব—"

"তাহলে বস। তোমাকে আম খাওয়াচ্ছি।"

বেজদাই ভিতর থেকে আম নিয়ে এল।

অন্যান্য আমের সঙ্গে সিঁদুরে আমও নিয়ে এল একটা।

বাবা বললেন—"তুমি এই আম চেয়েছিলে। ওইটেই আগে খাও—"

সাহেব এক কামড় দিয়েই বলে উঠল—"ও গড !" তারপর মিষ্টি আমও খেল কয়েকটি।

খেয়ে খুব খুশী।

বললে —"চমৎকার মিষ্টি। কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি কি জান ?"

"কি—"

"তোমার ওই লোকটি।"

বেজদাকে জড়িয়ে ধরে চপাৎ করে চুমু খেলে তার গালে।

বহুবর্ণ

উৎসর্গ

গল্প-সাগরের সুদক্ষ নাবিক বিদগ্ধ সুরসিক
অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

নী

তার নাম ছিল মনোমোহিনী। আমি তাকে ডাকতাম 'নী' বলে। আমাদের একমাত্র সন্তান নীলা। সে এখন বিলেতে পড়াশোনা করছে। তাকে খবরটা দিতে হবে। কিন্তু পারছি না। কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি বারবার। দু'টো চিঠির কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছি। আবার আরম্ভ করি।

কল্যাণীয়াসু,

মা নীলা, আশা করি ভাল আছ তুমি। তুমি তো জানই প্রতি শিবচতুর্দশীর দিন তোমার মা উপবাস করেন। আর রাত্রে প্রহরে প্রহরে শিবমন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। তোমার মামার বাড়ির সেই পুরোনো শিবমন্দিরে তুমিও তো গেছ কয়েকবার। থানার কাছে সেই মন্দিরটা। এখন চারদিক জঙ্গলে ভরে গেছে। মন্দিরটাও ভেঙে পড়েছে। কিন্তু 'নী' ওই মন্দির ছাড়া আর কোথাও যাবে না। এবারও গিয়েছিল। চাকরটা সেদিন আসে নি। আমারও হাঁটুর ব্যথাটা বেড়েছিল সেদিন। একাই গিয়েছিল 'নী' রাতদুপুরে। মন্দিরে কেউ ছিল না। 'নী' শিবলিঙ্গের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে চোখ বুজে বসেছিল। কতক্ষণ বসেছিল জানি না। হঠাৎ চোখ খুলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল সে। সামনে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন। ধবলকান্তি জ্যোতির্ময় মহাকালের গলায় জড়িয়ে আছে বিষধর একটি গোক্ষুর ফণা বিস্তার করে। মহাদেবের নয়নে প্রসন্ন দৃষ্টি। তিনি বললেন—'তোমার পুজোয় সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। কি বর চাও, বল।'

'নী' সসঙ্কোচে বলল - 'আপনি যা দেবেন তাই নেব।'

'বেশ, তোমাকে অমরত্ব দিলাম।'

'আমি একা অমরত্ব নিয়ে কি করব ঠাকুর? উনি আর নীলা যদি—'

'ওরা তো কেউ আমার পুজো করে নি। ওদের বর দেব কি করে?'

'আমি অমরত্ব চাই না তাহলে।'

এ কি—আবার সব গোলমাল হ'য়ে গেল। আমি আবার ভেসে যাচ্ছি—।

এ কাগজটাও ছিঁড়তে হ'ল।

কিন্তু কি করে খবরটা দিই নীলাকে? তোমার মা রাতদুপুরে এঁদো পাড়াগাঁয়ের শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে সর্পাঘাতে মারা গেছে—এইটুকুই লিখে দেব?

না, তা আমি পারব না।

কোথায় যাচ্ছি

[আরম্ভ]

[মালতীর বসিবার ঘর। ঘরটি আধুনিক কায়দায় সুসজ্জিত। ঘরের দেওয়ালে একটি আয়না আছে। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মালতী নিজের দিকে চাহিয়া আছেন। মাঝে মাঝে নিজের চুল ও শাড়ি ঠিক করিয়া লইতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। দুয়ারে কড়া নড়িল। মালতী কবাট খুলিয়া দিতেই একটি যুবক হাতে একটি থলি লইয়া প্রবেশ করিল।]

যুবক। (নিম্ন কণ্ঠে) এতে দুটো বোমা আছে—লুকিয়ে রেখে দিন। আমি একটু পরেই এসে নিয়ে যাব।

মালতী। আমি তো বলেছি আমি এ সবের মধ্যে আর থাকতে চাই না।

যুবক। এই সেদিন পর্যন্ত তো আপনি আমাদের দলে ছিলেন। এখন যদি দল ছেড়ে দেন, আপনাকে সবাই সন্দেহ করবে। আপনাকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। মাঝে মাঝে আপনার কাছে বোমা রেখে যাব, আর নিয়ে যাব। নিন্, রাখুন—নিন্—

[যুবক থলিটি মালতীর হাতে দিয়া চলিয়া গেল। মালতী কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর থলিটি লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। ঝাঁটা হাতে লইয়া ঝি প্রবেশ করিল। মালতীও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল আবার। দেখা গেল থলিটি হাতে নাই।]

মালতী। ওই কোণগুলো ভাল করে পরিষ্কার কর। একটুও ময়লা যেন না থাকে। উনি ময়লা একেবারে সহ্য করতে পারেন না। 'টুর' থেকে ফিরেই যদি দেখেন—

ঝি। না, মা সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি এখুনি। ময়লা তো নেই তেমন, তবু আবার ঝেড়ে দিচ্ছি।

[ঝাড়িতে লাগিল। ভিতরের দিক হইতে চাকর রামদেওয়ের প্রবেশ। তাহার হাতে একটি কাগজের ঠোঙা।]

রামদেও। লিন্ মা। আপেল আজ চার টাকা কেজি --

মালতী। আধ কেজি এনেছ তো ? ক'টা উঠল ?

রামদেও। তিনঠো।

[ঠোঙা হইতে তিনটি আপেল বাহির করিয়া দেখাইল]

— বড়া মাংঘা।

মালতী। মীট সেফে রেখে দাও ওগুলো। এবার বাবুর বিছানাটা বেশ ভালো করে পেতে ফেলোতো গিয়ে। চাদর কোথাও যেন কুঁচকে না থাকে। বালিশের ওয়াড়গুলোও বদলে দিও। আমি বার করে রেখে এসেছি। আর ঠাকুরকে পাঠিয়ে দাও তো একবার—

[রামদেও চলিয়া গেল।]

ঝি। আপেলের কি দাম গো। আমার ছেলেটা পেটের অসুখে ভুগছে। ডাক্তার বলেছেন আপেল খাওয়াতে। কিন্তু অত দাম দিয়ে আপেল কেনবার পয়সা কোথায় !

মালতী। উনি আপেল খেতে বড্ড ভালবাসেন। রোজ দুটো আপেল খান।

ঝি। (সসঙ্কোচে) বাবুর জন্যে যখন কাটবে তখন আমাকে এক-টুকরো দেবে মা। ছেলেটার পেটের অসুখ কিছুতেই সারছে না।

মালতী। না মা, আজ পারব না। উনি এমনিতেই রোজ দুটো খান। আজ ট্রেন থেকে আসছেন আজ হয়তো তিনটে খেতে চাইবেন ···

[ঝি কিছু না বলিয়া ঘর ঝাড়িতে লাগিল। ঠাকুরের প্রবেশ।]

ঠাকুর। আমাকে ডেকেছেন মা ?

মালতী। হ্যাঁ, রান্না কি কি করবে বলে দিচ্ছি। মাংসের ষ্ট্যু কোরো। ঝোলটা যেন একটু ঘন ঘন হয়। শেষে গাওয়া ঘি দিও দু' চামচ। ফুলকপি আর আলু দিয়ে ডালনা কোরো। বেগুন ভেজো ছাঁকা তেলে, চাকা চাকা করে। স্প্যানিশ রাইস (Spanish rice) আমি প্রেসার কুকারে নিজে রাঁধব। তুমি কিমা, চিংড়ি মাছ, ডিম সিদ্ধ, পেঁয়াজ, আলু, বীট্, গাজর এগুলো আলাদা করে ঠিক করে রেখ। 'চীজ' (cheese) এনেছ তো ?

ঠাকুর। এনেছি।

মালতী। ওর টিনটা খুলে রাখ, স্প্যানিশ রাইসে লাগবে।

ঠাকুর। আচ্ছা।

মালতী। আর দেখ, ঝাল দিও না বেশী। উনি ঝাল মোটে খেতে পারেন না।

ঠাকুর। ঝাল তো আমি দিই না বাবুর তরকারিতে।

মালতী। ময়দাটা মেখে রেখেছ ? চায়ের সঙ্গে ওঁকে ফুলকো লুচি আলু ছেঁচকি করে দিও। ছেঁচকিটা একটু মাখা মাখা কোরো—

ঠাকুর। বাবুর কি পছন্দ আমি জানিনা ?

মালতী। হ্যাঁ, চাট্নি কোরো একটা। কাঁচা তেঁতুলের চাট্নি খুব ভালবাসেন। কাঁচা তেঁতুল তো ঘরে নেই। বাজারে পাবে এখন ?

ঠাকুর। পাবে। ঝিকে পাঠিয়ে দিন না।

মালতী। (ঝিকে) যাবি একবার ?

ঝি। যাব না কেন। পয়সা দাও, যাচ্ছি।

[মালতী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া পয়সা দিল। ঝি চলিয়া গেল।]

মালতী। ওই দেখ ভুলে গেছি। ঠাকুর, রামদেওকে একবার পাঠিয়ে দাও তো। বাবুর কাপড় কুচিয়ে রাখা হয়নি এখনও। পাঞ্জাবীও একটা গিলে করে রাখুক।

[ঠাকুর চলিয়া গেল। মালতী আবার আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া প্রসাধনের খুঁটিনাটিতে মন দিলেন। রামদেও প্রবেশ করিল।]

মালতী। বাবুর একখানা ধুতি কুঁচিয়ে রেখে দাও। পাঞ্জাবীও গিলে করে রাখ একটা। এই নাও চাবি। আলমারির সামনেই আছে। আজ ছুটি তো, বিকেলে হয়তো বেড়াতে বেরুবেন।

রামদেও। আচ্ছা।

মালতী। ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার ?

রামদেও। হয়েছিল। তিনি বললেন 'সনঝা' বেলা বাবুর প্রেসারের দাবাই নিয়ে আসবেন।

[বাইরে একটা ক্রন্দন ধ্বনি শোনা গেল।]

মালতী। কাঁদছে কে ?

রামদেও। আবার কে। ঝিয়ের লেড়কিটা। ওর মা যে বাজারে গেল, ওকে লিয়ে যায়নি।

মালতী। মেয়েটাকে নিয়ে কেন যে ও কাজ করতে আসে বুঝি না। মেয়েটাকে ঘরে রেখে এলেই পারে। মেয়েটাকে তুমি কোথাও সরিয়ে দাও। বাবু গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না। এখুনি তো উনি এসে পড়বেন। ক'টা বাজল ? ও বাবা, দশটা বেজে গেল। ট্রেন লেট্ আছে নাকি ! এতক্ষণ তো আসা

উচিত ছিল, গাড়ি তো সাতটার আগে পাঠিয়েছি [ঝিয়ের মেয়ের ক্রন্দন কোলাহল বাড়িল] রামদেও, তুমি বাবা মেয়েটাকে সরিয়ে দাও। পাশের বাড়ীর ঝিয়ের কাছে রেখে এস।

[রামদেও হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গীতে হাত উল্টাইল। ভাবটা—আমি এখন ওকে কোথায় নিয়ে যাব। কাঁদছে কাঁদুক না। মুখে কিন্তু সে কিছু বলিল না। বাহির হইয়া গেল।]

মালতী। জিমি জিমি জিমি—

[ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে একটি কালো স্প্যানিয়েল কুকুর প্রবেশ করিল।]

আয় দেখি তোর কানে আবার এঁটুলি ধরেছে কি না। সরে আয় এদিকে। তোকে ঘাঁটতে আমার ভালো লাগে না। তোর বাবু এখুনি আসবেন, কানে এঁটুলি দেখলে রক্ষা রাখবেন না কারো। ওমা এই যে রয়েছে এঁটুলি। দাঁড়া, দাঁড়া—

[জিমি দাঁড়াইল না। চলিয়া গেল। ঝিয়ের মেয়ের কান্না বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গে মলিন একটি ছেঁড়া জামা। হাতে একটি বিস্কুট। রামদেও এই সহজ পন্থায় তাহার কান্না থামাইয়াছিল।]

মালতী। ও কি বিস্কুট কে দিল তোকে ?

মেয়েটা। (ঈষৎ হাসিয়া) রামদেও দাদা।

মালতী। রামদেও ভালো বিস্কুটগুলো শেষ করবে দেখছি। যা বাইরে যা—

[মেয়েটা চলিয়া গেল। বাইরের দুয়ারে কড়া নড়িল আবার। মালতী কপাট খুলিয়া দিতেই পাড়ার একটি ছেলে প্রবেশ করিল।]

ছেলেটি। আপনি খবর পাননি।

মালতী। কি খবর ?

ছেলেটি। চিৎপুরে প্রবীরবাবুর গাড়িতে বোমা ফেলেছে। আগুন ধরে গেছে গাড়িতে। প্রবীরবাবুকে নাকি অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি ভাল ক'রে সব খবর নিয়ে আসছি—

[ছেলেটি ছুটিয়া চলিয়া গেল। মালতী বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ঝি আসিয়া প্রবেশ করিল।]

ঝি। খুব ভাল তেঁতুল পেয়েছি মা—আমি বাড়ী চললুম।

[ঝি চলিয়া গেল। রামদেও আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি শান্তিপুরে ভালো ধুতি।]

রামদেও। এই কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখি ?

[মালতী বিহ্বলের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুর প্রবেশ করিল।]

ঠাকুর। বাবুর জন্য ডিম আর ব্যাসন দিয়ে—

মালতী। না, না, কিছু করতে হবে না। ট্যাক্সি ডাক একটা (চীৎকার করিয়া) ট্যাক্সি ডাক, ট্যাক্সি। যাও শিগ্গির যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন !

[উভয়ে চলিয়া গেল। তাহার পর ফোনটা হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। মালতী ছুটিয়া গিয়া ফোনটা ধরিলেন।]

মালতী। হ্যালো—হ্যাঁ আমি তাঁর স্ত্রী কথা বলছি। এখনি যাচ্ছি আমি। ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়েছি। কি বললেন—মারা গেছেন? সত্যি বলছেন—হ্যালো—হ্যালো—

[রিসিভারটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। মালতী মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। যে যুবকটি বোমা দিয়া গিয়াছিল সে আসিয়া প্রবেশ করিল।]

যুবক। ওটা দিন নিয়ে যাই—ও কি অমন ক'রে ব'সে আছেন কেন—

মালতী। [মালতী ব্যাঘ্রিণীর মতো তাহার দিকে আগাইয়া গেলেন এবং দুই হাতে তাহার কাঁধ ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে বলিতে লাগিলেন] এ তোমরা কি করছ, কি করছ, কি করছ। কোথায় যাচ্ছি আমরা—কোথায় যাচ্ছি—

[কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন।]

॥ যবনিকা ॥

মাধবীর খোঁজে

কুচকুচে কালো ঈষৎ কুঁজো মলিন-বেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার ডাক্তারখানায় এসে বললেন, "নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে পাগল হয়ে গেছে; তার একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।"

যে যুবকটি তাঁর সঙ্গে ছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "আমার ব্যবস্থা করতে হবে না আপনাকে। ব্যবস্থা করতে পারবেন না আপনি। আমি আসতামও না আপনার কাছে, একটি ক্ষীণ আশা নিয়ে এসেছি—

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাত দুটি ওলটালেন হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে।

"বসুন আপনারা। কি ক্ষীণ আশা নিয়ে এসেছেন আমার কাছে বলুন।"

যুববটি বললেন, "আপনি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবেন না। যা বলব তা বিশ্বাস করবেন—"

"বসুন আপনারা। বলুন কি বলবেন, বিশ্বাসযোগ্য হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "ওর গল্প শুনুন তাহলে। আমি বাজার থেকে ঘুরে আসি। দশটা বেজে গেছে, এর পর আর শাকসব্জিও পাব না।"

বৃদ্ধ চলে গেলেন।

"বলুন এবার।"

যুবকটি বলতে লাগলেন।

"প্রথমেই আপনাকে যে গল্পটা শোনাব তা সত্যিই ঘটেছিল আমার জীবনে। লেখাপড়া শেষ করে সব বাঙালীরা যে মরীচিকার পিছনে ছোটে আমিও ছুটেছিলাম। চাকরি জোগাড় করতে হবে একটা, এই হয়েছিল আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেরা রিক্সাওলা হ'তে পারে না, ফেরিওলা হ'তে পারে না, চাষী হতে পারে না, ব্যবসা করতে পারে না। অনেক কিছুই পারে না তারা। তার কারণ ওই "অনেক কিছু" হবার ট্রেনিং তাদের দেওয়া হয়নি। আমি সাহিত্যে এম এ· পাশ করেছি। তাই কেরানী হবার জন্যে ছুটোছুটি করছিলাম। স্কুলে, কলেজে, খবরের কাগজের দপ্তরে দপ্তরে, নানারকম অফিসে খোঁজ করেছিলাম যদি কেউ দয়া করে আমাকে বহাল করেন। কেউ করেন নি। শেষকালে একজন ধনী ব্যবসাদার আমাকে বহাল করলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ক'রে। ইংরেজিতে নানারকম চিঠি লিখতে হত আমাকে। অনেক লোকের সঙ্গে দেখা কববার জন্যে মফঃস্বলেও যেতে হত। এই হল আমার গল্পের পটভূমিকা। একবার একটা মফঃস্বল শহরে গিয়ে রাত্রে কোথাও থাকবার জায়গা পেলাম না। আমার মালিক কিছুদিন আগে ওই শহরের প্রান্তে একটা পোড়ো বাড়ি সস্তায় কিনেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল ওইখানে একটা বড় বাড়ি করবেন পরে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। বাড়িটা পোড়ো হয়েই ছিল। কোথাও যখন থাকবার জায়গা পেলাম না, তখন অগত্যা ও বাড়িটাতেই গিয়ে আশ্রয় নেব ঠিক করলাম রাতের মতো। একটা লণ্ঠন কিনে তেল ভরিয়ে নিলাম তাতে। তারপর এক রিক্সাওলার সহায়তায় উপস্থিত হলাম সেখানে। শহরের একটা দোকানে খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছিলাম। বিছানা সঙ্গেই ছিল। ভাবলাম রাতটা ওখানে কাটিয়ে সকালেই ডাক বাংলোতে গিয়ে অপেক্ষা করব। যাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছিলাম তিনি ডাক বাংলোতেই আসবেন কথা ছিল। রিক্সাওলাটা আমার বিছানা করে দিলে, আলোটা জেবলে দিলে। তাকে এক টাকা বেশী দিয়ে বললাম, "তুমি কাল সকালে এসে আমাকে ডাক বাংলোয় নিয়ে যেও।" রিকশাওলা চলে গেল, শুয়ে শুয়ে একটা উপন্যাস পড়তে শুরু করলাম। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ না পড়লে আমার ঘুম আসে না। উপন্যাসটা আমার বিছানাতেই ছিল। বাংলা উপন্যাস। উপন্যাসের নায়িকার নাম মাধবী। নায়ক একাধিক। এগারো জন। এরা প্রত্যেকেই মাধবীর প্রেমে প'ড়েছে এবং প্রত্যেকেই মাধবীকে ভোগ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মাধবী মেয়েটি আশ্চর্য মেয়ে। সে সবাইকে প্রলুব্ধ করছে, কিন্তু কারো কাছে ধরা দিচ্ছে না। কিন্তু গল্প লেখক শেষ পর্যন্ত ওকে মেরে ফেলেছেন। একটা কামুক ওকে হঠাৎ জাপটে ধরেছিল। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে খোলা ছাত থেকে নীচে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় মাধবীর। গল্প লেখক মাধবীকে অপরূপ রূপসী করেন নি, কিন্তু লিখেছেন সে ঘরে ঢুকলেই ঘরটি একটি মিষ্টি গন্ধে ভরে উঠত আর তাকে দেখলেই মনে হত মাধুরী যেন মূর্তিমতী হয়েছে। বইটা পড়া শেষ করে আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ঘুম কিন্তু এলো না। এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম বিছানায় শুয়ে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল জানি না, তবে একটা কথা সুনিশ্চিত ভাবে জানি, আমি ঘুমুই নি। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে ঘরটা ভরে উঠল। তার পর ঠুং করে একটা শব্দ হল। চুড়ির শব্দ। তারপর কাপড়ের খস্‌খস্‌ আওয়াজ। উঠে বসলাম বিছানায়। দেখলাম আমার বিছানা থেকে দূরে একটি মেয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম—"কে, কে তুমি?"

"আমি মাধবী!"

"মাধবী!"

"হ্যাঁ, যার কথা এতক্ষণ ধরে আপিন পড়লেন।"

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। সত্যিই আনন্দময়ী মূর্তি।

মাধবীই আবার বলল—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে লেখক যা যা লিখেছেন তা মিথ্যে। লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, আমার কাছে তিনি প্রণয় নিবেদনও করেছিলেন, কিন্তু আমাকে পান নি। তাই আমাকে কেন্দ্র করে ওই মিথ্যে গল্পটা লিখেছেন। নিজেকেই প্রকাশ করেছেন তিনি ওই গল্পে। আমাকে চিনতে পারেন নি তিনি। আমি অবশ্য মারা গেছি, কিন্তু ছাত থেকে পড়ে নয়, যক্ষ্মায়, অনাহারে! কিন্তু আমি বেঁচে আছি তবু। আমাকে যদি খোঁজেন পাবেন এখনও। আর একটা কথা। আপনি যাঁর চাকরি করছেন তাঁর পরিচয় কি জানেন আপনি? তিনি একজন কালোবাজারী। আপনার মতো ছেলে ওই কালোবাজারীর দাসত্ব করছে এটা ভাবতে খারাপ লাগে খুব···"

মাধবী মৃদু হাসল। তারপর মিলিয়ে গেল।

পাখী ডেকে উঠল চারদিকে, বুঝলাম ভোর হচ্ছে। চুপ করলেন যুবকটি।

"তারপর?"

"মাধবী ঠিকই বলেছিল আমার মনিব কালোবাজারী। আমি সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।"

"এখন কি করছেন?"

"কিছুই না। এখন মাধবীকে খুঁজছি। সে বলেছিল, "আমি বেচে আছি তবু তাকেই খুঁজছি। তার নাগাল পেতেই হবে। আমার গল্পটা বিশ্বাস করলেন? আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে করেন নি। আমি চললুম—"

উঠে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই এলেন তাঁর বাবা বাজার নিয়ে।

"দীপেন কোথায় গেল?"

"উঠে চলে গেল—"

"ওর কথা শুনলেন?"

"শুনলাম তো। যা বললো তা তো অদ্ভুত।"

"ওকে পাগল বলে মনে হয়?"

"না ঠিক পাগল বলে মনে হল না। অথচ—" চুপ করে গেলাম।

বছর পাঁচেক পরে একদিন দেওঘর থেকে ফিরছি। অনেক রাত তখন। রাস্তায় লোকজন বেউ নেই। আমি ড্রাইভ করছিলাম গাড়ি। হঠাৎ জোরে ব্রেক কষতে হল। দেখি রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা লোক চলেছে। গায়ে একটা ময়লা আলখাল্লা। মাথার চুল বড় বড়, মুখময় গোঁফ দাড়ি। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

আমার গাড়ি থামতেই সে আমার কাছে এগিয়ে এল। তারপর জিগ্যেস করলে—"মাধবী কোথায় থাকে বলতে পারেন?"

দীপেনকে চিনতে পারলাম।

টুনি ও ভি. আই. পি-রা

সেদিন সকাল থেকে ব্যস্ত ছিলাম খুব। অনেক ভি. আই. পি. এসেছিলেন বাড়িতে। নানারকম আলোচনা হল। কি কি কারণে যে দেশের শাসনব্যবস্থা ঠিকমত চলছে না, বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় কি, এত খরচ করে গঙ্গার উপর আর একটা সেতু নির্মাণ করা সমীচীন হচ্ছে কি না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ কোনখানে, যে বাংলাদেশের অধিকাংশ দোকান, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজিতে, যেখানে অধিকাংশ লোকই ইংরিজি বুকনি না দিয়ে বাংলা বলতে পারে না, সেখানে বাংলা ভাষায় সব হোক্ এ জিগির তোলার মানে হয় কি? এই ধরনের নানা গম্ভীর আলোচনা হল আমার বাড়িতে। সবাই চা খাবার ইত্যাদিও খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করে গেলেন। বেলা দশটা পর্যন্ত নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না সেদিন। আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা মোটরে মোটরে ভরে গিয়েছিল।

দশটার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করে খুললাম সেদিনের বাংলা দৈনিক একখানা। সেখানেও দেখি আগাগোড়া খালি দেশের খবর। কোথায় কি কি প্রকল্প হচ্ছে, কাকে কাকে নিয়ে কি কি কমিটি এবং সাবকমিটি বসছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সরকার, গরীবি হঠাবার জন্য, বেকারী দূর করবার জন্য কোথায় কি কি আয়োজন হচ্ছে—এসব খবরের ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য আমাদের দেশের শাসনকর্তাদের অন্যান্য খবরও আছে। কার কুকুরের ঠাণ্ডা লেগেছে, কার বাগানে ফুল ফুটেছে, কার ব্লাডপ্রেসার ওঠা-নামা করছে। কার গলায় কে মালা দিচ্ছে—এসব খবরের সঙ্গে কাগজওলার পেটোয়া লোকদেরও খবর বা ছবি আছে মাঝে মাঝে, কিন্তু এ সবও তো দেশের খবর। দেশের খবরেই ভর্তি কাগজটি। আমরা যে ক্রমাগত দেশের কথা ভাবছি, দেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি এই গর্বে মনটা ভরে উঠেছিল। এমন সময় রাস্তা থেকে মিষ্টি ডাক এল একটি।

"দাদু—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি টুনি দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ময়লা একটা ফ্রক। পিঠের দিকটা ছেঁড়া। ওর মা ঝি-গিরি করে। কিছুদিন আমার বাড়িতে কাজ করেছিল। সেই থেকে আমাকে দাদু বলে ডাকে। প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে যায়। কখনও আস্তে চলে না মেয়েটা। রাস্তা থেকে গোবর কুড়োয়। কোন কোন দিন দেখি একটি ডালা মাথায় চলেছে মায়ের সঙ্গে। কখনও বা হাতে র‍্যাশনের থলি। সর্বদা কিন্তু হাসিমুখ, আর সর্বদা চঞ্চল। কুচকুচে কালো রং, ঘাড় পর্যন্ত চুল, চোখ দুটি হাসিতে ঝলমল করছে সর্বদা। মাঝে মাঝে আমার বাড়ির সামনে এসে ডাকে—দাদু! আমার গিন্নী মাঝে মাঝে তাকে খাবার দেন একটু-আধটু।

দেখলাম টুনি প্রত্যাশা-ভরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যাশা আমি বোধহয় কিছু খাবার দেব।

বললাম—দাঁড়া, একটু খাবার নিয়ে যা। ভিতরে যেতেই গিন্নী বললেন—খাবার কোথা? তোমার ভি. আই. পি-রা তো সব খেয়ে গেছেন। একটা বিস্কুট পর্যন্ত নেই। বেরিয়ে টুনিকে বললাম—তুই বিকেলে আসিস। কেমন?

টুনি নাচতে নাচতে চলে গেল।

বিকেলে আর সে এল না।

ঘটনাটা তুচ্ছ। কিন্তু একে কেন্দ্র করেই বিরাট একটা সত্য যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার মনে।

সমীর ফ্লাওয়ার ও পিসিমা

পিসিমা—পিসিমা—

পরিধানে চোং-প্যান্ট ও হাফ-শার্ট, চোখে গগলস্, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চার মাইল হেঁটে ভদ্রলোক একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভিতর থেকে সাড়া না পেয়ে একটু হতাশও হয়ে পড়লেন। এটা কি তাহলে তাঁর পিসিমার বাড়ি নয়? বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার এসেছিলেন। তাঁর পিসেমশাই নকুল ভট্টাচায্যি অনেকদিন আগে মারা গেছেন, কিন্তু পিসিমার মৃত্যু-সংবাদ তো পাননি তিনি।

পাশের বাড়ি থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন তাকে।

"খোকা, এইটেই কি নকুলবাবুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"বাড়িতে কেউ নেই নাকি—"

"ঠানদি তো আছেন।"

"সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কারো—"

"তাহলে উনি বোধহয় পুজো করছেন। আচ্ছা দেখছি—আপনি কে—"

"আমি ওঁর ভাইপো। কলকাতা থেকে এসেছি।"

"ও আচ্ছা—"

খিড়কি দুয়ার দিয়ে ঢুকে পড়ল ছেলেটি। একটু পরেই সদর দরজাটাও খুলে গেল।

"আসুন বসুন, ঠানদি পুজো করছেন। আসুন বসুন—"

ঘরে চেয়ার ছিল না। মোড়া ছিল দুটো। টাইট চোং-প্যান্ট পরে নীচু মোড়ায় বসা একটু অসুবিধা-জনক। কিন্তু চেয়ার যখন নেই, তখন বসতেই হয়। সমীরের ওই একটা মস্ত গুণ। যে-কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

একটু পরেই পিসিমা এলেন। এসে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। চিনতে পারেন নি তিনি সমীরকে। প্রায় বিশ বছর আগে যখন তাকে দেখেছিলেন তখন সে পাঁচ বছরের শিশু।

"অবাক হয়ে দেখছ কি পিসিমা? আমি সমীর—"

"সমীর? ভাল নাম বুঝি? আমি নোটনকে চিনতাম। সেই কবে দেখেছি—"

"হ্যাঁ, আমারই ডাক-নাম ছিল নোটন।"

"একটু খবর দিয়ে এলি না কেন বাবা। দুটো ভালো-মন্দ রেঁধে রাখতুম তোর

জন্যে। আমি তো একা থাকি, ভাতে-ভাত খাই ; এবেলা তাই খা, ওবেলা ছিরু জেলের বাড়ি থেকে মাছ আনাব। আয়, ভেতরে আয়—"

সমীর দত্ত সোৎসাহে ভিতরে চলে গেলেন। পিসিমা মনে মনে একটু দুঃখিত হলেন সমীর তাঁকে প্রণাম করল না দেখে। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখলেন। ভাবলেন আজকালকার ছেলেদের এই রকমই ধরণ-ধারণ হয়েছে।

"পিসিমা চান করব আগে—"

"পাশেই তো পুকুর। ডুব দিয়ে আয় না একটা—"

"ওরে বাবা, পানা-পুকুরের ঠাণ্ডা জলে চান করতে পারব না। তুমি আমাকে একটু গরম জল করে দাও—"

স্নান করবার পর দুটি নারকেল নাড়ুও দিলেন। নারকেল নাড়ু খাবার পর পিসিমার সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেললেন সমীর দত্ত। কুসংস্কার মুক্ত সভ্য জীব তিনি।

পিসিমা নিজের জন্যে যা রেঁধে রেখেছিলেন তাই ধরে দিলেন ভাইপোকে। আর রান্নার হাঙ্গামা করলেন না। দুটো কলা আর একটু দুধ খেয়েই কাটিয়ে দিলেন তিনি সেদিন। সমীর বিছানা-পত্র আনেন নি। কিন্তু পিসিমার ঘরে বাড়তি বিছানা ছিল। পাশের ঘরে খাটের উপর বিছানা করে দিলেন তাঁর জন্য। বিছানায় শোবার আগে ব্যাগ থেকে কয়েকটা দেশী-বিদেশী মাসিকপত্র বার করে ফেললেন সমীরবাবু। তারপর সেগুলো পড়তে লাগলেন মন দিয়ে শুয়ে শুয়ে। পিসিমা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া শেখেন নি। কিন্তু মাসিক পত্রের ছবিগুলো দেখে তাঁর কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল।

॥ ২ ॥

সমীর দত্ত ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন নিজেকে পিসিমার-বাড়িতে। পিসিমাকে বললেন—আমি গ্রাম-বাংলাকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছি। গ্রাম-বাংলায় এখনও অনেক জিনিস অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সেগুলো প্রকাশ করব আমি। তারপর ওপার বাংলায় যাব। সেখানকার অজানা ঐশ্বর্যও আবিষ্কার করব আমি। সভা করব, সংগঠন করব—কাগজে কাগজে লিখব—ছবি ছাপাব—

পিসিমা অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু তিনি আরও অবাক হয়ে গেলেন যখন তিনি দেখলেন নোটনের গ্রাম বাংলা আবিষ্কারের তেমন তো গা নেই। সে খায় দায় আর ঘুমোয় খুব। প্রশ্ন করে করে তিনিই তার সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেললেন। সে নাকি হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পরীক্ষকদের পার্শিয়ালিটির জন্যে পাশ করতে পারে নি। সে নাকি কোথাও চাকরিও পাচ্ছে না ওই একচোখোমির জন্য। তাই সে ঠিক করেছে—গ্রাম-বাংলাকে পুনরাবিষ্কার করে তাক্ লাগিয়ে দেবে জগৎকে।

"দাঁড়াও না পিসিমা, কাগজে কাগজে যখন আমার প্রবন্ধ আর ছবি বেরুবে তখন—"

পিসিমা হেসে বললেন—"কিন্তু তুই তো খালি খাচ্ছিস আর ঘুমুচ্ছিস। গ্রামটাকে ভাল করে দেখ।"

"কাল বেরুব।"

॥ ৩ ॥

পরদিন দুপুরে সমীর দত্ত একটা ফুলসুদ্ধ ঝাঁকড়া গাছ বগলে করে বাড়ি ঢুকলেন।

"পিসিমা—পিসিমা—একটা ওয়াণ্ডারফুল আবিষ্কার করেছি। এ ফুল কলকাতার বাজারে দেখিনি কখনও। সেখানে খালি গোলাপ, পদ্ম, রজনীগন্ধা, জুই, বেলির ভীড়, চাঁপা, আর করবীও দেখেছি, জবাও দেখেছি, কিন্তু এ ফুল কখনও দেখিনি। এই অজ্ঞাত অচেনা ফুলকে আমি বিখ্যাত করব। এর ফটো তুলেছি আমি—"

পিসিমা বললেন—"ও তো ঘেঁটুফুল"।

"সেকি! আমি ঠিক করেছি এর নাম দেব সমীর ফ্লাওয়ার।"

পিসিমা হেসে বললেন—"তা দাও। কিন্তু ও ঘেঁটুফুল, সবাই ওর নাম জানে।"

"বল কি!"

পিসিমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"এ গাঁয়ের ধনী মহাজন বিলাস মিত্তিরের ভালো মেয়ে আছে একটি। সুন্দরী মেয়ে। তোকে দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে। তবে বড়লোকের একমাত্র মেয়ে তো, শ্বশুরবাড়ি যাবে না। তোকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে। তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে সম্বন্ধ করি। ওদের জামাই হয়ে এ গাঁয়ে থাকলে গ্রাম-বাংলাকে তুই আরও ভালো করে জানতে পারবি। সম্বন্ধ করব?"

সমীর দত্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"এক্ষুনি।"

যা হয়েছিল

"মিসেস মিত্র আজও কিন্তু আপনার লেট হয়েছে। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে—" মিসেস মিত্র অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন একটু। তারপর তাঁর সুমিষ্ট হাসিটি হেসে বললেন—"আমি এর জন্যে খুবই দুঃখিত মিষ্টার লাহিড়ী। কিন্তু আমার শাশুড়ির অসুখ হয়েছে ক'দিন থেকে। ডাক্তারবাবু দেরি করে আসেন। তাই আমার দেরি হয়ে যায়—"

মিষ্টার লাহিড়ী আই. এ. এস. কড়া অফিসার। মুখটা ঈষৎ সুচলো করে বললেন—"ও তাই বুঝি। শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু তবু আমাকে বলতে হচ্ছে, এ রকম দেরি করা তো চলবে না। ঠিক সময়ে আপিসে না এলে আপিসের কাজ চলবে কি করে। অনেক ফাইল জমে গেল—"

"বাকি কাজগুলো শেষ করে দেব আজ।"

"বেশ। বাই দি বাই, আপনাকে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় কেন? বাড়িতে আর কেউ নেই?"

"না। আমার স্বামী তো শিলিগুড়িতে বদলি হয়ে গেছেন। বাড়িতে আমি আর একটি ঝি আছে। মায়ের টাইফয়েড হয়েছে ডাক্তারবাবু বলছেন।"

"এ অবস্থায় আপনাদের তো একজন নার্স বাহাল করা উচিত।"

"নার্স বাহাল করবার ক্ষমতা আমাদের নেই স্যার। রোজ পঁচিশ টাকা করে লাগবে। এমনিতেই তো ডাক্তারবাবুর ফি আর ওষুধ বিষুধে রোজ পনেরো টাকা করে খরচ হচ্ছে—"

"হাসপাতালে ভর্তি করে দিন তাহলে।"

"হাসপাতালে জায়গা পাওয়া শক্ত। তাছাড়া মা হাসপাতালে যেতেও চান না।"

"আই সি। আচ্ছা যান, এরিয়র ফাইলগুলো ক্লিয়ার করে ফেলুন।"

মিসেস মিত্র নিজের টেবিলে গিয়ে বসতেই মনোরঞ্জন এসে হাজির হলেন। মনোরঞ্জন মিসেস মিত্রের সহপাঠী ছিলেন। এক সঙ্গেই এম. এ. পাশ করেছেন দুজনে। আর একটা কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনোরঞ্জন মিসেস মিত্রের প্রণয়ীও। ছাত্র জীবন থেকেই এই রোমান্সের জ্বরে তিনি ভুগছেন। এখনও আরোগ্য হন নি। সুদর্শন বলিষ্ঠ মনোরঞ্জনের চাকরি করার প্রয়োজন ছিল না। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র তিনি। কিন্তু তিনি যে-ই শুনলেন মিসেস মিত্র এই আপিসে চাকরি নিয়েছেন অমনি তিনিও জোগাড় যন্ত্র করে ঢুকে পড়েছেন আপিসে। সামান্য বেতনে সামান্য কেরাণীর কাজ করেন। একশ টাকা মাইনের একটা কেরাণীর পদে একজন ফার্ষ্টক্লাস ইংলিশের এম এ-কে পাবেন এ আশা কর্তৃপক্ষ করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে বাহাল করেছিলেন।

মনোরঞ্জন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন ছাত্রজীবনেই। মনোরঞ্জন সব শর্তই পূরণ করেছিলেন একটি কেবল পারেন নি। বেনের ছেলে কায়স্থ হতে পারেন নি।

গোঁড়া পরিবারের মেয়ে মিসেস সুশীলা মিত্র। সত্যিই সুশীলা। তিনি বাবা মায়ের অবাধ্য হতে চান নি। বাবা মায়ের নির্দেশ মেনে নিয়েই মিস ঘোষ মিসেস মিত্র হয়েছিলেন। বেশি দিন আগে নয়, মাত্র ছ'মাস আগে। বিয়ে করবার আগেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন তিনি। বিয়ে করার পরও চাকরি করছেন। স্বামী বলদেব মিত্র বলেছিলেন চাকরি ছেড়ে দিতে। চাকরি ছাড়েন নি সুশীলা মিত্র। তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর স্বামীর রোজগারে সংসার চালানো যাবে না। আড়াইশ টাকায় এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব। চাকরি ছাড়েন নি তিনি। বলদেব কিন্তু খুঁত খুঁত করছিলেন। এর মধ্যে হঠাৎ বদলি হয়ে গেলেন তিনি। সুশীলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলেন না বলে আরও বিরক্ত হলেন মনে মনে। মা বললেন, আমি বৌমার কাছেই থাকব। নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না। কিন্তু কদিন থেকে জ্বরে পড়েছেন তিনি। সুশীলার মনে হচ্ছে বটে যে এখন আপিসে না গিয়ে তাঁর কাছে থাকাই উচিত কিন্তু আপিসের ছুটি নেই। দেরি হলেও 'বস্' বকছেন।

কিন্তু সুশীলা সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছেন মনোরঞ্জনকে নিয়ে। মনোরঞ্জন যদি খারাপ লোক হত তাহলে অনায়াসে তাড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সুশীলা জানেন মনোরঞ্জন সাত রাজার ধন এক মাণিক। যদিও তিনি মাণিকটাকে আঁচলে বাঁধতে পারেন নি, কিন্তু মাণিকটা সঙ্গ ছাড়ে নি তাঁর। বারবার বলছে তুমি আমাকে আঁচলে বাঁধ আর নাই বাঁধ আমি তোমার সঙ্গে চিরকাল থাকব। ঠিক এই ভাষায় বলে নি, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে তাই মনে হয়।

সেদিন মনোরঞ্জন বললেন—"আমরা দুজনে মিলে আজ এরিয়ার ফাইলগুলো ঠিক করে ফেলব। আজই হয়ে যাবে সব। ও জন্যে চিন্তা নেই। আমি বলছি কি তুমি তোমার শাশুড়ির দেখাশোনা করবার জন্যে একটা ভালো নার্স বাহাল করে ফেল। টাকার জন্যে ভেবো না।"

"ভাবতেই হবে। টাকা নেই বলেই নার্স রাখতে পারি নি।"

"টাকা আমি দেব—"

"তোমার টাকা আমি নেব কেন?"

"বিয়ে হলে তো নিতে। বিয়ে হয় নি বলেই কি আমি তোমার পর হয়ে গেলাম? বিশ্বাস করতে পারছ না যে আমি তোমার সত্যিই আত্মীয়?"

সুশীলা লজ্জিত হলেন একটু। ঘাড় হেঁট করে লজ্জাটা গোপন করবার চেষ্টা করলেন।

তারপর বললেন—"এর একটা অন্যদিকও আছে। তোমার টাকা যদি নিই তাহলে উনি কি মনে করবেন?"

"এতে মনে করবার কি আছে? বন্ধুর বিপদে বন্ধু সাহায্য করে না?"

সুশীলা তার সুমিষ্ট হাসিটি হেসে বললে, "বন্ধুটি যদি তোমার মতো রূপবান একটি যুবক হন তাহলে লোকে অন্যরকম অর্থ করবে বই কি।"

মনোরঞ্জনের মধ্যে একটি অত্যন্ত জিদি গোঁয়ার লোক প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকত। এই ব্যক্তিত্বটিই অতীতে তাকে অনেক রকম দুঃসাধ্য কাজ করিয়েছে। তিনি পদ্মা নদী সাঁতরে পেরিয়েছেন, ভরপেট খাওয়ার পরে এক পরাত পায়েস খেয়েছেন। সেই ব্যক্তিত্বটি সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

তিনি বললেন—"আমি তোমাকে সাহায্য করবই।"

"পারবে না। আমি কিছুতেই নেব না তোমার টাকা।"

"নিতেই হবে।"

সেদিন আপিস থেকে ফিরতে একটু রাত হল। ফিরে যা দেখলেন, তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তে হল তাঁকে।

মা জ্বরের ঘোরে বিছানা থেকে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে আছেন তারপর থেকে। পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে বললেন, "কংকাশন হয়েছে।"

মারা গেলেন তিনি পরদিন।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর বলদেব সুশীলাকে বললেন—"আমার মা যখন অসুখে ছটফট করছিলেন তখন তুমি আপিসে কলম পিষছিলে। যাক—যা হবার তাতো হয়ে গেছে। এইবার তোমাকে একটি সাফ কথা আমি বলে দিতে চাই, হয় তুমি চাকরি ছাড়, না হয় আমাকে ছাড়। দু নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না—"

এরপর কি হয়েছিল?

এর পর হতে পারত

(১ সুশীলা বললেন—আমি চাকরি ছাড়ব না, তোমাকেই ছেড়ে যাচ্ছি—

(২) সুশীলা চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অতি কষ্টে সংসার চলতে লাগল তাঁদের। এমন সময় অত্যন্ত নাটকীয় ঘটনা ঘটল একটা। রেজেস্ট্রি ডাকে একটি চিঠি এল। সুশীলা খুলে দেখলেন—একটা উইল। মনোরঞ্জন তাঁর আড়াই লাখ টাকা

আয়ের সম্পত্তি সুশীলাকে দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সুশীলা কিন্তু নিলেন না তাঁর টাকা। সে টাকা দিয়ে করে দিলেন মনোরঞ্জন বিদ্যালয়।

(৩) সুশীলা চাকরি ছাড়লেন না। কিছুদিন পরে তাঁর স্বামী বলদেবের মনে হল ভাগ্যে ছাড়েনি। কারণ রাস্তায় 'বাস' অ্যাকসিডেণ্টে তার দুটো হাতই জখম হয়ে গেল। দুটো হাতই কেটে ফেলে দিলেন ডাক্তাররা।

এসব কিন্তু কিছুই হয় নি।

যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। চাকরি করা নিয়ে সুশীলা আর বলদেবের প্রায়ই তুমুল তর্ক হত। সুশীলা কিন্তু চাকরি ছাড়েন নি তৎসত্ত্বেও। স্বামীকেও ছাড়েন নি। মনোরঞ্জন ছাড়েন নি সুশীলাকে। প্লেটনিক প্রণয়ের উদাহরণ হয়ে ঘুর ঘুর করতেন তিনি সুশীলার চারপাশে। এই বেতালা ত্রিপদী কবিতাই মূর্ত হচ্ছিল তাঁদের ঘিরে। নাটকীয় কিছু হয় নি।

ফলিত জ্যোতিষ

শত্রুঘ্ন মল্লিক তাঁহার নিজের পরিচিত মহলে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। যে মহল তাঁহার পরিচিত সে মহলে অর্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা। সেই দেবতা যাহার ব্যাংকে স্তূপীকৃত মহিমায় বিরাজমান তিনিও সেই মহলে পরম পূজনীয়। শত্রুঘ্ন মল্লিক এইরূপ একটি ব্যক্তি। ব্যাংকে অনেক টাকা। কেহ বলে কোটি, কেহ বলে অর্বুদ। কলিকাতায় তো বটেই, ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরেও তাঁহার একাধিক অট্টালিকা। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানারকম ব্যবসা। ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরা বলেন কুমীর, ভক্তরা বলেন কুবের। শত্রু আছে বই কি। কয়টা লোক অজাতশত্রু? অনেক শত্রু আছে শত্রুঘ্ন মল্লিকের। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কায়দা করিতে পারে নাই। তিনিই সকলকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। শত্রুঘ্ন নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন তিনি। অর্থের মুষল প্রহারে সব শত্রুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনেক অবাধ্য লোককে তিনি বাধ্য ভৃত্যে রূপান্তরিত করিয়াছেন, অনেক ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্মচারীকে তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট চাটুকারে পরিণত করিয়াছেন. অনেক সতীর সতীত্ব ক্রয় করিয়াছেন, অনেক চরিত্রবান যুবক তাঁহার অর্থের লোভে চরিত্রহীন গুণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অর্থের তাড়নায় অনেকেই উঠ-বোস করিয়াছে। একটি জিনিস কিন্তু কিছুতেই উঠিতেছে না—গোফ-দাঁড়ি। শত্রুঘ্ন মল্লিক মাকুন্দ। প্রভাতে কাহারও সহিত দেখা হইয়া গেলে সে মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করে। বাজারে একটা গুজবও নাকি রটিয়া গিয়াছে তিনি ক্লীব। তিনি বিবাহ করেন নাই। ভ্রষ্টা এবং পতিতা স্ত্রীলোকদের লইয়াই বরাবর রিরংসা চরিতার্থ করিয়াছেন তিনি। বংশরক্ষার্থে যখন বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, তখন তিনি গুজবটা শুনিলেন এবং আবিষ্কার করিলেন তাঁহার পালটি ঘরের অধিকাংশ কন্যার পিতারা তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছুক। কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্যের প্রলোভনকেও সম্বরণ করিতেছেন তাঁহারা। একজন অতি গরীব আত্মীয়ও সেদিন তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া গেলেন। তিনি অসবর্ণ

বিবাহ করিলে হয়তো পাত্রী পাইতেন, কিন্তু মল্লিক মহাশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভিন্ন জাতের মেয়ের গর্ভে তাঁহার বংশধর জন্মগ্রহণ করিবে ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। প্রেম করিয়া বিবাহ করিতেও তাঁহার আপত্তি, তাহাছাড়া ঠিক তাঁহার পালটি ঘরের মেয়ে তাঁহার প্রেমে পড়িবে এ রকম যোগাযোগ হওয়াও কঠিন। তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক সে সম্প্রদায় ততটা আলোকপ্রাপ্ত নয়। মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরের বাহির হয় না।

যদি হইতও শত্রুঘ্ন মল্লিক তাহাদের পছন্দ করিতেন না। তাহার ধারণা ওই জাতীয় মেয়েরাও 'বাজারে' মেয়ে। বাজারে মেয়ে তাঁহার ধর্মপত্নী হইবে, ভবিষ্যৎ সন্তানের জননী হইবে ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব তাঁহার পক্ষে। সুতরাং প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনোমত পাত্রী পাইতেছিলেন না। যে গুজবটি তাঁহার নামে রটিয়াছিল সে গুজবটির টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইতেছিল তাঁহার। কিন্তু গুজবের টুঁটির নাগাল পাওয়া শক্ত। গুণ্ডা লাগাইয়া গুজবকে হত্যা করা যায় না। সুতরাং ফাপরে পড়িয়াছিলেন মল্লিক মহাশয়। তাঁহার বন্ধু টোটনবাবু একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি মাকুন্দ বলেই যত গোল হচ্ছে। ওই জন্যেই গুজবটা আরো জোর পাচ্ছে। তুমি গোঁফ-দাড়ি উঠিয়ে ফেল, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাল ভাল ডাক্তার দেখাও।" অনেক বড় বড় ডাক্তারকে কল দিলেন শত্রুঘ্ন মল্লিক, হু-হু করিয়া অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। মুখে অনেক ঔষধ মাখিতে হইল। ইন্‌জেকশনও লইলেন অনেকগুলি। কিন্তু হায় কোনই ফল হইল না। যেমন মাকুন্দ ছিলেন, তেমন মাকুন্দই রহিয়া গেলেন। তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তেমন উন্নতি হয় নাই, আজকাল হইলে হয়তো কোনও ফল ফলিত।

সহসা আর একটা এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটিল যে মল্লিক মহাশয়ের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা গোঁফ-দাড়িতে আর নিবদ্ধ থাকিতে পারিল না। অন্য এক কেন্দ্রে গিয়া ঘনীভূত হইল। যে চোরা-কারবারের পথে তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থাগম হয় সেই চোরা-কারবারের কথাটা নাকি সরকারের নিকট ফাঁস করিয়া দিবে বলিয়া জনৈক ফকির দাঁ শাসাইয়াছে। টোটনবাবু টাকা দিয়া ফকির দাঁর মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়াছেন। ফকির বলিয়াছে—মল্লিক আমার সহিত গোপনে দেখা করুক। তাহার পর যাহা হয় করিব। টোটনবাবুর পরামর্শে শত্রুঘ্ন মল্লিক একজন বড় জ্যোতিষীর নিকট গেলেন। জ্যোতিষী মহাশয় স্বল্পবাক লোক, কিন্তু তাঁহার নাম-ডাক খুব। হাত দেখাইতে নগদ একশত টাকা দিতে হয়। বলেন—ফলিত জ্যোতিষ অঙ্কের মতো মিলে যায়। কিন্তু অঙ্কটা ঠিক কষতে জানা চাই।

শত্রুঘ্ন মল্লিকের সব কথা তিনি শুনিলেন। মন দিয়া দুইটি হাতই অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন। কপালের রেখা এবং পায়ের তলার রেখাগুলিও পর্যবেক্ষণ করিলেন নানা ভাবে। বড় লেন্স সহযোগে। তাহার পর বলিলেন—"বিবাহ করুন। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

"আমি তো বিবাহ করতে প্রস্তুত। কিন্তু গোঁফ দাড়ি নেই বলে বিয়ে হচ্ছে না।"

"গোঁফ দাড়িও পাবেন।"

"মানে?"

জ্যোতিষী মহাশয় স্বল্পবাক লোক। বলিলেন—"আর কিছু বলব না, যা বলছি তাই করে দেখুন।"

ফকির দাঁর নিকট গিয়া অবাক হইয়া গেলেন শত্রুঘ্ন মল্লিক। হাতে চাঁদ পাইলেও বোধহয় এতটা অবাক হইতেন না।

ফকির দাঁ বলিলেন—"আপনি আমার পালটি ঘর। আমার মেয়েটিকে আপনি বিবাহ করুন। তা যদি করেন তাহলে আপনার ব্যবসার সম্বন্ধে যে সব খবর জানি তা কারো কাছে প্রকাশ করব না। নিজের জামাইকে জেল খাটাবার প্রবৃত্তি কারই বা হয় বলুন। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে—"

"কি শর্ত বলুন—"

"বিয়ের আগে আমার মেয়েকে আপনারা কেউ দেখতে পাবেন না। আমার মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি আছে। সেই জন্যেই বিয়ে হয় নি এতদিন। আর কুষ্টি ফুষ্টিও চাইতে পাবেন না। পণ-স্বরূপ টাকা-কড়িও কিছু দেব না। কারণ দরিদ্র লোক আমি—"

শত্রুঘ্ন মল্লিকের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল যদিও, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে হইল যে ঘোর প্যাঁচে পড়িয়াছেন তিনি। এখন রাজি হওয়াই কর্তব্য।

রাজি হইয়া গেলেন।

বিবাহের আসরেই শুভ দৃষ্টির সময় কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বধূর গোঁফ দাড়ি দুই-ই আছে।

ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

লাল ছাতা সবুজ হল

দ্বিতলের একটা ঘরে নবীন থাকেন। নামে নবীন হলেও বয়স প্রবীণ। দুঃখী মানুষ। রোগ আছে নানারকম। সেই রোগগুলিই তাঁর সঙ্গী। কোনদিন হাঁটুটা ফুলে উঠল, সেইটে নিয়েই রইলেন দিন কয়েক। কোন দিন বা আমবাত বেরুল সারাগায়ে। তাই নিয়েই গেল কয়েকটা দিন। তারপর হয়ত বদ হজম। মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়, কাশি—অনেক-রকম রোগ আছে নবীন সামন্তর। রোগ থাকলেই ওষুধ খেতে হয়। নিজের চিকিৎসা নিজেই করতেন। একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স, আর খান কয়েক হোমিওপ্যাথির বই ছিল তাঁর। এরই জোরে তিনি নিজের চিকিৎসা তো করতেনই, রামধনেরও করতেন। রামধন তাঁর ভৃত্য, সচিব, বন্ধু, রাঁধুনি, হিসাব-রক্ষক—সব। তাঁর নিজের তিন কুলে কেউ নেই। নবীনের আর একটি কাজ ছিল কোষ্ঠী গণনা করা। অনেক পুরানো পাঁজি এবং ফলিত জ্যোতিষের কয়েকটি বই ছিল তাঁর। তিনি যখন নিজের রোগ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তখন কোষ্ঠী নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এই ভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন তৃতীয় আর একটা মাথা-ঘামাবার ব্যাপার জুটল। নবীন যে ঘরে বসতেন সে ঘরের জানলা দিয়ে দূরে একটা রাস্তা দেখা যেত। হঠাৎ একদিন নবীনের নজরে পড়ল সেই রাস্তা দিয়ে একটি রঙীন কাপড় পরা মেয়ে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। দেখা মাত্রই নবীনের মনে পড়ে গেল ফুলকিকে। তাঁর বারো বছরের নাতনী ফুলকিকে বহুকাল আগে তিনি লাল ছাতা

কিনে দিয়েছিলেন একটা। কি গর্ব ভরে সে রঙীন শাড়ী পরে লাল ছাতাটি মাথায় দিয়ে বেরুত। ফুল্কি অনেক দিন আগে মারা গেছে। হঠাৎ যেন সে ফিরে এল আজ। কে ওই লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি ? আগে তো কখনও দেখেন নি। তারপর দিন আবার দেখলেন। তারপর দিন আবার। ঘড়ি দেখলেন, চারটে বেজেছে। তারপর দিন ঠিক চারটের সময় জানলার ধারে বসলেন। দেখতে পেলেন লাল ছাতা। এর পর থেকে এও তাঁর দৈনন্দিন কাজ হল একটা। কোন কোন দিন লাল ছাতা দেখা যেত না। তখন চিন্তা হত খুব। কি হল ফুল্কির ? ওকে ফুল্কিই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। সে যে মরে গিয়েছে এ সত্যটা অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছিলেন। লাল ছাতাটা দূর থেকে দেখলেই ভাবতেন ওই ফুল্কি যাচ্ছে। বাতে পঙ্গু তাই হাঁটতে পারতেন না। পারলে হয়তো গিয়ে আলাপ করতেন ওর সঙ্গে। ভাগ্যে করেন নি। কাছে গেলে দেখতেন ও একটা পঞ্চাশোর্দ্ধ বুড়ি রঙীন শাড়ী আর পেট কাটা ব্লাউজ পরে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। যেতে পারেন নি বলে ও ফুল্কিই রয়ে গেল নবীনবাবুর কাছে। আর এর পর একটা ওষুধ খেয়ে বাতের ব্যথাটাও বেশ কমে গেল তাঁর। দেখলেন বেশ হাঁটতে পারছেন। হোমিওপ্যাথিক ওষুধে এরকম চমকপ্রদ ফল মাঝে মাঝে হয়। নবীনবাবু ঠিক করলেন কাল গিয়ে ফুল্কির সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু পরদিন আর লাল ছাতা দেখা গেল না। উপর্যুপরি সাতদিন কেটে গেল, নবীন আগ্রহে জানলার ধারে বসে থাকতেন, লাল ছাতা আর দেখা যায় না। কোথায় গেল ফুল্কি ? নবীন একদিন বেরিয়ে পড়লেন। তখন বেলা চারটে। রাস্তাটায় গিয়ে পেঁাছে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন। দু একজন পথিককে দেখতে পেলেন অবশ্য, কিন্তু মনে হল না এরা কেউ তাঁর ফুল্কির খবর দিতে পারবে। অনেক দূরে দেখলেন একটি বাড়ির বারান্দায় একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছেই গেলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

"আচ্ছা এ পাড়ায় একটি মেয়ে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে রোজ যেত। সে কোথায় থাকে—"

"ও, মিসেস সিন্হার কথা বলছেন ? তাঁরা তো বদলি হ'য়ে চলে গেছেন এখান থেকে।"

"ও তাই নাকি—"

এরপর কি বলবেন ভেবে পেলেন না নবীন। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন।

হঠাৎ মেয়েটি মুচকি হেসে বললে—"আমারও একটা লাল ছাতা আছে।"

"তাই না কি—"

একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। নবীন নমস্কার করলেন তাঁকে। নিবারণবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল নবীনের। প্রথম দিনের সে আলাপ গাঢ়তর হল ক্রমশ। তারপর নিবারণবাবু যখন জানতে পারলেন নবীনবাবু হাত দেখেন, কোষ্ঠী বিচার করেন, তখন বললেন, আচ্ছা, আমি ফনতিকে নিয়ে যাব আপনার বাসায়। ওর হাতটা আর কুষ্ঠীটা দেখে দেবেন তো—।

"ওর নাম ফনতি না কি ! আমি ওকে ফুল্কি বলে ডাকবো। ফুল্কি নামে আমার এক নাতনি ছিলো।"

"বেশ তো, বেশ তো।"

ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

একদিন নবীন বললেন—"কই তুমি তোমার লালছাতা মাথায় দিয়ে একদিনও বেড়াও না তো।"

"আমার এক মাসী আমার জন্মদিনে ওই লাল ছাতাটা উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু লাল রঙ আমার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু মাসীকে কি সে কথা বলা যায়? তাছাড়া তিনি পঞ্জাব থেকে কিনে এনেছেন, ফেরাবেনই বা কি করে?"

"কি রং পছন্দ তোমার?"

"সবুজ।"

"বেশ, আমি একটা সবুজ ছাতা কিনে দেব তোমায়।"

"দেবেন? সত্যি দেবেন?"

ফনতির মুখে চোখে হাসি ঝলমল করতে লাগল।

কয়েকদিন পর দেখা গেল ফনতি চমৎকার একটি সবুজ ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে আর নবীন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছেন সেদিকে। ওই সবুজ ছত্র-ধারিণীর নাম যদিও ফনতি কিন্তু তিনি দেখছিলেন ফুলকিকে।

তোপ

প্রথম দৃশ্য ॥ রাজপথ ॥

[কথা বলতে বলতে যদু ও নবীনের প্রবেশ]

যদু। ওহে ললিতবাবু এই দিকেই আসছেন। হেঁটে আসছেন, আশ্চর্য।

নবীন। উনি যে রোজ সকাল বেলা হাঁটেন। ডায়াবেটিস হয়েছে। ডাক্তাররা হাঁটতে বলেছে।

যদু। এইখানেই তাহলে বলা যাক।

[ললিতবাবুর প্রবেশ]

যদু। (নমস্কার করে) আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম, সার।

ললিত। কেন?

যদু। সিমেণ্টের পারমিটটা যদি দেন আমাদের দয়া করে।

ললিত। [নবীনকে দেখিয়ে] ইনি কে?

যদু। ইনি আমার পার্টনার।

নবীন। আপনার প্রণামী আমি দেব। বেশী পারব না, হাজার দশেক যোগাড় করেছি।

ললিত। এসব কথা কি রাস্তায় হয়? আপিসে আসবেন।

যদু। তাই যাব।

নবীন। প্রণামীটা এখানেই দিয়ে দেব?

ললিত। আমার একান্ত সচিব বিজয়কে চেনেন? তার সঙ্গেই এ বিষয়ে আলাপ করুন।

[ললিতবাবু চলে গেলেন।]

নবীন। তার মানে বিজয়কেও কিছু খাওয়াতে হবে।

যদু। খাওয়াব। চার না ফেললে কি রুই কাতলা ধরা যায় ?

[নবীন ও যদু চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা পাগলাটে গোছের ছেলে প্রবেশ করে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়াল]

নবীন। ফটিক যে, কি খবর ?

ফটিক। খবর শোনেন নি আপনারা ?

যদু। কি খবর ?

ফটিক। তোপ আসছে। মস্ত তোপ।

নবীন। একটু হেসে ইস্ক্রুপ এখনও ঢিলে আছে দেখছি। চল হে চল, বিজয়বাবুর বাড়ি বেশ দূরে আছে।

[নবীন ও যদু চলে গেলেন। ফটিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

ফটিক। কি আশ্চর্য, এরা শোনে নি ? আমি কিন্তু তোপের গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করে আসছে—মস্ত তোপ। (দূরের দিকে চেয়ে) ও বাবা, এরা আবার কারা ! একটু আড়ালে যাই।

রাস্তার ধারে একটা থামের পিছনে গিয়ে লুকোল। স্খলিদণ্ডলা একটি তন্বীর পিছু পিছু একটি যুবকের প্রবেশ।]

তন্বী। (ভঙ্গী করে) কী যে বিরক্ত কর তুমি।

যুবক। তোমাকে দেখলে আর নিজেকে সামলাতে পারি না। তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেব।

তন্বী। আগেই তো তোমাকে বলেছি বিয়ে করতে পারব না। তুমি জান, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। বিশাল সম্পত্তির মালিক তিনি। তাঁর অমতে তোমাকে বিয়ে করলে তিনি আমাকে দূর করে দেবেন। আমি আমাদের এয়ার-কণ্ডিশনড্ তেতলা বাড়ি ছেড়ে তোমার সঙ্গে ফ্লাটে গিয়ে বাস করতে পারব না।

যুবক। কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি।

তন্বী। বাস, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দূর থেকে বাস। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।

যুবক। কিন্তু আমার সন্তান যে তোমার গর্ভে—

তন্বী। আজকাল তো আইন পাশ হয়ে গেছে। ভালো ডাক্তার দিয়ে সে সন্তানকে গর্ভ থেকে বার করে দেব। ও নিয়ে আমার মোটেই চিন্তা নেই।

যুবক। তুমি কি পাষাণ ?

[এর উত্তরে মেয়েটি হো-হো-হো করে হেসে উঠল। অদ্ভুত সে হাসি .

তন্বী। না, আমি পাষাণ নই। আমি একালের এ কালের এ কালের—

[চলে গেল। যুবকও অনুসরণ করল তার। ফটিক থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল]

ফটিক। তোপ কিন্তু আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি—ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড়—প্রকাণ্ড তোপ।

[কি যেন শুনতে শুনতে চলে গেল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পিছু পিছু চারটি চোং-প্যাণ্ট-পরা ছোকরার প্রবেশ। প্রত্যেকেই সিগারেট ফুঁকছে।]

১ম ছোকরা। ও মশাই, শুনুন।

প্রৌঢ়। আমাকে বলছেন?

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই আপনাকে। কিছু ছাড়ুন দিকি।

প্রৌঢ়। ছাড়ব? কি ছাড়ব?

৩য়। পকেটে পয়সা কড়ি যা আছে দিয়ে দিন।

৪র্থ। আমরা একটা স্বদেশ-সেবক ক্লাব করেছি, তাতেই চাঁদা-স্বরূপ দিন আপনি। আমরা রসিদ দেব আপনাকে।

প্রৌঢ়। (সবিস্ময়ে, বিহ্বলভাবে) স্বদেশ সেবক ক্লাব! চাঁদা! আমি গরীব ছাপোষা গেরস্ত লোক নুন আনতে আমার পানতো ফুরিয়ে যায়। আমার স্বদেশ আমার বউ আর ছেলেমেয়ে, তাদেরই সেবা করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়েছি। আপনাদের চাঁদা দেব কি করে?

১ম। সোজা আঙুলে ঘি না বেরুলে আমরা আঙুল বেঁকাবো।

২য়। (প্রৌঢ়ের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে) ন্যাকা সেজে কোন লাভ হবে না।

[প্রৌঢ় অসহায়ভাবে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগলেন, যদি কোন পুলিশ-টুলিশ দেখতে পান]

৩য়। পুলিশ খুঁজছেন? আমরা যে দিকে যাই পুলিশ সেদিকে থাকে না।

৪র্থ। দিন দিন আর ঝামেলা করবেন না।

১ম। আরে কেড়ে নে না—

[সকলে প্রৌঢ়কে জাপটে ধরল। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে নিয়ে সরে পড়ল]

প্রৌঢ়। হায় ভগবান, এ কোন দেশে বাস করছি। দিন দুপুরে রাহাজানি করছে এরা—ওরে বাবা, একি। না, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়—

[চলে গেলেন। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলের পিছনে পিছনে আর একটি ছোকরা ছুটতে ছুটতে এল। তার হাতে ছোরা। সে পিছন থেকে ছেলেটির পিঠে ছোরা বসিয়ে দিতেই ছেলেটি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিনটি ছেলে ছুটে এল। তাদের হাতে পাইপ গান। পাইপ গান দিয়ে শেষ করে দিল তারা ছেলেটিকে। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। প্রৌঢ় আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন।]

প্রৌঢ়। কি কাণ্ড, ভাগ্যে আড়ালে সরে গেসলাম। এখন পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালানো যাক। ব্যাগে পাঁচ সিকে ছিল সেইটের উপর দিয়ে ফাঁড়াটা কেটে গেল—বাপ্স্!

[ফটিকের প্রবেশ]

ফটিক। আপনি ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?

প্রৌঢ়। আওয়াজ! কিসের আওয়াজ?

ফটিক। গাড়ির চাকার। যে গাড়িতে চড়ে তোপ আসছে—তার আওয়াজ! পাচ্ছেন না?

প্রৌঢ়। না!

ফটিক। আকাশে কান পেতে শুনুন।

[প্রৌঢ় অনুমান করলেন ফটিক তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন—'যতো সব'। তারপর হন হন করে চলে গেলেন, 'মা' 'মা' বলে কাঁদতে কাঁদতে পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলের প্রবেশ]

ফটিক। কি হ'ল ? কাঁদছ কেন ?

ছেলেটি। আমার মা কোথায় চলে গেছে।

ফটিক। তোমার বাবা কোথায় ?

ছেলেটি। বাবা নেই।

ফটিক। বাবা কোথায় গেল ?

ছেলেটি। কি জানি।

[সুধাংশুর প্রবেশ]

সুধাংশু। এই যে এখানে পালিয়ে এসেছে দেখছি। খোকা পালিয়ে এলে কেন ? চল আমাদের বাড়ি—

ছেলেটি। না, যাব না। আমি মাকে খুঁজে বার করব।

ফটিক। [সুধাংশুকে] আপনি চেনেন না কি একে ?

সুধাংশু। আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে মশাই।

ফটিক। এর মা বাবা কোথায় ?

সুধাংশু। [নিম্নকণ্ঠে] কি জানি কোন পার্টিতে ওরা যোগ দিয়েছিল। প্রথমে মিস্টার রায় নিখোঁজ হলেন, তারপর কাল থেকে মিসেস রায়েরও আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরাই ছেলেটাকে এনে রেখেছিলাম আমাদের কাছে। কিন্তু যে রকম কাঁদুনে ছেলে ওকে বাড়িতে রাখা মুশকিল। একে আমার স্ত্রীর হিস্টিরিয়া—

ফটিক। ও আমার কাছেই থাক।

সুধাংশু। (সাগ্রহে) আপনি ভার নিলেন তাহলে ?

ফটিক। (হেসে) কে কার ভার নেয় মশাই। ভগবানই কিছু একটা হিল্লে করে দেবেন। থাক আমার কাছে—

সুধাংশু। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আচ্ছা চলি তাহলে। নমস্কার।

[চলে গেলেন]

ফটিক। (ছেলেটিকে) চল আমার সঙ্গে—

ছেলেটি। কোথায় ?

ফটিক। তোমার মাকে খুঁজে বার করব।

[ছেলেটি সাগ্রহে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

ফটিক। খাবে কিছু ? ক্ষিধে পেয়েছে ? কখন খেয়েছ ?

ছেলেটি। (কুণ্ঠিতভাবে) আজ খাইনি।

ফটিক। কিছু খাও নি ? সে কি (দূরের দিকে চেয়ে) এই ফেরিওলা এদিকে এস—

[খাবারের পসরা মাথায় নিয়ে একজন ফেরিওলার প্রবেশ]

কি খাবার আছে তোমার কাছে—

ফেরিওলা। সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙাড়া, নিমকি—

ফটিক। কি খাবে তুমি খোকা ? সিঙাড়া খাবে ?

(ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল)

খোকাকে চারটে সিঙাড়া দাও।

(ছেলেটি সিঙাড়া খেতে লাগল)

ফটিক। দাম কত ?

ফেরিওলা। ছ আনা।

ফটিক। বল কি ! এত দাম কেন ?

ফেরিওলা। দাম আরও বাড়বে বাবু। কিছুদিন পরে—টাকায় একটা করে সিঙাড়া বেচব। আলু, ময়দা, ঘি, দালদা, মসলা—কোনটা শস্তা বলুন। শালা কালোবাজারীরা সব জায়গায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাজারে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ নেবাবার চেষ্টা করছে না।

[ফটিক ফেরিওলাকে পয়সা দিল]

ফটিক। এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফেরিওলা। কে ঠিক করবে ?

ফটিক। (ওপরের দিকে আঙুল তুলে) ওপরওলা। তোপ আসছে—

ফেরিওলা। [সবিস্ময়ে] তোপ ! তোপ মানে ?

ফটিক। [হেসে] সে তুমি বুঝবে না।

ফেরিওলা। বুঝব না কেন। বুঝিয়ে বললেই বুঝব।

ফটিক। ইতিহাস পড়েছ ?

ফেরিওলা। না।

ফটিক। পড়লে বুঝতে পারতে। তোপের চাকার ঘড় ঘড়ও শুনতে পেতে তাহলে। [ছেলেটিকে] চল খোকা তোমাকে ওই বাড়িটাতে বসিয়ে রেখে আসি। কেমন ? একটু পরে তোমাকে নিয়ে তোমার মাকে খুঁজতে বেরুব।

[ছেলেটিকে নিয়ে ফটিক চলে গেল, ফেরিওলাও চলে যাচ্ছিল, এমন সময় চার-পাঁচটি ছোকরার প্রবেশ। মস্তান গোছের চেহারা।]

১ম ছোকরা। এই ফেরিওলা, কি আছে দেখি—

ফেরিওলা। খাবার আছে।

২য় ছোকরা। নাবা না—

[ফেরিওলা খাবারের পসরাটা নাবাতেই সবাই টপ টপ করে তার খাবার খেতে লাগল]

ফেরিওলা। আরে, কি করছেন আপনারা !

২য় ছোকরা। [দাঁত বার করে] খাচ্ছি—

ফেরিওলা। খাচ্ছেন, মানে— ?

৪র্থ ছোকরা। ভোজন করছি—

[হো হো করে উঠল সবাই]

ফেরিওলা। দাম দিয়ে কিনে তারপর খান—

৪র্থ ছোকরা। দাম দিতাম কিন্তু আমাদের ট্যাঁক গড়ের মাঠ। একদম ফাঁকা। শহীদ মীনার টিনারও নেই। স্রেফ ফাঁকা—

[আবার হেসে উঠল সবাই]

ফেরিওলা। [তার হাত চেপে ধরে] দাম দিয়ে তবে যান।

[৪র্থ ছোকরা হাত ছাড়িয়ে নিলে]

৩র্থ ছোকরা। দাম সরকারের কাছে চাও গিয়ে, যে সরকার আমাদের এতগুলো লোককে বেকার করেছে—

ফেরিওলা। [উচ্চকণ্ঠে] কে কোথায় আছেন আমাকে রক্ষা করুন। এরা আমার সব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচান আমাকে—

[রাস্তার দু-পাশের বাড়ির একটি বন্ধদ্বারও খুলল না। ছোকরারা খাওয়া শেষ করে চলে যাচ্ছে, এমন সময় ফটিকের প্রবেশ]

ফটিক। কি হ'ল ?

ফেরিওলা। এরা আমার খাবার জোর করে কেড়ে খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দাম দেয়নি এক পয়সা।

[ফটিক ৪র্থ ছোকরার হাতটা চেপে ধরল]

ফটিক। দাম দিয়ে তবে যান।

[৪র্থ যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করল ফটিকের গালে। ফটিক মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চলে গেল ছোকরার দল। ফেরিওলা এগিয়ে এসে দেখল]

ফেরিওলা। একি ! অজ্ঞান হ'য়ে গেছে দেখছি। ইস নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে। ব্যাপার ঘোরালো হয়ে পড়ল দেখছি। না, এখানে থাকা ঠিক নয়। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। সরে পড়ি।

[ফেরিওলা তার জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ল। তর্ক করতে করতে দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলছি আমি পঞ্চাশটা ভোট যোগাড় করব।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তুমি বাজে কথা বলছ। লাহিড়ী তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। লাহিড়ী ভিতরে ভিতরে ব্যাক করছে সিংঘিকে। তোমাকে ভাঁওতা দিচ্ছে।

প্রথম ভদ্রলোক। সিংঘি গদিতে বসলে ওর লাভ ? ও তো ঝাড়া হাত-পা ব্যাচিলার।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওর লাভ সিংঘি গদিতে বসলে নিকুঞ্জ চাকরি পাবে।

প্রথম ভদ্রলোক। নিকুঞ্জ আবার কে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওর রক্ষিতার ছেলে।

[এবার তাঁরা অজ্ঞান ফটিককে দেখতে পেলেন]

এ আবার কে পড়ে আছে এখানে ? মাতাল না কি ?

প্রথম ভদ্রলোক। নাকে মুখে রক্ত দেখছি। খুনটুন করে গেছে বোধ হয়। উঃ যা দিন-কাল পড়ল। চল চল এখানে দাঁড়ান ঠিক নয়—

[দুজনেই হন হন করে চলে গেলেন। কথা বলতে বলতে আরও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

প্রথম ভদ্রলোক। বলেন কি !

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যা বলছি তা ঠিক। আমার চেয়ে অনেক জুনিয়ারকে আমার ওপর ঠেলে তুলে দিয়েছে। হাতে মাথা কাটছে ওরা। একটা দরখাস্ত করেছিলাম, সেটাও একটা কেরাণী চেপে দিয়েছে ; আপিসে হাঁটাহাঁটি করে করে জুতো

ক্ষইয়ে ফেললাম, কিন্তু তাকে ধরতে পারছি না। একটি কেরাণী ঠিক সময়ে আপিসে যায় না। ফাইলের স্তূপ জমে গেছে, কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রথম ভদ্রলোক। কি করবেন তাহলে—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। কি আর করব। মুখ থুবড়ে ওইখানেই পড়ে থাকব, অন্য উপায় তো আর নেই। পাঁচটি মেয়ে, চারটি ছেলে, দুটি ভাইপো ঘাড়ে। তাছাড়া বিধবা বোন আর পিসি—আরে মশাই এ কে—

[দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে ফটিককে দেখতে লাগলেন]

প্রথম ভদ্রলোক। কে আবার রাজনীতির বলি—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। হায় ভগবান, আমরা কোথায় চলেছি—

প্রথম ভদ্রলোক। আপাতত আপনার বাসায় চলুন।

[দুজনেই চলে গেলেন। ফটিকের জ্ঞান ফিরেছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল]

ফটিক। কই, তোপ তো এখনও এলো না [আকাশের দিকে মুখ তুলে] ইতিহাসের কথা, পুরাণের ভবিষ্যৎবাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবে তাহলে? পাপের রাজত্বই চলতে থাকবে। এর প্রতিকার হবে না, প্রতিবাদ হবে না—

[একটি কুলি জাতীয় লোকের প্রবেশ। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা আঠা-লাগানো পোস্টার। সেটা সে একটা বাড়ির দেওয়ালে লাগিয়ে দিল। পোস্টারে লেখা আছে—(বড় অক্ষরে) লাস্যময়ী অনঙ্গমোহিনীর অদ্ভুত নৃত্য। মড়া উঠে বসবে। পাথরও জীবন্ত হয়ে লাফাবে। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। জীবন্ত খাজুরাহো, মাত্র সাত দিনের জন্য। গুহা থিয়েটারে অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে। পোস্টার লাগিয়ে কুলি চলে গেল। ফটিক নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল সে দিকে।]

ফটিক। আমি কিন্তু ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সত্যি শুনতে পাচ্ছি—আমার কল্পনা নয়। মতিভ্রম নয়।

[শ্রোতাদের দিকে চেয়ে] আপনারা বিশ্বাস করুন আমার কথা। আসছে, তোপ আসছে। ঠিক সময়ে সে আসবে—

[কাঁদতে কাঁদতে সেই ছেলেটি আবার এল]

ফটিক। ওখান থেকে চলে এলে কেন?

ছেলেটি। মায়ের কাছে যাব। আমার মা কোথা—

ফটিক। মা আসবে। আচ্ছা এখানেই ব'সো—

[স্নেহভরে ছেলেটিকে পাশে বসাল]

তোমার নাম কি খোকা?

ছেলেটা। নিতু।

ফটিক। বাঃ চমৎকার নাম!

[রাস্তার পাশের একটা বাড়ির ভিতর থেকে চীৎকার কলহ শোনা গেল। হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে বলে উঠল—"এর সঙ্গে না থাকতে পার, বেরিয়ে যাও।" হঠাৎ বাইরের দিকের কপাটটা খুলে গেল। একটি বলিষ্ঠ লোক ধাক্কা মেরে একটি মেয়েকে ফেলে দিল রাস্তায়। বলিষ্ঠ লোকটির পিছনে

আর একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল। মুখে মুচকি হাসি। যে মেয়েটি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে উঠে দাঁড়াল। দেখা গেল তার বেণী এলিয়ে পড়েছে। এলায়িতকুন্তলা মহিলা দৃপ্ত ভঙ্গীতে চেয়ে রইল বলিষ্ঠ লোকটার দিকে]

মহিলা। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমাকে দূর করে দিয়ে তুমি ঐ নটীটাকে নিয়ে থাকবে ?

বলিষ্ঠ লোকটা। থাকব। আমার খুশি মতো আমি যাকে ইচ্ছে নিয়ে থাকব।

মহিলা। তোমার ভয় নেই ?

বলিষ্ঠ লোকটা। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। কাউকে ভয় করি না।

মহিলা। [কম্পিতকণ্ঠে] কিন্তু মনে রেখো, ধর্ম আছেন, ভগবান আছেন।

বলিষ্ঠ লোকটা। তাদেরও টাকা দিয়ে বশ করব হা-হা-হা-হা-হা। টাকায় সবাই বশ হয়।

[ঠিক এই সময় চতুর্দিক সচকিত করে তোপের আওয়াজ হল। ক্রমাগত তোপ পড়তে লাগল]

ফটিক। তোপ এসেছে—তোপ এসেছে—তোপ এসেছে—

[উত্তেজিত হয়ে ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেল। ছেলেটি তারস্বরে কাঁদতে লাগল। ক্রমাগত তোপের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। তারপর নানা কণ্ঠের আর্তনাদ আর চীৎকার। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সূচীভেদী অন্ধকারে প্রথম দৃশ্য শেষ হল]

পট-পরিবর্তন

[একটি রূপসী রমণী সেই ছেলেটিকে কোলে করে বসে আছেন। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি।]

ছেলেটি। তুমি কে ?

রমণী। এখন আমি তোমার মা।

ছেলেটি। এখন আমার মা ? আগে কি ছিলে ?

রমণী। আমি তোপ হয়ে এসে পাপকে ধ্বংস করেছি। এখন আমিই আবার মা হয়ে তোমাকে পালন করব। আবার নূতন সৃষ্টি হবে নূতন যুগের—

ছেলেটি। আমার মা কোথায় গেল ?

রমণী। তিনি আমার মধ্যেই আছেন। এস—

[স্নেহভরে তাকে চুম্বন করলেন]

যবনিকা

অসাধারণ খবর

কোথাও চাকরি পাচ্ছিল না সহদেব। তার এম. এ. ডিগ্রি, তার সাহিত্যজ্ঞান, তার কল্পনাশক্তি কোনই কাজে লাগছিল না এতদিন। অনেক ভালো ভালো কবিতা গল্প লিখে কাগজে পাঠিয়েছে, ছাপা হয়নি। হঠাৎ তার কপাল ফিরে গেল। তার বন্ধু অমিতের বাবা একটা কাগজ বার করলেন। তাকে বললেন—তুমি আমার কাগজের সংবাদ-দাতা হও। খবর জোগাড় করে নিয়ে এস ছাপব। আপাতত মাসে একশ' টাকা করে মাইনে দেব। আর সে খবর যদি জবর খবর হয় তাহলে তার জন্যে দশ টাকা বেশী পাবে।

সহদেব জিগেস করেছিল—"খবর মানে কি।"

"যা ঘটে তাই খবর।"

"আর জবর খবর ?"

"যা সচরাচর ঘটে না আর যা পড়লে লোকে উত্তেজিত হয়।"

সহদেব রোজই সাধারণ খবর সরবরাহ করত। কোথার ট্রেন কলিশন হয়েছে, কোথায় নৌকা ডুবেছে, কোথায় বাস পুড়ল, কোথায় ছিনতাই হল, কোথায় ক'টা বোমা ফুটেছে, কোথায় পুলিশ গুলি চালিয়েছে কিন্তু একটি লোকও হতাহত হয়নি—এই সব খবর।

কিন্তু অসাধারণ খবর সে একটাও জোগাড় করতে পারে নি। মানুষের পেটে কুকুরের ছানা, কিম্বা পাঁচ-পা-ওলা সাপ এ ধরনের ব্যাপার তো ঘটে না সাধারণত।

একদিন কিন্তু ঘটল।

সেদিন রাত্রে রিপোর্ট লিখতে লিখতে তার মনে হল যা অসাধারণ তাই সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছে এখন। খুনের সংবাদ শুনে রক্ত গরম হয় না আজকাল, ভয়ে আঁতকেও উঠে না। যথারীতি খাই-দাই-ঘুমুই। স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, চতুর্দিকে স্ট্রাইক আর 'বনধ'। এ সব অসাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এ সবও গা সওয়া হয়ে গেছে, বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে কিন্তু এটাও তো দিব্যি সহ্য করছি আমরা, এতেও আর চমক নেই।

খবরগুলো লিখে সে ঘড়ি দেখল রাত বারোটা বেজে গেছে। এখন ওগুলো আর অপিসে দিয়ে আসার সময় নেই। ফোনও পায়নি এখনও। কাল সকালে গিয়ে দিয়ে আসবে।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

আলোটা নিবিয়ে দেবার পর তার জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকুল। জ্যোৎস্না ঢোকে তার জানালা দিয়ে। আজ কিন্তু অদ্ভুত মনে হল আলোটা। মনে হল এটা যেন আলো না, এ যেন আরও কিছু। দোতলায় একটি ঘরে থাকে সে। একতলায় লোক নেই। ঘরগুলো বন্ধ। দোতলায় তার ঘরের সামনে ছোট একটি ছাদ। একাই থাকে সে বাড়িতে। একজন কমবাইন্ড হ্যান্ড নিয়ে তার একার সংসার। চাকরটা রাত্রে বাড়ি চলে যায়।

জানালা দিয়ে যে জ্যোৎস্না ঢুকল তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। মেঘ-চাপা জ্যোৎস্না। কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা শুধু যেন জ্যোৎস্না নয়, যেন আরও কিছুর

একটা দ্যুতি প্রতিফলিত হচ্ছে। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল আজ যে অমাবস্যা। সকালে যখন সে আপিসে গিয়েছিল তখন শুনেছিল অমিতের বাবা আজ আপিসে আসবেন না, তিনি প্রতি অমাবস্যায় উপবাস করেন।

তাহলে কিসের আলো এ ?

তার পরই হঠাৎ একটা শব্দ হতে লাগল। যেন উপর থেকে কে নামছে। উপর থেকে। এ বাড়িতে তো তেতলা নেই। একতলার সিঁড়িতে তো সে খিল দিয়ে এসেছে। সে সিঁড়ি দিয়ে উঠলে এমন শব্দ হবে না তো। শব্দ। তাছাড়া অদ্ভুত শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত।

তাড়াতাড়ি ছাদের কপাট খুলে বাইরে গিয়ে নির্বাক নিশ্চল হয়ে গেল সে। বিরাট একটা সিঁড়ি আকাশ থেকে তার ছাদের উপরে নেমেছে। জ্যোতির্ময় স্ফটিকের সিঁড়ি।

সেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে একটি মেয়ে আর তার কোলে একটি শিশু।

বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সহদেব।

মেয়েটি নেমে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

"আপনি সাংবাদিক ?"

"হ্যাঁ—"

"তাহলে একটি খবর কাগজে দেবো, নেবেন ?"

"কি খবর ?"

"এই ছেলেটির মা আরও প্রায় পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে একটি পাট-ক্ষেতে লুকিয়েছিল পাক-সেনাদের ভয়ে। সেই রাক্ষসগুলো ক্ষেতের আশে পাশে ঘুরছিল। মায়ের কোলে এই ছেলেটি ছিল। হঠাৎ এ কেঁদে উঠল। সকলের ভয় হল কান্না শুনে পাক সেনারা ক্ষেতে ঢুকে পড়বে। মেরে ফেলবে তাদের সকলকে। তাই ওর মা ওর গলা টিপে মেরে ফেলল ওকে। এখন ওর মা ছেলের শোকে কাঁদছে। আপনি খবরটা ছেপে দিন ছেলে ওর মরে নি। আমার কাছে আছে। খুব যত্ন করে রেখেছি আমি ওকে—।"

"কে আপনি ?"

"আমি রোশেনারা। চলি তবে। খবরটা ছাপিয়ে দেবেন দয়া করে—"মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। আকাশে মিলিয়ে গেল।

সিঁড়িও মিলিয়ে গেল একটু পরে।

সহদেবের মনে হল,—এই তো অসাধারণ খবর। কিন্তু এ খবর কি ছাপা যাবে।

বুদ্ধি

পাক সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়ে গ্রামের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করছে এ খবর যখন এসে পেঁছিল, তখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। গ্রামের সবাই যে যেদিকে সুবিধা পেল সরে পড়ল। গ্রামের চেয়ে প্রাণের প্রতি মায়া তাদের বেশী। যেমন করে হোক প্রাণটা বাঁচাতে হবে। একলা পড়ে গেল শেষকালে সে। কি করবে ? সে-ও পালিয়ে যাবে ? গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে না। বাইরের জগতের সঙ্গে তার

পরিচয়ও নেই। কোথায় যাবে ? গ্রামের বাইরে সে যায় নি কখনও। মাঝে মাঝে তুলসীহাটা গ্রামে গিয়েছে বাজার করতে। তুলসীহাটার হাট থেকেই বুধি গাইটি কিনে এনেছিল। বুধি পোয়াতি হয়েছে, এইবার তার বাচ্ছা হবে কয়েক দিন পরে। বুধি গাই আর বিঘে দুই জমি ছাড়া আর তার কিছু নেই। বউ অনেক দিন আগে মরেছে। একটা মেয়ে হয়েছিল, সে-ও বাঁচে নি। তার সংসারে বুধি ছাড়া আর কেউ নেই। বুধি আসন্ন-প্রসবা। তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কোথায় যাবে সে। কিন্তু একদিন যেতেই হল। তুলসীহাটারই একজন লোক এসে বললে—আমরা সব পালাচ্ছি। তুমিও পালাও। পাক সেনারা এসে প্রথমেই তোমার গরুটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবে। ওরা যেখানেই যাচ্ছে, গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, মুর্গি, হাঁস সব সাফ করে দিচ্ছে। তারপর তোমাকে গুলি করবে। আর দেরি করো না, পালাও। বুধিকে কেটে খেয়ে ফেলবে ? সে কি ! একথা যে ভাবাও যায় না।

দুদিন ক্রমাগত হেঁটে অবশেষে একটা নদীর তীরে উপস্থিত হল সে। খরস্রোতা নদী। যে পথ দিয়ে সবাই আসছিল সে পথ দিয়ে আসেনি সে। সে মাঝামাঝি সোজা এসেছে। লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে এসেছে। তার সর্বদা ভয় তার বুধিকে যদি কেউ কেড়ে নেয়। পাক সেনারা হঠাৎ যদি এসে পড়ে পথ দিয়ে। পথ দিয়ে তাই যায় নি সে। লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠামাঠি এসেছিল।

নদীতে নৌকা নেই। ঘাটও সেই। তবু বুধিকে নিয়ে নদীতেই নেমে পড়ল সে। সাঁতরে পার হবে। ভীষণ স্রোত। স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। বুধিও সাঁতার কাটছিল, কিন্তু সে-ও ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের টানে। অন্য দিকে ভেসে যাচ্ছিল। তাদের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। অবশেষে সে যখন ওপারে উঠল বুধিকে দেখতে পেল না। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে অন্ধকার নামছে। বুধিকে আর দেখতে পেল না সে। নদীর তীরে একটা গাছতলাতে বসেই কাটিয়ে দিলে সে সমস্ত রাত। সকাল হল। কিন্তু বুধি কই ? বুধি তো এলো না। তখন সে হাঁটতে আরম্ভ করল। প্রশস্ত একটা মাঠ পেরিয়ে একটা গ্রামের ভিতর ঢুকল। বেশ বড় গ্রাম। পাকিস্তান, না, হিন্দুস্থান ? কে জানে ? গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সবাই অচেনা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

একটা ঘরের সামনে তার বুধিকে বেঁধে রেখেছে। বুধির বাচ্ছা হয়েছে একটা। বুধি তাকে দেখে ডেকে উঠল। এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে।

একজন বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—"তুমি কে হে ?"

"আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি।"

"এখানে কি চাও ?"

"কিছু চাই না। ওই গাইটা আমার।"

"তোমার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার যে তার প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ ? প্রমাণ কি করে দেব ?"

"তাহলে যাও।"

সে দাঁড়িয়ে রইল তবু।

"আমাকে এখানে থাকতে দিন দয়া করে।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

সে থতমত খেয়ে গেল। হিন্দু মুসলমান কি বললে সুবিধে হবে তার মাথায় এল না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আর একজন বেরিয়ে এসে বলল—"পাকিস্তানী চর মনে হচ্ছে। ধরে থানায় দিয়ে এস।"

ভয় হল তার। ছুটতে লাগল সে। প্রাণপণে ছুটতে লাগল। হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে পিছু ফিরে দেখল দড়ি ছিঁড়ে বুধিও তার পিছু পিছু আসছে। তার পিছনে টলতে টলতে আসছে বাছুরটা।

"সে হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন বুধির মনে কখনও জাগে নি।"

পাঁচ ফোঁটা গল্প

মহারাজা। (সক্রোধে) ওর শির নিয়ে এস।

মন্ত্রী। যো হুকুম।

[অভিবাদন করে মন্ত্রী বেরিয়ে গেলেন। মুচকি হাসতে হাসতে রাণীর প্রবেশ]

মহারাজা। রাণী, আমি বেয়াদপ লোকটার শির আনতে হুকুম করেছি।

রাণী। [আরও একটু হেসে] ঠিকই করেছেন, মহারাজের উপযুক্ত কাজই করেছেন। লোকটা কোথায়?

মহারাজা। শুনলাম তোমার জানলার নীচে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল।

[রাণী আরও হাসতে লাগলেন। মন্ত্রীর প্রবেশ]

মন্ত্রী। মহারাজ, গিয়ে দেখি লোকটার শির নেই। একটা কবন্ধ দাঁড়িয়ে আছে। জিগ্যেস করলাম তোমার শির কই? কবন্ধটা উত্তর দিলে রাণীর পায়ের তলায় অনেক আগেই লুটিয়ে দিয়েছি সেটা।

মহারাজা। সে কি?

[রাণী অট্টহাস্য করে উঠলেন]

মহারাজা। এর মানে?

[রাণী উত্তর দিলেন না। হাসি চাপতে চাপতে বেরিয়ে গেলেন। মন্ত্রীও অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন আর এক দ্বার দিয়ে। হতভম্ব মহারাজা দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—কোই হ্যায়। কেউ এল না।]

* * *

খোকন। পক্ষীরাজ ঘোড়া, এরোপ্লেন তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে ?

পক্ষীরাজ। না তো।

খোকন। তোমাকে আজকাল দেখতে পাই না। কোন আস্তাবলে তুমি থাকো এখন ?

পক্ষীরাজ। আমি আস্তাবলে থাকি না। যেখানে বরাবর ছিলাম এখনও সেখানে আছি।

খোকন। জায়গাটা কোথায় ?

পক্ষীরাজ। তোমার মনে।

* * *

[জনার্দন ও মালতী এক ফ্ল্যাটে বাস করে। ঠিক পাশাপাশি। এ বাড়ির কথা ও বাড়ি থেকে শোনা যায়। মালতী বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল হঠাৎ জনার্দনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।]

জনার্দন। এ কি সেজেগুজে কোথায় চলেছো।

মালতি। চাকরি করতে যাচ্ছি।

জনার্দন। চাকরি পেয়েছ নাকি ? আমি তো পাইনি এখনও।

মালতী। আমি পেয়ে গেছি।

জনার্দন। তোমার ছেলে কোথায় থাকবে ? তোমার স্বামীও তো চাকরী করেন ? তোমাদের ঝি বা চাকরও তো নেই।

মালতী। না। [মুচকি হেসে] ও ঠিক থাকবে।

[মালতী চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ি থেকে কান্না ভেসে এল —মা—মা—কোথা গেলে—মা—মা গো। জনার্দনের ডাগনে ভজহরির প্রবেশ।]

জনার্দন। ভজা, কাঁদছে কে ?

ভজহরি। কাঁদছে পাশের বাড়ির ছেলেটা। তার মা তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে গেছে।

জনার্দন। তাই নাকি।

[ছেলের কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল]

ভজহরি। কি কাণ্ড !

জনার্দন। তুই এক কাজ কর দিকি। আমাকে খানিকটা তুলো এনে দে।

ভজহরি। তুলো !

জনার্দন। হ্যাঁ। কানে এঁটে বসে থাকব। তাছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। যা রোদ উঠেছে, বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যাবে কি এখন ? তুলোই আন খানিকটা।

* * *

"আরে দাদা যে—"

সবিস্ময়ে বললাম—"চিনতে পারছি না তো।"

"পারছেন না ? সে কি ! আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমার মাসতুতো দাদা ফণীর সঙ্গে আপনার পিসেমশাই গণেশবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। ফণীই নিয়ে গিয়েছিল আমাকে আপনার কাছে। আপনি চা খাওয়ালেন, সন্দেশ খাওয়ালেন, বৌদি

মাছভাজাও খাওয়ালেন দুটো। ফণীকে জানেন তো? আপনার ছোট শালীর বোনপোর বেয়াই সে। সেই সুবাদেই আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। আমি আপনাকে আমার লেখা দুটো কবিতা আর তিনটে গল্প পড়ে শোনালাম—"

এত বিস্তৃত পরিচয় দেবার পরও আমার কিছু মনে পড়ল না। স্মৃতিশক্তিটা সত্যিই বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মীশাক খাব?

* * *

স্থান—চলন্ত বাস।

দৃশ্য—কয়েকজন যুবক উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছেন। তর্কের বিষয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ছাড়া এদেশে এখন অন্য কথা নেই। চোখ-ওঠার নামও হয়ে গেছে জয়-বাংলা। একজন যুবক বলছিলেন—"পৃথিবীর বড় বড় শক্তিরা ইয়াহিয়ার এই বর্বরতা সমর্থন করছে বলে কি আমরাও সেটা করব? অন্যায় আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।"

আর একজন বললেন—"ভারতের উচিত বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া। ভারত মুখে খালি ন্যায়ের বুলি কপচাচ্ছে কাজে কিছু করছে না। কিন্তু আমরা যুবকরা কিছুতেই অন্যায় সমর্থন করব না।"

বাসের সকলেই একমত হলেন, অন্যায় কিছুতেই সমর্থন করা উচিত হয়।

এমন সময় প্যান্ট পরা দুটি রোগা ছেলে বাসে উঠে আদেশের ভঙ্গীতে বলল—"আপনারা বাস ছেড়ে এখখুনি নেবে যান।"

"কেন?"

"আমরা বাস পোড়াব।"

সুটসুট করে নেবে গেল সবাই। ড্রাইভারও।

ন্যায়-অন্যায়ের বিচার পড়ে রইল 'বাসে'।

'বাস'টা পুড়তে লাগল।

জ্যোতিষ

জ্যোতিষের আসবার কথা ছিল। স্যুটকেশ গুছিয়ে তার অপেক্ষায় বসেছিলাম। দুজনে একসঙ্গে কাশ্মীর যাব ঠিক হয়েছিল প্রায় মাসখানেক আগে। সে নিজেই প্রস্তাবটা করেছিল প্রথমে। বলেছিল, 'ভাই পরেশ, কোলকাতা আর ভাল লাগছে না। বোমবাজি আর রাজনীতি, প্যানসে থিয়েটার আর বাজে সিনেমা, স্ট্রাইক আর হামলা—দম বন্ধ হয়ে এসেছে ভাই। চল পালাই কোথাও। কাশ্মীর যাবি। কাশ্মীরে মঞ্জুলিরা আছে। থাকবার কোনও অসুবিধা হবে না। মঞ্জুলির বাবা ওখানে বড় অফিসার। আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। চল কাশ্মীরই যাওয়া যাক।

পরশু দিন জ্যোতিষই দুটো বার্থ রিজারভেশনের টিকিট কিনে দিয়ে গেছে। বলেছে আজ ঠিক সময় ট্যাকসি নিয়ে আসবে। স্যুটকেশ গুছিয়ে দাড়ি কামিয়ে বসেছিলাম। জ্যোতিষের পাত্তা নেই। জ্যোতিষ একটি গভর্ণমেণ্ট ফ্ল্যাটে একটা রুম নিয়ে থাকে। তার ফোন আছে। ফোন করলাম। ফোনটা বাজতেই লাগল। তার

মানে সে বাড়িতে নেই। ট্রেনের সময় হয়ে গেল। তবু আসে না। আর একবার ফোন করলাম, ফোনটা বাজতেই লাগল। বাড়িতে নেই। আমার কাছে টিকিট ছিল। আমি নিজেই একটা ট্যাক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম হয়তো সে স্টেশনেই চলে গেছে। সেইখানেই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। কিন্তু না, স্টেশনেও নেই সে। ট্রেনটা ছেড়ে যায়নি। দুবার খুঁজলাম। পেলাম না তাকে। ইচ্ছে করলে আমি চলে যেতে পারতাম। কিন্তু তাকে ফেলে যাওয়াটা কি উচিত? গেলাম না। স্টেশন থেকেই তার ফ্ল্যাটে গেলাম। দেখলাম তার ঘরে তালা বন্ধ। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। কোলকাতা শহরে কেউ কারো খবর রাখে না। পাশের ঘরের লোক-ও না।

বাড়ি ফিরে এলাম।

আমিও একটা গভর্ণমেণ্ট ফ্ল্যাটে একটা রুম নিয়ে থাকি। আমারও একটা ফোন আছে। আবার এসে ফোন করলাম জ্যোতিষকে। ফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে। জ্যোতিষ নেই। ব্যাপার কি?

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার ফোনটা বাজছে।

"হ্যালো, কে—"

"আমি জ্যোতিষ।"

"তোর ব্যাপার কি।"

"আমি ভাই চলে এসেছি—"

"কোথায়? কাশ্মীর? প্লেনে? আমাকে ফেলে চলে গেলি? আশ্চর্য তো—"

"তোকে আনা সম্ভব ছিল না। অদ্ভুত এ দেশ।"

"খুব চমৎকার সিনারি, না? কাশ্মীর যে ভূস্বর্গ, সিনারি তো ভালো হবেই—আমাকে ফেলে চলে গেলি—"

"না সিনারি দেখছি না। এ এক অদ্ভুত দেশ। প্রথমে যখন এলাম তখন দেখি চারদিক ফাঁকা কোথাও কেউ নেই। বিরাট দেশ, বিরাট আকাশ, বিরাট মাঠ, বিরাট দিগন্ত। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। হাঁটতে লাগলাম। কিছুক্ষণ হাঁটবার পর দেখি একদল লোক ছুটে আসছে আমার দিকে। ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু পালাতে পারলাম না, চারদিক ফাঁকা. লুকোবার জায়গা নেই। লোকগুলো এসে আমাকে প্রশ্ন করল—আপনি বাঙালী? আমি বললাম, হাঁ। তারা বললে তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে। আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক, প্যাকিস্তানী ফৌজকে মেরে তাড়াব। তারা এখানেও এসেছে। কিন্তু এখানেও তাদের থাকতে দেব না। এখান থেকেও মেরে তাড়াব তাদের। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। তাদের কারো হাতে দা, কারো হাতে কুড়ুল, কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে তলোয়ার, কারো হাতে লাঠি। কারো হাতে কিছু নেই। যারা নিরস্ত্র তারা বলছে আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে, মনের বল আছে, হাতের ঘুসি আছে, পায়ের লাথি আছে। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে। চলুন, চলুন, আর দেরি নয়—। আমার হাত ধরে টানতে লাগল, শেষে আমিও তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। ছুটতে লাগলাম তাদের সঙ্গে। ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করলাম—কতদূরে পাক সৈন্য? আমরা কোথায় যাচ্ছি? তারা বললে—যাচ্ছি আমাদের নেতাদের কাছে। তাঁরাই আমাদের বলে দেবেন কোথায় কিভাবে আক্রমণ করতে হবে। আরও কিছু দূরে

ছুটে একটা জ্যোতির্ময় লোকে এসে পৌঁছলাম। চারদিক আলোয় আলো। প্রথমেই চোখে পড়ল একজন বলিষ্ঠ লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ওরা বলল—ওই যে দেখুন, বাঘা যতীন। তাঁর পিছনে ক্ষুদিরাম, তাঁর বাঁ-দিকে সূর্য সেন, তাঁর সামনে বিনয়, ওই টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন দীনেশ, এদিকে বাদল, বারীনদাও আছেন বাঁদিকে, ওই দেখুন শ্রীঅরবিন্দ অনেক দূরে, পুলিন দাস, তাঁর পাশে কানাই, তার পাশে—

আমি বললাম—"ও‍ঁরা তো সব মারা গেছে—"

"আমিও মারা গেছি। আমার দেহটা পড়ে আছে যাদবপুরে একটা নালির মধ্যে।"

"কি করে মারা গেলে তুমি—"

"পাইপগানের গুলি লেগে—"

"কে মেরেছে তোমায় ?"

"কে মেরেছে জানি। কিন্তু নাম তার বলব না। সে আমার বন্ধু। নিজের ভুল সে পরে বুঝতে পারবে। আমি—"

গলাটা ভারাক্রান্ত হয়ে এল তার।

ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

"হ্যালো, হ্যালো—"

আর সাড়া পাওয়া গেল না।

পিশাচ নয়

মাথার চুল উসকো-খুসকো। চোখ দুটি উজ্জ্বল কিন্তু কোটরগত। রং কালো। পরনে চোং প্যাণ্ট আর হাফশার্ট। দুটোই ছেঁড়া। পায়ে জীর্ণ চপ্পল। বগলে একটা ছোট কেরোসিন কাঠের বাক্স। বাক্সটার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। রং হয়তো এককালে ফরসা ছিল, এখন বাদামী হয়ে গেছে। গালের হাড় দুটো উঁচু। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। মুখভাবে কেমন যেন একটা উগ্র বেপরোয়া ভাব।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। একটা সংকীর্ণ গলির ভিতর ঢুকল সে। কিছুদূরে গিয়ে ডান দিকে আর একটা সংকীর্ণতর গলি। সেই গলিতে ঢুকে একটি জীর্ণ বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

"দামু—দামু—"

চীৎকারই করতে হল, কারণ বাড়ির দুয়ারে কড়া নেই। জীর্ণ কপাট, ধাক্কা দিলে ভেঙে যেতে পারে।

দামু বেরিয়ে এল।

দামুর পরনে একটা ছেঁড়া লুঙ্গি। খালি গা, খালি পা।

"কে রে বিল্টু না কি ? কি খবর—"

"চাকরি খতম। দশ দিন জেলে আটকে রেখেছিল। কোনও প্রমাণ পায় নি, তবু

বলছে তুমি নকশাল। অনেক কষ্টে অনেক জায়গায় তেল দিয়ে চাকরিটি যোগাড় করেছিলাম, তাড়িয়ে দিলে।"

"বলেছিলাম ওই কেষ্টটার সঙ্গে মিশিস না। ও যে একজন নকশাল তাতে সন্দেহ নেই।"

"ও নকশাল কি না জানি না, কিন্তু ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বিপদে-আপদে ও-ই সাহায্য করে—হঠাৎ ওর সঙ্গে মিশব না, মানে?"

"মানে কি তা তো বুঝতে পারছ। চাকরিটি গেল। বগলে ওটা কি—" সে কথার উত্তর না দিয়ে বিল্টু বললে—"চল একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি—"

"তুই একাই যা না। আমাকে আবার টানছিস কেন।"

"টানছি কারণ আমার ট্যাঁকে একটি পয়সা নেই। বাসের ভাড়া তুই দিবি।"

"আমার কাছেই পয়সা আছে না কি। আমিও তো বেকার বসে আছি। মামার কাছে আর কাঁহাতক পয়সা চাইব বল? চাইলেই অবশ্য দেবেন কিছু, কিন্তু চাইতে লজ্জা হয় ভাই—"

"তোর মামা-ভাগ্য ভালো। ভারি ভদ্রলোক। গোটাপাঁচেক টাকা চেয়ে নে—"

"পাঁচ টাকা? কেন, কি হবে।"

"নৌকো করে বেড়াবার ইচ্ছে আছে একটু।"

বিল্টুর কোটরগত চক্ষু দুটি আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠল।

"পাগল হয়ে গেলি না কি তুই।"

"মনটা বড্ড খারাপ হয়ে আছে ভাই—গঙ্গায় নৌকো চড়ে বেড়ালে একটু ভাল লাগবে। রাস্তার চারদিকে ভীড়, পার্কেও তাই, সিনেমা থিয়েটারেও তাই, হাঁফ ছাড়বার জায়গা কোথাও নেই এই কলকাতা শহরে। সামনের বাড়ির চওড়া রকটায় বসতাম, কিন্তু সেখানে আজকাল আর বসতে দিচ্ছে না।"

"কে, বিল্টু না কি—"

দামুর মামা বেরিয়ে এলেন।

"কি খবর—"

"খবর ভাল নয়। চাকরিটা গেল আজ। আমাকে নকশাল বলে সন্দেহ করছে ওরা—ডিসমিস করে দিয়েছে—"

"তাই না কি—! এস এস ভিতরে এস—"

"না আর ভেতরে যাব না। দামুকে নিয়ে বেড়াতে যাব একটু—"

দামু একটা হাফশার্ট পরে বেরিয়ে এল!

একটু দূরে গিয়ে বলল—"চল হেঁটেই যাই গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে গিয়ে না হয় ডিঙি ভাড়া করব একটা। রাস্তায় বিমলবাবুর কাছ থেকে ধার নেব।"

"ধার দেবেন?"

"দেবেন। কারণ তাঁর অবিবাহিতা কালো মেয়েটিকে আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টায় আছেন। মামার কাছে আসা-যাওয়া করছেন বার বার। বলছেন বিয়ে করলে তাঁর আপিসে একটা চাকরিও জুটিয়ে দিতে পারেন—"

"টাকা যদি ধার দেন তো নাও, কিন্তু খবরদার বিয়ে কোরো না।"

"কেন—"

"আমার দিকে চেয়ে দেখ তাহলেই বুঝবে। তুমি মামার ভরসায় বিয়ে করতে যাচ্ছ? আমি বাবার ভরসায় বিয়ে করেছিলাম। দেখ, আমার কি-অবস্থা। বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তিনটে বোনের বিয়ে হয় নি, আমার দু দুটো ছেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। আমাদের দুবেলা অন্ন জুটছে না, আমার চাকরি নেই—"

বিমলবাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দামু বলল—"দাঁড়া একটু। টাকাটা চেয়ে নিয়ে আসি।"

মিনিট পাঁচেক পরেই দামু বেরিয়ে এল।

"টাকা পেয়েছি। বেশীই পেয়েছি।"

"গুড্। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে পা দিও না।"

দুজনে খানিকক্ষণ নীরবে হাঁটল। তারপর বিল্টু বলল—"দোষ কার জান? দোষ আমার বাবার। কামের তাড়নায় তিনি ছেলের পর ছেলের জন্ম দিয়ে গেছেন। আমরা দুটো ভাই তিনটে বোন। ভাই দুটো গুণ্ডা হয়ে গেছে। বোন তিনটে ব্যাভিচারিণী হয়েছে। আমার বয়স যখন অল্প অর্থাৎ গোঁফও যখন ভাল করে ওঠে নি তখন আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। আমিও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। ছেলের পর ছেলে হয়েছে—কিন্তু একটাকেও বাঁচাতে পারি নি। একটা মরল ডিপথিরিয়ায় আর একটা টাইফয়েডে। চিকিৎসা করাবার টাকা ছিল না। পাড়ার হাতুড়ে হোমিওপ্যাথটার উপরই নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু সে লোকটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। একটি পয়সা নেয় নি সে।"

আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর একটা ভাল হোটেলের কাছাকাছি এল তারা।

"কত টাকা ধার করে আনলি—"

"দশ টাকা—"

"তাহলে ওই হোটেলটায় চল। মদ খাব।"

"মদ? আমি মদ খাই না।"

"আমাকে ভাই খাওয়া। প্লীজ, প্লীজ। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে আছে—" হোটেলে ঢুকতে হল দামুকে। বিল্টু একেবারে নাছোড়।

গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একটা ছোট নৌকা ভাড়া করা হল।

বিল্টু নৌকোয় চড়ে মাঝিদের বলল—"মাঝগঙ্গায় নিয়ে চল নৌকোটা—"

গঙ্গার মাঝখানে নৌকোটা যখন পেঁছিল তখন বিল্টু হঠাৎ সেই কেরোসিন কাঠের বাক্সটা গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"ওটা ফেলে দিলি কেন?"

"আমার প্রথম দুটো ছেলেকে গঙ্গায় দিয়েছিলাম। এটাকেও দিলাম—"

"সে কি! ওতে তোর ছেলে ছিল?"

"হ্যাঁ। আজই হয়েছে! ফুটফুটে চমৎকার ছেলে। গলা টিপে শেষ করে দিলাম তাকে। এই নরকে অমন ফুটফুটে চমৎকার ছেলে বাঁচত না—"

"বলিস কি? তোর বউ?"

"তাকেও শেষ করেছি। আমার বাবাকেও—"

বিল্টু ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে।

তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

শঙ্করীর ঘরেই

সেদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি নামল সন্ধ্যার আগেই। দুপুর থেকে গুমোট হয়েছিল, বিকেল বেলা মেঘ এল আকাশ ছেয়ে। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। কড় কড় করে বাজ পড়ল কোথায় যেন। তাড়াতাড়ি বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে দিলে শংকরী। তারপর ঘরের জানালাগুলোও। একটা জানালা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ছিল না। বার বার খুলে যেতে লাগল সেটা। জলের ছাট ঢুকতে লাগল ঘরের ভিতর। জানালার নীচেই দড়ির খাট ছিল একখানা, তার উপর বিছানা ছিল। সেইটে টেনে সরিয়ে নিয়ে এল শংকরী। তারপর জানালাটা ঢেকে দিলে একটা মোটা কম্বল দিয়ে। তবু জল আসতে লাগল, কপাট দুটো দড়াম দড়াম শব্দও করতে লাগল। শংকরী ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল সেদিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর মনে পড়ল। মনে পড়ল জানালার কপাট দুটোতে দুটো কড়া লাগানো আছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেই তো হয়। এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, দড়ি পেল না কোথাও। পুরনো কাপড়ের পাড় ছিঁড়বে? খোকনের পুরনো কাপড় আছে। কিন্তু সেগুলো পাড়ার একটি গরীব ছেলেকে দেবে বলে রেখে দিয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল চুলের ফিতে তো আছে। মাথার চুল খুলে চুলের ফিতেটা বার করে ফেলল সে। তারপর ফিতে দিয়ে জানালার কড়া দুটো বেঁধে দিলে শক্ত করে। দড়াম দড়াম শব্দটা বন্ধ হল। পরমুহূর্তেই রাগ হল খোকনের উপর। কতদিন থেকে খোকনকে বলছে যে জানলার ছিটকিনিটা সারিয়ে রাখ। কিন্তু এ সামান্য কাজটা সে আর করে উঠতে পারছে না। কাল নিজেই গিয়ে সে রঘু মিস্ত্রীকে ডেকে আনবে। শংকরীর রাগ কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। মনে হল কি করে সময় পাবে ছেলে। ভোর হতে না হতেই তো বাড়িতে রোগীর ভিড়। তারপর একটু কিছু মুখে দিয়ে বাইকে চড়ে রোগীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। ফেরে একটা দেড়টার সময়। ভাত খেয়ে আধ ঘণ্টাও বিশ্রাম করে না। আবার বেরিয়ে পড়ে। দু'বছরের মধ্যেই খুব প্র্যাকটিস হয়েছে খোকনের। হঠাৎ শংকরীর মনে হল এই দুর্যোগে খোকন কোথায় আছে? আজ ভীমগঞ্জে যাবে বলেছিল। সে তো অনেক দূর। শংকরীর মনটাতেও মেঘ ঘনিয়ে এল। চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বাজ পড়ল আর একটা। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—শংকরীর মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে পড়ল ঠাকুরের নাম। কিন্তু তাতে চিন্তা কমল না। সম্ভব অসম্ভব নানারকম বিপদের কথা জাগতে লাগল তার মনে। আবার বাজ পড়ল। 'নারায়ণ রক্ষা কর!' বলতে বলতে নিজের ছোট্ট ঠাকুরঘরটিতে ঢুকে পড়ল সে। ভাঁড়ারঘরের এক কোণেই একটি ছোট কাঠের সিংহাসনে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তি। তার সামনেই উপুড় হয়ে পড়ল শংকরী।

'খোকনকে রক্ষা কর ঠাকুর। ও-ই যে আমার একমাত্র ভরসা। ওকে অনেক বিপদ থেকে তো বাঁচিয়েছ ঠাকুর, তোমারই দয়ায় অকুল সমুদ্র পার হয়েছি। সব তোমারই দয়ায়—'

বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি চলতে লাগল। ঠাকুরের সামনে উপুড় হয়ে পড়েই রইল শংকরী।

…তার অতীত জীবনটা সহসা যেন মূর্ত হয়ে উঠল তার মানসপটে। কুড়ি বছর আগের ঘটনা, এখনও কিন্তু সেটা জ্বল জ্বল করছে আগুনের মতো, দগ দগ করছে ঘায়ের মতো। না, সে ভোলে নি, কিছু ভোলে নি।

…পাড়ার সবার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওরা। হাহাকার উঠছে চারিদিকে। তাদের বাড়ি ঘিরেও দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের দল। কপাট বন্ধ করে দিয়েছেন শংকরীর স্বামী। দমাদ্দম কুড়ুল পড়ছে কপাটে। কপাট ভেঙে গেল শেষে। ঢুকল গুণ্ডার দল পিল পিল করে। শংকরীর স্বামী রামদা নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু পারল না। ঘাতকের কুড়ুলের কোপ পড়ল তার গলায়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল। উঃ, কি সে রক্তের ফোয়ারা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর উঠল না। বুড়ি শাশুড়ি ছিল, তাকেও জবাই করলে তার চোখের সামনে। বুড়ির সেই আর্ত চীৎকার এখনও কানে বাজছে তার। কিন্তু তাকে মারল না। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল —তারপর—তারপর—সে কী বীভৎস কাণ্ড—কি লজ্জা! অজ্ঞান হয়ে গেল সে। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে কেউ নেই। সবাই চলে গেছে। উঠোনে পড়ে আছে সে। নিমাইদা বসে চোখে-মুখে জল দিচ্ছে।

'নিমাইদা, খোকন কোথা?'

'তাকে বাড়ির পিছনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বাইরে ছিল তাকে ওরা ধরতে পারে নি। তুমিও চল। এখান থেকে পালাতে হবে। আমি কাপড় চোপড় নিয়ে আসছি। তুমি ওই বনের ভিতর বসে থাক গিয়ে।'

বনের ভিতর গিয়ে দেখল খোকন কাঁদছে। নিমাইদার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে ছিল সে। নিমাইদা আর ফেরেনি। তাকেও ওরা খুন করেছিল।…তারপর শুরু হল লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে পথ চলা। দিনের বেলা পথ চলা সম্ভব ছিল না। অনেক কষ্টে অনেক দিন পরে বনগাঁয়ে এসে হাজির হয়েছিল তারা। আশ্রয় পেয়েছিল। সে-ও অনেক কষ্টে। কিন্তু তবু পেয়েছিল। কাজও পেয়েছিল একটা। ঝি-গিরি করত দু-তিনটি বাড়িতে। কিছুদিন পরে খোকনকে স্কুলে ভর্তি করার সুযোগ পাওয়া গেল। খোকনের বয়স তখন দশ বছর। খোকন পড়াশোনায় ভাল ছেলে। এখানে সে প্রতি ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে প্রোমোশন পেতে লাগল। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল শেষে। বছর দুই আগে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। শংকরীর ইচ্ছা, তার এবার একটি বিয়ে দেওয়া। কিন্তু খোকন বিয়ে করতে চায় না এখন। বলে—'আগে ছোটখাটো একটা বাড়ি করি, তারপর বিয়ে।…'

…আবার বাজ পড়ল। আবার শিউরে উঠল শংকরী। উঠে বসল সে। জোড়হাত করে চেয়ে রইল নারায়ণের মুখের দিকে। তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল। সমস্ত অন্তর জুড়ে শুধু ওই এক প্রার্থনা—ছেলেকে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়ে আন ঠাকুর। হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল। পিতলের নারায়ণ হঠাৎ যেন সজীব হয়ে উঠলেন। যেন তাঁর কানে কানে বললেন—'ছেলে ফিরে আসবে। তুমি কারো মনে দুঃখ দিও না। তাহলে তুমিও দুঃখ পাবে না।' শংকরী সত্যি সত্যি যেন শুনতে পেল কথাগুলো। নারায়ণের প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

বাইরের কপাটে কে ধাক্কা দিচ্ছে না?

খোকন এল বোধহয়।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল শঙ্করী। উঠে গিয়ে কপাটটা খুলে দিলে। 'কে রে, খোকন ?—'

না, খোকন তো নয় ! একটি মেয়ে। আপাদমস্তক ভিজে গেছে। থর থর করে কাঁপছে।

'কে তুমি—'

'আমি ফাতিমা। আমি তোমার বিটি। আমারে ঠাঁই দাও মা—'

'ফাতিমা ? মুসলমানের মেয়ে ? কোথা থেকে আসছ ?'

'বাংলাদেশ থেকে। আমার সর্বনাশ হইছে। আমারে দয়া কর মা—'

'এস, ভিতরে এস।'

ফাতিমা ভিতরে এল। তারপর ধীরে ধীরে বলল তার করুণ কাহিনী। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা খুন করেছে তার স্বামীকে, তার ছোট ছেলেকে। সতীত্ব অপহরণ করেছে তার। সে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে কোনক্রমে। কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা আবার যেন মূর্ত হয়ে উঠল শঙ্করীর মনে। তার সমস্ত সত্তা যেন পাথরের মতো জমে গেল। মনে হল···কিন্তু পরমুহূর্তেই নারায়ণের প্রসন্ন মুখচ্ছবি আবার দেখতে পেল সে, শুনতে পেল—'কারো মনে দুঃখ দিও না।'

শঙ্করীকে নীরব দেখে ফাতিমা হঠাৎ তার পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। 'ঠাঁই দাও মা, ঠাঁই দাও, আমার আর কেউ নাই—দিবা ? খুইলা কও।'

'নিশ্চয় দেব। ভয় কি ?'

পরমুহূর্তেই খোকনের গলা শোনা গেল।

'মা, মা, কপাট খোল। উঃ, যা ভিজেছি আজ। এই যে কপাট খোলাই আছে দেখছি—'

বাইক ঠেলতে ঠেলতে খোকন এসে প্রবেশ করল।

ভোটার সাবিত্রীবালা

তাহার নামটি একটু অদ্ভুত গোছের ছিল। রিপুনাশ। তাহার বড়দার নাম ছিল তমোনাশ। কিন্তু কালের এমনই গতিক যে কেহই কিছু নাশ করিতে পারে নাই। নিজেরাই নষ্ট হইয়াছিল। তমোনাশের জীবনে একটুও আলো প্রবেশ করে নাই। অ আ ক খ পর্যন্ত শেখে নাই সে। একেবারে নিরক্ষর ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল বলিয়াই দুইজনের দুইটি সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছিল। তাহাদের পিতা ছিলেন টোলের পণ্ডিত মোহনাশ তর্কতীর্থ। লোকে সংক্ষেপে বলিত মোহন পণ্ডিত। সমাজে আজকাল সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদর নাই। অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তিনি। পুরোহিতগিরি করিতেন। তিনি যখন মারা যান তখন তমোনাশের বয়স ছয় বৎসর, রিপুনাশের তিন। তাহাদের মা রাঁধুনি বৃত্তি করিয়া সংসার চালাইতেন। তমোনাশের বয়স যখন ষোল তখনই সে 'লায়েক' হইয়া উঠিল। মস্তানি করিয়া বেড়াইত। একটা গুণ্ডার দলই ছিল তাহার। সে দলে তাহার নাম ছিল তমুনা। গুণ্ডামি করিয়া কিছু রোজগার করিত সে। কিছু টাকা মাকে আনিয়া দিত, কিছু টাকা নিজের আমোদ

প্রমোদে ব্যয় করিত। কিন্তু এ জীবন সে বেশী দিন চালাইতে পারে নাই। গুন্ডামি করিতে গিয়া ছুরিকাহত হইয়া মারা গেল একদিন। তাহার দেহটা ফুটপাতে কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর পুলিস বাহিত হইয়া গেল মর্গে, ময়না তদন্তের জন্য। ডাক্তাররা তাহার দেহটা ছিন্নভিন্ন করিলেন। অবশেষে সেটা ডোমেরা অধিকার করিল। তমোনাশের মা তাহার মৃত পুত্রের শবদেহটা আর দাবি করিলেন না। লোকজন জোগাড় করিয়া শবদেহটার সৎকার করিতে যে টাকা লাগে সে টাকা তাঁহার ছিল না। চারিদিকে ধার জমিয়া গিয়াছিল, আর ধার বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না তাঁহার। ডোমেরা তমোনাশের শরীরের অস্থিগুলি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিল এবং অবশেষে সেগুলি 'অ্যানাটমি'র ছাত্রদের নিকট বিক্রয় করিয়া কিছু পয়সা রোজগার করিল। এইখানেই তমোনাশের জীবনবৃত্তান্ত শেষ। তমোনাশের মা সাবিত্রী খুব একটা কাঁদেনও নাই। তাঁহার চোখেমুখে প্রচ্ছন্ন একটা অগ্নি কেবল ধকধক করিয়া জ্বলিত। তাহা বাঙ্ময় নয়, দৃশ্যও নয়, কিন্তু নিদারুণ। সাবিত্রী যাঁহার বাড়িতে রাঁধুনী ছিল সেই ভদ্রলোক তমোনাশের মৃত্যুর পর সাবিত্রীর দুই টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাবিত্রী রাজী হয় নাই। সংক্ষেপে কেবল বলিয়াছিল, 'দরকার নেই।' রিপুনাশ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। যাহাদের ঘরে স্থান নাই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া যাহাদের জীবন অতিবাহিত হয়, যে কোনও মজা, যে কোনও হুজুগ, যে কোনও মোটর অ্যাক্সিডেন্ট, যে কোনও রাস্তার ভিড় যাহাদের আকৃষ্ট করে তাহারাই ছিল রিপুনাশের সঙ্গী। দলের মধ্যে তাহার নাম ছিল 'রিপুনে'। রিপুনে কিন্তু তমুনার মতো বলিষ্ঠ ছিল না। রোগা রোগা চেহারা। বাজারের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, মুটেগিরি করিয়া রোজগার করিত কিছু। বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিল। প্রত্যহ এক বান্ডিল বিড়ি কেনার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা মাকেই আনিয়া দিত। এইভাবেই চলিতেছিল। রিপুনের বয়স যখন ষোল-সতের তখন হঠাৎ একদিন একটা কান্ড ঘটিল। সে এক ঝাঁকা কপি বহিয়া আনিয়া এক মোটরওলা বাবুর মোটরের কেরিয়ারে সেগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল, গলার ভিতরটা কেমন যেন কুট কুট করিতে লাগিল। কাশি শুরু হইয়া গেল। মোটরওলা বাবু তাহার প্রাপ্য মজুরি বারো আনা পয়সা দিয়া চলিয়া গেলেন। রিপুনে ফুটপাথে বসিয়া কাশিতে লাগিল। হঠাৎ কাশির সহিত উঠিল এক ঝলক রক্ত। রিপুনে কিছুক্ষণ রক্তটার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাড়ি চলিয়া গেল।

সাবিত্রী তাহাকে লইয়া গেলেন পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি বুক-পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—যক্ষ্মা হয়েছে। আরও বলিলেন, আমাকে কিছু ফি দিতে হবে না। কিন্তু ওষুধ আর ইনজেকশন কিনতে হবে। তাছাড়া ভালো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ডিম, মাখন, মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি ইত্যাদি। সাবিত্রী নীরবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ মুখের অদৃশ্য অগ্নিশিখার বার্তা সম্ভবত ডাক্তারবাবুর মনে গিয়া পেঁছিল। তিনি বলিলেন—তোমার যদি সামর্থ্যে না কুলোয় হাসপাতালে ভরতি হওয়াই ভালো। তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেইটে নিয়ে তুমি হাসপাতালে যাও। চিঠি লইয়া সাবিত্রী সাতদিন হাসপাতালের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করিল। কিছুই হইল না। একটি রোগী বলিল—এখানেও বিনা পয়সায় কিছু হয় না, ঘুষ দিতে হয়। এ কথা শুনিবার পর সাবিত্রী আর হাসপাতালে যায় নাই। অত

টাকা পাইবে কোথায় সে? বিনা চিকিৎসাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল আবার। আবার সে রাস্তায় ঘুরিয়া মুটেগিরি শুরু করিল। একদিন তাহার এক সঙ্গী তাহাকে বলিল—"দেখ, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুই যদি কোনক্রমে ছ'মাস আলিপুর জেলে কাটাতে পারিস, তোর যক্ষ্মা ভাল হয়ে যাবে—"

"জেলে গেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে, বলিস কি।"

রিপুনে কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না।

সঙ্গী বলিল—"হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষ্মা হয়েছিল। সেখানে খুব ভাল হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। তুই জেলে চলে যা।"

কয়েক দিনের মধ্যেই রিপুনে ট্রামে পকেট কাটিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িল। সবাই যথেষ্ট প্রহার করিল তাহাকে এবং শেষে পুলিশের হাতে সঁপিয়া দিল।

আদালতে বিচারক বলিলেন—"তুমি তোমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উকিল দিতে পার। উকিল নিয়োগ করবার সামর্থ্য যদি না থাকে আমরাই তোমার পক্ষে উকিল দিতে পারি একজন—"

রিপুনে হাত জোড় করিয়া বলিল—"না হুজুর, উকিলের দরকার নেই। পুলিশ যা বলছে তা সত্য। আমি চুরি করব বলেই ওই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম।"

বিচারক রায় দিলেন—"পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে একমাস জেল।"

রিপুনে হাত জোড় করিয়া বলিল—"ধর্মাবতার, টাকা আমি দিতে পারব না। কিন্তু আমাকে এক মাস জেল না দিয়ে ছ'মাস জেল দিন।"

বিচারক অবাক হইলেন।

"ছ' মাস জেল চাইছ কেন?"

"আমার যক্ষ্মা হয়েছে। শুনেছি আলিপুর জেলে যক্ষ্মার ভালো চিকিৎসা হয়। ছ'মাসে সেরে যায়।"

বিচারকের রায় কিন্তু বদলাইল না। জেলের হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা হইয়াছিল কিন্তু অসুখ সারিল না। রিপুনে কাশিতে কাশিতেই জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল এক মাস পরে। ইহার পর আরও এক মাস বাঁচিয়া ছিল সে। একদিন গভীর রাত্রে খুব কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসিল এবং মায়েরই পায়ের উপর প্রচণ্ড রক্ত বমি করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল বেচারা।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল সাবিত্রী। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে আগুনের হালকা বাহির হইতে লাগিল। এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিল না সে।

ইহার মাস দুই পরে নির্বাচন হইয়াছিল।

সাবিত্রীবালা একজন ভোটার। তাহার দ্বারে মান্যগণ্য একজন ভোটপ্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাবিত্রী তাঁহার দিকে অগ্নি দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "আপনাকে ভোট দেব? কেন? কি উপকার করেছেন আমার? আপনি যখন গদিতে ছিলেন—তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিখিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি, শেষে সে গুণ্ডা হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল। ছোট ছেলেটা মল যক্ষ্মায়,

তার কোনও চিকিৎসা হ'ল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন, কাউকেই ভোট দেব না—"

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোক বলিতে গেলেন—"কিন্তু দেখুন গণতন্ত্রে—"

কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—"

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী।

সঞ্জয় উবাচ

॥ ১ ॥

অমিতার বাবা একটা খাম হাতে ক'রে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "তোর আর বিয়ে করে দরকার নেই। তুই এম. এ. টা পাশ ক'রে ফেল। তারপর—"

"কেন, কি হল—"

"ডাক্তার বসু যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তা দেখে পাত্র পক্ষ ঘাবড়ে গেছে। বলেছে ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব না—"

"রক্তে দোষ আছে না কি?"

"আছে। যে দোষের জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই। দায়ী ভগবান।"

"কি দোষ?"

"ডাক্তার বসু লিখেছেন যে তোমার রক্তে এমন এক জাতের হিমোগ্লোবিন আছে যা উৎকৃষ্ট নয়, যার ফলে তোমার ছেলেমেয়েরা সব রুগ্ন হবে। পাত্রের রক্তে কোন দোষ নেই।"

নির্বাক হয়ে রইল অমিতা।

অমিতা ভবেশবাবুর একমাত্র সন্তান। মা তার ছেলেবেলায় মারা গেছে।

অমিতা ভবেশবাবুর কন্যা নয় শুধু, বান্ধবীও। সে নিজেই একদিন বাবাকে বলেছিল, 'বাবা আমার বিয়ে দাও। রাস্তায় কলেজে, ট্রামে বাসে হ্যাংলা ছেলেগুলোর উৎপাত আর ভালো লাগছে না।"

"বেশ তো। আমি ভাবছিলাম তোর এম. এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই—"

"বিয়ে করেও তো পরীক্ষা দেওয়া যায়।"

"বেশ, বেশ।"

আসল কথাটা কিন্তু ভবেশবাবু প্রকাশ করেন নি।

অমিতার বিয়ে হ'য়ে গেলেই তো পর হ'য়ে যাবে সে। তখন নিতান্তই একা থাকতে হবে তাঁকে।

কিন্তু তা ব'লে ভবেশবাবু মেয়ের জীবনকে অসম্পূর্ণ ক'রে রাখবেন? কখনই না।

বন্ধু-বান্ধব মহলে চেষ্টা করতে লাগলেন, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলেন। অমিতা

দেখতে ভালো। মেয়ে অপছন্দ হবে না। এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে। অনেকে পণ দাবি করলেন, পণের অংকটা আকাশ ছোঁয়া। পণ যারা চাইলেন না তাঁরা আশা ক'রে রইলেন কিছু পাওয়া যাবে, মুখে বললেন, দেখবেন আমাদের মান-সম্ভ্রমটা যেন বজায় থাকে। অনেক জায়গায় পাত্রই পছন্দ হল না। কিন্তু সবচেয়ে বেশী মুশকিল হল কুষ্ঠী নিয়ে। অমিতার কুষ্ঠীর সপ্তম স্থানে নাকি শনি, রাহু এবং মংগল। যাঁরা কুষ্ঠী চাইলেন তাঁরা এ কুষ্ঠী দেখে পিছিয়ে গেলেন। বললেন এ মেয়ে নির্ঘাত বিধবা হবে। এই কুষ্ঠীর জন্য অন্তত জন দশেক ভালো পাত্র হাত-ছাড়া হয়েছে। অবশেষে দেবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি শুধু শিক্ষিত নন, তিনি আধুনিক-মনা। তিনি বললেন, আমি পণও চাই না, কুষ্ঠীও চাই না। কিন্তু আমি একটি জিনিস চাই। বিয়ের আগে ছেলের এবং মেয়ের স্বাস্থ্যটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করিয়ে নিতে চাই। আমার ছেলের স্বাস্থ্য আমি পরীক্ষা করিয়েছি, তার রক্তও পরীক্ষা করা হয়েছে। আপনার মেয়ের স্বাস্থ্য এবং রক্তও পরীক্ষা করাতে হবে। এতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই। ডক্টর বসু, আমার চেনাশোনা লোক, যদি বলেন তাঁকে পাঠিয়ে দিই।"

ডাক্তার বসু জানিয়েছেন মেয়েটির স্বাস্থ্য ভালই, কিন্তু রক্তের হিমোগ্লোবিন ভালো জাতের নয়। ছেলেমেয়ে রুগ্ন এনিমিক হবে।

অমিতা হেসে বলল, "বাবা ছেলেবেলায় আমি হার্ডল রেসে (Hurdle race) ফার্স্ট হতাম। আমাদের সমাজে দেখছি বিয়েটাও হার্ডল রেসের মতো। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি ভালো পাত্র জুটিয়ে ফেলব। আপত্তি নেই তো ?"

"না। তবে যা করবে ভদ্রভাবে কোরো।"

"নিশ্চয়।"

অমিতার পাতলা ঠোঁট দুটিতে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল পরমুহূর্তে।

বলল, আমাদের সমাজের কোনটা ভদ্র কোনটা অভদ্র তা বোঝা শক্ত। কুষ্ঠী মিলিয়ে পণ দিয়ে মল্লিকার বিয়ে হল একটা 'দোজবরে' বুড়োর সঙ্গে। কেউ আপত্তি করলো না। অর্থাৎ সমাজের মতে সেটা ভদ্র ব্যাপার। কিন্তু আমার এক বন্ধু সুলতা একটি ভিন্ন জাতের ছেলেকে বিয়ে করেছে। ছেলেটি খুব ভালো, খুব ভদ্র। কিন্তু সবাই নিন্দে করেছে। আমাদের সমাজকে তুষ্ট করা মুশকিল।"

আবার হাসল অমিতা। হাসলে তার নাকের উপরটা কুঁচকে যায় আর চোখ দুটো বুজে যায়।

"তুমি ভাল পাত্র জুটিয়ে ফেলবে ? কি করে ?"

"আমি লুকিয়ে কিছু করব না বাবা। পাত্রকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।"

"লোকটি কে ?"

"তা আমিও এখন জানি না।"

॥ ২ ॥

অমিতা অনেকেরই হৃদয় হরণ করেছিল। কারণ সে সুন্দরী ছিল। ভালো ছিল লেখা পড়াতেও। গণিতে বি. এ. অনার্স ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল সে। এ ছাড়া তাকে

ঘিরে যে সুষমা বিচ্ছুরিত হত, যে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে সে নিজেকে সজ্জিত ক'রে রাখত তা দুর্লভ। তাই অনেক প্রণয়ী জুটেছিল তার। কিন্তু কাউকেই সে আমোল দেয় নি। অনেকে চিঠি লিখত তাকে। কিন্তু কারো চিঠির সে জবাব দেয় নি। কিন্তু চিঠিগুলো ফেলেও দেয়নি, সব জমিয়ে রেখে দিয়েছিল একটা বাক্সে। সেদিন বাবার কাছ থেকে এসে নিজের ঘরে খিল দিয়ে সেই বাক্সটা খুলে বসল। এক গাদা চিঠি। চিঠি বেছে বেছে সে আবিষ্কার করল যে প্রফেসার সঞ্জয় মিত্রই তাকে সব চেয়ে বেশী চিঠি লিখেছেন। একটি চিঠিতে বিবাহের প্রস্তাবও করেছেন।

তাঁকেই সে একটি চিঠি লিখল।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সব চিঠিই আমি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হ'য়ে গেল, কারণ মন স্থির করতে পারি নি। এবার মন-স্থির করেছি। আগামী কাল ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একটি মীটিং আছে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে। আমি সেখানে থাকব। আপনিও যদি আসেন দেখা হবে। এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়ার আগে দেখা হওয়াটা প্রয়োজন মনে করি। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণতা অমিতা

সভা শেষ হওয়ার পর সঞ্জয়বাবু হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন।

"চলুন। কোথায় বসবেন। গোলদীঘিতে তো এখন খুব ভীড়। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

"কি বলুন—"

"আমার বাসাতেই চলুন না। বৈঠকখানা রোডে আমার বাসাটা। বাসায় লোকজনও কেউ নেই এক চাকর ছাড়া।"

"বেশ চলুন—"

সামনে দিয়ে একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। সেইটেকেই ডাকলেন সঞ্জয়বাবু। সঞ্জয়বাবু ট্যাক্সিতে উঠে হাসিমুখে চাইলেন অমিতার দিকে।

"ব্যাপার কি বলুন তো—"

"আমি আপনার ছাত্রী আমাকে 'আপনি' বলবেন না।"

খুশী হলেন অধ্যাপক সঞ্জয় মিত্র।

মুখে বললেন, "আজকাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা বলতে হয়। বেশ তুমি যখন বলছ—"

একটু হেসে অমিতা বলল—"আপনি এখনও কিন্তু আড়ষ্ট হ'য়ে আছেন।"

সঞ্জয়বাবু আবার হাসলেন একটু।

"দেখা করতে এসেছ কেন সেইটে না শুনলে সহজ হ'তে পাচ্ছি না।"

"আপনার বাড়ীতে গিয়ে বলব।"

একটু পরে সঞ্জয়বাবুর বাসায় পেঁৗছে গেল অমিতা। ছোট্ট বাসাটি। সঞ্জয়বাবু চাকরকে হুকুম করলেন—দু' কাপ চা নিয়ে আয়।

দ্বিতলে বসবার ঘরটিও বেশ সুন্দর।

"বস। এইবার বল তোমার বক্তব্য।"

অমিতা বলতে লাগল—"আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান। আমার মা-ও

নেই। বাবা প্রাচীন পন্থায় আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক পাত্রও এসেছিল। তাই আপনার চিঠির কোনও উত্তর দিই নি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রাচীন পন্থায় আমার বিয়ে হওয়া শক্ত। আমার কুষ্ঠী খারাপ, রক্ত খারাপ, ব্যাংক ব্যালান্সও ভালো নয়। তাই বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বিয়ে করতে হবে না, তুই এম. এ. টা পাশ করে ফেল।' আমি কেমন যেন অপমানিত বোধ করছিলাম। বাবাকে বললাম, 'আমি এম-এ. পাশ করব। আর বিয়েও করব, তোমার যদি আপত্তি না থাকে।' বাবা বলেছেন আপত্তি করবেন না, তারপর আপনাকে চিঠি লিখেছি। আপনি বিয়ের প্রস্তাব ক'রে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সব কথা শোনার পর এখন ভেবে দেখুন আপনার আগেকার প্রস্তাব বাতিল ক'রে দেবেন কি না। বিয়ের বাজারে সমাজ আমাকে পাসমার্ক দেয় নি—"

প্রফেসার সঞ্জয় বললেন, "না না আমার কোন আপত্তি নেই, কুষ্ঠীতে আমি বিশ্বাস করি না, পণ নেওয়া পাপ ব'লে মনে করি। কিন্তু তুমি বলছ তোমার রক্ত খারাপ, সেটা কি ব্যাপার ?"

অমিতা ডাক্তার বসুর রিপোর্টটি সঙ্গে ক'রে এনেছিল, সেটি বার ক'রে দিল।

"আমার রক্তে নাকি এরকম নিকৃষ্ট জাতের হিমোগ্লোবিন আছে যার ফলে আমার ছেলেমেয়েরা নাকি রুগ্ন হবে—"

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অধ্যাপক সঞ্জয়।

বললেন, "আমাদের দেশে সব ছেলেমেয়েই তো রুগ্ন। আচ্ছা, আমি ডাক্তার বসুর সঙ্গে দেখা করব। আমার আলাপ আছে তার সঙ্গে— ।"

অমিতা বলল, "আমার বিবেকে কিন্তু বাধছে। আমার জন্যে আপনার পরিবারে কতকগুলি রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে—সেটা কি ভালো হবে ?"

সঞ্জয় বললেন, "দেখ অমিতা, তুমি যেভাবে জিনিসটাকে দেখছ আমি সেভাবে দেখছি না। তোমার মতো মেয়ে আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে এই পরম প্রাপ্তিকে লাভ লোকসানের হিসেব ক'রে লাঞ্ছিত করতে চাই না। তুমি এই রক্ত পরীক্ষার কথা যদি আমাকে না বলতে আমি কিছুই জানতে পারতাম না, ও কথা আমার মাথাতেই আসত না। কিন্তু তুমি একথা আমাকে বলেছ বলেই তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তুমি শুধু সুন্দর নও, তুমি মহৎ—"

অমিতা ঘাড় হেঁট ক'রে বসেছিল।

সঞ্জয় বললেন, "তাহলে—"

অমিতা যখন ঘাড় তুলল তখন দেখা গেল তার দুটি চোখেই জল টলমল করছে।

পাগলির প্রশ্ন

সেদিন একটা সাহিত্য সভায় গিয়েছিলাম। সভায় অনেক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় ছিলেন, সাহিত্যিকরাও ছিলেন অনেকে। শরৎবাবুর সাহিত্য সৃষ্টি নিয়েই আলোচনা হয়েছিল সভায়। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শরৎবাবুর প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করবার

চেষ্টা করেছিলেন সাহিত্যিকেরা। আমি আলোচনা করেছিলাম শরৎচন্দ্রের নির্ভীকতা নিয়ে।

সভা শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। নিজের মোটর ছিল না। কারও মোটরে জায়গা হ'ল না আমার।

হেঁটেই বাড়ী ফিরলাম। বড় রাস্তায় আলো ছিল। কোনও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু বড় রাস্তার উপর আমার বাড়ী নয়। গলির গলি তস্য গলির ভিতর আমার বাসা। সব জায়গায় আলো নেই। গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই শুধু আলো আছে একটা। অন্যমনস্ক হ'য়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল।

"শুনুন—"

দেখি আলোর নীচে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাপড় নেই, চোখ দুটি যেন জ্বলছে। অপরূপ রূপসী।

"আমাকে বলছেন ?"

"হ্যাঁ, আপনাকে। আপনি এখনি শরৎবাবুর নির্ভীকতা নিয়ে আলোচনা করে এলেন সভায়। কিন্তু সত্যি কি তিনি নির্ভীক ছিলেন ? আপনিই বলুন যে সব মেয়ে প্রেমে পড়ে তারা সবাই কি পাগল হ'য়ে যায় ? সুস্থ মস্তিষ্কে বহাল তবিয়তে সমাজে থাকবার কি অধিকার নেই তাদের ?"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"তাহলে আমাকে তিনি পাগল করে দিলেন কেন ? কেন জানেন, ভয়ে। পাছে কেউ বলে ওই পাপিষ্ঠার তো কোন শাস্তি হল না। তাই আমাকে পাগল করে দিলেন !"

"কে আপনি।"

"আমি কিরণময়ী।"

মনুর মা

"আ মর মুখ পোড়া। কানের কাছে খালি কা কা কা। জ্বালাতন করে মারলে আমাকে। দূর হ হুস" জানলার ধারে যে আমড়া গাছটা ছিল তারই ডালে ব'সে ডাকছিল কাকটা। মনুর মায়ের তাড়া খেয়ে উড়ে গিয়ে বসল পাশের বাড়ির ছাতে।

ছাতে বসতেই মনুর মা বুঝতে পারলেন কাকটা খোঁড়া। কে তার একটা পা কেটে দিয়েছে। ভাল ক'রে চলতে পারছে না বেচারি। আহা ! তাঁর মনে পড়ল তাঁর মনুরও পা কাটা গিয়েছিল রেলে। সে বাঁচে নি। সবাই কিন্তু তাঁকে মনুর মা বলে ডাকে এখনও। মনু চলে গেছে।

পা-কাটা খোঁড়া কাকটাকে দেখে অনেকদিন পরে মনুর কথা মনে পড়ল তাঁর। মুহূর্তের মধ্যে অনেক দূরে চলে গেলেন তিনি। হাসপাতালে মনুর বিছানার কাছে ব'সে অছেন যেন। মনু অজ্ঞান। কাটা পায়ের ব্যান্ডেজটা রক্তে ভিজে গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল আলমারিতে একটা নাড়ু আছে। নারকেল নাড়ু। মনু খুব ভালবাসত।

এর পরই মনুর মা নারকেল নাড়ুটা বার ক'রে নিয়ে এলেন। সেই কাকটার দিকে নাড়ুটা তুলে বললেন, "আয়, আয় খা।"

কাকটা কিন্তু এল না।

উড়ে গেল।

তিন রকম

॥ ১ ॥

সেকালের একটি বিধবার মনোভাব

এখনও তো আছে মোর সে বাহু মৃণাল
তেমনি কোমল শুভ্র, নয়নে অধরে
এখনও সে ভাষা আছে, হৃদয়ে উত্তাল
শোকের তরঙ্গ শুধু কহে হাহা-স্বরে
তুমি নাই তুমি নাই শুধু। নিশীথিনী
আজও আসে পুঞ্জীভুত রহস্যের মতো
তারা-ভরা আকাশ ব্যাপিয়া, একাকিনী
বাতায়নে আজও করি প্রতীক্ষা সতত
হে প্রিয় তোমারি লাগি। মৃত্যু-পারাবার
এতই দুস্তর কি গো স্বামী-প্রাণা সতী
উত্তরিতে পারিবে না? অন্তর আমার
মানে না তা,—ব্যর্থ নাহি হয় পুণ্যবতী;
মৃত্যু-ভেদী আলো জ্বলে আমার প্রদীপে
যাব আমি প্রিয়তম তোমার সমীপে।

॥ ২ ॥

একটি অতি-আধুনিকা বিধবার আচরণ

রঙীন শাড়ি-পরা বিধবাটি
ফোন তুলে বললেন—হ্যালো, কে?
ও আপনি?
সত্যি? সিনেমায় নিয়ে যাবেন?
বাঃ, কি মজা।
সেদিন কিন্তু নিয়ে যান নি।
মল্লিকা সঙ্গে ছিল?
সে আবার কে!

না, আলাপ করতে চাই না
আমি যাব না সিনেমায়
আজও আপনি ওকে নিয়েই যান।
[কিছুক্ষণ শোনবার পর]
বেশ, যেতে পারি
জরিমানা যদি দেন।
নিশ্চয়, জরিমানা দিতে হবে বই কি !
কত ?
বেশী নয়।
সিনেমার পর
চীনে হোটেলে
মাংস আর চাউচাউ
মুরগি শুয়োর যাই হোক।
বেশ, আপনার দেওয়া শাড়িটাই পরে যাব,
শাড়ির রংটা সত্যিই পাগল-করা—
আপনার রুচির প্রশংসা করি।
গাড়ি নিয়ে আসবেন তো ?
বেশ, বেশ,
আমি "রেডি" হ'য়ে থাকব।
ছিঃ, ফোনে এসব কি কথা
দেখা তো হবেই একটু পরে।

পাশেই বিদ্যাসাগরের একটি মূর্তি ছিল
সেটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—ওফ্।

দাদুর উত্তর

খোকন তখন ছোট ছিল। মাত্র দশ বছর বয়স। একদিন গঙ্গার ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখছিল সে। ভাদ্রের ভরা গঙ্গায় প্রতিফলিত হয়েছে রঙিন মেঘে ভরা পশ্চিমের আকাশ। আকাশে কত রকম রং! যে সাতটা রং রামধনুতে দেখা যায় তা তো আছেই, তাছাড়া আছে আরও নানা রকম রং যার নাম খোকন জানে না। ফিকে হলুদের সঙ্গে ফিকে গোলাপী। কালো মেঘের টুকরোটিকে ঘিরে সোনালীর পাড়, বেগুনী আর লালের অদ্ভুত সমন্বয়, নীলের মাঝে মাঝে রুপোলী ছাপ, ওদিকে একটা দৈত্যাকার মেঘ সর্বাঙ্গে আবীর মেখে বসে আছে, পাহাড়ের উপর লাল টুকটুকে শাড়ি পরে হাত তুলে কাকে ডাকছে ওই শ্যামলা রঙের ছোট্ট মেয়েটি, উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা শ্বেত হস্তী, তার মুখে লালের আভা আর সর্বাঙ্গ দুগ্ধ-ধবল। একটা

রূপকথা যেন মূর্ত হয়েছে পশ্চিম আকাশে। ওপাশ থেকে ঝরে পড়ছে একটা আলোর ঝরনা, এ পাশে ছোট ছোট মেঘগুলি ভেসে চলেছে রঙের নদীতে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল খোকন। হাতে ছিল চিনে বাদামের ঠোঙা। হাতে ধরাই ছিল, খেতে ভুলে গিয়েছিল খোকন। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। কি মহোৎসব হচ্ছে ওখানে, অথচ কোন গোলমাল নেই, হাততালি নেই, মাইক নেই। একটু পরেই কিন্তু খোকন বলে উঠল—একি? রংগুলো সব ফিকে হয়ে যাচ্ছে যে! বদলেও যাচ্ছে! একটা অন্ধকারের পরদা ঢেকে ফেলছে সব যেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে রাত্রি নেমে এল। খোকন হতভম্ব হয়ে বসে রইল। তার বারবার মনে হতে লাগল এত শীঘ্র সব ফুরিয়ে গেল কেন? কোথা গেল এত রং? কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গেল? চানাচুরের ঠোঙাটার সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল সে। চানাচুর বার করে চিবুতে লাগল, কিন্তু গঙ্গার ধার থেকে উঠতে পারল না সে। কিসের একটা মোহ তাকে যেন আটকে রাখল অনেকক্ষণ। যে অপরূপ দৃশ্য সে এতক্ষণ দেখেছে তা যে আবার আকাশে দেখা দেবে এ আশা তার ছিল না, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে উত্তরটা সে খুঁজছে এত রং কোথায় গেল তা বোধহয় এইখানেই পাওয়া যাবে। অনেকক্ষণ বসে রইল কিন্তু কোনও উত্তর পেল না সে। বাড়ি ফিরে গেল শেষে। গঙ্গার ধারে বসে সন্ধ্যা সে আরও কয়েকবার দেখেছে, কিন্তু এ সব কথা মনে হয়নি। সব সময় সব কথা কি মনে হয়? হঠাৎ তার মনে পড়ল নিউটন সাহেব আপেলের গাছ থেকে পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছিল গাছ থেকে আপেলটা কিসের টানে মাটিতে পড়ছে। আপেল-পড়া তিনি নিশ্চয়ই আগে অনেকবার দেখেছিলেন কিন্তু একবারই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল আপেল পড়ে কেন? খোকনেরও একবার মনে হয়েছে এত রং কোথা থেকে এল, কোথায়ই বা গেল। হয়তো সে-ও একদিন বড় একটা আবিষ্কার করে ফেলবে এর উত্তর।

বাড়ি ফিরে দেখল মনীশবাবু বসে আছেন। মনীশবাবু তার প্রাইভেট টিউটার। রোজ সন্ধ্যাবেলা পড়াতে আসেন। তাঁকে দেখে খোকন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সত্যিই আজ বেড়িয়ে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

"খোকন, আজ তোমার এত দেরি যে? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"গঙ্গার ধারে বসে ছিলাম। কি সুন্দর সূর্যাস্ত যে দেখলাম মাস্টারমশাই। মেঘে মেঘে কি চমৎকার রং। ভাবছিলাম এত রং আসে কোথা থেকে। আর আসেই যদি কিছুক্ষণ পরে চলে যায় কেন। একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল। তাই গঙ্গার ধারে বসে বসে ভাবছিলাম কেন এমন হয়—"

মাস্টারমশাই বললেন—"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। রং আসে সূর্যের আলো থেকে। পৃথিবী নিজের চারদিকে ঘুরছে, তাই আমাদের দিন রাত্রি হচ্ছে। তাই সূর্যকে সকালে পূর্বদিকে আর সন্ধ্যায় পশ্চিম দিকে দেখা যায়। সূর্য যখন চক্রবাল রেখার কাছে থাকে তখন আলোর রংগুলো আমরা দেখতে পাই, আর তখন সেখানে যদি মেঘ থাকে তাহলে সে রং মেঘে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে তাই মনে হয় সূর্য ক্রমশঃ সরে সরে উপরের দিকে উঠছে। উপরে উঠলে সূর্যের আলোর রং আমরা দেখতে পাই না, সাতটা রঙে মিলে যে সাদা আলো হয়েছে সেইটেই তখন দেখতে পাই, সে আলোকে আমরা বলি রোদ—"

খোকন জিজ্ঞেস করলে—"দুপুর বেলার সূর্যে রং দেখা যায় না কেন ?"

মাস্টারমশায়ের বিদ্যা অল্প। তিনি বিশদ করে ব্যাপারটা খোকনকে বোঝাতে পারলেন না।

বললেন—"যায় না বলেই যায় না। এখন তুমি ইতিহাসটা খোল দেখি !"

মাস্টারমশাই সোৎসাহে ইতিহাস পড়াতে লাগলেন। ইতিহাস শেষ করে ভূগোল, তারপর অঙ্ক—।

পুরো দুটি ঘণ্টা পড়িয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

বাইরের প্রকাণ্ড হলটার একধারে খোকনের পড়ার টেবিল। আর একধারে একটা খাট। সে খাটে খোকনের দাদু সন্ধ্যের সময় শুয়ে শুয়ে বই পড়েন তামাক খেতে খেতে। মাস্টারমশাই চলে যাবার পর দাদু খোকনকে ডাকলেন।

"দাদু, শোন। আজ গঙ্গার ধারে গিয়েছিলে বুঝি—সূর্যাস্ত দেখলে ?"

"হ্যাঁ অতি চমৎকার। কিন্তু অত রং এলই বা কেন, গেলই বা কেন তা বুঝতে পারলাম না। মাস্টারমশাই যা বললেন তা-ও আমার মাথায় ঢুকল না।"

দাদু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "আমি কিন্তু উত্তরটা জানি। শুনবে সেটা ?"

"বল না—"

সূর্য মহা দাতা লোক। সর্বদা দান করছেন। তাই তাঁর ছেলে কর্ণ দাতাকর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সকালে এসেই একবার অজস্র রং দান করেন, আবার সন্ধ্যাবেলা অস্ত যাবার সময়ও অজস্র রং দান করেন। তাঁর সেই অজস্র দানের ছবি খানিকক্ষণের জন্য আকাশে ফুটে ওঠে তারপর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। তাই আর আকাশে দেখা যায় না—"

"তাই নাকি ! পৃথিবীতে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে সে সব রং ?"

"সর্বত্র। তোমার মায়ের মুখে, তোমার বাবার ভালবাসায়, তোমার বোনের চোখের দৃষ্টিতে সেই রং রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমার হাসিতেও হয়তো একটু আছে সেই রং। সবার মধ্যেই আছে। ফুলে আছে, ফলে আছে, পাখির পালকে আছে, প্রজাপতির ডানায় আছে। আমাদের স্নেহে, ভালবাসায়, ত্যাগে, ক্ষমায় সেই রং লুকিয়ে আছে। সেই রঙেই পৃথিবী রঙিন।"

দাদুর উত্তরটা খোকনের ভাল লাগল। এখন খোকন বড় হয়েছে। বিজ্ঞানের বই পড়ে সন্ধ্যা-ঊষার বর্ণমহিমার তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু দাদুর উত্তরটা এখনও ভালো লাগে তার। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হয় ওইটেই হয়তো সত্যি।

মুরলীর শেষ সুর

মুরলী বসু আমার বাল্যবন্ধু ছিল। সহপাঠী ছিল সে আমার। কিন্তু সহপাঠী মাত্রেই বন্ধু হয় না। মুরলী আমার বন্ধু ছিল। সে যে নিখুঁত মানুষ বলে তাকে ভালবাসতাম তা নয়, অনেক খুঁত ছিল তার। মনে হয় খুঁতগুলোর জন্যই ভালবাসতাম

তাকে। অনর্গল মিথ্যা কথা বলতে পারত। মিথ্যার সেতু দিয়ে বিপদের নদীটা পার হয়ে ওপারে পেঁৗছে অকপটে স্বীকার করত 'স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে চলে এলাম।' রগচটা লোকও ছিল সে। কথায় কথায় যেখানে সেখানে মারামারি করে বসত। দু'তিনবার পুলিস লক-আপে কাটাতে হয়েছে তাকে। আমরাই চেষ্টা-চরিত্র করে ছাড়িয়ে এনেছি। একবার এক দারোগা সাহেব বলেছিলেন মনে পড়ছে, আপনার বন্ধুটি অদ্ভুত। এতক্ষণ আমাদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। তার দরাজ গলায় হো হো হাসি, তার ছোট ছোট কৌতুক-গল্প-কণা, তার ভদ্রতা, তার গান গাইবার ক্ষমতা সত্যিই মুগ্ধ করে ফেলত সবাইকে। লেখা-পড়ার চেয়ে স্পোর্টসেই বেশী কৃতিত্ব ছিল মুরলীর। এম. এ. পরীক্ষায় কোনক্রমে একটা সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল, কিন্তু এক ফুটবল ম্যাচে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলায় সে এমন কৃতিত্ব দেখাল যে চারদিকে হই হই পড়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ আমলের একজন গভর্ণর। তিনি মুরলীর খেলায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরই অনুগ্রহে একটা বড় চাকরি পেয়ে গেল মুরলী। সেই চাকরিই সে বরাবর করছিল। বেশ উন্নতি হয়েছিল, হোমড়া-চোমড়া একজন অফিসার হয়েছিল সে। রিটায়ারও করেছিল বেশ মোটা পেন্সন নিয়ে। চাকরী-জীবনে কিন্তু স্বভাব বদলে গিয়েছিল তার। খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছিল, কোনও ক্লাবে যেত না। হাসিখুশি ভাবটাও ছিল না তত। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল একটু। আমি শেষের দিকে তার সঙ্গে নিয়মিত মেশবার সুযোগ পেতাম না। কারণ আমাকে নিজের সংসারও সামলাতে হত। তবু মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন গিয়ে দেখি সে রামায়ণ পড়ছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। পাশে যে টেবিলটা ছিল তাতে দেখলাম গীতা, উপনিষদ, ভাগবত, বিবেকানন্দের বই স্তূপীকৃত। মহাভারতও রয়েছে একখানা।

বললাম, "কিরে মুরলী, এসব কি ব্যাপার—"

মুরলী মুচকি হেসে চুপ করে রইল, তারপর বলল, "নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়েছি। অন্য কিছু আর ভাল লাগছে না।"

"শুনেছিস আজ রাস্তায় দুটো খুন হয়ে গেছে।"

"আমি খবরের কাগজ পড়ি না আজকাল। খুন হয়েছে নাকি। ও তো হবেই। যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল মুষল প্রসব করে। আমাদের বংশেও এঁরা মুষল প্রসব করেছেন, তার নাম রাজনীতি, যার অন্তরালে আছে গদি পাওয়ার লোভ। সুতরাং এরকম খুনোখুনি চলবেই।"

"তুই কাগজ পড়িস না ? আশ্চর্য তো !"

"কাগজ পড়ি না কারণ সুখ পাই না। কাগজে এমন কিছু থাকে না যা আমার পক্ষে প্রয়োজনীয়। বলিভিয়া বা রাশিয়াতে কি হচ্ছে, আমাদের দেশের কোন পার্টির লোক বিরুদ্ধ পার্টির ক'টা লোককে খুন করল, গ্রীসের কোন মেয়ে ক'টা শিশু প্রসব করেছে, কোন বারোহাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি বেরিয়েছে, এসব খবর পড়ে সুখ পাই না ভাই। ক্লাবে, বৈঠকখানায় বসে ঘোঁট করতে যেমন ভাল লাগে না, বিশ্ব-ঘোঁটের আসর খবরের কাগজ পড়তেও তেমনি ভাল লাগে না। তার চেয়ে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে সুখ পাই বেশী। তুইও আরম্ভ কর, ভারি আনন্দ পাবি। বিবেকানন্দ পড়তে আরম্ভ কর "

বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা' বইটা সে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

তার কয়েকদিন পরে খবর পেলাম মুরলীর বড়ছেলেকে কে যেন রাস্তায় ছুরি মেরেছে। মুরলীর স্ত্রী দুটি ছেলে রেখে অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। মুরলী ইচ্ছা করলে অনায়াসে আবার বিয়ে করতে পারত। কিন্তু সে করে নি। সে তার পুরাতন ভৃত্য সহায়ের হাতেই সমর্পণ করেছিল নিজেকে। সহায়ই তার দেখাশোনা করত। সহায় বাঙালী ছিল না। কাশীর লোক ছিল সম্ভবত। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারত। মুরলীর ছেলের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম একদিন। আশঙ্কা হয়েছিল গিয়ে দেখব মুরলী খুব মুষড়ে পড়েছে। কি ভাষায় তাকে সান্ত্বনা দেব তা মনে মনে 'মকসো' করতে করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। মুরলী হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমি তার ছেলের কথা তোলবার আগেই বলল—"প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়ে গেছে। বড়খোকা মারা গেছে। ছোটটাও যাবে, ওটাও শুনছি বোমা বন্দুক নিয়ে ঘুরছে!"

"প্রায়শ্চিত্ত? কার প্রায়শ্চিত্ত?"

"আমার। আমি ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করতে পারি নি। ওদের খবরাখবর রাখবারও সময় হত না আমার। আমি ব্যস্ত থাকতাম আমার আপিস আর ক্লাব নিয়ে। স্কুল কলেজে গিয়ে ছেলেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে না, করে ডিগ্রি। আশা করে সেই ডিগ্রির জোরে তারা কোথাও চাকরি পাবে, কিন্তু তা পাচ্ছে না। সুতরাং ওরা ক্ষেপে উঠবেই—"

"কিন্তু—এ যুগে—"

আমাকে থামিয়ে দিলে মুরলী।

বললে—"সব যুগেই এই হয়েছে, এক যুগে আমরা পাপ করেছি, পরবর্তী যুগে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তার। বহুবিবাহ, সতীদাহ, বক্তিয়ার খিলিজিকে ডেকে আনা, ইংরেজদের ডেকে আনা, ছেলেদের সুশিক্ষিত না করে ইংরেজদের কেরানী করবার জন্য চেষ্টা, গদির লোভে দেশভাগ করা—এ সবই পাপ, মহাপাপ। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? আমি তো মাত্র দুচারটে পাপের কথা বললাম, পাপের পুরো তালিকা আরও প্রকাণ্ড। এককথায় পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নান্য পন্থাঃ—"

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম।

সন্দেহ হতে লাগল মুরলীর মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো।

হঠাৎ মুরলী বললে—"ঈশ্বরকে ডাকো, যদি অবশ্য তোমার ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে। তা-ও আজকাল অনেকের নেই। আমারও নেই ভাই। সেকালের পুরাণকাররা যে ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিলেন সেটা বার বার আওড়াই, কিন্তু মন যে আমার মরুভূমি—ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই, আমার প্রার্থনা কি সফল হতে পারে? হবে না।"

"কি প্রার্থনা কর তুমি—"

মুরলী মুখস্থ বলার মতো বলে গেল—"শোন তাহলে। হে দেবতা, জাগ্রত হও। বিভীষিকাময়ী রজনী সমুপস্থিত। অবিশ্রান্ত বারি-পাতে কর্দম পিচ্ছিল পথ; মুহুর্মুহু বিদ্যুতে ও মেঘ-গর্জনে আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মনে হইতেছে যেন প্রিয়পরিজনের কাঁচা মাংস ও তপ্ত রক্তের উপর দিয়া চলিতেছি। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি আতঙ্কে স্তব্ধ হইয়া আছে। সকলেরই নিজেকে বড়

একা, বড় অসহায় মনে হইতেছে, যেন আর কেহ নাই। অন্ধকারে আমারই মতো আর যাহারা চলিতেছে তাহাদের সহিত মুখোমুখি হইলেই হিংস্র পশুর মতো পরস্পর চাহিয়া দেখিতেছি, পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার বাসনা, অথচ যেন পরস্পরকে হনন না করিয়া চলিবার উপায় নাই।···তোমাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না। আমাদের লাঞ্ছনার সীমা নাই। তবু রুদ্ধ নিশ্বাসে ভীত শঙ্কিত প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি, হে দেবতা, জাগ্রত হও। পাপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, জননীর বক্ষে স্তন্যদুগ্ধ নাই, ক্ষুধিত শিশুরা ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছে। অসহায় নারীদের আর্তনাদে কর্ণ বধির হইয়া গেল। এত আঘাত সহ্য করিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি। তোমার প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু অন্ধ হইতে বসিয়াছে। শাসনে, পীড়নে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়াছে। হে অন্ধকারের দেবতা, হে কৃষ্ণ, তুমি জাগ্রত হও।"

মুরলী চুপ করল। তারপর বলল—"যে বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা কৃষ্ণকে ডেকেছিলেন সে বিশ্বাস আমাদের নেই। তোমার আছে কি? আমার তো নেই। তাই যদিও ওই প্রার্থনা মনে মনে আওড়াই. কিন্তু তা কখনও সফল হবে বলে আশা করি না। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

মুরলী চুপ করে গেল।

বললাম, "আজ তাহলে উঠি। ভেঙে পড় না। আবার আসব।"

মুরলী নির্বাক হয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

দিন কয়েক পরেই শুনলাম তার ছোট ছেলেটিও বোমার ঘায়ে মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারলাম না। কি বলব তাকে গিয়ে? কিন্তু তবু যেতে হল একদিন। বেশ কয়েকদিন পরে গেলাম।

মুরলী স্মিত মুখে আহ্বান করল আমাকে।

দেখলাম পাশের ঘরে দুটি ছেলে রয়েছে। তর্ক করছে।

"এরা কারা?"

"আমার ছেলেদের বন্ধু। এখানেই খায় থাকে। ছেলে দুটোকে তো খেতে দিতাম এখন এদের দিই।"

"তার মানে?"

মুরলী মৃদু হেসে বললে—"প্রায়শ্চিত্ত করছি।"

নুটবিহারী

ট্রেনে যাচ্ছিলাম। থার্ড ক্লাস। খুব ভীড় ছিল সেদিন। কিন্তু সেই ভীড়ের মধ্যেই নাছোড়বান্দা ভিখারী জুটেছিল একটা। গায়ে ময়লা একটা ছেঁড়া হাফশার্ট, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল, পরনে একটা খাকি হাফপ্যান্ট। গোঁফ-দাড়ি কামানো, শরীরটিও বেশ হৃষ্টপুষ্ট। মাথায় কদম-ছাঁট চুল কাঁচা পাকা। সে করুণ কণ্ঠে সকলের কাছে হাত পেতে বলছিল, বাবু, আমি খেতে পাই না। কাল থেকে কিছু খাই নি। দয়া করে আমাকে কিছু দিন—

গাড়ি ভরতি লোক, কেউ কিন্তু তাকে একটি পয়সাও দিল না। দু'একজন মন্তব্যও করলেন।

গ্যাট্টাগোট্টা চেহারা, বলে খেতে পাই নি। জোচ্চোরে ভরে গেল দেশটা।

সিনেমা দেখবে মশাই—

কিম্বা নেশা করবে।

অনেক লোক কোন মন্তব্যই করলেন না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন। দু'চারজন বললেন—মাপ কর বাবা।

শেষকালে লোকটা এসে হাজির হল আমার কাছে। আমি পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে দেখলাম একটা সিকি রয়েছে। ভাঙানি পয়সা নেই। লোকটা যখন আমার কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াল—তখন আমার কেমন যেন একটা চক্ষুলজ্জা হল—না বলতে পারলাম না। যদিও বুঝতে পারলাম সিকিটা ওকে দিয়ে দিলে আমার হাতে এক পয়সা থাকবে না, হাওড়া থেকে হেঁটে আপিস যেতে হবে, আপিসে ক্ষিধে পেলে মাঝে মাঝে বুট-ভিজানো কিনে খাই—তাও খাওয়া হবে না।

দয়া করে দিন বাবু আমাকে কিছু। কাল থেকে কিছু খাই নি।

দিয়ে দিলাম তাকে সিকিটা।

ওটা নিয়ে সে সিগারেট খাবে, না খাবার খাবে, তা চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন মনে হল। সত্যি কথা হচ্ছে, লোকটাকে দেখে আমারই আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, একজন ভদ্রলোকের ছেলে, যে কারণেই হোক যখন ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে তখন সেটা আমাদেরই সমাজ-ব্যবস্থার দোষ এবং আমি সেই সমাজের একজন ; সুতরাং আমিও তার জন্যে খানিকটা অপরাধী।

হাওড়া স্টেশনে নেবে গেলাম আমি।

একমাস পরের ঘটনা।

তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে, এ'কশ আশি টাকা। একটু আগেই বাড়িওলা এসে যাচ্ছেতাই করে গেলেন। বলে গেলেন, দিন দশেকের মধ্যে যদি সব ভাড়া শোধ করে না দিই আমার নামে নালিশ করবেন। গিন্নী জানিয়েছেন, তার সবগুলো শাড়িই ছিঁড়ে গেছে। শেলাই করেও আর পরা যাচ্ছে না। তাঁর অন্তত দু'জোড়া শাড়ি চাই। খুব খেলো শাড়ি তিনি পরতে পারেন না। সুতরাং তাঁর দু'জোড়া শাড়ির জন্য অন্তত টাকা পঞ্চাশেক লাগবে। বেশীও লাগতে পারে। আমার বড় ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছিল। পাড়ার ডাক্তারবাবু ফি নেন নি, কিন্তু ওষুধের বিল পাঠিয়েছেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। আমার ছোট নাতির অন্নপ্রাশন হবে, গিন্নী বলছেন সোনার একটা আঙটি দেবেন তাকে। কোন দোকানে নাকি দেখে এসেছেন, পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে। ছোট শালীটির বিয়ে হবে। সেখানেও অন্তত বিশ-পঁচিশ টাকা দামের একখানা শাড়ি না দিলে শ্বশুরবাড়িতে মান থাকবে না। আমার বড় মেয়েটির বিয়ে দিতে পারি নি। সে পড়ছে। এবার কলেজে ভরতি হবে। তার জন্যেও বেশ কিছু খরচ আছে। অকূল পাথারে কোনও থই পাচ্ছিলাম না। অনেক বন্ধুর কাছে ঋণী হয়ে আছি। তাদের কাছে আবার গিয়ে হাত পাতবার উপায় নেই। আমার ঠাকুরদার একটা দামী জামিয়ার আছে। একটি শালওয়ালাকে দেখিয়েছিলাম, সে বলেছিল—এসব জিনিস দুষ্প্রাপ্য আজকাল। বিক্রি করলে অনায়াসে তিনশ' টাকা পেতে পারবেন। দাঁও মাফিক ছাড়লে

আরও বেশী পেতে পারেন। ভাবছি সেই জামিয়ারটাই বিক্রি করে দেব। কিন্তু প্রাণের কথা—বিক্রি করতে ইচ্ছে করে না। পূর্বপুরুষদের ওই একটিমাত্র স্মৃতিই এখনও আছে। তাঁদের ভারী ভারী বাসন-কোসন অনেক দিন আগেই বিক্রি করে দিয়েছি।

এই সব যখন ভাবছি বসে বসে তখন পিওন এল। বললে—একটি রেজেস্ট্রি চিঠি আছে। রেজেস্ট্রি চিঠি? কে লিখবে আমাকে রেজেস্ট্রি করে চিঠি? দেখলাম প্রেরকের নাম হচ্ছে নুটবিহারী সামন্ত। কলকাতায় থাকেন। চিঠিটা খুলে আরও অবাক হয়ে গেলাম। চিঠির সঙ্গে একটা পাঁচ হাজার টাকার চেক্। চিঠিখানি এই ঃ

মান্যবরেষু,

আমার পত্র পাইয়া আপনি নিশ্চয় খুব বিস্মিত হইবেন। আমার কিঞ্চিৎ মাথার ছিট আছে। আমি মাঝে মাঝে হারুণ-অল-রশিদ হইতে চাই। তাই ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়ি। মাসখানেক আগে আমি ভিখারীর ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল কোনও প্রকৃত ভদ্রলোক এখনও আছেন কিনা তাহাই সন্ধান করা। অনেক সন্ধানের পর আপনাকেই পাইয়াছি। নিশ্চয়ই আপনি জানিতে চাহিবেন, আমি ভদ্রলোক খুঁজিয়া বেড়াইতেছি কেন? সব কথা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি। বছর খানেক পূর্বে আমি লটারিতে টাকা পাইয়াছিলাম। ভাবিলাম, টাকাটা লইয়া কি করি। আপনাদের আশীর্বাদে আমার সংসারে কোনও অভাব নাই। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি এবং ব্যবসায় হইতে যাহা উপার্জন করি তাহাতেই আমার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। তাই ঠিক করিলাম লটারির টাকাটা আর সংসারে খরচ করিব না। একটা ভালো ব্যাংকে ফিক্স্ড্ ডিপজিট করিয়া দিলাম।

স্থির করিলাম, যাহা সুদ পাইব তাহা কোন সৎকর্মে ব্যয় করিব। এই প্রথমবার সুদ পাইলাম পাঁচ হাজার টাকা। তখন ভাবিতে লাগিলাম, কোন সৎকর্মে টাকাটা খরচ করি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে মনে হইল আজকাল নিম্ন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরাই সবচেয়ে বেশী বিপন্ন। নিম্ন মধ্যবিত্ত কোন ভদ্রলোককেই টাকাটা দিব। কিন্তু সে ভদ্রলোক কোথায় আছেন তাহার সন্ধান পাইব কি করিয়া? তখন হারুণ অল-রশিদের বুদ্ধিটা আমার মাথায় জাগিল। ভিখারী সাজিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ট্রেনের থার্ড ক্লাসেই নিম্ন মধ্যবিত্তরা যাতায়াত করেন। সেই ট্রেনেই তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিলাম। দশদিন ট্রেনে ট্রেনে ঘুরিয়া কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িতে হইল। কই, ভদ্রলোক কোথায়? শেষে দশদিন পরে আপনার দেখা পাইলাম। দেখিলাম আপনি আপনার মনিব্যাগ ঝাড়িয়া শেষ সিকিটি আমায় দান করিলেন। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আপনি যখন হাওড়ায় নামিলেন আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে নামিলাম। একটু দূরে দূরে আপনার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম আপনি হাঁটিয়া হাওড়ার পুল পার হইলেন। স্ট্র্যান্ড রোডে আপনার আপিসে ঢুকিলেন তাহাও দেখিলাম। আপনি যখন আপিসে ঢুকিয়া গেলেন তখন আপিসের দারোয়ানের নিকট জানিয়া লইলাম আপনার নামটি কি।

পরদিন আমার আপিস হইতে আপনাদের আপিসের ম্যানেজারকে ফোন করিলাম। তাঁহাকে আপনার নাম বলিয়া অনুরোধ করিলাম আপনার ঠিকানাটি যদি আমাকে জানাইয়া দেন আমি বড়ই বাধিত হইব। বলিলাম, ব্যাপারটা একটু গোপনীয়, আমি যাঁহার ঠিকানাটা জানিতে চাহিতেছি তিনি যেন ব্যাপারটা না জানিতে পারেন। ভয়ের

কোনও কারণ নাই, তাহাকে একটা "সারপ্রাইজ" দিতে চাই। আপনাদের ম্যানেজার অতি ভদ্রলোক, তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং আমি আপনার নাগাল পাইয়া গেলাম। এই সামান্য টাকাটা গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনার ভদ্রতা-বোধ যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

আমি কিন্তু নিজের পরিচয় দিলাম না। নীচে যে নাম সহি করিয়াছি তাহা আমার নিজের নাম নহে। খামের উপরে যে ঠিকানা লেখা আছে তাহাও একটি কল্পিত ঠিকানা।

আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি,

ভবদীয় নুটবিহারী

লেখক ও নিধিরাম

"তুমি তোমার জোয়ান বউকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলে? তাকে রক্ষা করবার একটু চেষ্টা করলে না—এতো ভারি আশ্চর্য।"

"পঞ্চাশ বাটজন গুণ্ডার বিরুদ্ধে আমি একা কি করব বলুন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছোরা, বোমা, বন্দুক। পুলিশ পুলিশ বলে চীৎকার করেছিলাম কিন্তু কোনও পুলিশ এল না। একটা গুণ্ডা আমার দিকে বন্দুক তাক করেছিল। আমি পালিয়ে এলাম।"

"পালিয়ে এলে! এ কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার।"

'খুবই লজ্জা করছে, কিন্তু উপায় কি বলুন। আমি যদি রাস্তায় গুণ্ডাদের গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম, তাতে লাভ কি হ'ত! আমার বউকে আমি উদ্ধার করতে পারতাম না, মাঝ থেকে আমার পরিবারটা ডুবে যেত। আমার বুড়ো মা বাবা, আমার দুটি ভাই, দুটি ভগ্নী আছে। আমার উপরই তাদের নির্ভর, পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। গুণ্ডার গুলি খেয়ে মরে গেলে লাভ কি হত বলুন?"

"যাদের আত্মসম্মান আছে তারা অত লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে না। তোমার যদি আত্মসম্মান বোধ থাকত তাহলে ঝাঁপিয়ে পড়তে, ওই গুণ্ডাদের উপর। আসল কথাটা কিন্তু তুমি বলছ না।"

"আসল কথা মানে?"

"তুমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে! এখন লাভ-লোকসানের হিসেব করছ!"

"প্রাণের ভয় কার নেই? আপনিও তো সেদিন একটা ছুটন্ত ষাঁড়ের সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে। আমিও হাঁটছিলাম আপনার পিছু পিছু। আমিও বারান্দায় উঠে পড়লাম। অনেকেই পালিয়ে গেলেন। প্রাণের ভয় সবারই আছে।"

"কিন্তু বউকে গুণ্ডাদের কবলে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসা আর একটা উন্মত্ত ষাঁড় দেখে পালিয়ে আসা কি এক হল? তোমার আত্মসম্মানজ্ঞান থাকলে বুঝতে পারতে দুটোতে অনেক তফাৎ!"

"আপনি সাহিত্যিক মানুষ, আপনি হয়তো তফাৎ বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। আমার কাছে ওই উন্মত্ত ষাঁড় আর উন্মত্ত গুণ্ডার দল একই

জিনিস। ষাঁড়টা আমার বউকে গুঁতিয়ে মেরে ফেলেছে বলে আমিও যে প্রাণ তুচ্ছ করে ষাঁড়টার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব এ রকম বুদ্ধি আমার নেই। অকপটে স্বীকার করছি আমি ভীতু লোক।"

"দেখ নিধিরাম, তোমাকে আমি ভালবাসি বলেই এ সব কথা জিগ্যেস করলাম। কিছু মনে কোরো না। তোমার বউটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার।"

"কি করবেন, ওই ওর অদৃষ্টে ছিল। আমার একটা ছোট বোন আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। প্রদীপ থেকে শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল দেয়ালীর দিন। আমরা বাঁচাবার খুব চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তাকে বাঁচাতে পারি নি। নিয়তির কাছে আমরা অসহায়। আজকাল আমরা আরও অসহায় হয়ে পড়েছি। দেশে অরাজকতা হয়েছে, যার যা খুশি তাই করছে। তাদের বাধা দেবার শক্তি গভর্ণমেণ্টেরও নেই। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা যথেচ্ছাচার হয়ে উঠেছে আজকাল। আমরা গরীব, দুর্বল, আমরা সহ্য করে যাচ্ছি—। ইংরেজদের আমলেও অনেক অত্যাচার অবিচার সহ্য করেছিলাম এদের আমলেও করছি—"

"কাল কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যে—"

নিধিরাম বলল—"কাগজ আমি পড়ি না। আগে পড়তুম, এখন দেখছি পড়ে' কোনও লাভ হয় না, রোজ কতকগুলো দুঃসংবাদ, আর হোমরা চোমরাদের বাজে বক্তৃতা পড়ে কি হবে। সময় নষ্ট খালি, পয়সাও নষ্ট—"

"তুমি তো নিতান্ত মূর্খও নও। কাগজ পড় না?" কাগজ পড়লে জনমত সৃষ্টি হয়, জনমত গণতন্ত্রের চালক—"

"কিন্তু জনমতও আজকাল কেনা যায়, নিজের মত অনুসারে চলবার ক্ষমতা ক'টা লোকের আছে।"

"কিছু পড় না তুমি! ভারি আশ্চর্য তো—"

"মাসিক পত্র পড়ি। বিশেষত আপনার লেখা যে কাগজটাতে বেরোয় সেটা পড়ি—"

লেখক খুশি হলেন এ কথা শুনে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াশুনো করবে। মাসিকপত্রগুলোতেও আজকাল দেশের খবর অনেক থাকে—"

নিধিরাম আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে বললে, "আমি গল্পগুলো পড়ি খালি—"

হা হা করে হেসে উঠলেন লেখক।

বললেন, "ভাল লেখকরাও দেশের বাস্তব সমস্যা ফুটিয়ে তোলেন তাঁদের গল্পে—"

"আমাকে ডেকেছিলেন কেন—"

"তোমার বউয়ের খবর জানবার জন্যে। খবরটা শুনে বড় কষ্ট হয়েছে, মনে হচ্ছে আমারই আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে যেন। তুমি তাকে গুণ্ডাদের হাতে ফেলে পালিয়ে এলে! ছি, ছি, আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে যেন—"

নিধিরাম আরও মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল—"আমি এবার যাই। আপিসের বেলা হল।"

"এস।"

নিধিরাম প্রণাম করে চলে গেল।

লেখক খোলা জানলার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরেই দেখতে পেলেন পাশের বাড়ির মেয়েটি ছাতে উঠে কাপড় শুকুতে দিচ্ছে। রোজই দেয়। লেখকও রোজ তার দিকে চেয়ে থাকেন। আজও রইলেন।

॥ ২ ॥

মাস দুই পরে।

নিধিরাম আর একবার এসে হাজির হল লেখকের বাড়িতে। লেখক বাইরের ঘরেই ছিলেন। নিধিরামের হাতে একখানা মাসিকপত্র।

"কি নিধিরাম কি খবর। হাতে ওটা কি কাগজ—"

"এ মাসের 'বিশল্যকরণী'। আচ্ছা এই গল্পটা কি আপনি লিখেছেন? আপনার নামই তো রয়েছে। ভাবলাম হয়তো অন্য লোকও হ'তে পারে। এক নামের দু'জন লেখক থাকা অসম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ, ও গল্পটা আমার লেখা। পড়েছ? কেমন লাগল?"

"আপনার লেখা!"

বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল নিধিরাম।

"আমারই লেখা। কেন, কি হল—"

"একটা ভদ্র ঘরের মেয়েকে কতকগুলো দুশ্চরিত্র গুণ্ডা হরণ করে নিয়ে গিয়ে নানাভাবে ধর্ষণ করছে আর ওই মেয়েটাও তাদের উৎসাহ দিচ্ছে প্রলুব্ধ করছে—এর বিস্তৃত বর্ণনা আপনি লিখেছেন? সেদিন আপনি আত্মসম্মানের কথা বলছিলেন, এ রকম লেখা লেখবার সময় আপনার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় নি? একটা মেয়েকে অত খারাপ করে আঁকবার সময় আপনার হাত কেঁপে গেল না? আশ্চর্য—"

"আমরা সাহিত্যিক, বাস্তবে যা ঘটছে তা আমাদের লিখতেই হবে।"

"বাস্তব! ও রকম মেয়েকে আপনি দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন বলুন—"

"খবরের কাগজে পড়েছি।"

"খবরের কাগজে যা ছাপা হয় তা সত্যি? একটা উড়ো খবরের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশের মেয়েকে অত হীন করে আঁকলেন আপনি? আর আপনিই সেদিন আত্মসম্মানের কথা বলছিলেন আমাকে? ছি ছি ছি এটা আপনার কাছে প্রত্যাশা করি নি। এতো নোংরা আপনার মন!"

"নোংরা বা পরিচ্ছন্নতার আমি তোয়াক্কা করি না, আমি আর্টিস্ট—"

"আর্টিস্ট হোন বা যা-ই হোন নোংরা মন না হলে অমন নোংরা বীভৎস ছবি আঁকতে পারে না কেউ—"

"দেখ নিধিরাম, তোমার মতো লোকের সঙ্গে আর্ট নিয়ে আমি চর্চা করতে চাই না। আর যে লোক গুণ্ডাদের হাতে নিজের বউকে ফেলে পালিয়ে আসে তার মুখে আত্মসম্মানের বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছেও আমার নেই—"

"আমার বউ ফিরে এসেছে।"

"ফিরে এসেছে? কি রকম—"

"যে গুণ্ডাদের আপনি অত খারাপ করে এঁকেছেন তারা সবাই অত খারাপ নয়। ওই গুণ্ডাদেরই একজন আমার বউকে বাড়িতে দিয়ে গেছে—"

"ও বউকে ফিরে নেওয়াতে আপত্তি করে নি কেউ?"

"করলেই বা আমরা শুনব কেন। আমার যে বোনটা আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে যদি না মরত সর্বাঙ্গে পোড়ার চিহ্ন নিয়ে বেঁচে থাকত তাহলে কি আমরা তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতাম? এ কথা আপনি ভাবলেন কি করে। আমি চললুম। আপনার এই কদর্য লেখাটা আপনার কাছেই থাক।"

মাসিকপত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল নিধিরাম।

অসম্ভব গল্প

সেদিন হরতাল। নার্স, চাকর কেউ আসে নি। বিলেত-ফেরত ডাক্তার কিরণ বসু কিন্তু সেদিন এসেছিলেন তাঁর ক্লিনিকে। রোগীও এসেছিল দু'চার জন। কিন্তু সব শেষে যে রোগীটি এলেন তাঁকে নিয়েই এই গল্প। লোকটির চেহারা ভয়ংকর। বেশ তাগড়া চেহারা। প্রকাণ্ড মাথা, প্রকাণ্ড গোঁফ, বড় বড় গোল গোল চোখ, হাঁড়ির মতো মুখ, বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চওড়া বুকের ছাতি। দ্বারে বেয়ারা ছিল না। সোজা তিনি চলে এলেন ডাক্তারবাবুর সামনে। নমস্কার করে জিগ্যেস করলেন, "আপনিই ডাক্তার কে. বসু?"

"হ্যাঁ, বসুন। কি দরকার আপনার?"

"চিকিৎসা করাতে এসেছি। কিন্তু আমার পুরো পরিচয়টা আগে শুনুন। চিকিৎসা আরম্ভ করবার আগে সেটা শোনা দরকার—"

"বেশ, বলুন।"

"আমি শেরপুরা জংগলে থাকি। আমি জংলি। আপনাদের সমাজে কখনও আসি নি। চিকিৎসার জন্যে আসতে হ'য়েছে।"

"কি হ'য়েছে আপনার?"

"গৌতম বাবা বলেছেন রক্তের চাপ বেড়েছে।"

"গৌতম বাবা কে?"

"তিনি একজন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। শেরপুরা জংগলে তিনি তপস্যা করেন। দয়ার অবতার।"

"তিনি কি ডাক্তার?"

"না। কিন্তু তিনি ডাক্তারের চেয়ে অনেক বড়। তিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তিনি কৃপা না করলে আমি আপনার নাগাল পেতাম না। শেরপুরা জংগলে কেউ আপনার নাম জানে না। তাঁর কৃপাতেই এখানে এসেছি।"

"কি রকম?"

"আমি হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলুম এক গাছতলায়। খানিকক্ষণ পরে জলের ঝাপটায় আমার যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলাম গৌতম বাবা নিজের কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে আমার মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিচ্ছেন, তাঁর কোলের উপর আমার মাথা

রয়েছে ; আমার জ্ঞান হ'তেই তিনি বললেন, তোমার রক্তের চাপ বেড়েছে। তুমি শহরে যাও, এই জংগলে তোমার চিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়। একজন বড় ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এস। তোমার পথ্য কি হবে তা-ও জেনে এস। শহরে চলে যাও তুমি।"

আমি সকাতরে বললাম, "আমি জংলি, শহরে কোথায় যাব ? একবার একটা গ্রামে ঢুকেছিলাম, আমাকে সবাই তাড়া করেছিল।"

গৌতম বাবা ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন আমার পাশে। অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, "পাশের শহরেই ভিক্টোরিয়া রোডের উপর কে. বসু নামে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁর বাড়ির সামনে একটি পিতলের ফলকে তাঁর নাম খোদাই করা রয়েছে। নামের পাশে অনেকগুলো ডিগ্রী। মনে হচ্ছে বড় ডাক্তার। তুমি এঁর কাছেই যাও।"

"আপনি ওঁকে চেনেন ?"

"চিনি না। তবে ডিগ্রীর বহর দেখে মনে হচ্ছে বড় ডাক্তার। এঁকেই তুমি দেখিয়ে এস একবার। উনি যদি কিছু না করতে পারেন তাহলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

তখন বললাম, "গৌতম বাবা, আমার এই জংলি চেহারা নিয়ে শহরে যাব কেমন করে ? আমার ভাষাই বা বুঝবে কে ? আপনি আমার ভাষা বোঝেন, কিন্তু ওই ডাক্তার কি বুঝতে পারবে ?"

গৌতম বাবা বললেন, "সব ঠিক করে দিচ্ছি।" তিনি আপাদমস্তক আমার গায়ে দু'বার হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার যে চেহারা দেখছেন সেই চেহারা হ'য়ে গেল তাঁর হাতের স্পর্শে। তারপর তিনি বললেন, "তুমি বাংলা ভাষা বুঝতে পারবে, বাংলা ভাষা বলতেও পারবে সে শক্তি তোমায় দিলাম। এতেই বুঝতে পারছেন তাঁর কৃপাতেই আমি আপনার কাছে এসেছি। অবশ্য তিনি এ আশ্বাসও দিয়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে আমি নিজ মূর্তি ধারণ করতে পারব। এখন আমার চিকিৎসা শুরু করুন।"

ডাক্তারবাবু সকৌতুকে জিগ্যেস করলেন, "আপনার গৌতম বাবা আর একটা প্রয়োজনীয় কথাও নিশ্চয় ব'লে দিয়েছেন। আমার ফি চৌষট্টি টাকা—"

"না। সে কথা তো বলেন নি। টাকা তো দেন নি আমাকে।"

"কিন্তু সেটা দিতে হবে।"

"তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মনে মনে ডাকি তাঁকে।"

লোকটি হাত যোড় করে স্তিমিত নেত্রে ব'সে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হ'ল এক আশ্চর্য কাণ্ড। ঘরের ছাত থেকে একটা থলি পড়ল ডাক্তারবাবুর টেবিলের উপর।

লোকটির চোখ খুলে গেল। বললেন, "গৌতম বাবা আপনার ফি পাঠিয়েছেন, গুণে দেখুন।"

অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। তাঁর মনে হ'ল অদ্ভুত লোকটা তো। ম্যাজিক জানে না কি !

"গুণে দেখুন।"

ডাক্তারবাবু থলি খুলে টেবিলের উপর উপুড় করলেন। অনেকগুলি চকচকে নূতন টাকা বের হ'ল। গুণে দেখলেন ঠিক চৌষট্টি টাকাই আছে।

"আপনার গৌতম বাবা কি ক'রে পাঠালেন টাকা ? আশ্চর্য তো—"

"সত্যিই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা। আপনি এবার চিকিৎসা আরম্ভ করুন।"

লোকটির দিকে চেয়ে কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। লোকটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। মুখ ভ্রূকুটি কুটিল, গোঁফ জোড়াও যেন ফুলে উঠেছে। বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, "এবার চিকিৎসা শুরু করুন। দেরি করছেন কেন ?"

ডাক্তারবাবু তাঁর নাড়ি দেখলেন।

"জিবটা বার করুন।"

খরখরে প্রকাণ্ড জিবটা বার করলেন লোকটি। তারপর ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্র নিয়ে রক্তের চাপ মাপলেন তিনি। স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠও পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "আপনার রক্ত, পেচ্ছাপ আর পাইখানা পরীক্ষা করাতে হবে।"

"পরীক্ষা করবে কে ? আপনি ?"

"না। অন্য তিনজন ডাক্তার তিনটে জিনিস পরীক্ষা করবেন। একজন পেচ্ছাপ, একজন পাইখানা, আর একজন রক্ত।"

"প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ফি দিতে হবে আবার ?"

"তা হবে বই কি ?"

লোকটির ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হ'য়ে উঠল। নাকের ছ্যাঁদা দু'টো বড় হয়ে গেল। মনে হ'ল চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে !

"গৌতম বাবার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আরও টাকা পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি আর প্রার্থনা করব না। আপনার চক্ষুলজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। আপনি এমনি আমাকে একটা ওষুধ দিন, খেয়ে দেখি।"

"আমার কাছে তো ওষুধ থাকে না, সেটাও কিনতে হবে।"

গর্জন ক'রে উঠল লোকটি।

"আপনি কিছুই করবেন না তো টাকা নিলেন কেন ?" গর্জন শুনে চমকে গেলেন ডাক্তারবাবু। তারপর আরও চমকে গেলেন যখন দেখলেন লোকটি নেই, তার জায়গায় ব'সে আছে প্রকাণ্ড একটি বাঘ।

বাঘ গর্জন ক'রে উঠল—"আপনি টাকা নিয়েছেন কিছু একটা করতে হবে আপনাকে। বলুন আমি কি খাব, আমার পথ্য কি ?"

ডাক্তারবাবু হকচকিয়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"বলুন আমার পথ্য কি ?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "ফল খাবেন।"

"ফল খাব ? আমি বাঘ, আমি ফল খাব ? এই ডাক্তারি আপনি শিখেছেন ?"

থাবা দিয়ে প্রচণ্ড এক চড় মারলেন তিনি ডাক্তারের গালে ! ডাক্তার পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে। জানলা দিয়ে এক লাফে বেরিয়ে গেল বাঘটা।

বীরুর ঘর

বীরু মাঠামাঠি হাঁটছিল। প্রখর দ্বিপ্রহর। হু হু করে হাওয়া বইছে। তপ্ত তীব্র পশ্চিমে হাওয়া। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বীরুর মাথার চুল। বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছে জামা কাপড়। ধুলো বালিও উড়ছে প্রচুর। সমস্ত প্রকৃতি যেন তাণ্ডবে মেতেছে। কোথাও কোন লোকজন নেই। পশু-পাখীও নেই। আছে খালি হাওয়া, ধুলো আর উত্তাপ। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। নিষ্ঠুর সূর্য নিদারুণ উত্তাপ বর্ষণ করছেন নির্মেঘ আকাশ থেকে।

বীরুর জামা কাপড় আধময়লা। জামার খানিকটা ছিঁড়েও গেছে। পায়ে মলিন কেডস্‌। মাথা নীচু করে চলেছে সে। হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ। কোথায় চলেছে বীরু? মিস্টার হালদারের বাড়ি। যত কষ্টই হোক সেখানে তাকে পৌঁছতেই হবে। মিস্টার হালদারই শেষ আশা। তাঁর ডিগ্রীর বোঝা কোন কাজে লাগেনি। সাহিত্য সম্বন্ধে তার গবেষণা না ওসব কথা ভাবতে চায় না সে। মাঠটাই পার হতে হবে আগেই। বীরু হাঁটছে, জোরে জোরে হাঁটছে। এই ঘোর দুপুরে উত্তপ্ত পশ্চিমে হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে এই তেপান্তর মাঠে কষ্ট হচ্ছে না ওর? না, হচ্ছে না। ওইটেই মজা। বীরুর দেহটা এই গরমে মাঠে হাঁটছে বটে কিন্তু মনে মনে ও বসে আছে একটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সুন্দর ঘরে নরম সোফার উপর। সেখানে মাথার উপর আস্তে আস্তে পাখা ঘুরছে। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ। দরজা জানলায় শৌখিন পর্দা ঝুলছে। ঘরে আলো জ্বলছে একটা। বীরু পড়ছে। রবীন্দ্রনাথের "মহুয়া" নূতন করে আবিষ্ট করছে তাকে। শরবতে চুমুক দিতে দিতে পড়ছে তন্ময় হ'য়ে। সামনে আর একটি সোফায় বসে আছে একটি তরুণী। অপরূপ লাবণ্যময়ী। তার হাতেও এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবৎ। বীরু পড়ছে সে শুনছে। তার চোখেও স্বপ্ন। অদ্ভুত অবর্ণনীয় স্বপ্ন। চুপ করে বসে আছে সে।

ফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো, হ্যাঁ আমি বীরু। সত্যি? আমার জন্যে হীরেমন কিনেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয় পুষব। দাঁড়ান গিন্নীকে জিগ্যেস করি—শুনছ, পরেশবাবু আমার জন্যে হীরেমন কিনেছেন। পুষবে?"

যে তরুণীটি সামনে বসেছিলেন তিনি বললেন, "পাখী পোষার অনেক হাঙ্গামা। তবে তোমার জন্যে অনেক হাঙ্গামাই তো পুইয়েছি, এটাও পোয়াব। পাখীকে কি খাওয়াতে হবে জিগ্যেস করে নাও।"

পরেশবাবু বললেন—"এমনি সাধারণ ছোলাটোলাই দিও। তবে কে একজন আমাকে বলেছিল আঙুর খাওয়ালে ওদের গলার স্বর আরও মিষ্টি হয়—"

বীরু বললে—"আমি সকালে আঙুর খাই, তার থেকেই না হয় দেব দু'চারটে।"

"বেশ।"

ফোন কেটে দিলেন পরেশবাবু।

বীরু বললে—"রেডিওটা খুলে দাও তো। এ সময় একটা সেতারের আলাপ আছে। একজন বড় ওস্তাদ বাজাবেন—"

রেডিওতে সেতারের আলাপ চলতে লাগল। তন্ময় হয়ে চোখ বুজে বসে রইল

বীরু। তরুণীটি ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। নিঃশব্দে উঠে নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। তার ঘুম পাচ্ছিল। বীরু যদিও চোখ বুজে ছিল, যদিও তরুণীটি চলে যাওয়ার সময় কোনও শব্দ করেনি, কিন্তু তবু বীরু অনুভব করেছিল ও চলে গেল। বুঝতে পেরেছিল ওর ঘুম পেয়েছে। কল্পনা করছিল পাশের ঘরে ও তার বিছানাটিতে শুয়েছে নরম পাতলা বালিশে মাথাটি রেখে, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় দেহটি প্রসারিত করে । ইলেকট্রিক বেলটা বেজে উঠল ঝনঝন করে। বীরু উঠে দাঁড়াল। কেউ এসেছেন নিশ্চয়ই। কপাট খুলতে প্রফেসার রায় প্রবেশ করলেন। হেসে বললেন, "আজ ছুটি, তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে আসি। ঘুমুচ্ছিলেন নাকি--"

"না। আমি দিনে ঘুমোই না।"

"আপনার থিসিস লেখা কতদূর হ'ল? বিষয়টি বড় ভালো নির্বাচন করেছেন। যদি ভালো ক'রে লিখতে পারেন নাম হবে আপনার। আমি আপনার জন্যে কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করছি, লংফেলো আর তাঁর সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দ, শীলার আর তাঁর সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দ, ব্রাউনিং আর তাঁর সমসাময়িক সমালোচকবৃন্দ। আপনি ঠিকই বলেছেন যে কোনও লেখকের সমসাময়িক সমালোচকরা তাঁর সম্পূর্ণ রূপটা দেখতে পান না, এমন কি যাঁরা তাঁদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'ন তাঁরাও না। সবাই একটা বিশেষ মাপের মাপকাঠি দিয়ে মাপতে যান, কিন্তু রূপকে কি কোনও মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায়?"

পরিষ্কার ফতুয়া-পরা একটি বালক ভৃত্য উঁকি দিল দ্বারপ্রান্তে।

বীরু হুকুম করলে—"মিস্টার রায়কে শরবৎ এনে দে।"

ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস শরবৎ এনে দিল সে। শরবৎ খেতে খেতে আরও অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন তিনি তার থিসিস নিয়ে। তারপর চলে গেলেন। তারপর এল তার বন্ধু দ্বিজেন। কাল সে খুব ভালো একটা সিনেমা দেখেছে, তারই গল্প করতে লাগল রসিয়ে রসিয়ে। তাকেও এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবৎ খাওয়ালে বীরু। দ্বিজেন চলে যাওয়ার পর এলেন ওস্তাদজি। বিনুকে (সেই তরুণীটিকে) সেতার শেখাবেন। বীরু ভিতরে চলে গেল বিনুকে ডাকতে। ছোকরা চাকরটি জানলার পরদাগুলো সরিয়ে দিতে লাগল: তারপর ভিতর থেকে নিয়ে এল সেতারটা। বিনু এল। শুরু হল সেতারের রেওয়াজ···

এই ঘরটিতে সর্বদা বসে থাকে বিনু। দেহটা তার ঘুরে বেড়ায় মাঠে মাঠে পথে পথে ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, রোদকে তুচ্ছ ক'রে। কিন্তু এ ঘর কোথায়? বীরুর মনে, বীরুর কল্পনায়। বিজ্ঞান দিয়ে এর ব্যাখ্যা যদি করতে হয় তাহলে বলতে হবে বীরুর মস্তিষ্কের মধ্যে। মস্তিষ্কের সেই ঘরটিতে সে ব'সে আছে সদাসর্বদা। বিরূপ প্রকৃতি তাকে বিচলিত করতে পারছে না। তপ্ত 'লু' কাবু করতে পারছে না, তার শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরটিতে ব'সে আছে সে। বীরু মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল, ক্রমাগত হাঁটছিল, প্রাণপণ করে হাঁটছিল, মাঠটা তাকে পার হতেই হবে। মাঠের ওপারে বড় রাস্তা। সেই রাস্তার উপর মিস্টার হালদারের বাড়ি। তিনি একজন ভি আই·পি·। তিনি যদি একখানা চিঠি লিখে দেন নির্ঘাত হয়ে যাবে চাকরিটা। গতির বেগ বাড়িয়ে দিলে বীরু। প্রায় ছুটতে লাগল।

বড় রাস্তায় যখন গিয়ে পড়ল তখন তার পা টলছে, মাথা ঘুরছে। তাকে ঘিরে ধুলো উড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে পশ্চিমে হাওয়া। চোখে অনেক বালি ঢুকেছে। দেখতে পাচ্ছে না ভাল। ওই তেতলা বাড়িটাই কি মিস্টার হালদারের বাড়ি। হ্যাঁ, ওইটেই তো।

রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানেই টাল খেয়ে পড়ে গেল সে। আর ঠিক সেই সময় একটা মোটর গাড়ি এসে চাপা দিল তাকে। মাথাটার উপর দিয়েই চলে গেল একটা চাকা। মড়মড় ক'রে ভেঙে গেল খুলিটা। কিন্তু তার থেকে বীরুর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর বেরুল না! বেরুল খানিকটা রক্তাক্ত মস্তিষ্ক। ওই মস্তিষ্কের স্পন্দনই কি সৃষ্টি করেছিল ঘরটা বীরুর কল্পনায়? সে কল্পনা কি কোথাও মূর্ত হবে না?

মহারাজ ও বাজিকর

।১।

মণি-মাণিক্য-খচিত সিংহাসনে বসেছিলেন মহারাজ মাথায় সোনার মুকুট পরে। নানা-রত্ন-ভূষিত রাজদণ্ড ছিল তার দক্ষিণ হস্তে। চোখ মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল প্রচ্ছন্ন দর্প। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র-মিত্র দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্ত্রস্ত হয়ে। বিচার করছিলেন মহারাজ। সামনে শৃঙ্খলিত বন্দীর দল দাঁড়িয়ে ছিল। এরা সবাই বিদ্রোহী।

মহারাজ বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"তোমরা বিদ্রোহ করেছিলে কেন?"

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল সবাই।

আবার মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"চুপ করে আছ কেন, উত্তর দাও।"

একজন বন্দী উত্তর দিল।

"মহারাজ, আমরা খেতে পাই না, পরতে পাই না, চাকরি পাই না, ব্যবসা করবার সুযোগ পাই না। খাজনার জন্যে আপনার পাইকরা আমাদের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করেছে। সুবিচার কোথাও নেই—"

"চোপরাও—"

গর্জন করে উঠলেন মহারাজ। তারপর সকলের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

টানতে টানতে বন্দীদের নিয়ে গেল প্রহরীরা। ঝমঝম করে বাজতে লাগল শিকল। হঠাৎ একজন বন্দী পিছন ফিরে বলল—"মহারাজ, দিন বদলে যাবে। আমাদের স্বপ্ন মূর্তিমান হয়ে আসবে একদিন।"

মহারাজ আদেশ দিলেন—"হত্যা করবার আগে ওর জিভটাও কেটে নিও।"

তাই হল।

।২।

দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন মহারাজ। সেদিনও সভা বসেছিল। মহারাজ স্বর্ণ-সিংহাসনে বসে স্বর্ণমুকুট মাথায় দিয়ে সেদিনও আস্ফালন করছিলেন নিজের সদম্ভ মহিমা। সেদিনও অনেকগুলি দরিদ্র বন্দীকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ

দিলেন তিনি। তারা খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে। বন্দীরা চলে গেল। সভার কাজ সমাপ্তপ্রায়, এমন সময় দৌবারিক এসে খবর দিল, "মহারাজ, বাইরে একটি বাজিকর এসেছে, সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কি আসবার অনুমতি দেবেন ?"

"না, আমার এখন সময় নেই।"

কিন্তু কি আশ্চর্য, মহারাজের কথা শেষ হতে না হতেই বাজিকর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হল মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন। তার হাতে একগোছা সরু সরু দড়ি।

বলল. "মহারাজ, আমার বেয়াদপি মাপ করুন। সত্যিই আপনার আর সময় নেই, কিন্তু দু-একটা খেলা আপনাকে দেখাবই।"

এই বলে, সে দড়ির গোছাটা মাটিতে ফেলে দু-পায়ে দলতে লাগল তাদের, লাফাতে লাগল তাদের উপর, জোরে জোরে লাথি মারতে লাগল তাদের, যা হল তা আশ্চর্য কাণ্ড। প্রত্যেকটি দড়ি রূপান্তরিত হয়ে গেল সাপে। ফণা তুলে দাঁড়াল তারা। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্র-মিত্ররা দুদ্দাড় করে ছুটে পালিয়ে গেলেন সভা ছেড়ে। সভা খালি হয়ে গেল। মহারাজের সামনে চারটে বড় বড় গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। সবিস্ময়ে বসে রইলেন মহারাজ।

তারপর হাঁক দিলেন—দৌবারিক !

কেউ সাড়া দিল না।

আবার হাঁক দিলেন—সেনাপতি !

কোন সাড়া এল না।

তারপর যা হল তা আরও বিস্ময়কর।

মহারাজের মনে হল তিনি যেন খুব হালকা হয়ে গেছেন। মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন স্বর্ণমুকুট নেই, গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন রাজ-পরিচ্ছদ নেই। রাজদণ্ড অন্তর্ধান করেছে। এমন কি রাজ-সিংহাসনটাও রূপান্তরিত হয়ে গেছে নড়বড়ে একটা কাঠের টুলে। ছেঁড়া কামিজ আর আধময়লা কাপড় পরে কাঠের টুলের উপর বসে আছেন মহারাজা।

মহারাজ হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "বাজিকর তোমার বাজি দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। পুরস্কার দেব তোমাকে। এইবার কিন্তু বাজি শেষ কর—"

বাজিকর স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, "আমি বাজিকর নই। এ বাজি শেষও হবে না—"

"বাজিকর নও ! কে তুমি ?"

"আপনি এতদিনে যে সব প্রজাদের অন্যায় অত্যাচার করে মেরে ফেলেছেন আমি তাদের প্রতিভূ—"

"কি রকম ?"

"তাদের কান্না থেকে আমি জন্মেছি, তাদের সম্মিলিত শক্তি আমাকে শক্তিমান করেছে। আমি যা খুশি করতে পারি।"

"তাদের কান্না থেকে তোমার জন্ম হয়েছে ? বল কি ?"

"তাদের কান্না থেকে আর একটা জিনিষও হয়েছে, অশ্রুর সাগর। সেই সাগরে আপনাকে যেতে হবে। এরা নিয়ে যাবে আপনাকে।"

"কারা ?"

"যে সাপ চারটে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ওরা সাপ নয়। আপনার অত্যাচারে ওরা সাপ হয়ে গেছে। সত্য, ধর্ম, পবিত্রতা, আর সাহিত্য আপনার পীড়নে মারা গেছে, তারপর চেহারা বদলে ফেলেছে। কিন্তু ওদের পূর্বরূপ আমি ফিরিয়ে দেব—"

বাজিকর চারটি সাপকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা যা ছিলে তাই হও" সঙ্গে সঙ্গে সাপ চারটি মানুষ হয়ে গেল।

বাজিকর বলল—"এই ভূতপূর্ব মহারাজকে নিয়ে তোমরা অশ্রুর সাগরে যাও। মহারাজকে সাঁতরে সেই সাগর পার হতে হবে। সেখানে একটা ছোট নৌকোও থাকবে তোমাদের জন্য। সেই নৌকোয় চড়ে তোমরা মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। তারপর যা তোমাদের ভাল মনে হয় তাই করবে। মহারাজের ভার তোমাদের উপর দিলাম।"

॥ ৩ ॥

অশ্রুসাগরের তীরে এসে মহারাজ প্রথমেই দেখলেন তাঁর মুকুটটা জলে ভাসছে।

"ওটা কি ?"

সত্য জবাব দিলেন, "আপনার মুকুটটা।"

"আমার মুকুট তো সোনার ছিল। সোনা জলে ভাসবে কি করে ?"

সাহিত্য হেসে জবাব দিলেন, "সোনা সোলা হয়ে গেছে—"

"ওগুলো উঁচু উঁচু কি দেখা যাচ্ছে জলের ভিতর থেকে।"

"আপনার প্রাসাদ আর আপনার ঐশ্বর্য সম্ভার।"

অপার অশ্রুসাগরের দিকে চেয়ে রইলেন মহারাজ।

"এই সাগর আমাকে সাঁতরে পার হতে হবে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আর দেরি করবেন না, নেমে পড়ুন।"

"আমাকে নিয়ে এরকম করছেন কেন আপনারা ?"

"আপনার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। একটা সাপই ছিল যথেষ্ট তার জন্য। আমরা চারজন আপনাকে বাঁচাতে চাই, তাই এই ব্যবস্থা। নেমে পড়ুন, দেরি করবেন না।"

"যদি না নামি ?"

"তাহলে আরও বিপদে পড়বেন।"

অবশেষে নেমে পড়লেন মহারাজ। নেমেই দেখেন অথৈ জল। সাঁতরাতে শুরু করলেন। কিছুদূরে সাঁতরে যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন ওরা চারজন নৌকায় চড়ে আসছেন তাঁর পিছু পিছু। কিছু দূর গিয়েই হাত পা অবশ হয়ে এল মহারাজার।

চিৎকার করে বললেন, "আমি আর পারছি না—"

নৌকোটা কাছে এল। পবিত্রতা একটু ঝুঁকে মহারাজের হাতটা তুলে নিয়ে ঘষে ঘষে দেখলেন।

বললেন, "না, এখনও হয়নি। এখনও অনেক ময়লা রয়েছে ; মহারাজ আপনি একটু ভেসে থাকুন, তারপর আবার সাঁতার দিন।"

তাই করতে হল মহারাজকে। কিছুক্ষণ পরে আরও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আর পারছি না—"

পবিত্রতা আবার তাঁকে পরীক্ষা করলেন।

বললেন, "না এখনও হয়নি।"

এমনি চলতে লাগল। অশ্রুসাগরের জলে ক্রমাগত নাকানি চোকানি খেতে লাগলেন মহারাজ। কত দিন কত রাত্রি কেটে গেল। শেষে একদিন অজ্ঞান হয়ে গেলেন তিনি।

॥ ৪ ॥

বিরাট এক মাঠে বসেছিলেন মহারাজ।

বাজিকর আবির্ভূত হলেন হঠাৎ।

বললেন, "পবিত্রতা বলেছেন যে আপনার ভিতর আর ময়লা নেই। আপনার দেহ-মন দুই-ই নির্মল হয়ে গেছে। ঠিক করেছি, আপনাকেই আবার আমাদের রাজা করব। কিন্তু একটি শর্তে—"

মহারাজ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

বাজিকর বললেন, "আপনি আমাদের সেবক হবেন। শাসনকর্তা হতে পারবেন না। রাজি আছেন ?"

মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না।

হাত জোড় করে প্রণাম করলেন শুধু।

উল্লসিত হয়ে উঠলেন বাজিকর—"বাঃ, বাঃ, বাঃ। বিনয়ও এসে গেছে দেখছি আপনার মনে। চমৎকার। বেশ, আপনাকে শাসনকর্তাই করব আমরা। সব আগেকার মতো হোক—"

দেখতে দেখতে সেই মাঠে মূর্ত হল রাজসভা। স্থাপিত হল স্বর্ণ-সিংহাসন। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র সবাই এসে দাঁড়াল। বাজিকর মহারাজের মাথায় পরিয়ে দিলেন সোনার মুকুট। হাতে দিলেন রাজদণ্ড। বললেন, "মহারাজ সিংহাসনে বসুন।"

শেয়ালের ডাক

রহিম আবার শেয়াল খুঁজছে।

গল্পটা তাহলে গোড়া থেকেই শুনুন। রহিম মফঃস্বলের একটা শহরে বাস করে। গরীব নয় সে। জমিজমা আছে কিছু। শহরে বাড়িও আছে কয়েকটা। এই আয় থেকেই সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তাছাড়া সে বিয়েও করেনি। বিলাসীও নয়, কিন্তু

খেয়ালী খুব। খেয়ালের জন্যই নানারকম খরচ হত তার। অচেনাকে চেনবার জানবার অদম্য কৌতূহল ছিল রহিমের। ছেলেবেলার খরগোস গিনিপিগ বিলিতি ইঁদুর কাকাতুয়া টিয়া চন্দনা ময়না ছাগল হরিণ—পুষেছে সে। কিন্তু এখন তার চেনা পাখী, চেনা জানোয়ার পোষবার শখ নেই। কিছুদিন থেকে সে এমন সব জানোয়ার পুষতে আরম্ভ করেছে যা সাধারণত কেউ পোষে না। কাক চিল বাদুড় পুষেছিল কিন্তু তাদের বাঁচাতে পারে নি। একটা বকের ছানা এনে অনেক যত্ন করেছিল তার। সেটা ছিল কিছুদিন। পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত আর মাছি খেত। ওর জন্যে বাজার থেকে ছোট ছোট মাছও কিনে আনত রহিম। কিছুদিন ছিল বকটা। তারপর একদিন উড়ে পালাল। রহিম কিন্তু দমে যায় না কখনও। ছোট ছোট কতকগুলো জালের খাঁচা তৈরি করিয়ে ফড়িং টিকটিকি গিরগিটি বিছে, এমন কি সাপ পর্যন্ত পুষেছিল সে। সাপটা ছাড়া আর সবগুলো মরে গিয়েছিল। মুশকিল হত তাদের খাদ্য সংগ্রহ করা। সাপের খাঁচায় মাঝে মাঝে ব্যাঙ দিত সে, কিন্তু সাপটা খেত না। হেলে সাপ আকারে ছোট, বড় ব্যাঙকে সে হয়ত কায়দা করতে পারত না। কিছুদিন বেঁচে ছিল সম্ভবত হাওয়া খেয়ে। ছ'মাস বেঁচে ছিল, কিন্তু তারপর মরে গেল। সজারু ভালুকের বাচ্চা এসবও পুষেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি কাউকে। ভালুকটা দুধ মধু খেত। কিন্তু বন্দীদশায় শেষে রোগে ধরল তাকে। পেটের অসুখ হল, বাঁচল না। শজারু নিরম্বু উপবাস করে মারা গেল। রহিম সুখী হয়েছিল গাছপালাদের নিয়ে। আগে সে ফুলের বাগান করেছিল। চেনা-ফুলের বাগান। গোলাপ, রজনীগন্ধা, গেঁদা, করবী, গন্ধরাজ—নানারকম ফুল ছিল তার বাগানে। কিন্তু চেনা ফুল চেনা গাছ দেখে শেষে তার তৃপ্তি হত না। সে নাম-না-জানা নানারকম বুনো গাছ এনে পুঁতল শেষকালে তার বাগানে। তাদের পাতার বৈচিত্র্য, তাদের ফুল, তাদের ফল মুগ্ধ করত তাকে। তাদের নাম জানত না, পরিচয় জানত না, কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা হ'ত না তার। তাদের দিকে চেয়ে খুব আনন্দ পেত সে। পাখী আর জানোয়াররা তাকে নানাভাবে দাগা দিয়েছিল, গাছেরা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত তিনটি জানোয়ার টিকে ছিল তার কাছে। একটি কাছিম, একটি ব্যাঙ, আর একটি শেয়াল। একটি ছোট্ট ডোবা তৈরি করে তার মধ্যে রেখেছিল সে কাছিমটাকে। ডোবাটা অবশ্য জাল দিয়ে ঘেরা। কাছিমটা ভালই ছিল। ব্যাঙটাকে রেখেছিল বড় একটা প্যাকিং কেসের ভিতর। সে রোজ চরতে বেরিয়ে যেত, আবার ফিরে আসত প্যাকিং কেসে। শেয়ালটা ছিল একটা জালের ঘরে। তিন দিকে জাল, আর একদিকে দেওয়াল। তার শোওয়ার জন্য একটা বড় বাক্সও ছিল ঘরটার মধ্যে। শেয়ালটা রোজ রাত্রে হুক্কা হুয়া বলে ডাকত। কাকে ডাকত কে জানে। বড় করুণ সে ডাক। রহিমের ভারি ভালো লাগত কিন্তু। এই ডাকটি শোনবার জন্যে কান পেতে থাকত সে। শেয়ালের জন্য সে যা খরচ করছে (তা রোজ তিন টাকা করে খরচ হত) তা যেন সার্থক বলে মনে হ'ত ওই হুক্কা হুয়া ডাকটি শোনবার পর। মনে হত শেয়ালের ভাষা সে জানে না, কি বলছে তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়, কিন্তু ওই অস্পষ্টতার মধ্যেই অপরূপ একটা মাধুর্য আছে মনে হ'ত তার। সন্ধ্যার পর সে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকত ডাকটি শোনবার জন্য। একদিন ডাকটি শোনা গেল না। রহিম গিয়ে দেখে ঘরের দরজা খোলা। শেয়ালটা নেই। বিকেলে তাকে মাংস দিয়ে

নিজের হাতে কপাটের ছিটকিনি লাগিয়ে গিয়েছিল। খুলল কে। চাকরটাকে ডেকে জিগ্যেস করল। সে বলল সে এদিকে আসেই নি। কি হল তাহলে! রহিম বিমর্ষ হয়ে বসে রইল তার ঘরে। সে নানারকম জন্তু পুষেছে, হরেক রকম পাখী পুষেছে, কিন্তু শেয়ালটার সঙ্গে তার যেমন একটা আত্মিক যোগ হয়ে গিয়েছিল এমন আর কারো সঙ্গে হয়নি। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। তারপরং চমকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া—তিনবার ডেকে উঠল শেয়াল। আবার ফিরে এল নাকি। টর্চ নিয়ে ছুটে চ'লে গেল সে শেয়ালের ঘরটার দিকে। কপাটটা খোলাই রয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ডাক শোনা গেল হুক্কা হুয়া। রহিম ঘরের ভিতর টর্চের আলো ফেলে অবাক হ'য়ে গেল। ঘরের মধ্যে একটা মানুষ বসে আছে।

"কে তুমি—"

"আমি রাম।"

"ওখানে কি করছ? বেরিয়ে এস।"

শতছিন্ন ময়লা-কাপড়-পরা লোকটা বেরিয়ে এল।

মুখময় গোঁফ দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, চোখ দুটো কোটরগত, গালের হাড় দুটো উঁচু। মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ যেন।

"কি করছ তুমি এখানে—"

"তোমাকে শেয়ালের ডাক শোনাব ব'লে এসেছিলাম।"

"তুমি শেয়ালের ডাক ডাকতে পার নাকি—"

হুক্কা হুয়া করে উঠল আবার লোকটা।

"ব্রাহ্মণের ছেলে, আমাদের বাড়িতে তো তুমি খাবে না।"

"খাব, খাব। আমি আর ব্রাহ্মণ নই, কিচ্ছু নই, আমি ক্ষুধার্ত মানুষ একটা। তোমার পাতের এঁটো কাঁটা দিলেও আমি খাব—"

"এ টাকাটা যখন ফুরোবে, তখন এসো, আবার দেব কিছু। তুমি অনাহারে যাতে না মর তার ব্যবস্থা করব—"

"কেন, তোমার এখানে থাকতাম, তোমাকে শেয়ালের ডাক শোনাতাম। শেয়ালকে যা দিতে আমাকে তাই দিও—"

"না ভাই। শেয়ালের ডাক শেয়ালের মুখে শুনেই আমার আনন্দ হয়। মানুষের মুখে শেয়ালের ডাক—"

রহিম একটু থেমে গেল। তারপর বলল, "আসল কথা কি জান, মানুষের সঙ্গই আমার ভাল লাগে না। আমি বুনো হয়ে গেছি। বুনো গাছপালা, বুনো জন্তু জানোয়ার—এদের সঙ্গই আমার ভালো লাগে—মানুষের সঙ্গ সহ্য করতে পারি না—"

রাম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনাগত যুগেও

বিজ্ঞানীদের, সাহিত্যিকদের, সমাজ-গবেষকদের, অর্থনীতিবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভবিষ্যৎ সমাজে সব মানবই যে মহামানব হইবেন এ বিষয়ে যাঁহারা সন্দেহ করেন তাঁহাদের প্রগতিতে বিশ্বাস নাই। আমি কিন্তু প্রগতিতে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে আগামী যুগের প্রত্যেক মানব মহামানব এবং প্রত্যেক মানবী মহামানবী হইবেন। হয়তো সে যুগে শিশুকে মহাশিশু, কিশোর-কিশোরীকে মহাকিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মহাযুবক-যুবতী বলিতে হইবে। সবই হয়তো বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় সব বদলাইবে কি?

কল্পনা করিতেছি। সেই অনাগত যুগের একটি দৃশ্য মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সু-উচ্চ একটি অট্টালিকার শিখরে বিরাট ছাদে দুইজন মহামানব পাশাপাশি বসিয়া আছেন্। দুইজনেই যদিও মহামানব কিন্তু দুইজনের আকৃতিতে কিছুমাত্র মিল নাই। একজন লম্বা ফরসা, আর একজন বেঁটে কালো। ফরসা লোকটির গোঁফ দাড়ি কামানো। চক্ষুতারকা নীলাভ। বেঁটে লোকটির মুখময় গোঁফ দাড়ি, হাতেও প্রচুর লোম। চোখের তারা বাদামী রঙের। দুইজনে পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। দুইজনেই মহাকাশযাত্রী। একটু পরেই একটা মহাকাশযান এই ছাতে অবতরণ করিবে, তখন তাঁহারা তাহাতে আরোহণ করিবেন। দুইজনেরই টিকিট দুই সপ্তাহ আগে কেনা হইয়াছে, মহাকাশযানে তাঁহাদের আসন নির্দিষ্ট হইয়া আছে।

...ঢন ঢন করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। তাহার পরই কোনও মহিলা কণ্ঠে বেতার-বার্তা ঘোষিত হইল—যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মহাকাশযান ঠিক সময়ে আসিতে পারিবে না। অন্তত দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। এই খবর শুনিয়া দুইজনেই একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। দুই ঘণ্টা! এ সময়টা তাঁহারা কাটাইবেন কি করিয়া। মাঠের মতো বিরাট ছাতের দিকে তাঁহারা দুইজনেই চাহিয়া দেখিলেন। তৃতীয় লোক কেহ নাই। অনেক দূরে একটা খাবার দোকান আছে, কিন্তু সেখানে দোকানী নাই। স্লটে (Slot) পয়সা ঢুকাইয়া দিলে কাগজের সুদৃশ্য থালা বাটিতে খাবার আপনি বাহির হইয়া আসে। খাবার অবশ্য অত্যন্ত দুর্মূল্য। মহামানব দুইজনেই বাড়ি হইতে খাইয়া আসিয়াছিলেন, সেজন্য খাবার দোকানের দিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইলেন না। কিন্তু এই দুই ঘণ্টা সময় কাটে কি করিয়া? খবরের কাগজ উঠিয়া গিয়াছে। দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর বেতারযোগে পৃথিবীময় এবং পৃথিবীর বাহিরেও সমস্ত খবর প্রচারিত হয়। গভর্নমেণ্ট আপিসে সমস্ত খবর টেপ-রেকর্ড করা থাকে। ভালো ভালো গ্রন্থ-গুলিও আর ছাপা হয় না। সব টেপ-রেকর্ডে রের্কড হইয়া আছে। নূতন গ্রন্থকাররাও তাঁহাদের পুস্তক আজকাল ছাপান না। টেপ-রের্কড করান। লাইব্রেরিতে সকলে সেই সব রেকর্ড শুনিতে যান। ছাপাখানা উঠিয়া গিয়াছে। যে দুই একটা আছে তাহাতে বই ছাপানো অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং শিক্ষিত লোকে আগে যেমন পকেটে, ব্যাগে, বাক্সে বই লইয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন মহামানবেরা তাহা করেন না। তাঁহারা কাজ করেন এবং কাজের অবসরে চিন্তা করেন। চিন্তা

করিয়া প্রত্যেককে প্রত্যহ কিছু টেপ-রেকর্ড করিতে হয়। সর্বত্রই টেপ-রেকর্ড করিবার ব্যবস্থা আছে। এমন কি প্ল্যাটফর্মেও আছে। কিন্তু এই মহামানবদ্বয় এমন কোন চিন্তাও করিতেছিলেন না, যাহা রেকর্ড করিবার মতো। মহাযান এখন আসিবে না শুনিয়া দুইজনেই বেশ বিরক্ত হইলেন। লম্বা ফরসা মহামানবটি বলিয়াই ফেলিলেন —"মহা মুশকিলে পড়া-গেল তো।" তাহার পর তাঁহার খর্বকায় সঙ্গীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন?"

"মঙ্গল গ্রহে। আপনি?"

"আমি চাঁদে যাচ্ছি।"

ইহার পর দুইজনেই আবার নীরব হইয়া গেলেন। তাহার পর খুব সম্ভবত আলাপের একটা সূত্র আবিষ্কার করিবার জন্য খর্বকায় মহামানবটি প্রশ্ন করিলেন— "চাঁদে আজকাল জমির দাম কত?"

"অনেক। তাছাড়া জমি কিনলেই তো হবে না। সেখানে বসবাস করতে হলে অনেক সাজসরঞ্জাম দরকার, আধুনিক বিজ্ঞানের ষোল-আনা সাহায্য না পেলে তো সেখানে বাস করাই অসম্ভব। অবশ্য আমি একটা ছোট ঘর করেছি সেখানে। পৃথিবীর গোলমাল থেকে মাঝে মাঝে পালিয়ে যাই। কিন্তু মাসে তিন লক্ষ টাকা করে খরচ হয় এজন্য।"

"আপনি কি কবি—"

"আজ্ঞে না। আমি খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করি। চাঁদেও আমার ছোটখাট একটি ল্যাবরেটরি আছে। বিশ্ব গভর্নমেন্ট অবশ্য আমাকে সাহায্য করেছেন অনেক, তা না হলে পারতুম না—"

তাঁহারা আলাপ করিতেছিলেন অবশ্য বিশ্ব মাতৃভাষায়।

"আপনি মঙ্গলে যাচ্ছেন কেন। সেখানে তো শুনেছি ভয়ানক গরম। থাকবার ব্যবস্থাও তো নেই তেমন। সেখানে গিয়ে উঠবেন কোথা!"

"তা তো জানি না। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে সেখানে—"

"গভর্নমেন্ট পাঠাচ্ছেন আপনাকে? সেখানে জরীপ হবে শুনেছি।"

"আজ্ঞে না, আমি সাহিত্যের অধ্যাপক। জরীপের কিছু জানি না। গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রাণের দায়ে সেখানে যাচ্ছি—"

"প্যাসেঞ্জারদের তালিকায় দেখলাম মহামানব পতঞ্জলি দেব এই আকাশ মহাযানে যাচ্ছেন। তাঁর সাহিত্য-কীর্তি তো ভুবনবিদিত। আপনি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি।"

"হতভাগ্য বলছেন কেন, আপনার মতো—"

"হতভাগ্য কারণ আমি অসুখী। কীর্তি অনেক জুটেছে, কিন্তু সুখ পাইনি।"

"মঙ্গলে কেন যাচ্ছেন—"

"যাচ্ছি আমার তৃতীয় পত্নী কুন্তীর খোঁজে। সে বিশ্ব ব্যাংকের ম্যানেজারের মেয়ে। বড় বড় গভর্নমেন্ট অফিসারের সঙ্গে দহরম মহরম আছে। হঠাৎ কাল এক চিঠি পেলাম সে বিখ্যাত এক জাপানী চিত্রকরের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহে গেছে। আমার কাছে তার আর ফিরবার ইচ্ছা নেই। তাই যাচ্ছি যদি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারি—"

"তাই নাকি! আচ্ছা, কুন্তী দেবী যখন কুমারী ছিলেন তখন তিনি কি কুন্তী ভোস ছিলেন—"

"হ্যাঁ। বরুণ ভোসের মেয়ে—"

খবরটি শুনিয়া ফরসা লম্বা মহামানবটির মনে যে কথা জাগিল তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে তিনি যে কৌতুক অনুভব করিলেন তাহার আভাস তাঁহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। কুন্তী ভোস কুমারী অবস্থায় তাঁহার প্রেমেও পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার চন্দ্রলোকের ছোট বাসাটিতে দুই রাত্রি কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক, বিবাহ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার অসুবিধা হয় নাই কোনও। তাঁহার বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, তাঁহার দরাজ মন—তাঁহার ব্যাংকের সুপ্রচুর আনুকূল্য বহু মহামানবীকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাঁহার দিকে। এখন তিনি চন্দ্রলোকে চলিয়াছেন মিসেস পাকড়াশির জন্য। তিনি তাঁহার বাসায় অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন—"নারীরা আমাদের প্রেরণা এবং সমস্যা দুইই। ওরা না থাকলে আমাদের জীবনের স্বাদ থাকত না এটা যেমন ঠিক, ওরা থাকাতে আমাদের জীবন জটিলও হয়েছে একথাও তেমনি অস্বীকার করা যায় না—"

"স্ত্রীলোকদের চরিত্রহীনতা কি আপনি সমর্থন করেন?"

"আমার বা আপনার সমর্থনে কি আসে যায়? রোহিণী ছিপকার কথা শুনেছেন তো। ও রকম প্রতিভাময়ী মহিলা এ যুগে তো আর হয়নি। উনি কি কারো সমর্থনের তোয়াক্কা করছেন? প্রতি মাসে ওঁর একজন নতুন প্রেমিক দরকার, তা না হলে উনি রিসার্চ করতে পারেন না। উনি আবার কোনও সতর্কতাও অবলম্বন করেন না। ওঁর মতে মিলনের মধ্যে কোনরকম কৃত্রিমতা আনলে মিলন সুখের হয় না। মিলন অবাধ হওয়া চাই এবং সে মিলন ফলপ্রসূ হবে এ সম্ভাবনাটাও মনে জাগরূক থাকা চাই। তিনি বলেন, ফল যদি হয় হোক, ইচ্ছে হয় তাকে রাখবো, না হয় ছিঁড়ে ফেলে দেব। বছরে বার দুই করে তিনি অ্যাবর্শন (abortion) ক্লিনিকে যান। এ যাবত সব ফলই ছিঁড়ে ফেলেছেন। বলেছেন পঁয়ত্রিশ বছর পার হলে একটি রাখবেন। এরা তো প্রকাশ্যেই এসব করছে, কারও সমর্থনের তোয়াক্কা করছে না।"

ইহা শুনিয়া দ্বিতীয় মহামানবটি আর একবার মর্মাহত হইলেন। রোহিণী ছিপকার প্রণয়ীরূপে তিনিও তাহার পিছনে কিছুদিন ঘুর ঘুর করিয়াছিলেন। রোহিণী আমল দেয় নাই তাঁহাকে। বলিয়াছিল, "বেঁটে ভালুককে আমি বড় ভয় করি মশাই, দয়া করে আমার কাছে আসবেন না।" ছিপকা বিজ্ঞানের নাম-করা অধ্যাপিকা, যাহা বলেন স্পষ্টভাবেই বলেন। একথা অবশ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার মতো নয়, দ্বিতীয় মহামানব চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি যে নারীজাতি সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ নন তাহা জাহির করিবার জন্য বলিলেন—"নর্তকী পিংলে দোয়েলের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, সে শুনেছি নিরামিষ খায়। তাই না?"

"আলোচালের ভাত আলুভাতে সুক্তো এইসব তার পছন্দ। কোনও আমিষাশী লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায় না সে। তাই না?"

"তাই। মেয়েটি কিন্তু সাংঘাতিক। কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে তার সীমা-

সংখ্যা নেই। খাওয়াতে হয়তো ও নিরামিষ কিন্তু মিলন ব্যাপারে ও ঘোর আমিষ। গোটা মানুষটাকেই গিলে ফেলে। একরকম স্ত্রী-মাকড়শা নাকি মিলনের পর পুরুষটাকে খেয়ে ফেলে—দোয়েলও অনেকটা তাই করে। ওর তিনজন প্রণয়ী যক্ষ্মায় মারা গেছে শুনেছি—"

'মনমুরলী গুপ্তা শুনেছি তার প্রণয়ীকে দিয়ে গা হাত পা টেপায়, জুতো বুরুষ করায়—"

বেঁটে কালো মহামানবটি ইহার উত্তরে আর একটি উত্তেজনাময়ী সুন্দরীর অস্বাভাবিক প্রণয়লীলা বর্ণনা করিলেন। দেখা গেল লম্বা ফরসা মহামানবটির গল্পের ভাণ্ডারও নিতান্ত ছোট নয়; তিনি আর একটি গল্প বলিলেন। পেটাপিটি তাসখেলার মতো উভয়ে উভয়কে গল্প শোনাইতে লাগিলেন। সবই নারী-সংক্রান্ত মনরোচক গল্প। দুইজনেই চিন্তিত হইয়াছিলেন সময় কি করিয়া কাটিবে। সময় হু হু করিয়া কাটিয়া গেল। তিনঘণ্টা পরে আকাশ মহাযান যখন আসিল তখনও তাহারা গল্পে মশগুল। মহামানবদের যুগেও এরূপ ঘটনা সম্ভব—এ কল্পনা করিয়া কি ভুল করিলাম ?

গৌড়-সারং

দুপুরে খাওয়ার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবুর্চি বললে যে-কেপন মুর্গিটা রাজপুরের হাট থেকে কিনে এনেছিলাম সেটি নাকি পালিয়ে গেছে। সে বাজার গিয়েছিল আর একটি মুর্গি কিনতে, পায়নি। তার বদলে চুনো মাছ কিনে এনেছিল কিছু। চুনো মাছের ঝাল দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়েছে আজ। মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে আছে। অথচ আমার বাবুর্চি বদরুদ্দিনকে বরখাস্ত করবার উপায় নেই। আমি অবিবাহিত লোক। সংসারের বাঁধনে নিজেকে বাঁধবার প্রবৃত্তি হয়নি। নানারকম খেয়াল নিয়ে মেতে থাকি। সম্প্রতি প্রজাপতি সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছি। আমার সঙ্গে থাকে একটি তাঁবু, একটি বিছানা, কিছু বাসনপত্র, কিছু বই, আর আমার হবির জন্য যে সব সরঞ্জাম লাগে তাই। এ সবেরই ভার বদরুদ্দিনের উপর। সে নিপুণভাবে আমার দেখা-শোনা করে। লালন-পালন করে বললেই ভালো হয়। তার চাল-চলন কথাবার্তা হাত-নাড়া অনেকটা মেয়েমানুষের মতো। ঢিলে আধময়লা পা-জামা গেঞ্জি না পরে সে যদি শাড়ি ব্লাউজ পরত তাহলে কিছু বেমানান হত না। মুচকি মুচকি হাসে কেবল। কথা বড় একটা বলে না। বদরুদ্দিনকে বাদ দিয়ে আমার সংসার অচল। লোকটা অত্যন্ত ভালো মানুষ। তাছাড়া ওকে ছাড়া আমার চলবেও না তো। ঠিক করেছি এবার যখন হাটে যাব মুর্গি একেবারে কাটিয়েই নিয়ে আসব। তাহলে আর পালাবে না। তাঁবুর ছায়া পড়েছিল খানিকটা, তারই উপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে ছিলাম রোদের দিকে পা করে। কেপনের কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম কাল একটা বেগুনী রঙের অদ্ভুত প্রজাপতি দেখেছিলাম। সেটা ধরতে পারিনি। ধরতে পারলে আমার সংগ্রহে একটা নূতন ধরনের প্রজাপতি হত। বেগুনীর সঙ্গে শাদা আর হলদে ফোঁটা আর

কোনও প্রজাপতির পাখায় দেখিনি আগে। সেই হারিয়ে-যাওয়া প্রজাপতির কথাটাই আমার বারবার মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি কেবল মুর্গিটার কথাই ভাবছি। অথচ আমি যে খুব একটা পেটুক বা খাদ্যরসিক লোক তা নই—অথচ ওই মুর্গি আর বদরুদ্দিনই আমার মন জুড়ে বসে আছে। আর একটা কথা ভেবেও অনুতাপ হচ্ছে। বদরুদ্দিনকে বলেছিলাম যে তোমার মাইনে থেকে মুর্গির দামটা কেটে নেব। যদিও আমি নিতাম না, তবু বলতে গেলাম কেন ও কথা। বদরুদ্দিন অবশ্য কিছু বলে নি, মুখটা কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়েছিল কেবল। তার সেই মুখটা মনে পড়ল হঠাৎ। শীতের দুপুর। পায়ের কাছে রোদটা চমৎকার লাগছে। দূরে একটা রিক্তপত্র গাছের শুষ্ক ডালে বসে আছে একটা চিল। এদিক ওদিক চাইছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ সূক্ষ্ম সুরের তান ছেড়ে সে উড়ে গেল। দূরে দেখলাম আর একটা চিল এসেছে। হয়তো তার সঙ্গিনী বা সঙ্গী। দেখতে দেখতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তারা। আমার তন্দ্রা এল একটু। আমার আধ-বোজা চোখের ভিতর দিয়েই কিন্তু যা দেখতে পেলাম তাতে আমাকে উঠে বসতে হল। দূরে মাঠে কতকগুলো খঞ্জন চরছে, আর তার ভিতর রয়েছে কয়েকটা হলদে মাথা আর সাদা মাথা খঞ্জন। এককালে পাখি দেখার নেশা ছিল। বাইনাকুলারটা সঙ্গেই আছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে বার করে নিয়ে এলাম সেটা। চোখে লাগিয়ে দেখতে লাগলাম তন্ময় হয়ে। কি সুন্দর! শীতকালের অতিথি ওরা কত দূর থেকে এসেছে। হঠাৎ পাখিগুলো উড়ে গেল। দূরবীনের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলাম তিলিয়া আসছে। তিলিয়া গোয়ালার মেয়ে। মাঠের ওপারে তার বাড়ি। এই মাঠে তার ছাগল দুটো চরে। মাঝে মাঝে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়ে যায়। তিলিয়াকে একটা খাঁচা কিনে দিয়েছি। বলেছি, প্রজাপতি ধরতে পারলে এর ভিতর পুরে রেখে দিস। আমি প্রজাপতি পিছু এক আনা করে দেব। তিলিয়া কিশোরী। আসন্ন যৌবনের আভাস তার সর্বাঙ্গে। চোখ দুটি অপরূপ। তিলিয়া আমাকে কয়েকটা ভালো প্রজাপতি ধরে দিয়েছে। ভাবলাম আজও বোধ হয় কয়েকটা প্রজাপতি ধরে নিয়ে আসছে। কাছে যখন এল তখন তার হাতে দেখলাম একটা চিঠিও রয়েছে। খামের চিঠি।

"পিওন দিলে চিঠিখানা—"

চিঠি খুলে অবাক হয়ে গেলাম।

বাতাসী চিঠি লিখেছে দীর্ঘকাল পরে। লিখেছে—"খেয়ালী বন্ধু তুমি কোথায় এখন। যার কাছে এ ঠিকানা পেলাম সে বললে তুমি হয়তো কিছুদিন পরেই অন্যত্র চলে যাবে। তবু তোমাকে এই চিঠি লিখছি। কারণ জীবনে সব কথাই তোমাকে বলেছি। প্রথম যখন গোড়-সারং শিখেছিলাম, তোমাকে শুনিয়েছিলাম তা। প্রথম যখন ভাল বেসেছিলাম তা-ও তুমি জানো। তুমি নির্বিকার, তুমি বিচলিত হওনি। অনেক কথাই বলেছি তোমাকে তবু। আজ আর একটা কথা বলবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। লিখছি, কারণ তোমাকে সব কথা না বললে আমার তৃপ্তি হয় না।

আগামী ১৯শে মাঘ আমার বিয়ে। জানি তুমি আসতে পারবে না। আশীর্বাদও করবে না কি? এখন কি নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে আছ? পাখি, প্রজাপতি, গাছপালা, না মেঘ? জানতে পারলে পরজন্মে তাই হবার জন্য প্রার্থনা করব ভগবানকে। এক লাইন চিঠি লিখবে কি? চিঠিটা পড়ে পকেটে রেখে দিলাম। সময় মতো একটা উত্তর

লিখে দেব। কিম্বা হয়তো লিখব না।

তিলিয়ার দিকে চেয়ে বললাম—"খাঁচায় প্রজাপতি এনেছিস না কি। কটা ধরেছিস ?"

তিলিয়া হেসে বললে, "প্রজাপতি নয়, মুরগি এনেছি। আপনার যে মুরগিটা হারিয়ে গিয়েছিল সেইটে ধরে এনেছি।" খাঁচার ভিতর থেকে বেশ একটি ভালো মুরগি বার করলে তিলিয়া।

অবাক হয়ে গেলাম দেখে।

"আমার 'কেপন'টা তো কালো রংয়ের ছিল, এটা তো দেখছি সাদা। তা ছাড়া এর ঝুঁটি যে রকম বড় তাতে মনে হয় এটা 'কেপন' নয়। কোথা পেলি এটা ?"

তিলিয়ার মুখখানায় মেঘ নেমে এল হঠাৎ। ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বেচারি।

"কোথা থেকে আনলি এ মুরগি ?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"পাশের গাঁ থেকে কিনে আনলাম।"

"কেন, কিনতে গেলি কেন ?"

"আপনি যেন বদরুদ্দিনকে কিছু বলবেন না। তার মাইনেও কাটবেন না। বড্ড গরীব বেচারি—"

"তার মাইনে কাটব কি করে জানলি তুই ?"

"বদরুদ্দিন আমাকে বলেছে। ও আমাকে সব কথা বলে।"

বাতাসীর কথা মনে পড়ল।

আর মনে পড়ল তিলিয়া হিন্দুর মেয়ে, বদরুদ্দিন মুসলমান।

"কত দাম নিয়েছে মুরগির—"

"চার টাকা।"

আমি পকেট থেকে টাকা বার করে দিলাম তাকে। প্রথমে নিচ্ছিল না, ধমক দেওয়াতে নিল।

"বদরুদ্দিনকে কিছু বলবেন না তো—"

"না—"

"মাইনে কাটবেন না ?"

"না, না, না—তুই পালা—"

তিলিয়া হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি চোখ বুজে বসে রইলাম। অনেক দিন আগে বাতাসী যে গৌড় সারংটা শুনিয়েছিল আমাকে সেইটেই যেন শুনতে পেলাম আবার।

অজিত

উসকো-খুসকো চুল মাথায়। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি। আড়-ময়লা কামিজ গায়ে। কামিজের পিঠে একটা অন্য কাপড়ের তালি লাগানো। কাপড়ও আড়-ময়লা এবং ছেঁড়া ছেঁড়া। পায়ে অতি-মলিন কেডস্ একজোড়া। ছোট্ট কপাল। কপালের উপর ঝাঁকড়া চুল এসে পড়েছে। ভুরু দুটোও বেশ ঝাঁকড়া। অদ্ভুত কিন্তু চোখ দুটি। দুটো মাণিক জ্বলছে যেন।

আমি বারান্দায় ছিলাম। টেবিলের উপর গোলাপ ছিল কয়েকটা একটা ফুলদানিতে। লোকটি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল। চোখাচোখি হতেই নমস্কার করে বললে—"একবার আসতে পারি কি?"

"আসুন।"

লোকটি এসেই প্রথমে গোলাপগুলিকে প্রণাম করল ফুলদানির কাছে মাথা ঠেকিয়ে। তারপর আমাকে প্রণাম করল।

"কে আপনি, আপনাকে চিনতে পারছি না তো—"

"আমি সামান্য লোক। আমাকে চেনবার কথা নয় আপনার। আমি কিন্তু আপনাকে চিনি—"

"কি করে চিনলেন, আপনাকে তো কখনও দেখি নি?"

"না, দেখেন নি। আজও আপনাকে দূরে থেকে দেখেই চলে যেতাম। কিন্তু আপনার গোলাপগুলো দেখে কাছে আসতে ইচ্ছে হল। মনে হল প্রণাম করে যাই—"

অতিশয় কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে সে চাইল আমার দিকে, যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

"গোলাপকে প্রণাম করছেন কেন?"

"প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। আমাদের আগে মস্ত একটা গোলাপ-বাগান ছিল। বাগানে গোলাপ ফুটলেই আমি তাকে গিয়ে প্রণাম করতাম। কেন করতাম তা জানি না, কিন্তু না করে পারতাম না—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে খানিকক্ষণ কোনও কথা বললে না। আমার দিকে চেয়ে চোখ মিট-মিট করতে লাগল শুধু।

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি আমাকে চেনেন বলছেন, কি করে চিনলেন—"

"মহিমবাবুকে চেনেন তো আপনি। তাঁর কাছে আপনার কথা শুনেছিলাম। বিষ্ণুবাবুও বলেছিলেন আপনার কথা একদিন। সভায় আপনার বক্তৃতাও শুনেছিলাম একদিন দূরে থেকে। পাশে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর কাছেই শুনলাম আপনার নামই বিজনবাবু। আপনি ব্রহ্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বেশ ভাল লেগেছিল আপনার বক্তৃতা। আপনাকে দেখে তাই আজ দাঁড়িয়ে গেলাম। কিন্তু, গোলাপগুলো না থাকলে আমি ভিতরে আসতুম না। অনেকদিন গোলাপকে প্রণাম করি নি। আপনাকেও প্রণাম করবার সৌভাগ্য হল।"

"আপনার পরিচয় দিন।"

"সে পরিচয় দিলে আপনার মনে দয়া হবে। আপনার ইচ্ছে হবে একে টাকা দিয়ে সাহায্য করি, তাই সে পরিচয় আমি দেব না। কিন্তু আমার আসল পরিচয় আপনি জানেন।"

"জানি? মনে হচ্ছে না তো। আগে আপনাকে কোথাও দেখে থাকতে পারি, তা-ও ঠিক মনে নেই, কত লোকই তো আসে আমার কাছে। কিন্তু আপনার পরিচয় তো জানি না—"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল লোকটি।

"জানেন। আমিও আপনার আসল পরিচয় জানি—" একটু চুপ করে থেকে

আবার বললে—"আপনার আসল পরিচয় বিজন দত্ত অ্যাডভোকেট নয়, উপনিষদের বক্তা বলে আপনার নাম আছে, সে পরিচয়ও আপনার আসল পরিচয় নয়—"

"তার মানে ?"

"ওই গোলাপফুলের যে পরিচয়, আপনারও সেই পরিচয়। আপনি উপনিষদের বক্তা অ্যাডভোকেট বিজন দত্তর চেয়ে অনেক বড়।—"

"ঠিক বুঝতে পারছি না—"

হঠাৎ লোকটার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠল—"তৎত্বমসি। আপনিই সেই তিনি। আমিও। এই গোলাপগুলোও। চললুম—"

হঠাৎ বারান্দা থেকে নেমে চলে গেল সে।

এর দশ বছর পরে যে ঘটনাটা ঘটল তা আরও অদ্ভুত। আমি তখন জজ হয়েছি। সেদিন কোর্টে বসে আছি। একটা নৃশংস নরহত্যার মামলা উঠবে সেদিন। অজিত বলে একটি লোক একটি ধনী ব্যবসায়ীকে খুন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে। স্বীকারও করেছে যে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে খুন করেছে সে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা করেনি। কোর্ট থেকেই তার পক্ষে উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে।

একটু পরেই আসামী এসে কাঠ গড়ায় দাঁড়াল। মাথা ভরা ঝাঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া ভুরু, মুখে খোঁচা খোচা গোঁফ-দাড়ি। কিন্তু আমি চমকে উঠলাম তার চোখ দুটি দেখে। মাণিকের মতো জ্বলছে। মনে পড়ে গেল দশ বছর আগেকার কথা। মনে পড়ে গেল—তৎ ত্বমসি। সন্দেহ রইল না যে এ সেই লোক যে এসে আমার গোলাপগুলোকে প্রণাম করেছিল। উচ্চারণ করেছিল বেদান্তের মহাবাক্য। খুন করেছে ? একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। চোখাচোখি হতেই হাসল সে একটু। তারপর বলল —"যিনি ত্রিপুরকে বধ করেছিলেন, রাবণকে বধ করেছিলেন, মধুকৈটভকে বধ করেছিলেন—আমিই সেই। সোঽহম্। আমি যাকে হত্যা করেছি তাকে হত্যা না করলে আমার কর্তব্যচ্যুতি হত।"

হাসতে লাগল আমার দিকে চেয়ে।

তারপর বলল—"আপনি বিচারক। আপনি আপনার কর্তব্য করুন। আমি আমার কর্তব্য করেছি, আপনিও আপনার কর্তব্য করুন।"

"আইনের চক্ষে যে অপরাধ আপনি করেছেন তাতে আপনার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে, তা জানেন ?"

"জানি। এ-ও জানি আমার যে দেহটার নাম অজিত সেইটেরই মৃত্যু হবে। আমার মৃত্যু হবে না। যিনি অমর যিনি মৃত্যুঞ্জয় আমি সেই—সোঽহম্।"

অজিতের ফাঁসি হয় নি। যাবজ্জীবন (মানে কুড়ি বছর) কারাদণ্ড হয়েছিল।

এর পর তাকে আর একবার দেখেছিলাম। তখন আমি কর্ম থেকে অবসর নিয়ে কাশী বাস করছি। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটি ছোট সরু গলিতে একটি পুরনো একতলা বাড়ি কিনে বাস করচি সেখানে। জীবনে অনেক শোক পেয়েচি। স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। সবাই মারা গেছে। পুরনো চাকর শীতল এবং বিধবা বোন সঙ্গে আছে কেবল। বাকী জীবনটা বাবা বিশ্বেশ্বরের নাম করে কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি।

কিন্তু তা-ও নির্বিঘ্নে করতে পারছিলাম না ক'দিন। সেই সরু গলির মধ্যে আমার বাড়ীর সামনে একটা ঘেয়ো কুকুর জুটল কোথা থেকে। দিন রাত চিৎকার করত। তার পিঠের উপর মস্ত একটা ঘা। অনেককে অনুরোধ করলাম কুকুরটাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে। কেউ রাজি হল না। এমন কি মেথর পর্যন্ত না। বিশ্বেশ্বরের নামের সংগে কুকুরের ক্রন্দন মিশে মাঝে মাঝে এমন মনের অবস্থা হতে লাগল যে মনে হত কুকুরটাকে গুলি করে মেরে ফেলি। তখনও আমার বন্দুকটা ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সকালবেলা কুকুরটার কান্নায় ছেদ পড়ল। বেরিয়ে দেখলাম একটা ছেঁড়া কাপড়-জামা পরা বুড়ো লোক ঝুঁকে কুকুরটার পিঠের ঘা চেটে দিচ্ছে। ঘৃণায় আতংকে শিউরে উঠলাম।

"ও কি করছ তুমি—"

তখন মুখটা তুলল। দেখলাম তার ঠোঁটে পুঁজ-রক্ত লেগে রয়েছে। একমুখ গোঁফ-দাড়ি আর ঝাঁকড়া ভুরু। তারপর দেখতে পেলাম চোখ দুটি। মাণিকের মতো জ্বলছে। চিনতে পারলাম অজিতকে। অজিত হেসে বলল, "বেচারীর পিঠে ঘা হয়েছে তাই চাটতে পারছে না। ওরা চেটেই ঘা সারায়। আমি চেটে দিচ্ছি, যদি সেরে যায়। বড় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা—"

"অজিত! তুমি জেল থেকে ছাড়া পেলে কবে?"

"দিন সাতেক আগে। আপনি চেনেন নাকি আমাকে?"

হাসিমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি আর আত্মপরিচয় দিতে পারলাম না। লজ্জা হল।

দু'কান কাটা

লিখতে শুরু করব এমন সময় দুয়ারের কড়া ন'ড়ে উঠল।

"ভিতরে আসুন—"

যে ব্যক্তি প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে চমকে উঠলাম। ভদ্রলোকের দু'কান কাটা। একেবারে পুঁচিয়ে কাটা। অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন—"হ্যাঁ, আমার দু'কান কাটা। বসতে পারি—"

"বসুন—"

এর পর কি বলব ভেবে পেলুম না। অপরিচিত লোকের কাছে প্রায়ই আমি হতবাক হয়ে যাই। এঁর দু'কান কাটা দেখে সত্যিই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন—"আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন লোকটার দু'কান কাটা কেন? কারণ আছে। একাধিক কারণ। প্রথম কারণটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। আপনারা চাইছেন না যে পরিবারে ফালতু ছেলেমেয়ে হোক। জন্ম নিয়ন্ত্রণ চালু করেছেন সেই উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। আমি চাইছি আমার শরীরের ফালতু অংশগুলো কেটে বাদ দিতে। এ বাজারে মশাই যতটুকু খাবার যোগাড় করতে পারি তার অংশ কানের পাতা দুটোকে দিয়ে লাভ কি? কানের পাতা দুটো যখন ছিল তখন যেমন শুনতে পেতুম এখনও তেমনি পাই। ঘুমোবার সময় দু'টো ছিপি দিয়ে কানের ছেঁদা বন্ধ করে দি। কোনও অসুবিধা হয় না। যে ডাক্তারবাবু আমার কান

কেটেছেন তাঁকে বলেছি এ্যাপেন্ডিক্স আর বাড়তি আঙ্গুলে টাঙ্গুলগুলোও কেটে দিতে—দেবেন বলেছেন। মস্ত বড় ডাক্তার। নাম—"

এইখানে তিনি একজন ডাক্তারের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর, সব বললেন।

তারপর বললেন—"দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমি মশাই সেণ্ট সাবান, ছুরি কাঁচি, কামাবার ব্লেড টুকিটাকি এইসব ফিরি করি। কিন্তু আমার লাইনে মেয়ে ফেরি-ওলাও জুটেছে। মেয়ে বলেই তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমার দিকে কেউ ফিরেও চাইত না। কান দুটো কেটে ফেলার পর থেকে অনেকেই ডাকছে আজকাল। আপনি কিছু নেবেন কি—"

"না। ব্লেড কালই আমি কিনেছি দু প্যাকেট। সেণ্ট সাবান আমি মাখি না—"

"হতাশ ক'রে ফিরিয়ে দেবেন একেবারে? তাহলে একগ্লাস জল খাওয়ান—"

চাকরটা বাজারে গিয়েছিল। নিজেই উঠে গিয়ে একগ্লাস জল এনে দিলাম। ভদ্রলোক জল খেয়ে চলে গেলেন।

একটু পরেই আমার চাকর ফিরল। সে বলল, "বাবু আরও দুটো টাকা দিন। টাকায় কম পড়ে গেল, চিনি আনতে পারি নি।"

টাকা দিতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম টেবিলের উপর থেকে আমার মনিব্যাগটি অন্তর্ধান করেছে। লোকটি ডাক্তারবাবুর নাম ঠিকানা আমাকে বলেছিল। সেটা মনে ছিল আমার।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। গলির গলি তস্য গলিতে ডাক্তার নেপাল সরকারের ক্লিনিক। দেখলাম তিনি একটা ভাঙা টেবিলের সামনে একাই ব'সে আছেন। বড় সার্জন? কেমন যেন সন্দেহ হল। তবু সব কথা বললাম তাঁকে। তিনি বললেন—"আমি একটা লোকের কানে তিম্বতী একরকম লতা জড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর কানের পাতা দুটো বিনা রক্তপাতে খসে গিয়েছিল তাঁর দেহ থেকে—সে-ই কি?"

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কি ডাক্তার?"

"চিকিৎসা করি জড়ি বুটি তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে। অ্যালোপাথিক, হোমিওপ্যাথিক বা কবিরাজী আমি শিখি নি। আপনার কোনও প্রয়োজন হলে আমার কাছে আসবেন।"

"কিন্তু সে লোকটা কোথা গেল? সে আমার মনিব্যাগ চুরি করে এনেছে।"

"তা তো বলতে পারব না—"

পরমুহূর্তেই বাইরে থেকে শোনা গেল—"ন্যাপলা, দশ জায়গায় তোমার নাম চাউর করেছি—অন্তত গোটা পাঁচেক টাকা চাই—"

পরমুহূর্তেই ঘরে দু'কান কাটা লোকটা ঢুকল। আমিতো অবাক; ন্যাপলা ডাক্তার অবাক। দু'কান কাটাও অবাক।

সেই প্রথম কথা কইল।

"আপনি এখানে এলেন হঠাৎ যে।"

"আমার ব্যাগটা দিন "

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা বার ক'রে দিলে সে।

তারপর বলল—"এবার আমাকে জুতো মারুন। না না, জুতো মারুন আমাকে। আমি অতি পাজি, অতি নীচ, অতি মিথ্যেবাদী, আমি চোর, আমি পাষণ্ড, আমি

নরাধম। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিন আমার। নাকটা থেঁতলে দিন। চীনে গিয়েছিলাম মশাই। ভালো কাজ করছিলাম। কিন্তু রক্তের ভিতর পেজোমি আছে, সেখানে অফিসের টাকা চুরি করে বসলাম। তারা আমার দুটি কান কেটে নিয়ে দূর করে দিলে। কানের ঘা সারতে দুমাস লাগল। দেশে ফিরলাম, এখন এই ন্যাপলা ডাক্তারের বিজ্ঞাপন করে বেড়াচ্ছি। জুতো মারুন আমাকে—"

এই বলে সে আমার পা থেকে জোর করে পামশু জোড়া খুলে নিলে।

"নিন্ মারুন—"

"কি যে করেন —"

"মারবেন না ?"

"দিন জুতো দিন—"

"না, আপনার জুতো মাথায় করে রাখা" বলেই লোকটা নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি খালি পায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ন্যাপলা বললেন—"লোকটা অতি পাজি দেখছি। আচ্ছা, আপনি বসুন। গোটা দুই টাকা দিন আমাকে। আমি মন্ত্রের জোরে ওকে আনিয়ে দিচ্ছি আবার। তিব্বতী মন্ত্র ছাড়লে বাপ বাপ ক'রে ফিরে আসবে এখ্খুনি—"

কিছু না বলে খালি পায়েই বেরিয়ে গেলাম। ট্রামে চড়লাম। কিন্তু একটু পরেই নেবে পড়তে হল। টিকিট কিনতে গিয়ে দেখি ব্যাগে একটি পয়সাও নেই।

গোল মুখ, চাপ দাড়ি

প্রবোধ মল্লিক অবশেষে হাঁটছিলেন। ট্যাক্সি, ট্রাম, বাস, রিকশা সব রকম যানেই তিনি ঘুরেছেন সকাল থেকে। বৃথাই ঘুরেছেন। যদিও 'ক্লু'র সঙ্গে ঠিক মেলে নি তবু তিনি তিনটে দাড়ি-ওলা লোকের পিছু নিয়েছিলেন। অনেক ঘুরে শেষে তিনি উপলব্ধি করেছেন ওদের কেউ বীরভদ্র নয়। একটা হল আধুনিক একটি ছেলে, দাড়ি রাখা আর প্যান্ট পরাটাই যাদের ফ্যাশান হয়েছে আজকাল। তার মুখটা গোল মনে হয়েছিল বলে তার পিছু নিয়েছিলেন মল্লিক মশাই। ছোকরা প্রথমে হাঁটছিল। মল্লিক মশাইও হাঁটছিলেন। তারপর সে একটা 'রিকশা' ডেকে চড়ে বসল, মল্লিক মশাইও একটা 'রিকশা' ডেকে চড়লেন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল কয়েকটি মেয়ে আসছে। ছোকরা শিস্ দিল একবার, তারপর একটা সিনেমার গান ধরে দিল। মল্লিক মশাই তখনই বুঝলেন এ সেই আদর্শবাদী বীরভদ্র হতে পারে না। বীরভদ্রকে পেলে মল্লিক মশাই যদিও সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যারেস্ট' করবেন, সেইজন্যই ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি, কিন্তু বীরভদ্রকে তিনি ভক্তিও করেন খুব। বীরভদ্র অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, অন্যায়কারীকে বার বার সাবধান করেন, কিন্তু তাঁর সাবধান বাণী যদি সে না শোনে তাহলে তাকে হত্যা করেন।

কয়েকটি নামজাদা নেতা, দু'জন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, একজন পুলিশ অফিসার, একজন হাইকোর্টের জজ বীরভদ্রের গুলিতে মারা গেছেন। অথচ লোকটাকে ধরা যাচ্ছে না। মল্লিক মশাই পুলিশে চাকরি করেন, তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। উপর থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে লোকটার কালো চাপ দাড়ি আছে। মুখটা গোল। ইদানীং

কাজের গাফিলতির জন্যে তাঁর সার্ভিস রেকর্ডে একটু খুঁত হয়েছে—তাই তিনি বীরভদ্রকে ধরবার জন্যে বেশী তৎপর হয়েছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়। কিন্তু তাঁকে সহজে পাবেন কী? লোকটি 'রবিন হুড' জাতীয় লোক। আধুনিক 'রবিন হুড'। মনে হয় এড্গার ওয়ালেস-এর লেখা 'ফোর জাস্ট্ মেন' বই থেকে যেন একটা চরিত্র জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। একে ধরা কি তাঁর কর্ম? কিন্তু চাকরি বজায় রাখতে হবে। সুতরাং তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে দ্বিতীয় চাপ দাড়ির সন্ধান পেলেন। এর মুখটা ঠিক গোল নয়, ডিম্বাকৃতি। দাড়িটা কিন্তু বেশ চাপ চাপ, ঘন কালো। পরনে ঢিলে পা-জামা আর ঢিলে পাঞ্জাবি। মনে হল পাঞ্জাব প্রদেশের লোক। চুলগুলোও সেই রকম। সে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে। মল্লিক মশাইও সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিলেন। তার পিছু পিছু গেলেন নিউ মার্কেট পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে যা আবিষ্কার করলেন তাতে হতাশ হয়ে পড়তে হল তাঁকে। লোকটার প্রকাণ্ড কশাইয়ের দোকান। এ লোক কখনও বীরভদ্র হতে পারে না। মল্লিক মশাই বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিউ মার্কেট থেকে। আত্মধিক্কারে তাঁর মন ভরে গেল। ভাবলেন, 'ছি ছি, এ কি করছি আমি। এমন একটা ভালো লোককে ফাঁসী কাঠে তুলে দেবার চেষ্টা করছি।' সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, 'না করে উপায়ই বা কি। এই তো আমার চাকরি। তিনটে মেয়ের বিয়ে হয় নি, ছেলেটা নাবালক। চল্লিশ বছর বয়স পার হয়ে গেছে। অন্য কি কাজ এখন করি। ঘোষ সায়েব আমার পিছনে লেগেছেন, শেষ পর্যন্ত হয়তো চাকরিটি খেয়ে দেবেন। বীরভদ্রকে ধরব বলে তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি। যদিও বুঝতে পারছি এভাবে টো টো করে রাস্তায় ঘোরাটা বোকামির চূড়ান্ত, এ রকম পদ্ধতিতে আসামীকে ধরবার চেষ্টা সাধারণত কোন বুদ্ধিমান ডিটেকটিভ করে না, তবু আমি করছি, তার কারণ হয়তো আমার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। রোখ চেপেছে, মিস্টার ঘোষকে তাক লাগিয়ে দিতেই হবে। কলকাতা শহর চষে ফেলব আমি। যত চাপ দাড়ি-ওলা লোক আছে প্রত্যেককে 'ফলো' করব। দুটি 'ক্লু' পেয়েছি। একটি হচ্ছে বীরভদ্র কলকাতায় এসেছে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার ঘন চাপ-দাড়ি আছে। গোল মুখ। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এটি। এরই উপর নির্ভর করে ঘুরছি। এটাও অবশ্য ঠিক, তাকে যদি ধরতে পারি তাহলে আমার কষ্টও হবে খুব। কারণ আমার ধারণা লোকটা মহাপুরুষ!'

মল্লিক মশায়ের কাছে একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। সেখানে দেখা পেলেন তৃতীয় চাপ-দাড়ির। সেকেণ্ড ক্লাসে বসে আছে লোকটা। মল্লিক উঠে পড়লেন। তার পাশে গিয়েই বসলেন। দেখলেন লোকটার হাতে একটা বড় কাঁচি রয়েছে। পাশে বসে লক্ষ্য করলেন তার মুখটাও ঠিক গোল নয়, দাড়িও ঠিক চাপ দাড়ি নয়। মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, পাকা চুলও রয়েছে। বর্ণনা ছিল ঘন কৃষ্ণ চাপ দাড়ি। একটু হতাশ হলেন মল্লিক মশাই। তবু বসে রইলেন তার পাশে। আড়চোখে দু' একবার তাকালেন তার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল চেক্-চেক্ লুঙ্গী পরে আছে লোকটা। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল —এঃ।

"আমাকে কিছু বলছেন?"—প্রশ্ন করল লোকটি।

একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে মল্লিক মশাইকে বলতে হল—"আপনার কাঁচিটি খুব ভালো মনে হচ্ছে—"

"আসল বিলিতি। সর্বদা হাতে রাখি মশাই। এ মাল আজকাল বাজারে পাবেন না।"

"তা ঠিক। কি করেন আপনি এ কাঁচি দিয়ে—"

"কাপড় কাটি। দর্জির দোকান আছে আমার!"

"কোথায়?"

"চিৎপুরে।"

মল্লিক মশাই পরের স্টপেজেই নেমে গেলেন। নেমে হাঁটতেই লাগলেন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। তিনি যে সস্তা হোটেলে এসে উঠেছিলেন সেটা সিঁথির কাছাকাছি। অতদূরে এখন না গিয়ে তিনি এখানেই কোনও একটা হোটেলে খেয়ে নেবেন কিনা ভাবছিলেন। এমন সময় ঠিক তাঁর পাশেই একটা ট্যাক্সি থামল এবং ট্যাক্সি থেকে নামল আর একজন চাপ দাড়ি-ওলা লোক। গোল মুখ। দাঁড়িয়ে পড়লেন মল্লিক মশাই। দেখলেন লোকটি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একটি একতলা বাড়ির তালা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। মল্লিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মিনিট। লোকটার খোঁজ খবর না নিয়েই চলে যাবেন? কাছে একটা ছোঁড়া দাঁড়িয়েছিল তাকে জিগ্যেস করলেন—"এই বাড়িতে কে থাকে জান?"

ছোঁড়াটা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তারপর সরে পড়ল কোনও উত্তর না দিয়ে। পাশের গলি থেকে একটি মেয়ে বেরুল। তাকেও জিগ্যেস করলেন। সে বলল—"ও বাড়িতে কেউ থাকে না বোধহয়। সর্বদাই তো দেখি তালা ঝুলছে—"

"এখুনি একটা চাপ দাড়ি-ওলা লোক ঢুকল দেখলাম।"

"তাহলে জানি না। আমি তো কাউকে দেখি নি।"

চলে গেল মেয়েটি। মল্লিক মশাই আরও মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা ফেরিওয়ালা এল। "চা—ই ফু—ল ঝাড়ু।"

"ওহে শোন। তুমি এ পাড়ায় কত দিন থেকে ফেরি করছ—"

"দু মাস থেকে"

"এই বাড়িটায় কে থাকে জান!"

"না। ঝাড়ু নেবেন?"

"না।"

চলে গেল ফেরিওলা।

আরও দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন মল্লিক মশাই বন্ধ দ্বারটার দিকে চেয়ে। তারপর মরীয়া হয়ে এগিয়ে গেলেন এবং কড়া নাড়তে লাগলেন। ভিতর থেকে সাড়া এল না। আবার নাড়লেন। শেষে লাথি মারতে লাগলেন কপাটে।

খট্ করে ছিট্‌কিনি খোলার শব্দ হল। কপাট খুলে বেরিয়ে এলেন যে ভদ্রলোক তাঁর গোঁফদাড়ি একেবারে নেই। ক্লীন শেভড্।

মল্লিক মশাই আরও অবাক হলেন যখন তিনি "আরে মল্লিক মশাই নাকি, আসুন আসুন। কি ব্যাপার—" বলে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে।

"এখানে চাপ-দাড়ি-ওলা যে লোকটি ঢুকলেন তিনি কোথায়?"

"চাপ-দাড়ি-ওলা লোক তো কেউ আসে নি এখানে—"

"আমি স্বচক্ষে দেখলাম।"

"স্বচক্ষে দেখলেন? আশ্চর্য কাণ্ড। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না।"

"কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলাম একজন চাপ-দাড়ি-ওলা লোক এই বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল, ঘরের তালা খুলে এই বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।"

"আশ্চর্য কাণ্ড। দিন দুপুরে এত বড় দৃষ্টি বিভ্রম সাধারণত হয় না। আপনাকে না চিনলে আমি এখনই আপনার মুখের উপর কপাট বন্ধ করে দিতুম—"

"আমাকে আপনি চেনেন ?"

"বিখ্যাত গোয়েন্দা মল্লিক মশাইকে কে না চেনে। আপনি দু'জন স্বদেশপ্রেমিক ছেলেকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন এ কথা কে না জানে। আপনাকে আমি শুধু চিনি না, শ্রদ্ধা করি। আপনার চেহারা কিন্তু বড্ড খারাপ মনে হচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বোধ হয়। আপত্তি যদি না থাকে আমার কাছে একটু বিশ্রাম করে যেতে পারেন। নিশ্চয় কোন আসামীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আসুন—"

ভদ্রলোকের সহৃদয় আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না মল্লিক মশাই। ভিতরে ঢুকলেন।

"কিন্তু সেই চাপ-দাড়ি-ওলা ভদ্রলোক আমার সামনে ঢুকলেন এই বাড়িতে—"

"আপনি দেখুন না নিজেই। ওইটে বাথরুম। ওখান থেকে কেউ পালাতে পারবে না। এইটে আমার শোবার ঘর আর ড্রইং রুম। পাশের ঘরটা রান্নাঘর। আমি নিজেই রান্না করে খাই। আপনি দেখতে চান তো দেখুন না।"

মল্লিক মশাই তিনটে ঘরেই ঢুকে দেখলেন। সত্যিই কেউ নেই। খাটের নীচে উঁকি দিয়ে দেখলেন, সেখানে ছোট একটি স্যুটকেস রয়েছে। আর কিছু নেই।

"এইবার বিশ্বাস হয়েছে তো—"

"নিজের চোখকে অবিশ্বাস করব ? আশ্চর্য কিন্তু। গেল কোথায় লোকটা !"

"যদি বলি ওটা আপনার ইলিউসন্ ! যাক গে, আপনি এই ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিন—"

ইজিচেয়ারের উপর বসলেন মল্লিক মশাই।

"ইলিউসন্ বলছেন ?"

"তাছাড়া আর কি। ওই রকম একটা লোকের কথা বোধহয় ক্রমাগত ভাবছেন। শ্রীরাধা যেমন সর্বত্র কৃষ্ণকে দেখতে পেতেন আপনারও হয়তো তাই হচ্ছে। যাক শুয়ে পড়ুন। একটু কফি খাবেন ? ভাল দুধ আছে আমার কাছে—"

"কফি ? না থাক—"

"থাক কেন। এখনি করে দিচ্ছি আপনাকে—"

পাশের ঘরে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

সামনেই একটা আয়না টাঙানো ছিল। মল্লিক মশাই তাতেই নিজের চেহারাটা প্রতিফলিত দেখলেন। সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেছে চেহারা।

"আসুন। দুধ বেশী করে দিয়েছি। খেয়ে ফেলুন। ভালো লাগবে।"

মল্লিক কফিটা খেয়ে সত্যিই আরাম বোধ করলেন।

"আমাকে আপনি চিনতেন ?"

"খুব। আপনাদের সবাইকে চিনি। মিস্টার ঘোষকেও চিনি। একের নম্বর হারামি লোকটা। ঘুষ খায়, ভাল লোকের পেছনে লাগে—"

"ঘোষকেও চেনেন ?"

"খুব।"

পাশের ঘরে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

বাথরুমে স্নান করার শব্দ হতে লাগল।

মল্লিকের কেমন যেন ঘুম পেতে লাগল। চোখ বুজে শুয়ে রইলেন তিনি। তারপর ক্রমশ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

প্রায় বারো ঘণ্টা পরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। সমস্ত রাত তিনি এখানেই ছিলেন নাকি? উঠে বসেই কিন্তু চমকে উঠতে হল তাঁকে। আয়নায় গোল মুখ চাপ দাড়ি। হঠাৎ অনুভব করলেন তিনি একটা মুখোশ পরে বসে আছেন। মাথা মুখ গলা সমস্ত মুখোশের ভিতর। রবারের মুখোশ। মনেই হয় না যে মুখোশ। অনেকটা মংকি ক্যাপের মতো। খুলে ফেললেন সেটা। আবার পরলেন। চমৎকার জিনিস তো।

মুখোশটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। নজরে পড়ল একটি খবরের কাগজ টেবিলের উপর রয়েছে। দিল্লীর কাগজ। লাল কালীতে দাগ দেওয়া রয়েছে এক জায়গায়।

পড়ে অবাক হয়ে গেলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লেখা রয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের মিস্টার ঘোষকে কাল গোল মুখ চাপ-দাড়ি-ওলা একটি লোক গুলি করে হত্যা করেছে। তাকে ধরা যায় নি।

পুলিশের সন্দেহ হত্যাকারী বীরভদ্র।

মল্লিক মশাই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ পুরীতে

শেষ পুরী নামটাই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে। বিজ্ঞাপন দেখলাম—"শেষ পুরী গ্রামে এক বিঘা জমির উপর একটি পুরাতন পাকা বাড়ি বিক্রয় আছে। বোনপাশ স্টেশনে নামিয়া কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই শেষ পুরীর রাস্তা দেখাইয়া দিবে। স্টেশনে রিকসাও পাইতে পারেন। যিনি কিনিতে চান তিনি আসিয়া রাত্রি দশটার সময় বাড়ির মালিকের সহিত যোগাযোগ করুন। সেই সময় দামের কথা আলোচিত হইবে।"

দিনেও একদিন গিয়েছিলাম বাড়িটা দেখতে। পোড়ো বাড়ি। তবে অনেকখানি জায়গা আছে পিছন দিকে। ডাকাডাকি করে কারো সাড়া পাই নি। বাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছিল। জায়গাটি বেশ নির্জন। ভদ্রলোক কত দাম চাইবেন কে জানে।

যদিও সময়টা বেশ অসুবিধাজনক তবু রাত্রি দশটার সময়ই গিয়ে হাজির হলাম একদিন। খবর দিতেই বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক। দেখলাম বেশ প্রবীণ তিনি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা গোঁফ, মাথায় প্রকাণ্ড টাক। বেঁটে আর খুব রোগা। রং বেশ কালো। একটি কোট গায় দিয়ে বেরিয়ে এলেন। কোটের দু'পকেটে দুহাত ঢোকানো।

নমস্কার। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে বাড়িটার সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছি।

বাড়িটা দেখেছেন তো—

হাঁ দিনের বেলা এসে দেখে গেছি একদিন। অনেক ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া পাইনি।

দিনের বেলা বাড়িতে কেউ থাকে না। আমি জামা বিক্রি করতে বেরুই। একটু আগেই ফিরেছি—। বাড়ি পছন্দ হয়েছে আপনার ?

পছন্দ হয়েছে। তবে বাড়িটা খুব পুরোনো—

হ্যাঁ, খুব পুরোনো। আমার ঠাকুর্দার আমলে তৈরি। তবে রেফ্‌তার গাঁথুনি—এখনও থাকবে কিছুদিন।

আপনি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছেন কেন ?

আমি এখান থেকে চলে যাব। এখানে বড় হাল্লা হচ্ছে—তাছাড়া—

কি রকম হাল্লা—

সেইটে শোনাবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি। রাত্রি দশটার পর হাল্লাটা শুরু হয়। একটু পরেই শুনতে পাবেন।

কারা গোলমাল করে ? গোলমাল আমি থামিয়ে দেব। আমি পুলিশে কাজ করি।

পারবেন না।

পারব না, মানে ? আমি হুকুম করলে বন্দুক আর টিয়ার গ্যাস নিয়ে পুলিশ ফোর্স আসবে—

তবু পারবেন না।

স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

বললাম—বাড়ির দাম কত চান, সেইটে আগে বলুন। খুব বেশী দাম চাইলে আমি কিনতে পারব না। হাল্লা টাল্লার জন্যে ভাবি না।

দামের জন্য আটকাবে না। আপনি যা দেবেন তাই নেব। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর আপনিই প্রথম এসেছেন, আপনাকেই দেব বাড়িটা।

বললাম—আমি কুড়ি হাজার টাকার বেশী দিতে পারব না। শহরের কাছে হলে এ বাড়ির দাম কয়েক লক্ষ টাকা হত। কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে, তাছাড়া বাড়িটা সারাতেও হবে—

আহা গোড়াতেই বলেছি তো। আপনার সঙ্গে দর-দস্তুর করব না, যা দেবেন তাই নেব। কিন্তু ব্যাপারটা আগে বুঝে নিন। মানে হাল্লাটা আগে শুনে নিন। আপনাকে আমি ঠকাতে চাই না—

হাল্লা আমি থামিয়ে দেব। আপনি একাই থাকেন এখানে ?

এখন একা হয়ে গেছি। অনেক দিন থেকেই একা হয়ে গেছি। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে। একটি ছেলে ছিল, সে হল টেরারিস্ট। ফাঁসি হয়ে গেল তার। মেয়েটাও রিভলভার হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল একদিন। সে-ও আর ফিরল না। কোথায় গেল, কি হল খবর পাই নি। তখন ইংরেজের আমোল। আমার চাকরি গেল, আমাকেও ধরে নিয়ে গেল জেলে। অনেক দিন জেলে ছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে কোন চাকরি পেলাম না। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যখন যা পেতুম করতুম। ফেরিওয়ালা, চাকর, জনমজুর, রাজনৈতিক দলের ভলান্টিয়ার সব রকম কাজ করেছি। একটা দর্জির দোকানে কাজ করবার সময় দর্জিগিরি শিখেছিলাম। আমার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটা কল ছিল। সেটা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এখন

জামা সেলাই করি। নানা জায়গা থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে আনি। ওতেই আমার দিন চলে আজকাল। এই ভাবে চলছিল, কিন্তু আর চলছে না। জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে—

কেন, কি হল—

সবটা আগে শুনুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন। দিন কয়েক আগে হঠাৎ একজন ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন আমার কাছে। উসকো খুসকো চুল, মাথার উপর একটা কাটা দাগ, খাঁড়ার মতো নাক। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ির পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, নয়? বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তাহলে আমরা এখানেই থাকব। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁক দিলেন—এইখানে, এইখানে, এইখানে জায়গা আছে। এইখানে চলে এস সব। তারপরেই দলে দলে লোক আসতে লাগল। মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো নানা রকম লোক। সবাই রোগা, সবার মুখেই কেমন যেন একটা রাগের ছাপ। ভদ্রলোক এসে আমাকে বললেন, আমরা সব নির্যাতিত উদ্বাস্তু। কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। এইখানে থাকব। বর্ধমানে একটা পুরনো বাড়ির পেছনে ছিলাম। কিন্তু সেখানে সব ভেঙে চুরে নূতন বাড়ি উঠছে। সেখানে থাকা গেল না। এইখানেই থাকব। জিজ্ঞেস করলাম—এইখানে থাকবেন? বললেন—হ্যাঁ। জবর দখল করব। এই যে মেয়েগুলি দেখছেন এরা সবাই ধর্ষিতা। আমাদের বিষয় সম্পত্তি ওরা কেড়ে নিয়েছে। আমরা নিঃস্ব, আমরা নিঃসহায়। জবর-দখল করা ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই—এই বলে তারা পিল পিল ক'রে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। চলে গেল পিছন দিকে। সেই থেকেই ওরা আছে। সমস্ত দিন চুপচাপ থাকে। হাল্লা শুরু করে রাত্রি দশটার পর।

ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে এইবার হাত দুটি বার করলেন। দেখলাম ডান হাতে একটি রিভলভার রয়েছে।

বললেন—এটি আমার ছেলের রিভলভার। পুলিশ এটির সন্ধান পায় নি। আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। ওই এইবার শুরু হল—হঠাৎ বাড়ির পিছন থেকে কে একজন চীৎকার করে উঠল।

শপথ কর—

সমবেত কণ্ঠে উত্তর হল—শপথ করছি—

শপথ কর যে আমরা এর বদলা নেব।

আবার সমবেত কণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল—আমরা এর বদলা নেব।

আবার চীৎকার উঠল—শপথ কর—

আবার সমবেত কণ্ঠে সবাই বলল—শপথ করছি।

শপথ কর আমরা এর বদলা নেব।

আবার সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হল—আমরা এর বদলা নেব।

ক্রমাগত এই চলতে লাগল। মনে হল আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

বললাম—আপনি কি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

দিই নি। ওরা কেউ জীবিত নয়। সবাই প্রেতাত্মা। পুলিশ ওদের কি করবে? আপনাকে সব বললাম। আপনি নিজের কানেও শুনলেন। বাড়ি যদি কিনতে চান

যা খুশি দাম দেবেন। সে টাকা আমি নেব না। সেটা উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য খরচ করবেন, এই আমার অনুরোধ। এবার আমি চললুম –

মুখের মধ্যে পিস্তলটা পুরে নিমেষে আত্মহত্যা করে ফেললেন তিনি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন আমার পায়ের কাছে। মনে হল আবার যেন আমাকে অনুরোধ করছেন—টাকাগুলো উদ্বাস্তুদের কল্যাণের জন্য খরচ করবেন—

বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম।

ভিতরের দিকে হাল্লা চলতে লাগল।

শপথ কর, আমরা এর বদলা নেব।

আমরা এর বদলা নেব।

রম্য রচনা

চূড়ামণি রসার্ণবের কথা একটি কাহিনীতে ইতিমধ্যে লিখিয়াছি। লোকটি অসাধারণ। রসিক, কবি, খামখেয়ালী এবং যাদুকর। মাঝে মাঝে আমার কাছে আসেন এবং কখনও যদি কিছু অনুরোধ করি তাহা হইলে তাহা রক্ষা করেন। অথচ তাঁহার ঠিকানা জানি না। মনে তাঁহার কথা উদিত হইলেই তিনি সশরীরে হাজির হন। বলেন—"কি হে, স্মরণ করছ কেন?"

যৌবনকাল হইতেই ওইভাবে চলিতেছে। তিনি অন্তরঙ্গ অথচ তাঁহার পরিচয় ঠিকানা কিছুই জানি না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। মুচকি মুচকি হাসেন কেবল।

যৌবনে একবার দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। 'জীবন' নামে একটি মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলাম। লেখক-লেখিকাদের দ্বারে লেখা সংগ্রহ করিবার জন্য ধর্ণা দিতাম। একদিন মনে হইল চূড়ামণি মহাশয়কে স্মরণ করিলে কেমন হয়।

তখন রম্যরচনার যুগ শুরু হইয়াছে। ভাবিলাম চূড়ামণি মহাশয় যদি একটা রম্যরচনা দেন আমার 'জীবন' ধন্য হইয়া যাইবে। দিবেন কি?

স্মরণ করিবামাত্র তিনি দেখা দিলেন।

—কি হে, কি ব্যাপার?

—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? 'জীবন' নামে একটা কাগজ বার করেছি, তাতে যদি একটা রম্যরচনা দেন, 'জীবন' ধন্য হয়ে যাবে।

—রম্যরচনা? আচ্ছা চেষ্টা করব।

—কি নাগাদ পাব?

—তা বলতে পারছি না। তবে পাবে।

চূড়ামণি মহাশয় চলিয়া গেলেন। মাসখানেক কোনও সাড়াশব্দ পাইলাম না। তাগাদা দিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় একদিন সকালে আমার বাড়ির সামনে একটি ট্যাক্সি ক্যাঁচ্ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ট্যাক্সি হইতে নামিল একটি তরুণী। সুবেশা, সুন্দরী, আলিঙ্গিতা। আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। তাহার পর একটি ছোট কাগজ দিল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে—একটি জীবন্ত রম্যরচনা পাঠাইলাম। তোমার

'জীবনে' যদি স্থান দাও তাহা হইলে আমার বিশ্বাস তোমার জীবন সত্যই ধন্য হইয়া যাইবে। বিধাতার সৃষ্টি চমৎকার রম্যরচনা এটি। মেয়েটির দিকে চাহিতেই সে মৃদু হাসিয়া মুখটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

উক্ত রম্যরচনাটির গর্ভে আমিও তিনটি রম্যরচনা উৎপন্ন করিয়াছি।

প্রত্যেকটিই স্ত্রীলিঙ্গ। চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন স্মরণ করিলাম।

—কি হে, কি ব্যাপার, ডেকেছ কেন ?

—ক্রমাগতই যে মেয়ে হচ্ছে কি করি—ফতুর হয়ে যাবো যে—

—ভয় কি। যথা সময়ে রং চং করে বাজারে ছেড়ে দিও। এটা প্রগতির যুগ। সবারই গতি হয়ে যাবে কেউ পড়ে থাকবে না।

মুচকি হাসিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

সমস্যা

প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চাকলাদার বেশ নাম করেছিলেন প্রত্নতত্ত্বে। সকলে তাঁকে সময়-বিশেষজ্ঞ বলে খাতির করতেন। ইতিহাসের সন তারিখ সাল খ্রীষ্টাব্দ হিজরি নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণার ফলে ইতিহাসের অনেক তারিখ বদলে গিয়েছিল। যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির জন্ম পঞ্চম শতাব্দীতে হয়েছিল বলে সকলের ধারণা ছিল, চাকলাদার মশাই অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সে ধারণা ভুল, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে। আধুনিক ইতিহাসের অনেক তারিখ ওলট পালট করেছিলেন তিনি। ১৫ই আষাঢ়কে ৭ই শ্রাবণ, ১১ই বৈশাখকে ১০ই বৈশাখ, ২রা জানুয়ারীকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি করে তিনি যে সব কীর্তি অর্জন করেছিলেন তা বিদগ্ধ সমাজে সম্মানিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা মুগ্ধ করেছিল সকলকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব গোলমাল হয়ে গেল।

চাকলাদার মশাই ঐতিহাসিক তারিখগুলিকে নির্ভুল নিখুঁত ছন্দে সাজাবার চেষ্টাই শুধু করেন নি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও আশ্চর্যরকম বাঁধা ছিল সময়ের ছন্দে। উঠতেন ভোর পাঁচটায়। তারপর থেকে যা যা করতেন সবই ঘড়ি ধরে। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগত। তারপর চোখ বুজে তিনি প্রার্থনা করতেন মিনিট দশেক। চা জলখাবার খেতে পনেরো মিনিট যেতো। তারপর লেখাপড়া করতেন একটানা তিনঘণ্টা। এরপর স্নান এবং তার পরেই আহার—ঠিক একঘণ্টা লাগত। খাওয়ার পর ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে থাকতেন আধঘণ্টা। তারপর উঠেই আবার পড়াশুনা করতেন। পাঁচটা পর্যন্ত ওই নিয়েই থাকতেন। তারপর দুটি বিস্কুট দিয়ে চা খেতেন। ঠিক পনেরো মিনিট লাগত। তারপর জামা কাপড় পরতেন। এতেও পনেরো মিনিট। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি বেড়াতে বেরুতেন। ঠিক একঘণ্টা বেড়াতেন। তাঁর বাড়ির রাস্তাটা ধরে সোজা হাঁটতেন উত্তর দিকে, ঠিক আধ-ঘণ্টায় গিয়ে পেঁছিতেন লাল বাড়ির গেটের সামনে। আধ ঘণ্টার বেশি কোন দিন লাগত না। গেটের সামনে পেঁছেই ফিরতেন আবার। বাড়ি ফিরতে আরও আধঘণ্টা লাগত। এক মিনিট এদিক ওদিক হয় নি কখনও।

সেদিনও লালবাড়ির সামনে পেঁছে ফিরেছিলেন তিনি বাড়ির দিকে। আধঘণ্টার মধ্যেই নিজের বাড়িতে পেঁছিবার কথা। হঠাৎ একটা শব্দ হল, একটু চমকে উঠলেন। তারপর মনে হল খুব যেন হাল্কা হয়ে গেছেন। হাঁটা বন্ধ করেন নি কিন্তু। যেমন হাঁটছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই হাঁটতে লাগলেন। আধঘণ্টা হেঁটে কিন্তু বাড়ির সামনে যখন পেঁছিলেন তখন দেখেন তাঁর বাড়ি নেই। যেখানে তাঁর টালির একতলা বাড়িটা ছিল, সেখানে একটা আকাশচুম্বী বিরাট বাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশেপাশে চেয়ে দেখলেন একটাও চেনা বাড়ি চোখে পড়ল না। তাঁর পাশেই থাকতেন ডাক্তার ঘনশ্যাম মিত্র। তাঁর হলদে রঙের বাড়িটাও নেই। সেখানেও একটা নভশ্চুম্বী প্রাসাদ। তাঁর বাড়ির সামনে বিরাট একটা বস্তি ছিল ছোটলোকদের। সেটার জায়গায় বিরাট একটা পার্ক। এ কি হল। হাত ঘড়িটা দেখতে গেলেন—দেখলেন তাঁর হাত নেই, দেহ নেই। একঘণ্টার মধ্যে এ কি হয়ে গেল।

এক শতাব্দী আগে অ্যাটম বম্ পড়ে অধ্যাপক চাকলাদার মারা গিয়েছিলেন। তাঁর দেহটা সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেহাতীত লোকে বেঁচেছিল তাঁর মনটা। ঘুরে বেড়াচ্ছিল মহাশূন্যে এক শতাব্দী ধরে। তাঁর সেই মন ভাবছিল এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি ফিরছেন, কারণ, বেড়িয়ে ফিরতে কখনও তো তাঁর একঘণ্টার বেশি লাগে না। সেকালে সংস্কার আবদ্ধ তাঁর মন কিছুতেই ধারণা করতে পারল না যে এক শতাব্দী কেটে গেছে।

উপলব্ধি

পাখীর সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও ছিল না তেমন। ঔৎসুক্যও ছিল না। কিন্তু আমার একমাত্র মামার মৃত্যুর পর আমার আগ্রহ হল একটা পাখী পুষব। আমার মামা সিঙ্গাপুরে চাকরি করতেন। অবিবাহিত লোক ছিলেন। নানা রকম শখ ছিল তাঁর। কুকুর পুষতেন, পাখী পুষতেন নানা রকম। বাগানও করতেন শুনেছি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর অনেক জিনিসপত্র আমার কাছে এসে পেঁছিল। কারণ আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁর জিনিস পত্রের সঙ্গে এল একটি চমৎকার খাঁচা। এ রকম মনোরম খাঁচা আমি ইতিপূর্বে দেখি নি। সম্ভবত কোন চীনে শিল্পীর তৈরী। এই খাঁচাটি পেয়ে আমার পাখী পোষবার ইচ্ছে হল। ইচ্ছা হল সাধারণ টিয়া ময়না মুনিয়া বদরি পুষব না। এই অসাধারণ খাঁচায় অসাধারণ পাখী পুষতে হবে। কিন্তু অসাধারণ পাখী পাওয়া গেল না চট্ ক'রে। বাজারে গিয়ে দেখি সাধারণ পাখীরই মেলা। খাঁচাটা খালিই পড়ে রইল কিছুদিন। গিন্নি দু-একবার তাগাদা দিলেন। আবার বাজারে গেলাম। কিন্তু অসাধারণ পাখী চোখে পড়ল না। তারপর হঠাৎ একদিন এক পাখীওলা এল আমার বাড়ির সামনে। তার সব খাঁচাগুলিই খালি। একটি ছোট খাঁচায় কেবল একটি ছোট্ট পাখী রয়েছে। চড়ুই পাখীর চেয়ে একটু বড়। কিন্তু কি চমৎকার দেখতে। পিঠের উপরটা কুচকুচে কালো। ডানাও কালো। ডানায় কালোর উপর চমৎকার শাদা পাড়। ঠোঁটটি হলদে। সোনার বরণ, পাকা সোনার মতো। মাথার উপরটি কালো কিন্তু নীচের দিকটা হলদে। আর গ্রীবা-ভঙ্গী কি মনোরম। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

"কি নাম এ পাখীর।"

পাখীওলা অবাঙালী।

সে বলল—"তোফিক্"—তারপর একটু থেমে বলল—"কোই কোই "সুবেগী" ভি বোলতা হ্যয়—"

তোফিক্ সুবেগী দুটো নামই অদ্ভুত মনে হল। খুব নতুন ধরনের।

পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে ফেললাম পাখীটা।

অভিজ্ঞ বন্ধুরা বললেন—"বাজে পাখী রং ক'রে দিয়ে গেছে।"

স্থান করালাম তাকে ভাল করে, রং উঠল না বরং উজ্জ্বলতর হল। গৃহিনী খাঁচার সামনে বসে, তাকে হরেকৃষ্ণ নাম পড়াবার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে লাগলেন। পাখী কিন্তু কোন শব্দ করে না। কিছু খায়ও না। নানারকম ফল দেওয়া হল তাকে, স্পর্শ করল না। জল পর্যন্ত খেল না এক ফোঁটা। খাঁচার শিক ধরে ধরে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে লাগল শরীরটাকে উলটে উলটে। পাখীটার ঠিক পরিচয় কেউ দিতে পারল না। সবাই বললে বাজে পাখী কিনেছ। নিজের পরিচয় নিজেই সে একদিন দিল। হঠাৎ দুপুর বেলা ডেকে উঠল "ফটি—ক জল", একটু পরে আবার "ফটি—ক জল"। তার পর দিনই মারা গেল।

এটা অনেকদিন আগেকার ঘটনা। তখন যুবা ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হয়েছি। এখন মনে হয় ভগবানও হয়তো অমনি ভাবে চলে গেছেন আমার কাছ থেকে কতবার, নির্যাতিত হয়ে। আমি তাঁকে চিনতে পারি নি।

শান্সিক সম্বর্ধনা

চূড়ামণি রসার্ণব যে যাদুকর তাহা আগে জানা ছিল না। কতটুকুই বা জানি তাঁহার সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে আমার কাছে সহসা আসিয়া হাজির হন। বিশেষ করিয়া তখনই আসেন যখন মনে মেঘ জমিয়া থাকে, যখন বিমর্ষ হইয়া পড়ি। আসিয়া বলেন, "মন খারাপ করে বসে আছ দেখছি। নাও এই লজেনসটা মুখে পুরে ফেল। ফরাসী দেশের মাল। ভাল করে চোষ, ওতে ফরাসী সংস্কৃতির আস্বাদ পাবে।" লজেনস চুষিয়া মনে পুলক জাগে। মনের মেঘ কাটিয়া যায়। কখনও আসিয়া কবিতা আওড়ান, কখনও পরচা করেন, কখনও আমার লেখার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠেন। মনের মেঘ কাটিয়া আলো ঝলমল করিয়া ওঠে।

নিজের পরিচয় তিনি কখনও দেন না। জিজ্ঞাসা করিলে মুচকি হাসেন শুধু। বুঝিয়াছিলাম তিনি রসিক বিদগ্ধ ব্যক্তি। সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম তিনি যাদুকরও।

সেদিন বাজার হইতে এক টাকা কেজি ঝিঙা কিনিয়া বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিলাম বারান্দায়। হঠাৎ চূড়ামণি দেখা দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "আজও মন খারাপ দেখছি কি হল, ব্যাপার কি—"

"দেশের অবস্থা দিন দিন যা হচ্ছে—"

"দেশের কথা তুমি ভাব না কি।"

"গতবার দেখেছিলাম তুমি গোঁফে আতর মেখে বসে আছ—"

"পুরোনো আতর ছিল একটু। তাই মেখেছিলাম। জমিরুদ্দিন আতর-ওলা দিয়েছিল অনেক আগে। সে তো এখন পাকিস্থানে—"

"তার কথা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?"

এখন তার কথা ভাবছিলাম না।

"অনেকদিন মাছ খাইনি। আজ বাজারে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম ইলিশ বারো টাকা কেজি, ছোট পুঁটি পাঁচ টাকা। পয়সায় কুলোল না। তাই ঝিঙে কিনে নিয়ে এলাম। তাই ভাবছি।"

"কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশের আবহাওয়া এত ভালো হয়ে গেছে যে পশুপক্ষীরা পর্যন্ত ভদ্র হয়ে উঠেছে। সুন্দর বনে একদল ভেড়া না কি এক রয়াল বেঙ্গল টাইগারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এখানে আজ মাঠে শালিক-সম্বর্ধনা হচ্ছে। এসব অতি শুভ লক্ষণ—"

"শালিক সম্বর্ধনা ? এখানকার মাঠে ? কি রকম ?"

"দেখবে ? চল যাই তাহলে। কিন্তু তার আগে শালিক হতে হবে। শালিক না হলে শালিকদের ব্যাপার বুঝবে না—"

"শালিক হব কি করে—"

"ব্যস্ত হচ্ছ কেন, দেখই না।"

চূড়ামণি নিমেষের মধ্যে আমাকে শালিকে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। নিজেও শালিক হইয়া গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড। তখনই বুঝিলাম চূড়ামণি যাদুকরও। দুজনে গেলাম মাঠের দিকে।

মাঠে বহু শালিক সমবেত হইয়াছিল। বিরাট সভা। একটি উঁচু ঢিপির উপর দেখিলাম একটি শালিক বসিয়া আছে। মুখটা হাসি-হাসি। তাকে উদ্দেশ্য করিয়া এক একজন শালিক বক্তৃতা করিতেছিল। লম্বা বক্তৃতা। সকলের বক্তৃতা একত্রিত করিয়া একটি মোটা গ্রন্থ হয়। আমি সকলের বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি এখানে।

"হে সুধি তুমি শালিক প্রবর, শালিক-চক্রবর্তী, শালিকোত্তম—শালিক-বংশাবতংস। তুমি রূপবান, তুমি গুণবান, তুমি শিল্পী-শ্রেষ্ঠ, তুমি নানা-ভঙ্গিময়, হে গুণি, তুমি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ কর। তুমি কবি, তুমি সুরকার। আমাদের দেশের দোয়েল, পাপিয়া, কোকিল, বেনে বউ, বিহঙ্গরাজ তোমার সুর শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছে. তোমার গ্রাম্য কাকলির সরল সহজ সুরে তাহাদের কলা-কৌশলময় সঙ্গীত-লীলা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের রূপবান পাখীরা ময়ূর, নীলকণ্ঠ—ভগীরথ-বসন্তবৌরী, টিয়া, চন্দনার দল অনুভব করিতেছে যে তাহাদের বর্ণ বাহুল্য তুচ্ছ, তোমার সরল শালিক মূর্তিতে রূপের যে অপরূপ বঞ্চনা অলংকৃত মহিমায় পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা অনবদ্য, তাহা অপরূপ, তাহা তোমার অঙ্গসৌষ্ঠবেই বিকশিত হইয়া আড়ম্বরকে নীরব ভাষায় ধিক্কার দিতেছে। হে সর্বগুণান্বিত তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ কর—"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম। চূড়ামণি আমার কানে কানে বলিলেন—

"ব্যাপারটা বুঝলে তো। এইবার বাড়ি চল—"

বাড়িতে ফিরিয়া আবার মানুষ হইলাম আমরা। যাদুকর চূড়ামণি অতি সহজেই তাহা করিয়া দিলেন।

বলিলাম—"সকলে মিলে শালিকটিকে এত প্রশংসা করছে কেন বুঝতে পারলাম না। ওটা তো অতি সাধারণ শালিক একটা—"

চূড়ামণি সংক্ষেপে বলিলেন, "ভদ্রতা—"

"অতি সাধারণ একটা শালিককে নিয়ে এমন ভদ্রতার তুফান তোলারই বা দরকার কি—"

"ওটি সাধারণ শালিক নয়। ভিন্ন রাজ্যের শালিক—"

"তাই না কি।"

চূড়ামণি বলিতে লাগিলেন, "ভদ্রতাই মানব-সভ্যতার শেষ কথা। আমাদের দেশে সেই ভদ্রতার ঢেউ এসেছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা, সাহিত্যিকরা এমন কি পশু-পক্ষীরাও ভদ্র হয়ে গেছে। খুব শুভ লক্ষণ এটা। সবাই যদি আমরা ভদ্র হয়ে যাই তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আবার জমিরুদ্দিন আতর নিয়ে আসবে, ইলিশ মাছ টাকায় চারটে পাওয়া যাবে, পুঁটি মাছের দর হবে এক আনা কেজি। সব ঠিক হয়ে যাবে। নাও এই লজেন্স দুটো খাও। আমেরিকান মাল—"

দুটি রঙীন লজেন্স দিয়া হাসি মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন চূড়ামণি।

আলো

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বলবেন আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করব না। দুর্বুদ্ধিই হয়েছিল আমার। আমার স্বপক্ষে শুধু একটি কথাই বলবার আছে—আমি প্রেমে পড়েছিলাম। যদিও পঞ্চান্ন বছর আগে, যদিও সে প্রেমের উপর দিয়ে দুটো বিশ্ব মহাযুদ্ধ, একটা ভয়াবহ ভূমিকম্প, কয়েকটা ভীষণ ঝড় আর বন্যা হয়ে গেছে, যদিও আমাদের প্রথম যৌবনের স্বাধীনতা-স্বপ্নের উপর খড়্গ চালিয়ে ইংরেজ হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করেছে, লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে, গৃহহীন হয়েছে, ভ্রংশ ভ্রষ্ট হয়ে হারিয়ে গেছে, তলিয়ে গেছে, যদিও আমার চোখের সামনে কংগ্রেসের যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং মৃত্যু দেখলাম, যদিও অনেক রকল অদলবদল হ'ল—এসব সত্ত্বেও আমার প্রেম কিন্তু এখনও অম্লান আছে। আমার বয়স যখন কুড়ি আর টুনির বয়স যখন পনেরো তখন দেখা হয়েছিল আমাদের এক জ্যোৎস্নালোকিত অলিন্দে। সেই প্রথম দর্শনই শুভদৃষ্টি। সেই মুহূর্তেই তার গলায় মালা পরিয়েছিলাম আমি। ঠিকুজি-কুষ্ঠি মেলানো হয় নি, পণ নিয়ে দর-কষাকষি হয় নি, শাঁখ বাজে নি, শানাই বাজে নি, উলু দেয় নি কেউ। তবু আমি জানি আমাদের বিবাহ হয়েছিল। শাস্ত্রে বিবাহের যত রকম শ্রেণী বিভাগ আছে এটা তার কোন বিভাগেই পড়ে না, তবু জানি আমাদের বিবাহ হয়েছিল। আমি সামাজিকভাবে টুনিকে পাই নি, পাওয়ার আশাও ছিল না। টুনি ছিল বিরাট বড়লোকের মেয়ে, তার বাবা ছিলেন গভর্নমেণ্টের একজন বড় অফিসার। আর আমি ছিলাম এক নগণ্য কেরানীর ছেলে। পাশের বাড়িতে থাকতাম বলেই তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম তার ভায়ের উপনয়ন উপলক্ষে। সেদিন পূর্ণিমা ছিল। জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল তাদের বারান্দায়। টুনি এসে বলেছিল, "আপনি শুনেছি খুব ভালো ছেলে। আমাকে অ্যালজ্যাবরার (Algebra) কয়েকটা অংক বুঝিয়ে দেবেন ?"

"দেব। আসছে রবিবার আসব—"

টুনির মুখে সেদিন চাঁদের আলো পড়েছিল। পিঠে দুলছিল বেণী। একটা গোলাপী রঙের শাড়ি পরেছিল। গলায় ছিল একটা সরু হার। চোখে হাসি চিকমিক করছিল। তার এই চেহারাই মনে আছে। তারপর আর দেখিনি তাকে। টেলিগ্রামে তার বাবাকে বদলি করা হয় বোম্বেতে। দু'দিন পরেই চলে গিয়েছিল তারা। তারপর আর দেখা হয় নি। পঞ্চান্ন বছর দেখা হয় নি। তবে তার খবর রেখেছি আমি। আমি জানি টুনির বিয়ে হয়েছে একজন বড় মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে। তার সঙ্গে সে প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছে। তিনটি ছেলে হয়েছে তার। এখন কানাডায় বাস করছে। ডিটেকটিভ লাগিয়ে পুলিশরা যেমন চোরের সন্ধান করে, আমি তেমনিভাবে টুনির ঠিকানা সন্ধান করেছি। দুখানা চিঠি লিখেছিলাম তাকে, সাধারণ চিঠি। উত্তরও পেয়েছিলাম। সাধারণ উত্তর। দিন সাতেক আগে হঠাৎ তার চিঠি পেলাম একটা। লিখেছে, তার স্বামী মারা গেছে। তার বড় ছেলে ভারতবর্ষে মিলিটারি বিভাগে চাকরি পেয়েছে। তারা আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসছে। ১৭ই মার্চ তারা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ল দেখতে আসবে। আমি যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে যাই তাহলে দেখা হবে। চিঠি লিখেছে দিল্লী থেকে। আমি যেদিন চিঠি পেলাম সেদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি। চিঠি পেয়ে মনে হল—না, কি মনে হ'ল তার বর্ণনা করতে পারব না। অনেক কবির লেখায় আপনারা যে সব বর্ণনা পড়েছেন তার সঙ্গে কিছু মিল নেই তার। তা অন্য রকম, কিন্তু তা আমি বলতে পারব না। আমার একটা কথা মনে হল—পঞ্চান্ন বছর পরে সে আমাকে চিনতে পারবে কি? সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে ফোটো তোলালাম একটা। সেটা পাঠিয়ে দিলাম তাকে। লিখলাম—আমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়লে বিকেল চারটের সময় যাব। মনে হচ্ছে এতদিন পরে হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। তাই এখনকার একটা ফোটো পাঠাচ্ছি। একটু কুঁজো হয়ে গেছি, চুল সব সাদা, দাঁত বাঁধানো। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়লের গেটের সামনেই থাকব আমি।"

পনেরই মার্চ সকালে হীরেন ডাক্তার এল। হীরেন আমার স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধায়ক। প্রতি মাসে এসে আমার হেল্‌থ চেক্ করে। দেশের জন্যে অগ্নিযুগে আমি নির্যাতন সহ্য করেছিলাম ব'লে হীরেন আমার ভক্ত হয়েছে। প্রতি মাসে এসে গাড়ি করে আমাকে তার ক্লিনিকে নিয়ে যায় এবং সব রকম পরীক্ষা করে। ব্লাড প্রেসার, চোখ, রক্ত এই তিনটেই সে দেখল আগে। বলল, "আপনি তো নিশ্চয়ই অত্যাচার করছেন আবার। আপনার ব্লাড প্রেসার আড়াই শ, ব্লাড সুগার দুশো কুড়ি, আর চোখের অবস্থাও খুব ভালো নয়। সাবধানে থাকবেন।"

বললাম, "দেশের যা অবস্থা হয়েছে, আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। পরশু পর্যন্ত ভালো থাকব ত?"

"পরশু পর্যন্ত? তার মানে—"

"ওইদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে যাব একবার—"

"হঠাৎ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে যাবেন? এখন ক'দিন আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"

হীরেনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করলাম না। জানি আমাকে যেতেই হবে।

আমি থাকি ব্যারাকপুরে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ক'রে যাওয়ার পয়সা ছিল না, বাসে করেই গেলাম। বাড়ি থেকে দুটোর সময় বেরিয়েছিলাম।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের সামনে উত্তেজনার তুঙ্গে আরোহণ ক'রে অপেক্ষা করছিলাম টুনির জন্য।

পিছন থেকে হঠাৎ শুনলাম।

"কে মণিদা নাকি—"

চমকে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। দুটো চোখেই হেমারেজ হয়ে গেল।

"কে টুনি—"

"হ্যাঁ আমি এসেছি। আমার বড় ছেলেও এসেছে। আপনি একা এসেছেন? আপনার ছেলেকে বা মেয়েকে দেখব আশা করেছিলাম।"

"আমি তো বিয়ে করি নি। কিন্তু আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। দুটো চোখেই হেমারেজ হয়েছে বোধহয়—"

"তাই নাকি?"

টুনি আর তার ছেলে আমাকে ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে গেল। বলল, "কালই আমাকে বাঙ্গালোর যেতে হবে।"

"কি দুর্ভাগ্য আমার। তোমাকে আর একবার দেখতে পেলাম না।"

দেখতে কিন্তু পেয়েছিলাম।

অন্ধকার পটভূমিকায় টুনি আবার এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই টুনি যাকে অনেকদিন আগে দেখেছিলাম জ্যোৎস্নালোকে। পরনে গোলাপী শাড়ি, পিঠে বেণী দুলছে, গলায় সরু হার, চোখের দৃষ্টিতে চিকমিক করছে হাসি। মনে মনে জিগ্যেস করলাম —"টুনি, এসেছ তুমি—"

টুনির উত্তরও যেন শুনতে পেলাম, "এসেছি। আমার নামটা কিন্তু এখন আর টুনি নয়—"

"নয়? কি তবে—"

"আলো।"

এর মানে তখন বুঝি নি। অনেকদিন পরে বুঝেছি।

কবিতা

সকাল থেকেই ভাবছিলাম কি নিয়ে কবিতা লিখি। মাথায় কিছুই আসছিল না। দু কাপ কফি খেলাম, অনেকবার নস্যি নিলাম, চোখ বুজলাম, চোখ খুললাম, জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলাম সামনের মাঠে একটা কাদামাখা মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। তাকে নিয়ে দু লাইন লিখলামও—"হে যমবাহন মহিষ, আছে কি তোমার সহিস।" ভাল লাগল না। ছিঁড়ে ফেললাম কাগজটা। তারপর ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। খানিকক্ষণ পরে তন্দ্রা এল একটু। কিন্তু উঠতে হল, দুয়ারে কড়া নড়ছে। ইলেকট্রিক বেলটাও বেজে উঠল।

কপাট খুলে দেখি একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বব-করা চুল, গালে রং, ঠোঁটে রং, চোখে কাজল। পেট কাটা ব্লাউস, পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, নাভির নীচে কাপড়। গলায় পাউডার। পায়ে ছুঁচলো লাল স্যাণ্ডাল। হাতে রিষ্টওয়াচ।

কিন্তু ভারি রোগা মেয়েটি। চোখের কোলে কালি, গালের হাড় উঁচু, চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

"কে আপনি ?"

"আমি কবিতা। আমাকে তো ডাকছিলেন আপনি—"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি করুণ কণ্ঠে বললে—"বড় ক্ষিধে পেয়েছে। বাড়িতে খাবার আছে কিছু।"

"বিস্কুট আছে—"

"তাই দিন।"

মেয়েটি আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকল।

খাবার টেবিলে বসালাম তাকে।

বিস্কুটের টিনটা এগিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে ঢাকনি খুলে হ্যাংলার মতো খেতে লাগল। টিনে খান দশেক বিস্কুট ছিল। সব খেয়ে ফেললে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—"ক'দিন খাইনি। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল।"

"খান নি কেন ?"

"পয়সা নেই।"

"কিন্তু আপনার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তো মনে হয় না আপনি গরীব—"

"পোশাক পরিচ্ছদ একটাও আমার নয়, সব ধার করা।"

"ধার দিলে কে—"

"উলঙ্গিনী। তার অনেক পয়সা। আমি কিন্তু উলঙ্গিনী হতে পারি নি, তাই খেতে পাচ্ছি না। আর কিছু খাবার আছে আপনার ?"

"হয়তো পাউরুটি আছে ও ঘরে। দেখি। জ্যামও আছে হয়তো—"

"নিয়ে আসুন—"

পাশের ঘর থেকে পাউরুটি আর জ্যাম নিয়ে এসে দেখি মেয়েটি টেবিলের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। অঝোর ঝরে কাঁদছে—।

মরা বাঁচা

ডাক্তার বসু দেখলেন আবার সেই বুড়িটা এসেছে। আইনসঙ্গত ভাবে আগে নাম না পাঠিয়েই ঢুকে পড়েছে তাঁর কনসালটেশন রুমে।

"আজ জ্বরটা বড্ড বেড়েছে বাবু। গা পুড়ে যাচ্ছে।"

"এই বুড়ি, তুমি বাইরে বস, কথা শোন না কেন ?"

যে দ্বারপাল তাঁর কনসালটেশন রুমের দ্বার রক্ষা করে, সে এসে বুড়িকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত হল ডাক্তার বসুর। সে কুঞ্চন অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না,

আবার তিনি রোগী দেখায় মন দিলেন। কিন্তু ওই বুড়ির নাতিটার কথা বার বার মনে হতে লাগল তাঁর। বুড়ি থাকে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক ঘোর পাড়াগাঁয়ে। খুব গরীব। তাঁকে গ্রামের এক ভদ্রলোক কল দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলের শিক্ষক একজন। রাস্তা খুব খারাপ, প্রায় দুর্গম বললেই চলে। তাঁর গাড়ির একটা চাকা জখম হয়েছে। ফি অবশ্য তিনি পেয়েছিলেন। পুরোই পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই স্কুলের শিক্ষকটি বললেন বুড়ি তার গয়না বাঁধা দিয়ে নাকি টাকাটা যোগাড় করেছে। রোগী বুড়ির একমাত্র নাতি। বুড়ি একটা গরীব গয়লানী। দুটি গাই আছে। দুধ আর ঘুঁটে বিক্রী করে দিন চলে তার। এ সব দুঃখের কথা শুনেও ডাক্তার বসু 'ফি' নিয়েছিলেন। দুঃখের কাঁদুনিতে গলে গেলে রোজগার বন্ধ করে মিশনারি হতে হয় এদেশে। ডাক্তার বসু কিন্তু লোক খারাপ নন। তিনি বুড়িকে বলেছিলেন—আমার পক্ষে তো রোজ আসা সম্ভব না। তুমি তোমার নাতিকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। তোমার নাতির টাইফয়েড হয়েছে সেবা দরকার। তোমার ঘরের জানালা কপাট সব ভাঙ্গা। ঘরের চালে খড় নেই। বৃষ্টি হলে ঘরের ভিতর জল পড়ে, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, বিছানার চাদর ভিজে গেছে। টাইফয়েড রোগী কি এ ঘরে থাকতে পারে? হাসপাতালে ভর্তি করে দাও।

বুড়ি বললে হাসপাতালে তার ছেলে মারা গিয়েছিল। সেখানে সে তার নাতিকে নিয়ে যাবে না।

ওষুধের প্রেসক্রিপশনে যে সব ওষুধ প্রথমে লিখেছিলেন সেগুলোও কেটে দিতে হয়েছিল। অত দামী ওষুধ কেনবার সামর্থ্য নেই বুড়ির। সাধারণ একটা ফিভার মিকশ্চার লিখে দিয়ে এসেছিলেন। ওতে কি টাইফয়েড জ্বর কমবে? সব রোগী যখন চলে গেল তখন বুড়ি আবার এল।

"জ্বরটা বড্ড বেড়েছে ডাক্তারবাবু। গা পুড়ে যাচ্ছে।"

"ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে আজকাল। প্রথমে যে ওষুধগুলো দিতে চেয়েছিলুম তা দিলে জ্বর কমে যেত।"

"অত টাকা যে নেই ডাক্তারবাবু। ধারও দিতে চাইছে না কেউ। শিবের দোরে ধর্না দিচ্ছি রোজ। বাবা যদি মুখ তুলে চান।"

"তবে বাবার উপরই নির্ভর কর। আমার কাছে এসেছ কেন?"

"বাবা যা করবার আপনার হাত দিয়েই করবেন। আপনার কত হাতযশ—"

"যে ওষুধটা দিয়ে এসেছিলাম ওইটেই খাওয়াও তাহলে। আর দেখো যেন ঠাণ্ডা না লাগে। তোমার ঘরের যে অবস্থা দেখে এসেছি।"

"আমার বোন একটা কাঁথা দিয়েছে। বাবাই জুটিয়ে দিয়েছেন। বেশ মোটা কাঁথা। সেইটেই গায়ে দিয়ে রাখি সর্বদা।" বুড়ি চলে গেল।

তারপরই ফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো, ও নমস্কার, কেমন আছে খোকা? জ্বর কম আছে? কমে যাবে। ওষুধটা ঠিক মতো পড়ছে তো? পালস রেট কত? নার্স কোথা? তাকে ফোনটা ধরতে বলুন।"

নার্স ফোন ধরে প্রয়োজনীয় খবরগুলো জানাল ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তার বসু জিগ্যেস করলেন—"পালস্ রেট ১৪২, একটু বেশী মনে হচ্ছে। রেসপিরেশন কত? ৩০? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি এখুনি।"

একটু চিন্তিত হলেন ডাক্তার বসু। ছেলেটা বড্ড রোগা। বুকের হাড় গোণা যায়। রিকেটস্। বড়লোকের ছেলে, নানারকম 'ফুড' খেয়ে মানুষ হয়েছে, মাইদুধ পায় নি। তার উপর হয়েছে টাইফয়েড। চিকিৎসার অবশ্য কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

ডাক্তার বসু প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা যান ছেলেটিকে দেখতে। দরকার হলে আরও দু'একবার যেতে হয়। ধনীর একমাত্র ছেলে, টাকার জন্যে কিছু আটকাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিজ্ঞতর চিকিৎসক, কিংবা স্পেশালিস্ট আসছেন।

ডাক্তার বসু গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর মনে হল 'চেস্ট স্পেশালিস্ট' ডাক্তার মল্লিককে ডাকা দরকার। তাঁর আশংকা হতে লাগল বুকে সর্দি বসেছে। কিন্তু নিজের দায়িত্বে কিছু করবার সাহস পেলেন না তিনি। মল্লিক এসেও সেই কথা বললেন, কিন্তু যেহেতু তিনি 'স্পেশালিস্ট' তাই তিনি বললেন—এক্সরে প্লেট নিলে ভালো হয়। পোর্টেবল এক্সরে নিয়ে এসে দু'খানা প্লেট নেওয়া হল। একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল, কিন্তু ডাক্তার বসুর যে সন্দেহটা হচ্ছিল সেটা মিটে গেল। ছেলেটি খুবই রোগা, তাঁর আশংকা হচ্ছিল হয়তো ভিতরে ভিতরে যক্ষ্মা ছিল, সেটাই মাথা চাড়া দিচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। কয়েকটা ইন্‌জেকশন দিলেই সেরে যাবে। কিন্তু একরকম ইন্‌জেকশনই বিভিন্ন কোম্পানীর আছে বিভিন্ন নামে। ডাঃ বসু একজন নামজাদা ডাক্তারের নাম করে বললেন তাঁর ওপিনিয়ন নেওয়াই ভালো। নামজাদা ডাক্তারবাবু এলেন, রোগীকে দেখলেন, প্লেট দেখলেন, তারপর বললেন এক রকম নয়, দুরকম ইন্‌জেকশন দেওয়াটাই নিরাপদ। তাই দেওয়া হতে লাগল। তিনি আরও বলে গেলেন—হার্টটার সম্বন্ধেও লক্ষ্য রাখবেন। লক্ষ্য রাখা হচ্ছিলও, তবু আর একটা বিশেষ ওষুধ দিয়ে গেলেন তিনি। গোটা দশেক ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেল। ছেলেটা ভারি দুর্বল হয়ে পড়ল কিন্তু। নানারকম দামী দামী বলকারক ওষুধ, ভিটামিন, ফলের রস প্রভৃতি দিয়েও দুর্বলতা যাচ্ছে না দেখে অবশেষে ডাক্তাররা ঠিক করলেন ওকে মাছের ঝোল দেওয়া হোক। বাড়িতে যে পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করতেন প্রত্যহ, তিনি কবিরাজীও পড়েছিলেন কিছু। তিনি বললেন—বাঙালীর ছেলেরা মাছ ভাত দুধ দই খেয়ে যত শক্তি লাভ করে তত শক্তি সম্ভবত দেবতারা অমৃত পান করেও লাভ করেন নি। আমার মতে পাঁচ বৎসরের পুরাতন তুলসীমঞ্জরী চাউল আর জীবন্ত মাগুর মৎস্যের ঝোল দিয়ে পথ্য দিন, তারপর ক্রমশঃ একটু একটু করে দুধ দেবেন। দেখবেন ছেলে ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হয়ে যাবে। ছেলের মায়ের অগাধ বিশ্বাস পুরোহিত মহাশয়ের উপর। তিনি ডাক্তার বসুকে পুরোহিত মহাশয়ের বিধানের কথা বললেন। ডাঃ বসু সাবধানী লোক। তিনি আবার ফোনে বিজ্ঞতর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন। বিজ্ঞতর ডাক্তারবাবু বললেন—ভালই তো। মাগুর মাছের ঝোল আর পুরানো চালের ভাত, এতে আর আপত্তি কি।

পুরানো তুলসীমঞ্জরী যোগাড় করতে কিন্তু বেগ পেতে হল বেশ। কিন্তু টাকা থাকলে যোগাড় করা যায়। চোরাবাজার থেকে দশ টাকা কে জি দরে পাঁচ কে. জি. চাল পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। মাগুর মাছ পাওয়া গেল বারো টাকা কে জি. দরে। যেদিন পথ্য দেওয়ার কথা সেদিন সকালে মহাসমারোহে চণ্ডীপাঠ করলেন পুরোহিত মহাশয়। চণ্ডীপাঠ ছাড়াও আরও নানারকম স্তব আওড়ালেন তিনি। খোকনের মা

ডাক্তার বসুকে বললেন, "ডাক্তারবাবু, খোকন যখন পথ্য পাবে, তখন আপনিও থাকবেন। দুপুরে খাবেনও সেদিন এখানে—"

ডাক্তার বসু বললেন—"ক'টার সময় পথ্য দেবেন ?"

"পণ্ডিত মশায় পাঁজি দেখে বলে দিয়েছেন—ঠিক দশটায় হবে।"

"ঠিক সে সময় তো আমার পক্ষে আসা মুশকিল। অনেক রুগী আসে তো সে সময়। তবু আমি চেষ্টা করব।"

পথ্যের দিন সকালে খোকনের ছোট মাসী এসেছিল ভবানীপুর থেকে। যদিও বয়স বারো বছর তবু অনেক গল্পের বই পড়েছে সে। হাসির গল্প তার বিশেষ প্রিয়। খোকনের জন্যও দুটো হাসির গল্পের বই এনেছিল সে। বইয়ের ছবিগুলো দেখে খোকন খুব হাসতে লাগল।

মাসী বললে—"ওর গল্পগুলো পড়লে আরও হাসতে হবে। পরে পড়িস।"

"আমাদের পাড়ার গণ্ডারদার গল্প শোন—"

"গণ্ডার মানুষের নাম না কি—হি-হি-হি।"

"ওর আসল নাম গণেশ, আমরা আড়ালে বলি গণ্ডার। যেমন কালো, তেমনি মুস্কো, আর তেমনি রাগী—রেগে গেলে গোঁ গোঁ শব্দ করে—"

"হি-হি-হি-হি—"

হেসে লুটিয়ে পড়ল খোকন।

"কেঁউ কেঁউ বললে ও চটে যায়। কাল বিষ্টি হয়েছিল তো খুব। গণ্ডারদা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল—"

খোকনের মা এসে বললেন—"চল খাবার দেওয়া হয়েছে—"

কপালে টিপ পরিয়ে দিলেন একটি।

ভাল কার্পেটের আসনের সামনে রুপোর থালা-বাটিতে পথ্য সাজানো ছিল।

ঠাকুরঘরে প্রণাম করে এসে খোকন আসনে বসল। তার মাসীটিও সঙ্গে সঙ্গে এসে বসল তার কাছে।

তারপর ফিস ফিস করে বলতে লাগল—"গণ্ডারদা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। পাড়ার কয়েকটা ছেলে দূর থেকে বলছিল কেঁউ কেঁউ। গণ্ডারদা যেই তাদের ধরবে বলে ছুটে সেদিকে গেল অমনি পা পিছলে আলুর দম। কাল বিষ্টি হয়েছিল তো খুব, রাস্তায় খুব পেছল হয়েছিল।"

হো হো করে হেসে উঠল খোকন।

তারপরই তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে আসনের উপর শুয়ে পড়ল সে।

ডাক্তার বসুর ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

"শিগ্‌গির আসুন, ডাক্তারবাবু, খোকন কেমন করছে।"

ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন খোকন মারা গেছে। হার্টফেল করেছে। হাসির ধাক্কা সামলাতে পারে নি।

॥ ২ ॥

মাস দুই কেটে গেছে তারপর।

ডাক্তার বসু তাঁর ক্লিনিকের সামনে মোটর থেকে নামতেই একটি ন্যাড়ামাথা রোগা ছেলে এসে প্রণাম করল তাঁকে।

পিছনেই আধ-ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক একটি ছোট হাঁড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, "আমার নাতি হারু বাবার দয়ায় আর আপনার চিকিৎসায় ভাল হয়েছে। ভাল করে পেন্নাম কর। উনি দেবতা—"

হারু আবার প্রণাম করল।

মেয়েটি তখন কুণ্ঠিত স্বরে বলল—"আপনার জন্যে একটু দই পেতে এনেছি ডাক্তারবাবু। আমার ঘরেই দুধ হয়, নতুন হাঁড়িতে আলাদা করে পেতেছি আপনার জন্য—"

ক্লিনিকের বারান্দায় হাঁড়িটি রেখে গলবস্ত্র হয়ে সে-ও প্রণাম করল তাঁকে।

টিক্‌রে

টেলিস্কোপে দৃষ্টি-নিবদ্ধ বিজ্ঞানীরা মহাকাশের অসীমে সন্ধান করছেন নূতন গ্রহ, নূতন নক্ষত্র, নূতন ধূমকেতু, নূতন নীহারিকা। তাঁদের ওই অতন্দ্র সাধনা। আর একদল বিজ্ঞানী অংক কষছেন, যন্ত্র তৈরি করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহাকাশযাত্রা। তাঁরা চাঁদে যাবেন, মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবেন ভেদ করবেন শুক্রগ্রহের মেঘে ঢাকা কুজ্ঝটিকা। তাঁরাও অতন্দ্র। আর অতন্দ্র আমাদের পরিচিত সাবু মল্লিক। তিনি জীবনে ভালো খাবার কিনে খাননি, ভালো কাপড় কিনে পরেন নি, পারতপক্ষে ট্রামে-বাসে চড়েন নি, বিয়ে করেন নি, একটা শস্তা মেসে অখাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করছেন। তিনি সাধক। তিনিও অতন্দ্র। তাঁরও জীবন-দর্শন একলক্ষ্যাভিমুখী। তিনি টাকা জমাতে চান। কোটিপতি হতে চান। নানারকম ছোট বড় ব্যবসা আছে, সুদের কারবার আছে, শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত আছে, মাঝে মাঝে লটারির টিকিটও কেনেন। সাবু মল্লিকের দলেও অনেক লোক। সবাই ওই এক সাধনায় মগ্ন। ধনী হতে হবে—কোটিপতি-অর্বুদপতি। আর একদল অতন্দ্র সাধকের খবর জানি। তাঁরা কবি, তাঁরা শিল্পী। অধরাকে ধরবার চেষ্টা করছেন ভাষায়, রঙে, রূপে। সৃষ্টির স্বপ্নলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন অনন্যকে। সামান্যকে তুচ্ছ করে সত্য শিব সুন্দরকে নূতন রূপে সৃষ্টি করছেন অসামান্য অপূর্বতায়। আর একদল সাধকের খবরও জানি—তাঁরা চান মান প্রভাব প্রতিপত্তি। তার জন্যে নানারকম তদ্বির তোষণ মনোরঞ্জন করে চলছেন নানা স্তরের নানা দলের নানাবিধ লোককে। এঁদের সাধনাও অতন্দ্র, এঁদের দলেও বহুলোক। মান প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে ধনও কামনা করেন অনেকে। তা ছাড়া আছেন জ্ঞান-পিপাসুর দল, ধর্ম-জিজ্ঞাসুর দল। এঁরাও সংখ্যায় কম নয়, এঁদের সাধনাও নিরলস। নানারকম সাধক দেখেছি জীবনে, তাঁরা সবাই কিন্তু দলবদ্ধ। সবাই একাধিক। একক এবং অদ্ভুত ধরনের সাধক একবারই দেখেছি জীবনে।

তাঁর কথাই বলব এবার।

॥ ২ ॥

বড় জংশন স্টেশন একটা। ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়ায় সেখানে। আমি ভবঘুরে লোক। হাতে যখন কিছু পয়সা হয় তখন যেখানকার হোক একটা টিকিট কিনে চেপে বসি রেলগাড়িতে। বলা বাহুল্য থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ করি। ভ্রমণের আনন্দ থার্ড ক্লাসে গেলেই বেশী পাওয়া যায়। সমস্ত দেশের লোককেই যেন পাওয়া যায় কাছাকাছি একটা কামরার মধ্যে আমি লম্বা দূরের টিকিট কাটি না কখনও। দু'চার ঘণ্টার বেশী ট্রেনে থাকতে ভালো লাগে না। নেমে পড়ি কোনও অচেনা জায়গায়। খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করি সেখানে। তারপর আবার টিকিট কাটি। কোনও বিশেষ জায়গায় পেঁছানো আমার উদ্দেশ্য নয়। ইতস্ততঃ ভ্রমণই আমার বিলাস।

সেদিন বড় জংশন স্টেশনে যে ট্রেনটিতে উঠে বসেছিলাম সেটি ওই জংশন থেকেই ছাড়ে। টিকিট কিনতে গিয়ে দেখলাম প্রচুর ভিড়। তাই ভাবলাম ট্রেনে উঠেই বসে থাকি, টিকিট কালেকটার এলে তাঁকে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে নেব। ট্রেনে সেদিন খুব ভিড়। কোনক্রমে ঠেলেঠুলে উঠে বসলাম এক কোণে। তারপর তিনি এলেন, মানে সেই সাধকটি, যাঁরা কথা বলছি। প্রথমে চিনতে পারিনি তাঁকে। দেখলাম তাঁর সঙ্গে অনেক মালপত্র উঠল। বাক্স, বিছানা, বড় একটি ঝুড়িতে নানারকম টুকিটাকি জিনিস, টুকিটাকি নানারকম জিনিসের মধ্যে যেটি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি একটি গড়গড়া। মহৎ গড়গড়া। সাজে, সজ্জায়, আকারে, অলংকারের আভিজাত্যে অপূর্ব। ঝুড়িটার মধ্যে ছোটোখাটো পুঁটলি, টিনের কৌটো, কয়েকটা খরমুজ প্রভৃতি ছিল। আরও সব নানারকম টুকিটাকি জিনিস। গড়গড়াটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনও রাজাধিরাজ যেন দাঁড়িয়ে আছেন নোংরা একটা বস্তির মধ্যে, কলকেটা তখনও দেখতে পাইনি। সেটা ভদ্রলোক হাতে করেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কলকেটা দেখেও চমৎকৃত হয়ে গেলাম। পিতল দিয়ে বাঁধানো বড় কাঠের কলকে একটা। ভদ্রলোকের জিনিস তখনও উঠছিল। শেষকালে উঠল একটা ছোট বেঞ্চির মতো জিনিস। গাড়িতে বসবার জায়গা ছিল না। ভদ্রলোক সেইটে টেনে নিয়ে বসে পড়লেন দুটো বেঞ্চির মধ্যে। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার পা তুলে বসল। কুলি গোছের লোক তারা। ভদ্রলোকের খাতির করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত।

ভদ্রলোক বসেই বললেন, "ওরে হেবো, কোথা গেলি। এক ছিলিম তামাক সাজ দিকিন। এই ভিড়ে আনন্দ পেতে গেলে তামাক খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গড়গড়ার জলটা ফিরিয়েছিলি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। প্ল্যাটফর্মেই ফিরিয়ে নিয়েছি—" হেবো নামক ভৃত্যটি ঝুড়ির ভিতর থেকে একটি টিনের বাক্স বার করে কি যেন খুঁজতে লাগল। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা হল। গার্ড সাহেবের বাঁশিও শোনা গেল। ট্রেনটাও ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

হেবো বাক্সটার মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করে বললে—"এই সেরেছে দাঠাকুর। ঠিকরেটা বোধ হয় প্ল্যাটফর্মে পড়ে রইল: আপনি প্ল্যাটফর্মে বসেই তামাক চাইলেন তো, দিলুম; কলকেটা ঝেড়ে ঠিকরেটা বোধ হয় তুলতে ভুলে গেছি।"

"অ্যাঁ, বলিস কি রে! ঠিকরেটা আনিস নি। থামা, থামা, গাড়ি থামা,—চেন টান, চেন টান—"

ধড়মড়িয়ে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। নিজেই চেন ধরে ঝুলে পড়লেন।

ট্রেন থেমে গেল।

"নামা, নামা, জিনিসপত্তর নামা। আমি চললুম প্ল্যাটফর্মের দিকে।…" ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নেমে কলকেটি নিয়ে ব্যাকুলভাবে ছুটতে লাগলেন প্ল্যাটফর্মের দিকে। ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে কিছু দূর চলে এসেছিল।

আমার কেমন কৌতুক বোধ হল। আমিও নেমে পড়লুম ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমিও ছুটতে লাগলুম।

প্ল্যাটফর্ম তখন খালি। ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মে পেঁছে চাইতে লাগলেন চারিদিকে। প্রায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন। আমিও তখন গিয়ে পড়েছি। ভদ্রলোক প্রবীণ, চোখেও বোধ হয় কম দেখেন। তিনি দেখতে পাননি, কিন্তু আমি পেলাম। প্লাটফর্মের একধারে যে জলের কলটি ছিল দেখলাম তার একপাশে কলকের গুলটি রয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিলাম। দেখলাম ঠিকরেটিও রয়েছে।

"দেখুন তো, এইটেই কি আপনার ঠিকরে?" আকুল আগ্রহে ছুটে এলেন ভদ্রলোক। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে আত্রেয়ীকে ফিরে পেয়ে চাণক্য যে কাণ্ড করেছিলেন অনেকটা সেই রকম কাণ্ড করলেন তিনি।

"ঠিকরে? দেখি, দেখি—হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"এইতো—এইটেই খুঁজছিলাম। আপনি কে—আপনাকে আমি চিনি না তো—আসুন—"

গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে আবদ্ধ করে বললেন, "যেই হোন, আপনি আমার পরম আত্মীয়, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। হেবো ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। "জিনিসপত্রগুলো সব নামিয়েছি। টিফিন কেরিয়ারটা উলটে সব খাবার পড়ে গেছে।"

"গড়গড়াটা?"

"সেটা ঠিক আছে।"

"ঠিকরেটা পাওয়া গেছে, গড়গড়াটা নিয়ে আয় আগে। তামাক সাজ।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব জিনিসপত্র এসে পড়ল। হেবো তামাক সেজে দিলে, ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের উপর একটা বেঞ্চিতে বসে চোখ বুজে গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন। অবশেষে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "আঃ বাঁচা গেল। হেবো ঠিকরেটা এবার আমি নিজের হেফাজতে রাখব। আমার স্যুটকেসের ভিতর একটা কৌটা থাকে, প্রত্যেকবার তারই ভিতর রেখে দিবি—"

"যে আজ্ঞে—"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে—,

"একটা কথা জানবার জন্যে আমি আপনার সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি। আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গেছি মশাই। সামান্য একটা ঠিকরের জন্য আপনি চেন টেনে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। আশ্চর্য কাণ্ড।"

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন—"ঠিকরেটি সামান্য নয়, দু' বছর লেগেছিল ওটি খুঁজে বার করতে। পেয়েছিলাম হরিদ্বারে—"

"কি রকম?"

"সব শুনুন তা হলে। আমার গুরুদেব একদিন আমার উপর খুব প্রসন্ন হয়ে

বললেন, তুই সবচেয়ে কি ভালবাসিস বল তো ? আমি মাথা হেঁট করে ঘাড় চুলকে বললাম, সেটা বলতে লজ্জা লজ্জা করছে গুরুদেব। গুরুদেব হেসে বললেন—না, না, লজ্জা কিসের।

তখন বললাম, আমি তামাক খেতে ভালবাসি। গুরুদেব হাসলেন একটু। বললেন —সেটা আমি জানতাম। তার পরদিনই আমার বাড়ি থেকে চলে গেলেন তিনি। দিন সাতেক পরে এই কলকেটি এল রেজিস্টার্ড পার্সেলে। কলকের সঙ্গে ছোট একটি চিঠি। লিখেছেন, তোমার সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি। একটি তিব্বতী কলকে পাঠালাম তোমার জন্য, এটি চন্দন কাঠের তৈরী। এর বাইরে এবং ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত পিতল দিয়ে মোড়া। আগুনে পুড়বে না। এটি ব্যবহার করলে তুমি আনন্দ পাবে। কলকে তো এল, কিন্তু ও কলকের উপযুক্ত ঠিকরে আর খুঁজে পাই না। ঠিকরে ছোট হলে তামাক ঢুকে গিয়ে ছ্যাঁদা বন্ধ হয়ে যায়, ধোঁয়াই বেরোয় না। বড় হলেও সেই রকম। মধু কুমোরকে দিয়ে একটা করলাম—সে-ও ঠিক হল না। তারপর থেকে ক্রমাগত ঠিকরে খুঁজেছি মশাই। ঝাড়া দু' বছর। তারপর হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এই ঠিকরেটি পেলাম। তারপর থেকেই মহানন্দে আছি। আজ এত কাণ্ড করে ট্রেন থামিয়ে ছুটে এলাম সাধে ? ওই ঠিকরেটাই আমার জীবনের আনন্দের উৎস।”

সেদিন ভদ্রলোকের কথায় খুব মজা লেগেছিল, আজ কিন্তু হঠাৎ মনে হচ্ছে আমিও ঠিকরে খুঁজছি। আমিও এক অদৃশ্য হুঁকোয় অদৃশ্য তিব্বতী কলকে চড়িয়ে তামাক খাচ্ছি, কিন্তু সুখ পাচ্ছি না, ধোঁয়া ঠিকমত বেরুচ্ছে না। এত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু মনের মতো বন্ধু একটাও পেলাম না আজও। কোন হরিদ্বারের কোন গঙ্গার তীরে তিনি আছেন কে জানে !

দ্বিতীয় শালিকটি

কোনও কুসংস্কারকে সত্য ব'লে প্রমাণ করবার জন্য এ গল্প লিখছি না। কুসংস্কারকে মহিমান্বিত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। যা ঘটেছিল তাই বলছি।

কনভেন্টে পড়া মেয়ে নন্দিনী সোমের মনে একটি বিলিতি কুসংস্কার শিকড় গেড়েছিল অনেকদিন থেকে। একটা শালিক দেখলে না কি দুঃখ সূচিত হয় জীবনে, আর দুটো শালিক এক সঙ্গে দেখলে সুখ। One for sorrow, two for joy এ ফরমুলা সে শিখেছিল তার সহপাঠিনী এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে অ্যালিসের কাছে। তারপর সে যাচিয়েও দেখেছে অনেকবার, কথাটা মিথ্যে নয়। সেবার অঙ্ক পরীক্ষার দিন সমানে একটা শালিক ঘুরঘুর করতে লাগল তার চোখের সামনে। কিছুতেই আর একটা শালিক দেখতে পেল না সে। একটি জানা অঙ্ক এল না সেবার, পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল। আর একবার জোড়া শালিকের কেরামতিও দেখেছিল সে। সামনে পরীক্ষা, মাত্র সাতদিন বাকি, অথচ হিস্ট্রি একদম পড়া হয় নি। কিন্তু দুটি শালিক সমানে এসে বসতে লাগল সামনের বাড়ির ছাতটায়। যখনই নন্দিনী চোখ তুলেছে তখনই দেখতে পেয়েছে দুটিতে পাশাপাশি বসে আছে। তারপরই হঠাৎ এক পলিটিকাল ঢেউ এল শহরময়। পরীক্ষার দিন তিন মাস পেছিয়ে গেল। হিস্ট্রিতে অনার্স পেল নন্দিনী সোম। সেই থেকে শালিক-থিয়োরিতে তার বিশ্বাস অটল।

॥ ২ ॥

এরপর তার ভাব হল ভূপেন রক্ষিতের সঙ্গে। বিলেত ফেরত ভূপেন রক্ষিত তাদের কলেজে প্রাণিবিদ্যার প্রফেসার হয়ে এসেছিল। পাখীদের সম্বন্ধে খুব ঝোঁক তার। কলকাতায় থাকতে প্রায়ই তারা পাখীর বাজারে যেত। একবার সে নন্দিনীকে একটা দুধরাজ পাখী কিনে দিয়েছিল। কিন্তু নন্দিনী সেটাকে বাঁচাতেই পারল না হস্টেলে। কোন খাবারই খেত না। একদিন সকালে দেখল খাঁচায় মরে পড়ে আছে। এত দুঃখ হয়েছিল। ভূপেন রক্ষিতকে বলেছিল– আর পাখী কিনো না, আমি আর কখনও পাখী পুষব না। ভূপেন রক্ষিত হেসে উত্তর দিয়েছিল—একটা পাখী কিন্তু তোমাকে পুষতেই হবে। সে না খেয়ে মরবে না। ভাত ডাল তরকারি যা দেবে তুমি সব খেয়ে ফেলবে। খাঁচা খুলে দিলেও উড়ে পালাবে না। এ-কথা শুনে মুচকি হাসি ফুটেছিল নন্দিনীর ঠোঁটে, চোখে স্বপ্নও নেমেছিল।

রাজী? প্রশ্ন করেছিল ভূপেন রক্ষিত।

আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি বাবাকে চিঠি লেখ। তাঁর অমতে আমি কিছু করতে পারব না।

এর বেশী আর কিছু বলে নি নন্দিনী। কি-ই বা আর বলতে পারত।

॥ ৩ ॥

নন্দিনী সোমের বাড়ি বিহারে মফঃস্বলের এক শহরে। কলকাতায় কলেজের পাট চুকিয়ে সে বাড়িতেই ফিরে এল। ফিরে এসে আবার পড়ল সে শালিকের পাল্লায়। এসেই তার চোখে পড়ল তাদের উঠোনে এক জোড়া শালিক ঘুর ঘুর করছে। দেখেই তার মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। স্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে শালিক-দম্পতীর দিকে। শালিকরা কারো দৃষ্টি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। পিড়িং শব্দ করে উড়ে গেল দু'জনেই। কিন্তু তারা রোজই এসে দেখা দিয়ে যেত নন্দিনীকে। নন্দিনীর আশা-অংকুরটি উদ্গত হয়েছিল মনের গোপন কোণে, শালিক-দম্পতীর কল্যাণে সেটিও একটি দুটি করে সবুজ পাতা ছাড়তে লাগল। দিন দশেক পরে ভূপেন রক্ষিতের মামার চিঠিও এসে গেল। তিনিই ভূপেনের গার্জেন। তিনি নন্দিনীর বাবাকে লিখেছেন—"আমার ভাগিনেয় শ্রীমান ভূপেন রক্ষিতের ইচ্ছা আপনার কন্যা শ্রীমতী নন্দিনীকে বিবাহ করে। আমারও ইহাতে অনিচ্ছা নাই। আপনার মত পাইলে আমাদের উভয়ের সুবিধা মতো দিনস্থির করিতে পারি।" বলা বাহুল্য, নন্দিনীর বাবা আপত্তি করলেন না। নন্দিনীও সানন্দে লক্ষ করল শালিক-দম্পতীও রোজ দেখা দিয়ে যাচ্ছে। কখনও আলসের উপর, কখনও ছাতে, কখনও মাঠে, কখনও বাড়ির উঠোনে।

তারপর দোল এলো। নন্দিনীর বাবা এক রঙের দোকানে চাকরি করতেন। তিনি নন্দিনীকে জার্মানির পাকা রং এনে দিলেন কিছু। বিশেষতঃ নীল রংটি তো যেমন চমৎকার, তেমনি পাকা। একবার কোথাও ছোপ লাগলে কিছুতেই আর উঠবে না। সেই নীল রংগুলো নন্দিনী পিচকারিতে পুরেছে এমন সময় দেখতে পেল সেই শালিক

দম্পতী দেওয়ালে এসে বসেছে। নন্দিনী দিল এক পিচকিরি রং ছুঁড়ে তাদের দিকে। পালাল তারা তৎক্ষণাৎ। তারপর দিন কিন্তু আবার এল। নন্দিনী দেখলে একটি শালিকের গায়ে নীল রঙের ছোপ লেগেছে। ডানার নীচে যে সাদা পালকটি থাকে সেটি নীল হয়ে গেছে। যেন নীলকণ্ঠের পালক। তারপরও রোজই এল তারা কয়েকদিন। নন্দিনী দেখল পালকের নীল রংটা ওঠে নি। বরং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ভুপেনেরও চিঠি আসতে লাগল নিয়মিত। বেশ সুন্দর কবিত্বময় চিঠি সব।

তারপর হঠাৎ একদিন নীল শালিকটা এল না। ধক করে উঠল নন্দিনীর বুকের ভিতর। নিঃসঙ্গ একা শালিকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে মুখ চুন করে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল নন্দিনী, কোথাও দেখতে পেল না নীল শালিকটাকে। পাড়ায় বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখল অনেক জায়গায়। কোথাও নেই। ভুপেনের চিঠি আসাও বন্ধ হয়ে গেল। ভুপেন প্রায় রোজই চিঠি লিখত। কিন্তু এক মাস তার কোন চিঠি পাওয়া গেল না। একা শালিকটা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারিদিকে।

এক মাস পরে ভুপেনের চিঠি এল। "ভাগ্যে বিয়েটা হয়ে যায় নি! সেদিন কলেজ থেকে ফিরে মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্তপাত। ডাক্তারেরা বললেন হিপসর্টিসিস। এক্স-রে করা হল। ডাক্তাররা টি. বি. সন্দেহ করছেন। সুতরাং এখন আমি ছাদনাতলায় না গিয়ে স্যানাট্যেরিয়মে চললাম। আমার মতো রুগ্ন লোককে বিয়ে করলে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যেত। তুমি ভালো মেয়ে, তোমাকে আমি ভালবাসতাম, তাই সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি, তুমি সুখী হও।

॥ ৪ ॥

কয়েক মাস কেটে গেছে।

নন্দিনী স্কুলে চাকরি নিয়েছে একটা। এখনও সে শালিক পাখী দেখে। কিন্তু জোড়া শালিক বড় একটা দেখতে পায় না সে। কখনও শালিকের ঝাঁক, কখনও তিনটি, কখনও একটা। দুটো শালিকও যে না দেখেছে তা নয়, কিন্তু ক্বচিৎ। ভুপেনের চিঠি আসে মাঝে মাঝে। সে লিখেছে জীবনে আর সে বিয়ে করবে না। সে জানে তার বাবাও ওই যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি হবেন না। সেরে গেলেও না। নন্দিনী আর ভুপেনের মাঝখানে একটা দুস্তর সাগর যেন মূর্ত হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। আর সেই সাগরের উপরেই নৌকো ভাসিয়ে এল আর একজন। নবীন ঘোষ। সদ্য-পাশ-করা সৌম্য মূর্তি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। নন্দিনীরও ভালো লাগল ছেলেটিকে। নবীন ঘোষও নন্দিনীকে পছন্দ করলেন খুব। নন্দিনীর বাবা নবীনের বাবাকে চিঠি লিখলেন, তারপর সেইসব মামুলি কথাবার্তা চলল দিন কতক। অবশেষে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। নন্দিনী ভুপেনকে চিঠি লিখল একটা। "আমার বিয়ে আগামী পঁচিশে ফাল্গুন। তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।"

বিয়ের দিন সকালে ভুপেন এসে হাজির। তার হাতে ছোট একটি খাঁচা। খাঁচার ভিতর একটি শালিক পাখী।

"ওটা কি—"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল নন্দিনী।

"এক স্টেশন আগে সুলতানগঞ্জে একটা ছোঁড়া দেখলাম পাখী বিক্রি করছে। তার কাছেই এটা ছিল। আর একটা বিশেষত্ব আছে। ডানার নীচের শাদা পালকটা একটু নীলচে। তাই কিনে নিলুম। খাঁচাটাও সে-ই দিল। নীল রংটা চমৎকার নয়?"

নন্দিনীর মনের দিগন্তে সহসা স্মৃতির নীলাঞ্জন রেখা পরিয়ে দিলে কে যেন।

"ওটাকে ছেড়ে দাও—"

খাঁচার দরজা খুলে দিতেই পাখীটা উড়ে গেল।

মালিয়া

আমার দাইয়ের নাতনীর পোষাকী নাম ছিল মালা কিন্তু সবাই তাকে মালিয়া বলে ডাকত। তার মা মারা যাওয়ার পর খুব ছেলেবেলায় সে আমার বাড়িতে আসত, আর 'নানি'র কাছে ঘুর ঘুর করত, একটু আধটু খাবারের জন্যে লোলুপ হয়ে থাকত, আবদার করত যখন-তখন। কালো মুখ চালতার মতো। মাথায় ঝাঁকড়া তৈল হীন চুল, দুষ্টু দুষ্টু বড় বড় চোখ, পরণে ছেঁড়া জামা (কখনও কামিজ, কখনও ফ্রক) আর ময়লা হাফ প্যাণ্ট। মাঝে মাঝে বকুনি খেত আমার স্ত্রীর কাছ থেকে। বকুনি খেলে একটু বেঁকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত মুখের দিকে একদৃষ্টে। তারপর পালিয়ে যেত একছুটে। আবার আসত। এইভাবেই চলছিল। তাকে কিছু কিছু প্রশ্রয়ও দিতাম আমরা। কখনও লজেন্স, কখনও মাথার ফিতে, কখনও বা ভালো খাবার দিতাম একটু আধটু। ওই সামান্য জিনিসেই কি খুশী। ঘাড় বেঁকিয়ে ছোট মিষ্টি হাসিটি হাসত। টোল পড়ত গালে। এই ভাবেই চলছিল—দিন যে কখন নিঃশব্দে আসে আবার চলে যায় তার হিসাব আমরা রাখি না—হঠাৎ একদিন দেখলাম মালিয়া মশলা বেটে দিচ্ছে তার নানীর। দাইয়ের জ্বর হয়েছিল সেদিন। তার সব কাজ মালিয়াই সেদিন করে দিলে। একগাদা কাপড় কেচে নিংড়ে শুকাতে দিল সেগুলো। দুপুরে ঘুঁটেও দিয়ে দিলে দেওয়াল ভরে। কতই বা বয়স। আট বছর হবে। কিন্তু ওই আট বছরের মেয়ে কী কাজের হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। আমার খাস চাকর দুর্গা একদিন এল না। দুর্গা না এলে আমার গোলাপ বাগানে জল দেওয়া হয় না, আমার রাতের শেক বন্ধ হয়ে যায়। কয়লার উনুন জেলে আমার হাঁটুতে, কোমরে, পায়ের পাতায় রসুনের তেল মালিশ করে ন্যাকড়া গরম করে শেক দেওয়ার অনেক হাঙ্গামা। দুর্গা না আসাতে একটু চিন্তিত হলাম। আমার শেকের জন্য ততটা না যতটা আমার গোলাপ গাছগুলোর জন্য। নতুন কয়েকটা চারা আনিয়েছি, জল না দিলে মরে যাবে।

একটু পরে দেখি মালিয়া তোলা উনুনটা নিয়ে এসে হাজির। গনগন করছে কয়লার আঁচ। তার উপর তেলের বাটিটা।

কি রে—

"শেক লেভো নি ?"
(শেক নেবে না ?)
"তুই পারবি ?"
"হ্যাঁ-আ। কাহে নেই ?"
(হ্যাঁ, কেন পারব না ?)

সত্যিই মালিয়া আমার পায়ে তেল মালিশ করে ন্যাকড়া গরম করে শেক দিয়ে দিলে। অবাক হয়ে গেলাম। আট বছরের মালিয়া এত কাজের হয়েছে। বিকেলে দেখি সে ছোট একটা বালতি নিয়ে গোলাপ বাগানেও ঢুকেছে। গাছ কোমর বেঁধে সব গাছ-গুলোতে জলও দিয়ে দিলে সে।

মালিয়া ক্রমশঃ অপরিহার্য হয়ে উঠল আমাদের সংসারে। আমাদের দাই তার নানী, বুড়ি হয়ে গিয়েছিল, তার অর্ধেক কাজ সে-ই করে দিত। মশলা বাটা, বাসন মাজা, রুটি-শেকা, কাপড় কাচা, ঘুঁটে দেওয়া সব। দাবড়ে কাজ করে বেড়াত চার দিকে। সামান্য ডাল ভাত তরকারী খেয়ে তার স্বাস্থ্যও উথলে উঠল। তার নতুন নামকরণ করলাম মহিষমর্দিনী। কাজের মহিষকে জব্দ করেছে ওইটুকু মেয়ে। আমি ডুমুর খেতে ভালবাসি ওই কথা শুনে সে গাছে চড়ে ডুমুরও পেড়ে এনে দিল একদিন।

এর কিছুদিন পরে যা ঘটল তা যদিও আমাদের চোখের সামনেই ঘটছিল প্রতি মুহূর্তে কিন্তু সেটা আমরা সহসা প্রত্যক্ষ করলুম একদিন। হঠাৎ যেমন কর্ণিকারের পত্র পল্লবে সোনার বান ডাকে, আমের ডালপালায় মুকুল ভিড় করে আসে তেমনি মালিয়ার সর্বাঙ্গে যৌবন এসে গেল। তখন তার বয়স কত হবে। বড় জোর বারো কিংবা তেরো। কিন্তু যৌবনের তোড়ে তার বয়েসের হিসাব ভেসে গেল। তার পীবর বক্ষ, তার সহসা ভারাক্রান্ত শ্রোণী, তার সর্বাঙ্গের প্রস্ফুটিত সুষমা সকলের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা বয়সের অঙ্কে নিবদ্ধ রইল না। তা পুলকিত করতে লাগল সকলকে। ভয় পেয়ে গেল তার বাবা আর নানী। তার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা।

মালিয়ার কিন্তু বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করি নি। সে যেমন মহিষমর্দিনী ছিল তেমনি রইল। তেমনি হাঁই হাঁই করে বাসন মাজত, কাপড় কাচত, ঘুঁটে ঠুকত, পেয়ারা গাছে চড়ে পেয়ারা পাড়ত, আমার জন্যে ডুমুর খুঁজে আনত। তার দেহে যৌবন এসে গিয়েছিল, কিন্তু মনে আসে নি। তার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কোন লাজনম্রতা বা মৌন আমন্ত্রণ লক্ষ্য করি নি একদিনও। তার সর্বাঙ্গ যখন মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত তখন সে কিন্তু উদাসীন। তার ঔদাসীন্য সত্ত্বেও কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলো আঘাত করল কয়েক জনকে। পাড়ার যুবকরা চঞ্চল হয়ে উঠল, দেখেশুনে কিন্তু মেয়েটা ভয় পেয়ে গেল। সে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে কারণে অকারণে বসে থাকত। পারতপক্ষে পাড়ায় বেরুত না। তার বিগত যৌবনা পিসীও ছিল গোটা তিনেক। তারা সবাই তার গার্জেন হয়ে উঠল। বাইরে বেরিয়ে কোথাও দাঁড়ালে বা কারো সঙ্গে একটু হেসে কথা কইলে অশ্রাব্য গালাগালি দিত তারা। মালিয়া পালিয়ে আসত আমাদের বাড়িতে। তার বাবা চেষ্টা করতে লাগল তার বিয়ের। মালিয়ার মা ছিল না, ছিল সৎ মা—সে-ও এক বিগতা-যৌবনা খান্ডারনী। নবোদ্ভিন্নযৌবনা মালিয়া তারও চক্ষুশূল হয়ে উঠল। তাঁকে ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে দিত না।

এই সময় আমার চাকর দুর্গা একদিন কামাই করল এবং ঠিক সেই দিনই আমার এক বন্ধু রেল-যোগে আমাকে একটি গোলাপ চারা পাঠিয়ে লিখলেন—"খুব ভাল ফুল। পাওয়ামাত্রই পুঁতে দিও, ফেলে রেখো না।" দুর্গা নেই, কে পুঁতবে? বিপদে পড়লাম একটু।

মালিয়া বলল—"হাম্মো তো ছি—।"

("আমি তো আছি—।")

মহিষমর্দিনী মালিয়া গাছকোমর বেঁধে এক হাঁটু গর্ত করে তাতে সার দিয়ে পুঁতে ফেললে গোলাপ গাছটা।

তার দিন কতক পরেই বিয়ে হয়ে গেল তার। খুব ধুমধাম করেই বিয়ে দিলে তার বাপ। লোকজন অনেক খেলো, লাউডস্পীকার বাজল, গয়না কাপড়ও অনেক কিনে দিলে তাকে। আমরা কিছু উপহার দিলাম। আমার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল—"তুই কি রংয়ের শাড়ি নিবি?"

"কুসমি—"

খুব ভালো হলুদ রঙের শাড়ি কিনে দেওয়া হল তাকে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে মালিয়া যখন ফিরল তখনও তার মুখ শুকনো। মনে সুখ নেই। তার স্বামী রোগা ভালোমানুষ গোছের কিশোর একটি। শাশুড়ী চির-রুগ্না, শয্যাগতা। বিয়ের পরেই তার শ্বশুর পাগল হয়ে গেল, পাগলা গারদে পাঠাতে হল তাকে। তার মামা শ্বশুর মারা গেল হঠাৎ। আরও কে একটা মারা গেল যেন। সবাই বলতে লাগল বউটা অপয়া, ডাইনী। দেখছ না অত কম বয়সেই যৌবনের ঢল নেমেছে সারা দেহে? এ রকম তো হয় না সাধারণতঃ। তার যৌবনের অকালবোধনকে সুচক্ষে দেখল না কেউ। সেখানেও গাল দিতে লাগল সবাই, সেখানকার পাড়ার ছোঁড়ারাও নানারকম ইঙ্গিত করতে লাগল তাকে। তিতিবিরক্ত হয়ে মালিয়া পালিয়ে এল একদিন, একাই রিক্শা চড়ে। ফিরেই আর এক প্রস্থ গালাগালির সম্মুখীন হতে হল তাকে। তিন পিসী আর সৎমা যেন ক্ষেপে গেল তার পুনরাবির্ভাব দেখে। পাড়ার রসিক একটা ছোঁড়া একটা চোখ কুঁচকে একটা ইশারা করল তাকে।

আমি বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরে দেখি মালিয়া ঘুঁটে ঠুকছে।

"কি রে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এলি?"

কোন জবাব না দিয়ে ঘুঁটেই ঠুকতে লাগল।

"কবে আবার যাবি—"

"হাম্মো নেই যাইবো—"

(আমি যাব না—)

আমি যখন তেল মাখছিলাম তখন আমার সামনের বারান্দায় এসে বসল সে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু বলি বলি করেও বলে উঠতে পারল না। উঠে চলে গেল।

তারপর তার ভাইটা এসে হাসতে হাসতে বললে—মালিয়া নাকি কলকে ফুলের বিচি খেয়েছে।

বিশ্বাস করলাম না। ওকে দেখে সে কথা মনেই হয় নি।

আমার চাকর দুর্গা বললে ও নাকি বলেছিল—এখানে কেউই আমাকে চায় না, আমি ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছি। একথাটাও বিশ্বাস হল না।

কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে তার নানী এসে বললে ও ক্রমাগত বমি করছে। কনেলের (কলকে ফুলের) বিচিই খেয়েছে ও।

বললাম—এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

পাড়ার লোক ভয় দেখালো হাসপাতালে গেলে পুলিশের পাল্লায় পড়ে যাবে। তাই হাসপাতালে যায় নি। সন্ধ্যা বেলা অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ তখন আমাকে আর একবার খবর দিলে। গেলাম তাদের বাড়িতে। গিয়ে দেখি অন্ধকার ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। হাত দেখলাম, নাড়ী নেই। উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল—বাবু।

আমি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলাম তাকে।

কিন্তু বাঁচল না। ঘণ্টা দুই পরে মারা গেল।

তার পরদিন 'পোস্টমর্টেম'ও হল। তার যৌবন পুষ্পিত দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে আইন নির্ণয় করবার চেষ্টা করল মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি। সমাজের যে স্তরে সে কারণটা নিহিত সেখানে ডাক্তারদের ছুরি পেঁছিয় না।

মাস ছয়েক পরে মালিয়া যে গোলাপ গাছটি পুঁতে গিয়েছিল তাতে ফুল ফুটল। হলদে রঙের চমৎকার ঢলঢলে একটি গোলাপ।

মনে হল কুসুমী রঙের শাড়ি পরে মালিয়াই যেন হাসছে আমার দিকে চেয়ে। মনে হল ও যেন মরে নি, কোন দিন মরবে না—ওই গোলাপ গাছেই ও বারবার এসে ফুটবে।

ঐতিহ্যবাহী

মহামুনি চণক যখন যুবক ছিলেন, যখন তিনি সাধনার উপযোগী একটি স্থান অন্বেষণ করছিলেন তখন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তিনি নদীতীর, অরণ্য, প্রান্তর, সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে নাতি-উচ্চ একটি পর্বতের ধারে ছোট একটি নদীতীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতীরে ছায়া সুশীতল একটি বটবৃক্ষ ছিল। স্থির করলেন সেই বটবৃক্ষতলে বসেই তিনি তপস্যা শুরু করবেন। তপস্যা শুরু করলেন সেখানে। ভারি ভালো লাগল। সেখানে যোগানন্দে সমাহিত হয়ে দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করতে লাগলেন। গ্রামবাসীরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে যে ফলমূলাদি দিয়ে যেত তাতেই বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত তাঁর। বেশ সুখেই ছিলেন। তারপর হঠাৎ সেই আশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটল একদিন। চণক দেখলেন বেশ বলিষ্ঠাকৃতি একটি ব্যক্তি হাতজোড় করে তাঁর অনতিদূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে কি যেন বলতে চাইছেন।

"কে আপনি?"

"আমি এই পর্বতের আত্মা—"

"ও। কি চান আপনি—"

"আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। আপনি এখানে আছেন কেন? আমার শীর্ষদেশে আরোহণ করে আপনি সেখানেই তপস্যা করুন।"

কষ্ট করে পাহাড়ের শীর্ষদেশে আমি আরোহণ করতে যাব কেন ? তাতে আমার লাভ কি ?"

"লাভ আপনার নয়, লাভ আমার। আপনি আমার শীর্ষদেশে বসে তপস্যা করলে আমার মর্যাদা বাড়বে।"

"আমি যে এখানে আছি তা আপনি জানলেন কি করে ?"

"আপনি যখন তপস্যা করেন তখন আলোক ছটায় এই বটবৃক্ষতল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অপরূপ গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়। আপনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি মুনিবর। আপনি কৃপা করে আমার উপর আরোহণ করুন।"

"গ্রামবাসীরা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসে। তারা কি অতদূরে কষ্ট করে উঠবে ?"

"উঠবে ! না যদি ওঠে তাহলেও চিন্তা করবেন না। দু-চারটে ফলের গাছ পাহাড়ের উপরেও আছে। আপনি দয়া করুন।"

পর্বতের আগ্রহাতিশয্যে চণক শেষে পর্বতারোহণ করতে রাজি হলেন।

প্রকৃতই সুখ পেলেন তিনি সেখানে গিয়ে। নির্জন পর্বত শিখরে বসে নিত্য নব দিগন্তের সন্ধান পেলেন তিনি যেন। সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হলেন। আকাশ যেন নূতন বাণী শোনাল তাঁকে। বাতাস বহন করে নিয়ে এল দূরে দেশের সৌরভ। গ্রামবাসীরাও পর্বতশীর্ষে আসতে লাগল তাঁর জন্য পূজা উপহার বহন করে। বেশ সুখে দিন কাটতে লাগল তাঁর।

সুখ কিন্তু বেশীদিন থাকে না। একটা বিপর্যয় ঘটল একদিন। ভূমিকম্পে পাহাড়টা ধ্বসে গেল। বিদীর্ণ হয়ে গেল তার চূড়া। পর্বত আর পর্বত রইল না, গহ্বরে পরিণত হল। চণক ঋষি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা পেলেন।

চণক ঋষি একটা জিনিস অনুভব করলেন অবশেষে। প্রকৃতির ক্রোড়ে বসে তপস্যা করা আনন্দজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সব সময় নিরাপদ নয়। ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য মানব-মনীষা যা উদ্ভাবন করেছে তার আশ্রয়ে থাকাই সমীচীন।

এর কিছুদিন পরে তাঁর দেখা হল শ্রেষ্ঠী রেবন্ডের সঙ্গে।

রেবন্ড বললেন—মুনিবর, আপনার খ্যাতি আমি শুনেছি। আপনি যে পর্বতে থাকতেন সে পর্বত তো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আপনাকে বিব্রত হতে হয়েছে নিশ্চয়।

"হ্যাঁ তা তো হয়েইছে। কোথাও আশ্রয় পাই নি এখনও। আশ্রয়ই খুঁজে বেড়াচ্ছি"—

"আমার কাছে আসুন। আমি সম্প্রতি একটি বাগানবাড়ি কিনেছি। তাতে ভালো বাড়ি আছে একটি। ঘরের মেঝে শ্বেতপাথরের তৈরি। দেওয়ালগুলি মাটির। ঘরের চাল মজবুত এবং সুনির্মিত। আপনি সেখানেই এসে থাকুন, আমি কৃতার্থ হব।"

"সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু একটি কথা আছে। আমি তপস্বী। আমার স্বাধীন চিন্তায় বা স্বাধীন তপস্যায় বিঘ্ন হলে আমি থাকতে পারব না।"

রেবন্ড সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"কিছু-মাত্র বিঘ্ন হবে না।"

ঋষি চণক শ্রেষ্ঠী রেবন্ডের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। ঋষি চণক হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন কে যেন

তাঁকে সম্বোধন করে বলছে—"ঋষি চণক, এই ধনীর আশ্রয়ে বাস করে তুমি অধঃপতিত হয়েছ। তুমি আমার কাছে এস—"

"তোমার পরিচয় কি - "

"যে পর্বতে তুমি বাস করতে সেই পর্বতই আমার প্রসবিতা। আমি সেই পর্বতের ঐতিহ্যবাহী "

"কোথায় থাকো তুমি "

"গর্তে। সেইখানেই এস তুমি।"

"কোথায় তুমি, তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না—"

"এই যে আমি—"

নেংটি ইঁদুরটি তখন তাঁর সামনে এসে হাজির হল।

"তুমি পর্বতের ঐতিহ্যবাহী ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই "

ঋষি চণক কোনও উত্তর দিলেন না। একটা কৌতুকপূর্ণ হাসিতে তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝিকমিক করতে লাগল শুধু।

তৃতীয় আকাশ

"দুই আকাশ" নামে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচণ্ড পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ পাল বিদ্বৎসমাজে বেশ বাহবা পাইয়াছেন। অবশ্য তিনি যে বিদ্বৎসমাজে বিচরণ করেন সেই সমাজেই। সে সমাজে এক 'অহং' ছাড়া আর কোন কিছুরই স্থান নাই, আমাদের দেশের সবই যে খারাপ এই কথাই নানা সুরে সে সমাজে আলোচিত হয়। আমের আচারের মতো অবস্থা হইয়াছে সে সমাজের। বিদেশী সভ্যতার তেলে মজিয়া আম আমের আচারে পরিণত হইয়াছে। আচারেরও একটা মুখরোচক স্বাদ আছে, কিন্তু তাহা আমের স্বাদে নহে। কৃষ্ণচরণ বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতামহ গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন, পিতা ছিলেন কট্টর নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম। কৃষ্ণচরণ এখন গোমাংস ভক্ষণ করেন. বিলাতী মদ না পাইলে তাঁহার কল্পনা পাখা মেলিতে পারে না, পরকীয়া-প্রেমে হাবুডুবু খাইবার জন্য তিনি সতত উন্মুখ। অর্থাৎ "কালচার" মানে নানাভাবে আত্ম-বিনোদন, ইহাই তাঁহার মত। তিনি ইনটেলেকচুয়াল। ভারতবর্ষে একটা ঘর ভাড়া করিয়া তিনি বাস করেন বটে কিন্তু তিনি ভারতের কেহ নন। যাহারা ভারতবাসীকে উপহাস করে, মনে মনে ঘৃণা করে, তিনি তাহাদেরই স্তাবক। বিদেশীদের নিকট বাহবা পাওয়াই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। বিদেশীরা এ ধরনের লোকদের চিরকাল তোয়াজ করিয়া থাকে, কৃষ্ণচরণ পালকেও করিয়াছে।

"দুই আকাশ" সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা দীর্ঘ। কিন্তু তাহার মূল বক্তব্য অল্পকথায় বলা যায়। তাহা এই। আমরা আকাশের নীল রং দেখিয়া মুগ্ধ হই, আমরা আকাশের সন্ধ্যা-ঊষা-চন্দ্র-সূর্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি, আমরা অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা-ভরা রূপের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হই। আমরা রোমাঞ্চিত হই ওই আকাশে যখন কাল-বৈশাখীর ঝড় আসে, আবিষ্ট হই যখন নানারূপের নানা মেঘ

নানা বর্ণে নানা ভঙ্গীতে আকাশে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় শরতে, বসন্তে, হেমন্তে, শীতে। কবিরা এই আকাশ দেখিয়া চমৎকৃত। কিন্তু আকাশের আর একটা রূপ আছে। সে আকাশে সন্ধ্যা-ঊষা নাই, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র নাই, ইন্দ্রধনু নাই। আছে ধুলা, আছে ধোঁয়া, সঙ্গে পচা ডোবার গ্যাস, আছে মানুষের থুতু, আছে মলমূত্রের গন্ধ, আছে আর্তনাদ, হাহাকার আর যন্ত্রণার বিলাপ, আছে বিক্ষোভ-প্রদর্শনের গর্জন, বন্দুকের গুলির আওয়াজ—আছে······এইভাবে দীর্ঘ ফর্দ দিয়াছেন তিনি। এ ধরনের "দুই আকাশ" সর্বত্র আছে, কিন্তু তিনি ইহাকে ভারতবর্ষের "দুই আকাশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহার বন্ধুমহলে যখন ইহা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে তখন একটা কাণ্ড হইল। ওই আকাশ হইতেই বজ্রপাত হইল একদিন। বজ্রাঘাতে কৃষ্ণচরণ মারা গেলেন।

মারা যাইবার পর তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া কে যেন তাঁহাকে শূন্যপথে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। হুহু করিয়া তিনি উপরে উঠিয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে উপরে উঠিয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি ধূলি-ধোঁয়া-গ্যাস-দুর্গন্ধের আকাশ পার হইয়া গেলেন। তাহার পর চন্দ্রলোক-সূর্যলোক, নক্ষত্রলোকও পার হইয়া এমন একটা লোকে প্রবেশ করিলেন যাহা অন্ধকার, কিন্তু যাহা মাঝে মাঝে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। যিনি চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে শূন্যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—এই তৃতীয় আকাশে কিছুদিন বাস কর। নিরবলম্বন হইয়া তিনি সর্বত্র ঝুলিয়া ঝুলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা অনুভব করিলেন ক্ষুধা পাইয়াছে। একটা বীফ্‌স্টিকের সহিত যদি কিছু 'রাম' (Rum) পাওয়া যাইত········· । সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে আলো দেখা গেল। একটি প্লেটে বীফ্‌-স্টিক (Beef-steak) এবং এক বোতল রাম মূর্তি পরিগ্রহ করিল—কিন্তু যেই তিনি তাহাদের ধরিতে গেলেন—তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রণয়িনী ফিরোজা বিবির কথা মনে হইতেই আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল—ফিরোজা বিবি হাসিতে হাসিতে আবির্ভূত হইলেন—কিন্তু যেই পাল মহাশয় দুই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গেলেন—ফিরোজা বিবি অন্তর্ধান করিলেন। কাছে দূরে অস্পষ্ট আরও দুই-একটি মূর্তি সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিলেন।

পাল মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—"কে আপনারা ?"

"আমি মীরজাফর, ইঁনি উমিচাঁদ—"

"কার প্রতীক্ষা করছেন এখানে ?"

"শুনেছি মিস মেয়ো আর মিস র‍্যাথবোন আসবেন এখানে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবার খুব ইচ্ছে—"

একটা উচ্চ হাসিতে চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিল।

"ও কে—?"

"ইংরেজ আমলে ও একজন স্পাই ছিল। এখন পাগল হয়ে গেছে লোকটা—"

যা ফুরোয় নি

আজকাল বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না। চাল ডাল নুন তেলও সব সময়ে পাওয়া যায় না, দোকানদার বলে ফুরিয়ে গেছে। সেদিন দুটো দরকারি ওষুধ খুঁজতে গিয়েছিলেন জগদীশবাবু—তাঁর ডায়াবিটিস ও বাত দুটোই আছে—কিন্তু ইনস্যুলিন আর কলচিকাম (Colchicum) পাওয়া গেল না—দোকানদার বললে, ফুরিয়ে গেছে। স্যাকারিনও পাওয়া গেল না, ফুরিয়ে গেছে। হর্লিকস ফুরিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর সবই আমাদের যেন ফুরিয়ে গেছে।

জগদীশবাবুর চাকর পলটুও ফুরিয়ে গেছে যেন। তার দেহে মনে কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই আর। হাড়জিরজিরে চেহারা, চোখে জ্যোতি নেই, সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেছে, হাত-পা কাটি-কাটি, মাথাটা বিরল কেশ, যে চুল ক'টা আছে তাও কালো নয় সব ক'টা। পাকিস্তানি রেফিউজি। ফরিদপুর জেলার কোন একটা গ্রামে ও নাকি সম্পন্ন গৃহস্থ ছিল একদিন। বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব হত। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী সব ছিল ওর। সবাই মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছিল। ও-ই কেবল পালাতে পেরেছিল একলা। ও নাকি জাতে ব্রাহ্মণ। পলটুর এসব কথা বিশ্বাস করেন জগদীশ-বাবু। ব্রাহ্মণ! দেখতে তো চামারের মতো। নিজের পরিবারবর্গকে কশাইয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুই পালালি কেন? একথা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি পলটুকে। পলটু পূর্ববঙ্গের ভাষায় উত্তর দিয়েছিল। আমি পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় সেটার অনুবাদ করে দিচ্ছি। পলটু বলেছিল—"আমি মানুষ নই, পশু তাই পালিয়েছিলাম প্রাণভয়ে। এর জন্যে অনুতাপে রোজ আমার বুক ফেটে যায়। আপনি আমার একটি উপকার করবেন বাবু?"

"কি"—কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন জগদীশবাবু। ভয় হচ্ছিল দমকা টাকাকড়ি না চেয়ে বসে।

"আপনার তো বন্দুক আছে। আপনি সেদিন একটা পাগল কুত্তাকে মারলেন দেখলাম। আমাকে মেরে ফেলুন। আমি এবার আর পালাব না। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—" সত্যিই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। জগদীশবাবু শিক্ষিত নাট্য-রসিক লোক, পলটুর এই উক্তিতে মুগ্ধ হলেন তিনি। তার পিঠ চাপড়ে বললেন—"পাগল না ক্ষ্যাপা। তুই যেমন আছিস তেমনি থাক। ভালভাবে যদি থাকিস তাহলে তোর বিয়ে দেব আবার। নতুন সংসার গড়তে পারবি—"

এই আশ্বাসে পলটুর চোখে এমন একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল যার অর্থ বুঝতে পারলে জগদীশবাবু ভয় খেয়ে যেতেন।

পলটুকে সস্তায় পেয়েছিলেন জগদীশবাবু। পেটভাতায় অমন একটা চব্বিশ ঘণ্টার হামে হাল চাকর পাওয়া যায় না আজকাল। ওরকম একটা চাকরের মাইনে আজকাল কম করে ধরলেও একশ টাকা। পলটু খায়ও খুব কম। বেশী খেতে পারে না। যদিও মুখফুটে বলেনি কোনদিন তবু এটা ঠিক যে অত মোটা চাল খাওয়া সত্যিই অভ্যাস ছিল না তার কোনদিন। তাছাড়া তার সঙ্গে ওই ফ্যানমেশানো ডাল আর পাঁচমিশেলি একটা অখাদ্য চচ্চড়ি ভালই লাগত না তার খেতে। জোর করে খেত

তবু। ক্ষিধের জ্বালায় খেতে হত। কিন্তু বেশী খেতে পারত না, গা বমি বমি করত।

জগদীশবাবু সস্তাতেই পেয়েছিলেন পল্টুকে। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হত পল্টু বাজার থেকে নিশ্চয় চুরি করে। সন্দেহ হবার সঙ্গত কারণ ছিল। কারণ নিজেও তিনি চুরি করেন। তাঁর মাইনে আড়াই শ' টাকা, কিন্তু রোজগার করেন পাঁচশো, কখনও কখনও ছ'শ সাত'শ। সবই 'উপরি' থেকে। পৃথিবীতে কোন সৎ লোক যে থাকতে পারে এ তাঁর ধারণার বাইরে। তাঁর মতে তারাই সৎ লোক যাদের চুরি ধরা পড়েনি। তিনি শ্যেন দৃষ্টি রাখতেন পল্টুর উপর। বাজার থেকে ফিরলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিতেন। কিন্তু চুরি ধরতে পারেননি কোনদিন। তাছাড়া তরকারির বাজারের চুরি ধরাও শক্ত। দাম রোজ কমছে বাড়ছে। আজ যেটা আট আনা কিলো কাল সেটা বারো আনা, আজ যেটা বারো আনা, কাল সেটা হয়ত আবার নেমে দশ আনায় দাঁড়ালো। এ অবস্থায় চুরি ধরা শক্ত। তবু রোজ হিসাবটা নেন জগদীশবাবু। সেদিনও নিচ্ছিলেন।

"সিগারেট কত নিলে আজ ?"

"সিগারেট নেই। ফুরিয়েছে, পরশু আসবে বলল—"

"চিনি ?"

"চিনিও পাইনি, ফুরিয়েছে—"

"বিস্কুট ?"

"বিস্কুটও ফুরিয়েছে—"

"মাছ—"

"বড় মাছ দশ টাকা কিলো, ছোট মাছ এনেছি একপো—"

"কত নিলে ?"

"সাড়ে ছ' টাকা কিলো।"

"অ্যা ! বলিস কি ? আর কি এনেছিস—"

"আলু ফুরিয়েছে। লাউ এনেছি একটা দশ আনা দিয়ে—"

"ওইটুকু লাউ—দশ আনা ?"

চুপ করে রইল পল্টু।

"দে দেখি কত ফিরেছে—"

জগদীশবাবু পয়সা গুণতে লাগলেন।

গুণতে গুণতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

"একি, তিরিশ নয়া পয়সা কম কেন ? তোকে তো পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলাম—"

পল্টুও আর একবার গুণ্‌লে। সত্যিই তিরিশ নয়া পয়সা কম। জগদীশবাবুই তাকে একটা ছেঁড়া কামিজ দিয়েছিলেন। সেইটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পলটু আবিষ্কার করল পকেটটা ছেঁড়া।

"পকেটটা ছেঁড়া বাবু। অত দেখতে পাইনি। এই পকেটেই পয়সা রেখেছিলাম। পড়ে গেছে বোধহয়—"

জগদীশবাবু আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন।

"একটা দরকারি জিনিস তো আনতে পারনি বাজার থেকে। সবই ফুরিয়েছে, ফুরিয়েছে, ফুরিয়েছে। তার উপর তিরিশ নয়া পয়সা চুরি করে বলছ—পকেট ছেঁড়া ছিল পড়ে গেছে—চোর কোথাকার—"

"আজ্ঞে না, আমি চুরি করিনি—"

"বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে—"

ঠাস্ করে একটা চড় মারলেন তাকে।

রুগ্নশীর্ণ পল্টু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারও শরীরে কিছু ছিল না, সব ফুরিয়ে গিয়েছিল তবু সে উঠে বসল এবং মাথা হেঁট করে বসেই রইল।

দেখা গেল একটা জিনিস ফুরোয় নি। চোখের জল। তাই তার দু গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

নূতন রূপে

সে আসে, রোজই আসে। আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে, কিন্তু আমি যেতে পারি না। নানান বাধা। নদীর ধার বেশী দূরে নয় আমার বাড়ি থেকে, কিন্তু এই সামান্য দূরত্বটুকু অতিক্রম করেও যেতে পারি না তার কাছে। তিনদিনের হিসাব দিচ্ছি।

শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় সেজেগুজে ঠিক বেরুচ্ছি এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন।

"আমাকে চিনতে পারো বাবা ?"

চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ। চিনতে পারলাম না।

"না, ঠিক চিনতে পাচ্ছি না—"

"আমি তোমার কাকার বন্ধু ছিলাম। এখানে এসেছি আমার নাতনীর জন্যে একটি পাত্রের খবর পেয়ে। পাত্রটি ভালো। পাত্রের বাবা দেখলাম তোমাকে খুব ভক্তি করে। তুমি একবার চল বাবা আমার সঙ্গে—"

বিষণ্ণ বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু যেতে হল শেষ পর্যন্ত। নদীর ধারে যাওয়া সম্ভব হল না।

শনিবার দিন স্টোভে তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাজার থেকে তেল এনে চা খেয়ে বেরুতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। তবু বেরিয়েছিলাম—কিন্তু গেটের সামনে এসেই একদল ছেলেমেয়ের সম্মুখীন হতে হ'ল। তারা কলকাতা থেকে এসেছে বিয়ের বরযাত্রী হয়ে। আমার সঙ্গে তারা দেখা করতে এসেছে। দেশের বর্তমান সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চায়। এবারও বিষণ্ণ বোধ করলাম। কিন্তু 'না' বলতে পারলাম না। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সবাই। সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে যা আলোচনা হ'ল তা উল্লেখযোগ্য নয়। উল্লেখযোগ্য শুধু এইটুকুই যে বকর বকর করে পুরো দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল। নদীর ধারে যাওয়া হল না। মনে হল সে এতক্ষণ চলে গেছে। গিয়ে লাভ নেই।

রবিবার দিন বেরিয়েছি—আবার হই হই ক'রে পাড়ার একদল ছোঁড়া এসে হাজির।

"আপনার কম্পাউণ্ডে সাপ ঢুকেছে একটা—"

"সাপ ঢুকেছে? কোথায়, কোন্ দিকে—"

"আপনার পূব দিকের দেওয়াল দিয়ে। মালতীলতার ঝোপের ভিতর লাফিয়ে পড়ল—"

তাদের কয়েকজনের হাতে লাঠি ছিল। আমার চাকর দুর্গাও লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। বল্লম নিয়ে এল পাড়ার আর একটা ছেলে। হই-হই প'ড়ে গেল। আমার মালতী-মঞ্চের উপর ক্রমাগত লাঠি পড়তে লাগল। কিন্তু সাপ বেরুল না।

"তোমরা ঠিক দেখেছিলে সাপ এর ভিতর ঢুকেছে?"

"হাঁ, হাঁ—স্বচক্ষে দেখেছি। ইয়া বড় সাপ একটা—"

দমাদম লাঠি পড়তে লাগল। ছিন্নবিছিন্ন বিধ্বস্ত করে ফেলল তারা ঝোপটাকে। তারপর সাপটা বেরুল। সত্যিই প্রকাণ্ড সাপ। দুর্গার লাঠির ঘায়েই তার মাথাটা ছেঁচে গেল। প্রকাণ্ড ঢ্যামনা সাপ একটা।

হই-হই করতে করতে শিকারীর দল সাপটাকে নিয়ে যখন চ'লে গেছে—তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম সাতটা বেজে গেছে। এখন নদীর ধারে যাওয়া বৃথা।

সোমবার দিনও বেরুতে দেরি হ'ল। কারণ গৃহিণী বললেন—চাল বাড়ন্ত। তখনই বাজারে ছুটতে হল আমাকে। দোকানদারকে অনেক খোশামোদ ক'রে সের খানেক চাল নিয়ে এলাম তিন টাকা দিয়ে। যখন ফিরলাম তখন অন্ধকার নেমেছে। মনে হল আজও তার দেখা পাব না। লগ্ন বয়ে গেছে। কিন্তু আমার কেমন যেন জেদ চেপে গেল। আজ যাবই। গেলাম।

দেখলাম সে যায় নি, আছে। কিন্তু অন্য বেশে।

সন্ধ্যাকে দেখব বলেই গিয়েছিলাম। যাকে দেখলাম তার গায়ে রঙের চিহ্ন নেই। তার গায়ের কালো-ওড়নায় এক ঝাঁক তারার চুমকি চিকমিক করছে—আর মাথার চুলে দপদপ ক'রে জ্বলছে স্বাতী নক্ষত্রটা। সন্ধ্যা নয়, কিশোরী রাত্রি। সন্ধ্যাকে নূতন রূপে নূতন বেশে দেখে বড় ভালো লাগল।

রঙের খেলা

মায়া বলেছিল—বেশ, তুমি যখন বলছ, লালটাই নেব। সামান্য কয়েকটি কথা। ঘটনাটিও সামান্য।

পূজার সময় দুটো শাড়ি কিনেছিলাম। একটা লাল রঙের, আর একটা কমলা রঙের। কমলা রঙেরটাই পছন্দ করেছিল ও। বলেছিল, আমার গায়ের রং কালো, লাল আমাকে মানাবে না। মা কিন্তু বললেন কমলা রঙেরটা আমার বোনকে দিতে। মা রং বিচার করেন নি দাম বিচার করেছিলেন। কমলা রঙের শাড়িটার দাম দু'টাকা বেশী ছিল।

আমি ওকে আড়ালে ডেকে বললাম—তুমি লালটাই নাও—মা—

সে আমাকে কথা শেষ করতে দেয় নি।

বলেছিল, বেশ তুমি যখন বলছ লালটাই নেব……। লালটাই নিয়েছিল। লাল শাড়ি পরেই হাসি মুখে ঘুরে বেড়িয়েছিল চারিদিকে।

তারপর কত ঘটনা ঘটে গেছে।

বিহারে ভূমিকম্প হয়েছে, পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়েছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, সুভাষ বসু অন্তর্ধান করেছেন, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, গান্ধীজী মারা গেছেন গডসের গুলিতে। মায়াও মারা গেছে আজ কুড়ি বছর হ'য়ে গেল। আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছি বিছানায়। উল্লিখিত ঘটনা-প্রবাহের কোনও তরঙ্গ আমার মনে এখন আলোড়ন তোলে না। আলোড়ন তোলে কেবল ঐ কথাগুলি—বেশ, তুমি যখন বলছ লালটাই নেব।

আমার চোখের সামনে মায়ার একটা অয়েল পেণ্টিং টাঙানো আছে। আমার অনুরোধে শিল্পী তাকে কমলা রঙের শাড়ি পরিয়েছে।

হঠাৎ কাল সকালে দেখলাম—শাড়িটা কমলা নয় লাল। ডাক্তারবাবুকে খবর দিলাম। তিনি এসে আমার চোখ পরীক্ষা ক'রে বললেন—আপনার চোখটাই খারাপ হয়েছে। ছবির শাড়ির রং কমলাই আছে।

একটু হাওয়া

যখন ঘটনাটি ঘটল তখন মনে হ'ল আকস্মিকভাবেই ঘটল। অবাক্ হ'য়ে গেলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ওই রকমই হয়। কেন হয় কি করে হয় ঠিক ওই বিশেষ মুহূর্তেই সেটা হয় কেন তা জানি না। শুধু জানি সকালে পদ্ম ফোটে বিকেলে সন্ধ্যা-মণি, কেন ফোটে তা জানি না।

অসহ্য গুমোট হয়েছিল সেদিন। আকাশে একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ, মেঘলা মেঘলা ভাব, হাওয়া নেই, বৃষ্টি তো নেইই। সন্ধ্যা-বেলা অসহ্য হয়ে উঠল। ইজি-চেয়ারটা বাইরে বার করে মাঠে বসলাম উত্তর দিকে মুখ করে। সামনে পাতলা-মেঘে-ঢাকা ঘোলাটে আকাশ।

উত্তর আকাশের দিকে মুখ করে বসে অনেক দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ল। বড় সপ্তর্ষি'র আর ছোট সপ্তর্ষি'র মাঝখানে খুব ছোট্ট একটি তারা আছে। তার ইংরেজী নাম থুবান (Thuban), তাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম সেদিনের আনন্দের কথা হঠাৎ মনে পড়ল আজ। তখন আকাশ-চর্চা করতাম, রাত জেগে জেগে আবিষ্কার করতাম জ্যোতিষ্কদের। এখন ভুসির ব্যবসা ক'রে ধনী হয়েছি। আকাশের জ্যোতিষ্কদের নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। মনে পড়ল থুবানের নাম দিয়েছিলাম থেবি। থেবি আমাদের ছেলেবেলাকার বান্ধবী ছিল। আমার বয়স তখন দশ, থেবির পাঁচ বা ছয়। বেড়াবিনুনি ক'রে চুল বাঁধত। পরত একটা ছিটের ফ্রক। বেড়ালের মতো গোল মুখ ছিল তার। গড়নটি থ্যাবড়া-থোবড়া। দুজনে একসঙ্গে নানারকম খেলা করেছি। কানা-মাছি চোর-চোর আরও কত কি। তারপর থেবির বাবা বদলি হয়ে গেলেন। থেবি হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। তবু থেবিকে ধ'রে রেখেছিলাম কিছুদিন, ওই থুবান নক্ষত্রটার মধ্যে। নক্ষত্ররাও যখন আমার জীবন থেকে অন্তর্ধান করল তখন সবই হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ঝির ঝির ক'রে একটু হাওয়া উঠল। তার পরই রিক্‌শাটি এসে থামল আমার গেটের সামনে। ভাবলাম ভুসির দালাল ছেদিলাল এল বুঝি। কিন্তু এলেন একটি মহিলা।

"আমাকে চিনতে পারেন?"

"অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমি থেবি। আজকাল স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছি। যা গরম। ওয়েটিং রুমে পাখার তলায় বসেছিলাম। তারপর দেখলাম একটু হাওয়া উঠছে, ভাবলাম তাহলে যাই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। মনে আছে কি আপনার থেবিকে?"

একটি কাঁচ গোল মুখ মানস পটে ফুটে উঠল—মাথায় বেড়াবিনুনি বাঁধা। যে মহিলাটি এলেন অন্ধকারে তাঁর মুখ আমি দেখতে পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম উত্তর-আকাশের যুবান নক্ষত্রটিকেও। হাওয়া ওঠাতে সেখানকার মেঘও সরে গিয়েছিল।

দশ বছর

চিঠি লিখতে বসে সোমনাথ পুনরায় যেন নূতন করে আবিষ্কার করল তার আঙুলগুলোতে ধবল হয়েছে। মুখে নাকে এবং চোখের পাতার উপরও হয়েছে। অনেক চেষ্টা, চিকিৎসা করেও কিছু হয় নি। আঙুলগুলোর দিকে চেয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর লিখতে শুরু করল।

পুষ্প,

সময় কত তাড়াতাড়ি কেটে যায়। আজ ক্যালেন্ডার দেখে হঠাৎ মনে হ'ল দশ বছর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। এই দশ বছরে আমরা প্রকাণ্ড পরিবার সৃষ্টি করে ফেলতাম। কিন্তু কিছুই হয়নি। আমি সেই মেসের সেই ঘরটিতেই আছি। চারটি বিষয়ে এম. এ. পাশ করে ফেলেছি, ডক্‌টরেটও পেয়েছি একটা, অনেকরকম বই পড়েছি। কিন্তু কি মনে হয় জান, ভস্মে ঘি ঢেলে চলেছি কেবল। শুষ্ক মরুপথে হাঁটছি, হাঁটছি, হেঁটেই চলেছি। এর শেষ কোথায় জানি না। এই মরুভূমির উপর মুখ থুবড়ে যেদিন পড়ব সেইদিনই এ নাটকের শেষ দৃশ্য দেখা যাবে হয়তো। মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালবাসা। সে ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম। তারই স্মৃতিকে আঁকড়ে এখনও আমি বেঁচে আছি। এখনও আমি আশা করি এ মরুপথ আমাকে সেই মরূদ্যানে নিয়ে যাবে যেখানে তুমি উদ্যান-লক্ষ্মীরূপে আমার প্রতীক্ষা করছ। শেলী, বার্ণার্ড শ' বিবাহের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিয়েছেন, বলেছেন বিবাহ করলে প্রেম মরে যায়—তাঁরা দুজনেই কিন্তু বিবাহ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত। বিবাহ না করলে শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি হয় না যেন, মনে হয় সমাজের বাইরে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। রোমাণ্টিক প্রেম যখন মরে যায় তখন ছেলেমেয়েরা আসে—তাদের স্পর্শে সেই মৃত প্রেম আবার সঞ্জীবিত হয় নূতন রূপে। আমার জীবন কেমন যেন ব্যর্থ হয়ে গেল, তবু তোমার আশায় এখনও বসে আছি। তোমার সঙ্গে যখন মিস্টার রজত রায়ের বিবাহ হয়ে গেল আর তিনি যখন

তোমাকে নিয়ে বিলেত চলে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন তখন আমার নবোদ্গত প্রেমাঙ্কুরের উপর প্রচণ্ড বজ্র পড়েছিল। আমার মন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যে ফুলগুলো তোমাকে দেব বলে তুলেছিলাম তা পরিণত হয়ে গিয়েছিল ভস্মস্তূপে। কিন্তু সে অকাল বজ্র হেনেছিল সেই আকাশেই। আবার আশার আলো নিয়ে এল আবার যখন শুনলাম মিস্টার রায়ের বিলেতে মৃত্যু হয়েছে। হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেলেন তিনি। সবিস্ময়ে দেখলাম সেই বজ্রাহত প্রেমাঙ্কুরে আবার সবুজ পাতা গজিয়েছে। আশা করতে লাগলাম তুমি ফিরে আসবে। কিন্তু তুমি ফিরলে না। লিখলে—আমার স্বামী এখানে যে ফার্মে কাজ করতেন সে ফার্মের সঙ্গে না কি কনট্রাকট ছিল যে পাঁচ বছর কাজ করতেই হবে। আমি তাদের গিয়ে বললাম আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমিই আমার স্বামীর চাকরিটা চালিয়ে দিতে পারি, আমিও এম. এ., পি. এইচ্. ডি (Ph. D): ও'রা রাজি হয়েছেন। আর একটা কাণ্ড হয়েছে। আমার স্বামী এখানে একটা বইয়ের ব্যবসা খুলেছিলেন একজনের সঙ্গে শেয়ারে এবং আমার বেনামিতে। সে ব্যবসায়ে লোকসান হয়েছে খুব। তার জন্যেও অনেক টাকার দরকার। সে-ও আমাকে খেটে রোজগার করতে হবে। সুতরাং এখন আমার ফেরা হবে না। কিন্তু এসব ব্যাপার মিটে গেলে—ফিরবো, নিশ্চয়ই ফিরবো।

তোমার এই আশ্বাসে নির্ভর করে এখনও অপেক্ষা করছি আমি। তোমার সেই তন্বী দেহ, তোমার সেই মধুর হাসি, তোমার চোখের উপরের পাতার সেই মৃদু কম্পন, তোমার সেই কালো চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি, তোমার সেই নাক-কুঁচকে লাল জিবের ডগা বার করে ভেঙচি-কাটা—এই সবই সম্বল ক'রে বসে আছি আমি। দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল। এখনও বসে আছি। আমরণ থাকব। তোমার চোখে একদিন আমিও সুন্দর ছিলাম। আমাকে তুমি অ্যাপোলোর চেয়েও বেশী সম্মান দিয়েছিলে। বলেছিলে—তোমার তুলনায় অ্যাপোলো কুৎসিত। আমি তোমাকে উর্বশী বলতাম। বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি—কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী। আমার শরীর কিন্তু ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। দশ বছর কম সময় নয়—সময়ের মতো অতবড় destructive artist আর কেউ নেই। আমাকে ভেঙে দিচ্ছে, কদাকার করে তুলছে।—এই পর্যন্ত লিখে সোমনাথ থামল। তার যে চোখে মুখে আঙুলে ধবল হয়েছে এ কথা লিখবে কি না। কিছুক্ষণ ভেবে ঠিক করল, লিখবে না।

লিখল—"কালের নিরন্তর প্রহারকে সহ্য করে তবু প্রহর গুণছি, কখন তুমি আসবে।"

ইতি—সোমনাথ।

সোমনাথের স্বভাব সে নিজের হাতে সব চিঠি পোস্ট করে। বিশেষ করে পুষ্পকে লেখা চিঠি। চিঠিখানি নিয়ে নীচে নামল সে।

নেমেই দেখল একটি মোটা-সোটা ঘাড়-গর্দানে মেয়ে বাড়ির নম্বর দেখে দেখে বেড়াচ্ছে।

"আচ্ছা ২/২ কি এই নাম্বারটা—"

"হ্যাঁ। আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"আমি সোমনাথবাবুকে খুঁজছি।"

"আমিই সোমনাথ। আপনি—"

"আমি পুষু—"

দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যা হয় না

হাবু আর গবুকে লোকে বলত মানিকজোড়। সত্যিই হরিহর-আত্মা ছিল দু'জনে। এক গ্রামে বাড়ি। একই পাঠশালায় পড়েছিল দু'জনে। তারপর গ্রাম থেকে যখন শহরে এল তখন একই স্কুলে ভরতি হয়েছিল দু'জন। একই বোর্ডিংয়ে এক ঘরে থাকত। রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু প্রাণের সম্পর্ক গভীর ছিল দু'জনের। বোর্ডিংয়ে যখন থাকত তখন একই রকম জলখাবারও খেত দু'জনে। বিকেলে স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেলে রাজেনবাবুর দোকানে গিয়ে দুজনেই চারখানি লুচি আর গোটা দুই জিলিপি খেত। দুজনেরই ফুটবল খেলার ঝোঁক ছিল, দুজনেই ব্যাকে খেলত। ভালো খেলোয়াড় ছিল দু'জনেই। তখনই তাদের মানিকজোড় নাম দিল সকলে। মনের এত মিল ছিল যে, এক রকম ছিটের জামাও পরত দু'জনে। লাল ডোরা-কাটা এক রকম ছিট পাওয়া যেত সেকালে। তারই গলা বন্ধ কোট। দুজনেই মারবেল খেলতে ভালবাসতো। ছুটির দিনে মাঠে গিয়ে ঘুড়িও ওড়াত দু'জনে মিলে। দুজনেরই একরকম লাটাই, এক রঙের ঘুড়ি। এরকম মনের মিল সাধারণত দেখা যায় না। দুজনে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল তখন দেখা গেল, দুজনেই থার্ড ডিভিসনে পাশ করেছে। মার্কশীট আনিয়ে দেখা হয় নি, কিন্তু আনলে হয়তো দেখা যেত, দুজনেই একরকম নম্বরও পেয়েছে। এর পর আর কলেজে পড়ার উৎসাহ পেলে না তারা। ওই শহরে কলেজ ছিল না, থাকলেও থার্ড ডিভিসনের ছেলেরা ভরতি হওয়ার হয়তো সুযোগ পেত না। অন্য শহরে গিয়ে কলেজে ভরতি হওয়া স্বপ্নাতীত ছিল তাদের। চাকরি নিতে হল শেষ পর্যন্ত। তাদেরই সহপাঠী রামলক্ষ্মণ ঢনঢনিয়ার প্রেস ছিল একটা। দুজনেরই চাকরি হয়ে গেল সেই প্রেসে। প্রেসের পিছন দিকে একটা ঘরে থাকবার জায়গাও হল। সিধার ব্যবস্থাও করে দিলে রামলক্ষ্মণ। রান্না করেই খেত ওরা। হাবুই রাঁধত। দিনের বেলা ভাতে-ভাত, রাত্রে ডাল রুটি। এইভাবেই চলছিল ওদের। এক ফ্যাশানের চুল ছেঁটে, এক রকম জুতো কাপড় পরে খাশা ছিল তারা। সমস্ত দিন প্রেসে পাশাপাশি খাটত তারা, রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে ঘুমুত একই বিছানায়। একদিন প্রেসের মালিক—রামলক্ষ্মণের বাবা—গবুকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন প্রেসের জন্য জিনিসপত্র কিনতে। গবু সাতদিন কলকাতায় ছিল। ভারি কষ্ট হয়েছিল হাবুর। গবু না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না তার এক মুহূর্ত। খবরের কাগজে একটা বাস দুর্ঘটনার খবর পড়ে ভারি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল সে। রামলক্ষ্মণের কাছে ছুটে গিয়ে বলল—ভাই, 'বাসে' গবু ছিল না তো। ওরাও তো বড়বাজার অঞ্চলেই গেছে। হো হো করে হেসে উঠল রামলক্ষ্মণ। তার হাসির বহর দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল হাবু। "ঘুম হচ্ছে না বুঝি—" জিজ্ঞেস করল রামলক্ষ্মণ।

হাবুর সত্যিই ঘুম হচ্ছিল না। কিন্তু সে কথা বলতে পারল না সে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। সাত দিন পরে গবু ফিরে বলল—"দেখ, তোর জন্যে কি এনেছি। পরে দেখতো—"। একটা শস্তা আংটি। যদিও ঝুটো, তবু আংটির পাথরটি চমৎকার নীল।

"আমি কিনেছি একটা—। তুই আগে পর, তারপর আমি পরব—"

আর একটা নীল পাথর বসানো আংটি বার করে দেখাল সে। হাবুর আঙুলেও ঠিক 'ফিট' করে গেল আংটিটা। দুজনে আংটি পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল হাসিমুখে। হঠাৎ হাবুর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। "ও কি রে! কাঁদছিস তুই?" —বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করল গবু। কিন্তু দেখা গেল তার চোখের কোণও সজল হয়ে উঠেছে।

সত্যি, আশ্চর্য মিল ছিল দুজনের। এমনটা দেখা যায় না কখনও। শুধু বাইরের দিকেই নয়, মনের দিকেও মিল ছিল দুজনের। একজনের মনের কথা, সব কথা, শ্লীল অশ্লীল সব কথা, আর একজন জানত। কেউ কারো কাছে গোপন করত না কিছু। হাবুর অন্তত ধারণা ছিল, গবুর সব কথা সে জানে।

কিন্তু বছর খানেক পরে সে বুঝতে পারল, গবুর একটা খবর সে জানত না। গবু যে পাড়ার একটা মেয়েকে ভালবাসে এ খবর সে জানত। গবুর যে গনোরিয়া হয়েছিল এ-ও তার অবিদিত ছিল না। কিন্তু গবু যে কলকাতায় গিয়ে লটারির টিকিট কিনেছিল এ কথা সে কোনও দিন জানতেও পারত না। কিন্তু যখন খবরের কাগজে প্রকাশিত হল—শ্রীগোবিন্দ সরকার অর্থাৎ গবু লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হয়ে পড়েছে তখন কথাটা আর চাপা রইল না।

খবরটা বেরুতেই গবু চলে গেল কলকাতায়। হতভম্ব হয়ে গেল হাবু। এ কি হল! রামলক্ষ্মণ বললে, "তুমিও নিশ্চয় টিকিট কিনেছিলে, কিন্তু গবুর ভাগ্যটা ভালো—"

"আমি টিকিট কিনি নি—"

"তোমরা দুজনে তো চিরকাল এক সুরে বাঁধা। সব কাজ একসঙ্গে কর। টিকিট কিনি নি বললে শুনব কেন। তোমার ভাগ্যটা খারাপ তাই বল—"

"আমি টিকিট কিনি নি—"

"বিশ্বাস করলাম না—"

এর মাস দুই পরে যা হল তা আরও অবিশ্বাস্য। হাবু একটা চিঠি পেলো। গবুর চিঠি।

ভাই হাবু,

তুই চিঠি পেয়েই চলে আয়। টাকা দিয়ে আমি একটা ভালো প্রেস কিনেছি। তুই আর আমি. দুজনেই তার মালিক হব। এর জন্যে যে দলিল হবে তাতে তোরও সই দরকার। যে টাকা পেয়েছি তার অর্ধেক তোকে দিয়েছি। দেরি করিস নি। এখানকার হোটেলের রান্না খেতে পাচ্ছি না। তোর হাতের ডাল রুটির জন্যে প্রাণ কাঁদছে। এখানেও আমরা ভাতে-ভাত আর ডাল রুটি খাব। তুই রাঁধবি। অন্য রান্না পেটে সহ্যই হয় না। চিঠি পেয়েই চলে আয়। নীচে ঠিকানা দিলাম। ইতি—গবু।

বিবর্তন ?

প্রথম ঘটনাটা আগে লিখি।

যা লিখছি তা এখনকার দিনে গল্প-কথা বলে মনে হলেও গল্প নয়, সত্যি কথা। আমার নিজেরই জীবনের অভিজ্ঞতা এটা। সে জীবন আর নেই। র‍্যাশান-সীমিত মৌখিক-ভদ্রতার মুখোশ-পরা আধুনিক জীবনে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে মনে হয় যা একদিন বাস্তব সত্য ছিল তা এখন বর্ণ-বহুল স্বপ্ন হয়ে গেছে। কেউ যদি বিশ্বাস না করেন তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত এ কথাও আজকাল বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু ইতিহাসে এ সংবাদ লিপিবদ্ধ আছে। আমি যা লিখছি তা-ও আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় প'য়তাল্লিশ বছর আগে তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম। পূর্ণিয়া জেলার মনিহারী গ্রামে আমার বাড়ি। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন ও অঞ্চলে। সুবিস্তৃত প্র্যাকটিস ছিল তাঁর। সেই সূত্রে ও অঞ্চলের অনেক লোকের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল তাঁর। সে হৃদ্যতা প্রকৃত বন্ধুত্বে এবং আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। দিল্লী দেওয়ানগঞ্জের জমিদার গৌরবাবুর (স্বর্গীয় গৌরমোহন রায়) সঙ্গে আমাদের রক্তের কোনও সম্পর্ক ছিল না তবু তিনি ছিলেন আমাদের ঠাকুরদা। বাবা তাঁকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। মনে আছে আমার বোন রাণীর বিয়ের সময় তিনি এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর মাছ, দই, দুধ, ক্ষীর, চিঁড়ে, কয়েক কাঁদি পাকা কলা, আর দু'গাড়ি কলাপাতা। তাঁর বেশবাসে কোনও চটক ছিল না। সাধারণ একটি মেরজাই আর থান পরেছিলেন। এসেই তিনি মেরজাইটাও খুলে ফেললেন। পালকিতে এসেছিলেন, পালকিতেই ছোট বাক্স ছিল একটি। তার মধ্যে খড়মও ছিল একজোড়া। নগ্নগাত্রে খড়ম পরে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পেতে লাগল তাঁর গৌরবর্ণ অঙ্গে। খর্বাকৃতি লোক ছিলেন তিনি। চোখের তারা একটু কটা ছিল। তিনি এসে অভিভাবকের মতো সব তদারক করে বেড়াতে লাগলেন। বিকেলের দিকে এসেছিলেন। বাবা খাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করবেন জিজ্ঞাসা করাতে বললেন—আমি এখন খাব না কিছু। আগে বরযাত্রীদের খাওয়া হোক, কন্যা-সম্প্রদান হোক, তারপর আমি খাব। আমি তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ি। বরযাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য আমি গান লিখেছিলাম একটি। সে গানটি পড়ে খুব খুশী হলেন তিনি। বললেন, "বিয়ের পর জামাইকে নিয়ে দিল্লী দেওয়ানগঞ্জে এসো একদিন। নিমন্ত্রণ করছি।"

কিন্তু নিমন্ত্রণটি রক্ষা করতে অনেক দেরি হ'য়ে গেল। আমাদের জামাই থাকতেন পুরুলিয়ায়। মনিহারীতে ক্বচিৎ আসতেন, যখন আসতেন তখন আবার আমি থাকতাম না। যোগাযোগটা হ'ল তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, সে সময় জামাইও এসেছিলেন। আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটল সে সময়ে। দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ থেকে একটা হাতীও এসে পড়ল কি একটা কাজে। হাতীটা খালিই ফিরছিল, আমরা তাতে চড়েই চলে গেলাম দিল্লী দেওয়ানগঞ্জ।

যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। গৌরবাবু বাইরের ঘরেই ছিলেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—

"কে আপনারা—"

প্রথমে আমাদের চিনতেই পারেননি।

পরিচয় দিয়ে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম—"আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। আসতে একটু দেরি হয়ে গেল—!" চাপা হাসিতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল তাঁর চোখ দুটি। তারপর বললেন—"বুঝেছি, আমাকে তোমরা ঠকাতে এসেছ, অপ্রস্তুত করতে এসেছ। অসময়ে এলে, এখন কি ক'রে তোমাদের অভ্যর্থনা করি বল তো!" জামাইবাবু বললেন—"আমরা সকালে পেট ভ'রে খেয়ে এসেছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এমনিই এলাম বেড়াতে—"

"আমরা সেকেলে লোক, অতিথি এলেই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ি, বিশেষত অতিথিরা যদি নাতি-গোষ্ঠীর হ'ন তাহলে তো অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়। খেয়ে এসেছ? কিছু খাবে না?"

"একটু চা খাব শুধু"—জামাইবাবু বললেন।

"শুধু চা? তথাস্তু—"

কাছেই একটি চাকর এসে দাঁড়িয়েছিল। গৌরবাবু তার দিকে একবার চাইলেন মাত্র, সে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল ভিতরে।

গৌরবাবু জামাইয়ের দিকে ফিরে বললেন—"জামাইবাবুর শুনেছি গান বাজনার দিকে ঝোঁক আছে—"

"আছে একটু একটু—"

"গাইতে পার?"

"গলা ভালো নয়, তাই গান গাই না, বাজাই।"

"কি কি যন্ত্র বাজাও?"

"সাধারণত ক্ল্যারিওনেট। তবে একটু আধটু সবই বাজাতে পারি।"

গৌরবাবু উঠে গেলেন এবং পাশের ঘর থেকে ছোট সেতার নিয়ে এলেন একটি।

"এটা চলবে?"

জামাইবাবু তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে সেটি নিলেন এবং মেজরাবটি প'রে টুং টাং ক'রে সুর বাঁধতে লেগে গেলেন। তিনি যতক্ষণ সুর বাঁধছিলেন ততক্ষণ ঠাকুরদা (গৌরবাবু) নিমীলিত নয়নে বসে ছিলেন চুপ করে। সুর বাঁধা হয়ে যাওয়া মাত্র চোখ খুলে মৃদু হেসে বললেন—"বাঃ বাজাও একটা কিছু। কি বাজাবে?"

"গৌড় সারং। দুপুর বেলা গৌরবাবুর দরবারে আর কি বাজাব।"

"বাঃ বাঃ, রসিক পুরুষ দেখছি তুমি। বাজাও—"

জামাইবাবু গৌড় সারং আলাপ করতে লাগলেন।

একটু পরেই চাকরটি একটি ছোট টেবিল এবং চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করল।

"হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও আগে। আমি বাড়িতে একটু খবর দিয়ে আসি—"

খড়ম চট্‌চট্‌ ক'রে চ'লে গেলেন তিনি বাড়ির ভিতরে। চাকরই চা ছাঁকতে লাগল। চায়ের কাপগুলি ধপধপে সাদা ছিল, চা ঢালবামাত্রই সেগুলি চায়ের রং

হ'য়ে গেল। চা ছাড়া বিস্কুটও ছিল কয়েক রকম, মেওয়াও ছিল কিছু। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখলাম চমৎকার দার্জিলিং চা। মনে মনে স্বীকার করতে হল যে ঠাকুরদা যদিও দেহাতে পাড়াগাঁয়ে বাস করেন কিন্তু তিনি আমাদের চেয়ে কম 'আপ-টু-ডেট্' নন।

একটু পরেই গরম কচুরি নিয়ে প্রবেশ করল আর একজন ভৃত্য। ঠাকুরদাও এসে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর পিছু পিছু আর একজন ভৃত্য, তার হাতে দুটি বাটি, বেশ বড় বাটি, বাটিতে ক্ষীর।

"এ কি কাণ্ড!"

"যেমন খবর না দিয়ে এসেছ এই অল্পতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি কর আপতত।"

"আমাদের মোটেই ক্ষিধে পায়নি। বললাম তো খেয়ে এসেছি—"

"তোমরা নবযুবক। এই রোদে এত ক্রোশ হাতীর পিঠে চ'ড়ে এসেছ, তোমাদের ক্ষিধে পায়নি একথা বিশ্বাস করলেন না তোমার ঠানদি। তাঁর কথার প্রতিবাদ করবার সামর্থ্য অনেকদিন হারিয়েছি। আর আহরণও করেছি একটি সার সত্য। ও আদালতে আপীল নেই। সুতরাং খেয়ে ফেল—"

খেতেই হ'ল।

এরপর সঙ্গীত চর্চা হ'ল আরও খানিকক্ষণ। জামাইবাবু আরও দু'একটা সুর আলাপ করলেন।

দ্বারপ্রান্তে জন দুই চাকর দেখা গেল একটু পরে।

"এইবার স্নান ক'রে ফেল। ওরা তোমাদের তেল মাখাবে। রোদে ব'সে তেল মেখে নাও, তারপর স্নানের ঘরে গিয়ে স্নান কোরো।"

তেল মাখানোটা একটা পর্ব। আমাদের জামাই খুশি হলেন। তিনি এতে অভ্যস্ত। তেল মাখাবার জন্যে সঙ্গে চাকর নিয়ে আসেন পুরুলিয়া থেকে। আমি ওসবে অভ্যস্ত হবার সুযোগ পাইনি। মেসে থাকতাম, কোনরকম স্নান সেরে নাকে-মুখে ভাত গুঁজে কলেজে দৌড়তে হ'ত তখন। ঠাকুরদাকে বললাম—"আমাকে তেল মাখাবার দরকার নেই। আমি নিজেই মেখে নেব—"

"তোমর দরকার নেই, আমার দরকার আছে।"

"কি রকম—"

"রাবণ উপদেশ দিয়ে গেছেন অশুভস্য কাল হরণম্, আমি কিছু কালহরণ করতে চাচ্ছি। যে অশুভ মুহূর্তে তোমাদের সামনে খাবার দিয়ে লজ্জায় অধোবদন হ'তে হবে সেটা যত দেরিতে আসে ততই ভালো—"

"তার মানে—"

"তার মানে, খবর দিয়ে তো আসনি। সবে রান্না চড়েছে—"

আবার চাপা হাসিতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠল তাঁর চোখ দুটো।

"নাও, ভালো করে তেল মেখে নাও"—অতি শৈশবে মা হয়তো এমনিভাবে আমার সর্বাঙ্গে তেল মাখাতেন। বড় হওয়ার পর এ অভিজ্ঞতা আর হয়নি। খুব ভালো লাগল। চাকরটি যখন তেল মাখাচ্ছিল তখন আরামে চোখ বুজে আসছিল।

স্নান শেষ করে যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম তখন তিনটে বেজে গেছে। ঠাকুরদা নেই, একটি চাকর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আপনারা ভিতরে চলুন। খাবার দেওয়া হয়েছে—"

বাবু কোথা—

"তিনি ভিতরে গেছেন।"

অন্দর মহলের দ্বারদেশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

"এসো, এসো—"

ভিতরে গিয়ে দেখি দুটি চমৎকার কার্পেটের আসনের সামনে প্রকাণ্ড দুটি কাঁসার থালায় ভাত বাড়া রয়েছে। ভাতকে বেষ্টন করে আলুভাতে, শাকভাজা, বড়িভাজা প্রভৃতি নানারকম ভাজা। থালাকে বেষ্টন করে অর্ধচন্দ্রাকারে একসারি বাটি—প্রত্যেক বাটিতে তরকারি। স্থুক্তোই দু'তিন রকম। আলুর দম, ঝিঙের তরকারি, নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট, পালংশাকের ঘণ্ট, আরও কত কি নিরামিষ তরকারি সব মনে নেই। মাছের তরকারিও—তিন চার রকম। ঝোল, ঝাল, কালিয়া, ভাজা তো ছিলই, তাছাড়া ছিল আলাদা ছোট রুপোর থালায় একটি ক'রে প্রকাণ্ড রুই মাছের মুড়ো। এর উপর দই, পায়েস, ক্ষীর এবং মিষ্টি। ঠাকুমা স্বয়ং বসেছিলেন পাখা হাতে একটি মোড়ায়। হেসে বললেন—"খবর না দিয়ে অসময়ে এসেছ, কিছুই করে উঠতে পারলাম না।" জানি না খবর দিয়ে এলে কি করতেন! আমরা বসবার পর একটি ঠাকুর ছোট ছোট বাটি করে গরম ঘি নিয়ে এল। আর একটি ঠাকুর এল তার পিছু পিছু। তার হাতে একটি থালা, থালায় ছোট ছোট কয়েকটি সুদৃশ্য কাচের বাটিতে কয়েক রকম আচার এবং মোরব্বা।

বললাম—"এতো কি খেতে পারব!"

ঠাকুরদা বললেন, "পারবে না কেন। তোমরা নবযুবক, এতদূর হাতীর পিঠে এসেছ। বসে পড়—" বসলাম।

"তোমার বাবা কি রকম খেতে পারতেন জান?"

বাবা কি রকম খেতে পারতেন তার গল্প শোনাতে লাগলেন। ঠাকুমা সারাক্ষণ ব'সে রইলেন মোতায়েন হ'য়ে। সব খেয়ে তবে উঠতে হল।

বাইরে এসে ঠাকুরদাকে বললাম—"এইবার আমাদের দুটো গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন। শুয়ে শুয়ে চলে যাই—"

ঠাকুরদা সংক্ষেপে বললেন—"আজ যাওয়া হবে না। সন্ধ্যার সময় নাতজামাইয়ের বাজনা শুনব। আজ থেকে যাও—"

জামাইবাবু বললেন—"একটি শর্তে থাকতে রাজি আছি—"

"বল কি শর্ত—"

"রাত্রে কিছু খাব না—"

"কিছু খেতেই হবে। তোমার ঠাকুমা এ প্রস্তাবে রাজি হবেন না—"

"বেশ তাহলে চাট্টি মুড়ি খাব না হয়—"

"তাই খেও—"

সন্ধ্যার সময় গানের মজলিশ বেশ জমল। একজন গায়ক এলেন। তিনি বেহালাও এনেছিলেন একটি। জামাই বেহালাতে ইমন কল্যাণ আর বাগেশ্রী আলাপ করলেন। গায়ক মশাই ঠুংরি গাইলেন। ঘণ্টা তিনেক সময় বেশ কেটে গেল। সঙ্গীত সভা ভঙ্গ হল প্রায় রাত ন'টার সময়।

তারপর এল মুড়ি খাওয়ার পালা। আমাদের প্রত্যেকের জন্য দুটি বড় বড় বাটিতে মুড়ি এল—একটিতে ঘিয়ে মাখা মুড়ি, অন্যটিতে তেল-মাখা মুড়ি। তার সঙ্গে দু' তিন রকম ঘুগনি, আলুভাজা এবং মাছ ভাজা প্রচুর। তারপর ক্ষীর এবং সন্দেশ।

"একি কাণ্ড করেছেন—"

"তোমার ঠাকুমা বললেন এর কমে দেওয়া যায় না—"

বুঝলাম প্রতিবাদ করা নিষ্ফল হবে। শুরু করে দিলাম। মাছ ভাজা খেতে খেতে একটা কথা মনে হল।

"এই পাড়াগাঁয়ে এমন চমৎকার পাকা মাছ পান কোথা থেকে। আপনাদের বিল তো অনেক দূরে শুনেছি—"

"তোমাদের মতো বে-আক্কেল খবর-না-দিয়ে-আসা অতিথির অভ্যাগম হয় মাঝে মাঝে। তাদের সম্বর্ধনার জন্যে একটা কৌশল করতে হয়েছে। বাড়ির পিছনে একটা ছোট পুকুরে বড় বড় মাছ জিইয়ে রেখেছি তাদের নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে। কাল সকালে দেখাব—"

পরদিন পুকুরটি দেখলাম। একটি চাকর বড় বড় দুটি রুই মাছ টেনে তুলল পুকুর থেকে, মাছের নাকে দড়ি বাঁধা।

"ও মাছ দুটো সঙ্গে নিয়ে যাও তোমরা—"

॥ ২ ॥

পঁয়তাল্লিশ বছর পরের ঘটনাটা এইবার শুনুন। এটাও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। মাস দুই আগেকার কথা। আমার পিতৃবন্ধুর পুত্র তাঁর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন আমাকে। পিতৃবন্ধুর নামটা আর করব না। গৌরবাবুর মতো তিনিও দিলদরিয়া সেকেলে লোক ছিলেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং তাঁরও জীবনের নীতি ছিল। প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল বাড়িতে। তাঁর কথা স্মরণ করে গেলাম নিমন্ত্রণ খেতে। সঙ্গে করে দামী শাড়ি নিয়ে গেলাম একটা। বন্ধু পুত্রের সঙ্গে আমার তেমন আলাপ ছিল না। কিন্তু তাঁকে বাঙালী পোষাকে দেখব প্রত্যাশা করেছিলাম। হাতকাটা হাওয়াই শার্ট আর চোং প্যাণ্ট পরে এসে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। আমার দুটো হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—"যাক, এসে গেছেন তাহলে। আপনার ঠিকানাটা যোগাড় করতে কি দারুণ বেগ যে পেতে হয়েছে। ভীষণ আনন্দিত হয়েছি আপনি এসেছেন বলে। বসুন, বসুন—"। আমার হাত থেকে শাড়িটা নিয়ে আমার নামের লেবেল দিয়ে রেখে দিলেন সেটা পাশের ঘরের একটা টেবিলে। সেখানে দেখলাম নানারকম উপহারের প্রদর্শনী হয়েছে একটা।

"চলুন, ওই বারান্দায়—"

বারান্দায় নিয়ে গিয়ে একটি টেবিলের সামনে বসিয়ে দিলেন আমাকে। তারপর একটা চাকর ছোট একটি মাটির 'ডিশ' রেখে গেল আমার সামনে। ডিশে ছিল কিছু ডালমুট, একটি ছোট সন্দেশ আর ছোট কাটলেট একটি।

"চা খাবেন? না শরবৎ?"

"চা—"

চায়ে চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখতে হল কাপটা। অখাদ্য!

বিবর্তন?

হয়তো।

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বুদ্ধ পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর এই শহরে একটি উৎসব হয়। সে উৎসবের প্রধান অংগ নাচ-গান। শহরের ছেলে মেয়েদের মধ্যেই কেউ গান গায়, কেউ আবৃত্তি করে, কেউ সেতার বা এস্রাজ বাজায়। দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গানও কারও মুখস্থ নেই। হার্মোনিয়ামের উপর 'গীত বিতান' রেখে গান করেন গায়ক-গায়িকারা। আবৃত্তি প্রায়ই নির্ভুল হয় না। হাফ প্যাণ্ট পরা বুশ-শার্ট-গায়ে বাঙালী ছেলেরা বুদ্ধ-বন্দনা করেন ভুল বাংলা উচ্চারণ করে। কিন্তু তাঁরা এটার নাম দিয়েছেন সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠান। সুতরাং একজন সাহিত্যিক সভাপতি চাই। কোনও সিনেমা-ষ্টার পেলে অবশ্য তাঁরা সাহিত্যিককে বাদ দিতেন কিন্তু কোনও সিনেমা-ষ্টারের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় এদের পক্ষে। সাহিত্যিকের নাগাল পাওয়াও শক্ত। কেউ আসতে চান না—মফস্বলের এই শহরে বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে। আমাকে নিয়েই টানাটানি করেন এঁরা প্রতিবার। সেবার কিন্তু আমি নিস্তার পেয়ে গেলাম। আমার মাস্টারমশাই সেবার এসেছিলেন আমার কাছে। তিনি ইতিহাসের একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তাঁকেই অনুরোধ করলাম সভাপতিত্ব করতে। তিনি প্রথমে রাজি হতে চান নি। বললেন—আমি তো ওসব করিনি কোনদিন। পারব কি? তাছাড়া—আমার আগ্রহাতিশয্যে রাজি হলেন তিনি শেষ পর্যন্ত।

সভা আরম্ভ হল সন্ধ্যার সময়। আরম্ভ হওয়ার কথা সাড়ে ছ'টায়। হ'ল সাড়ে সাতটার পর। কারণ যিনি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" গানটার সংগে নাচবেন—সেই ভদ্রমহিলা—এখানকার সরোজবাবুর শালী—ঠিক সময়ে এসে পেঁছতে পারেন নি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। সেই উন্নতবক্ষা মহিলা টাইট পোষাক পরে দমাদ্দম করে নৃত্য করলেন খানিকক্ষণ ষ্টেজের উপর। দর্শকদের ভিতর "সিটি" দিল দু' একজন রসিক ছোকরা। নাচ শেষ হতেই তড়তড় করে হাততালি পড়ল। তারপর প্যাণ্টপরা এক ছোকরা বাঁশের বাঁশীতে বাজালেন রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানটি —"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে—ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা"। খুব হাততালি পড়ল। তারপর হ'ল একটা ক্যারিকেচার। একজন বাঙালের সংগে একজন মাড়োয়ারীর ঝগড়া। আনন্দে হই-হই করে উঠল দর্শকবৃন্দ। ঘন ঘন সিটি পড়তে লাগল।

এর পর একটা আধুনিক গান গাইলেন একটি রোগা মহিলা। খুব জমল না। তারপর জমল। সরোজবাবুর শালীটি আর একটি নাচ নাচলেন—"নমো হে নম" এই গানটির সংগে।

তারপর হ'ল একটা হাস্যরস-প্রধান ছোট নাটিকার অভিনয়। নাটিকাটি এখানকার

একজন উদীয়মান লেখকের লেখা। নাটকের নাম "রং-তুফান", একটি মেয়েকে নিয়ে তিনটি ছোকরার নানা রকম ক্যাবলামি। এতেই খুব হাসির রোল উঠল সভায়।

তারপর আবার আধুনিক গান। গাইলে একটি ছোট মেয়ে। বেহালার সঙ্গে। কিছু শোনা গেল না।

তারপর আবৃত্তি হ'ল রবীন্দ্রনাথের "বিজয়িনী"। "আচ্ছোদ সরসী নীরে" বলেই থেমে গেল ছেলেটি। উইংসের দিকে চাইতে লাগল। প্রমটারের কথা শুনতে পাচ্ছিল না সে। বার বার থেমে অবশেষে একেবারেই থেমে গেল ছোকরা এবং প্রস্থান করল দ্রুতপদে।

এতেও হুই-হুই হাসি উঠল।

তারপর সমবেত নৃত্য। চারটি ছেলে আর চারটি মেয়ে নানা রকম মুদ্রা দেখিয়ে রোগা লিকলিকে হাত পা নেড়ে বন বন করে ঘুরতে লাগল স্টেজটা জুড়ে। স্টেজের পিছনে বুদ্ধদেবের একটা ছবি ছিল একটা ছোট টেবিলের উপর। নাচের ধমকে টেবিলটা পড়ে গেল। ছবির কাঁচ ভেঙে চুরমার।

এতেও তুমুল হাসি।

শেষকালে ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'এইবার সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণ দেবেন'।

মাস্টারমশাই স্টেজের উপর উঠে হাতজোড় করে বললেন—আপনারা যদি অনুমতি করেন আমি বসে বসেই বলব। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারি না, বয়স হয়েছে—

তিনি একটি চেয়ারে বসে চোখ বুজে বলতে লাগলেন। তিনি চোখ বুজেই বক্তৃতা করলেন।

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,—

আজ আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের স্মৃতি-অর্চনা উপলক্ষে সামান্য কিছু আনন্দের আয়োজন করেছি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি এই ভাষণে বৌদ্ধ বঙ্গদেশে যে সব বাঙালী কীর্তিমান ছিলেন, তাঁদেরই সামান্য অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। আমরা বিশেষ করে বাঙালীরা আমাদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা বর্তমানকে নিয়েই বড় বেশী ব্যস্ত। বর্তমান যুগেও রাজনৈতিক নেতা অভিনেতা অভিনেত্রী, সাহিত্যিক শিল্পীর নাম আমরা জানি, তাঁদের কুল পরিচয়ও হয়তো অনেকের কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিজেদের বংশ ইতিহাস আমরা জানি না। অতি বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম করতে বললে অনেকেই হয়তো নীরব হয়ে যাবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর যে প্রতিভা বাংলাদেশকে গৌরবের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সে প্রতিভার সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো দু-চারজন বিশ্ববিখ্যাত লোকের নাম মাত্রই আমরা জানি ; তাঁদের সম্যক পরিচয় জানবার আমাদের তত আগ্রহ নেই।

আমি আজ যে সব বাঙালীদের নাম করতে যাচ্ছি তাঁরা বহুকাল পূর্বে ভারতের বিদগ্ধ সমাজে বাঙালীর কীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমরা বাঙালীরা, তাঁদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখি নি, তাঁদের অনেক বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় বৌদ্ধ আচার্যগণ বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সহায়তায়

অনেক গ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তার থেকেই আজ আমরা অনেক বাঙালী প্রতিভাধরের খবর পাই।

পাল রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে যে সব বাঙালী পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের খবর পাওয়া যায়, তাঁদের রচনা অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বাংলা ভাষার তখন অতি শৈশব।

পাল রাজাদের পূর্বেই সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়েই নাকি বাঙালী প্রতিভা সংস্কৃত কাব্যে গৌড়ী রীতির প্রবর্তন করেন। অনেকের মতে প্রসিদ্ধ চান্দ্র ব্যাকরণ-প্রণেতা চন্দ্রগোমিনও বাঙালী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধও ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহল দ্বীপে পড়ানো হত। এই কালে রচিত আর একটি বিশাল গ্রন্থের খুব খ্যাতি আছে। সেটির নাম হস্তায়ুর্বেদ। চারি খণ্ডে ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিরাট গ্রন্থে হস্তীদের নানারূপ ব্যাধির আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এ গ্রন্থের রচয়িতা ঋষি পালকাপ্য বাঙালী ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁর আশ্রয় ছিল।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক গৌড়পাদ, ইতিহাসে গৌড়াচার্য নামে অভিহিত হয়েছেন। অনেকের মতে ইনিও বাঙালী। এঁর রচিত গৌড়পাদকারিকায় শঙ্করের পূর্বেই প্রচলিত বেদান্ত মতবাদ ও মাধ্যমিক শূন্যবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এঁর রচনাতে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেকে।

পাল রাজাদের আমলে বাঙালী প্রতিভার আরও অনেক পরিচয় আছে। দেবপালের মন্ত্রী বাঙালী দর্ভপাণি চতুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন। বাঙালী কেদার মিশ্রও চতুর্বিদ্যাপয়োধি পান করে বেদ, আগম নীতি জ্যোতিষশাস্ত্রে যে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তার বর্ণনা সে যুগের তাম্র শাসনে উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা নাট্যকার বিশাখ দত্ত, অনর্ঘরাঘবের কবি মুরারি, চণ্ডকৌশিক নাটকের কবি ক্ষেমীশ্বর, কীচক বধ কাব্য প্রণেতা নীতিবর্মা, এবং নৈষধ চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ—এঁরা সবাই বাঙালী ছিলেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে অনেক।

অভিনন্দ নামে একজন বাঙালী কবির খবর আমরা পাই। এঁকে সবাই গৌড় অভিনন্দ বলত। ইনি অনেক বিখ্যাত শ্লোক রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন বিখ্যাত কাদম্বরী-কথা সার এঁরই রচনা।

পাল যুগের আর একজন কীর্তিমান বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। এঁর বিখ্যাত কাব্যের নাম 'রামচরিত'—

দর্শন শাস্ত্রেও পাল যুগে আমরা একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতের নাম পাই—তিনি হচ্ছেন ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধর ভট্ট। অনেকের মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি মৈত্রেয়-রক্ষিত, বিমলমতি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈশ্য-করণিক এবং অমরকোষের টিকাকার সুভূতিচন্দ্রও বাঙালী।

বৈদিক শাস্ত্রেও সেই যুগে কয়েকজন বাঙালী বিজ্ঞানীর অবিস্মরণীয় দান আছে। অনেকের মতে সুবিখ্যাত নিদান গ্রন্থের প্রণেতা মাধব, চরক ও সুশ্রুতের টিকাকার চক্রপাণি দত্ত বাঙালী ছিলেন।

পাল রাজত্বের শেষভাগে আর একজন বৈদ্যক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—

সুরেশ্বর অথবা সুর পাল। এ'র বিখ্যাত গ্রন্থ দুটির নাম 'শব্দপ্রদীপ' ও 'বৃক্ষায়ুর্বেদ'। ঔষধে লোহের ব্যবহার সম্বন্ধেও ইনি 'লোহপদ্ধতি' বা 'লোহসর্বস্ব' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চিকিৎসা সার সংগ্রহের লেখক বঙ্গসেনও বাঙালী ছিলেন—অনেক ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন।

মীমাংসা গ্রন্থও বাঙালী রচনা করেছেন সে যুগে। ভবদেব ভট্টের তৌতাতিত মত-তিলক এর প্রমাণ।

উত্তর রাঢ় নিবাসী নারায়ণ রচনা করেছিলেন ছান্দোগ্য পরিশিষ্টের প্রকাশ নামে টিকা। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বাঙালী অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ এ বিষয়ে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

জীমূতবাহন সম্ভবত এ'দেরই সমসাময়িক যদিও তাঁর সঠিক কাল এখনও নির্ণীত হয়নি।

জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ তখনও বাঙালীর উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে। জীমূতবাহনের মতো বাঙালী, প্রতিভার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

এ যুগে বাঙালী প্রতিভা ও চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই সহজযান বা সহজিয়া ধর্মে। সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের এক বিপুল সাহিত্য আছে। তার অধিকাংশই বাঙালীর রচিত। পাল যুগের এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙালী প্রতিভার একটি প্রকৃত নিদর্শন।

যদিও পাল যুগের কিছু আগে তবু এই প্রসঙ্গে শীলভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তি দেব নামে দুজন এবং জেতারি নামে দুজন বাঙালী বৌদ্ধ সাহিত্যিকের নামও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। একজন জেতারি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলার এক শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত—তাঁর লেখা অধিকাংশ গ্রন্থ বজ্রযান সাধন বিষয়ে।

তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে আরও অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন। তাঁদের নাম—দিবাকর চন্দ্র, কুমার চন্দ্র, কুমার বজ্র, দানশীল, পুতলী নাগরবি এবং প্রজ্ঞাবর্মণ।

আজ বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে আমি পাল রাজাদের সমসাময়িক কিম্বা পাল রাজাদের কিছু আগের বা পরের সময়কার কয়েকজন প্রতিভাবান বাঙালীর সামান্য পরিচয় এই ভাষণে আপনাদের বললাম—তার কারণ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বাঙালী পাল রাজাদের চারশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই চারশ বছরে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক গুরুতর পরিবর্তনও ঘটেছিল—বুদ্ধ ধর্মের সহজিয়া রূপদান তার একটি প্রমাণ। এই চারশ বছরে বৌদ্ধ ধর্ম বাঙালী পাল রাজগণের উৎসাহে উত্তরে তিব্বতে ও দক্ষিণে নবদ্বীপ যবদ্বীপ সুমাত্রা ও মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন—বাংলার পাল রাজারা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ রক্ষক হিসাবে সমগ্র বৌদ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছিলেন।

চোখ বুজে বলেই যাচ্ছিলেন তিনি ক্রমাগত। কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কারণ সভার লোকেরা একে একে উঠে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত এক আমি ছাড়া হলে আর কেউ ছিল না।

আমি তখন স্টেজে উঠে গিয়ে মাস্টারমশায়কে বললাম—চলুন এবার বাড়ি যাই। সবাই চলে গেছে—

ও তাই নাকি?

চোখ খুলে তিনি ফাঁকা হলটার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন—"চল।"

মজা

জগা বলেই তাকে ডাকত সকলে। তার পুরো নামটা যোগেন্দ্র, জগদীশ্বর, না জগদম্বা এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কেউ। আমার মামা নিবারণবাবুর বাড়ির চাকর ছিল সে। কুৎসিত দেখতে। বেঁটে, মুখময় খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, নাকটা ভুঁড়ো, চোখগুলো ছোট ছোট। চোখ দুটির কিন্তু একটি বিশেষত্ব ছিল। সর্বদাই একটা হাসি চিকমিক করত চোখ দুটিতে। মনে মনে সর্বদাই সে যেন কি একটা আনন্দ উপভোগ করছে। সে আনন্দের কারণ যখন সে ব্যক্ত করত তখন দেখা যেত কারণটা অতি অকিঞ্চিৎকর—অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে।

"হাসছ কেন—" একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে।

খুক খুক করে হেসে উঠল জগা।

বলিল—"কি মজা ওই দেখ না। টিকটিকিটা দেওয়ালের কোণটায় ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু কোনও পোকা ওঁর কাছে আসছে না—কি মজা!"

এতে মজার কি আছে বুঝতে পারলাম না।

মামাও বলতেন, "ও ব্যাটার মাথায় ছিট আছে, কিন্তু কাজ করে ভাল।"

কিন্তু যে কথাটা মামা কারও কাছে বলতেন না সেটা হচ্ছে ও বিনা মাইনেতে পেট- ভাতায় কাজ করে। আর সব কাজ করে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত।

কিন্তু তবু বেশী দিন কোথাও চাকরি করতে পারত না সে। এর আগের মনিব ছিলেন ধনকুবের সুদখোর সোমেশ্বর বাগচী। খুব মকোর্দমাবাজ লোক। তিনি একদিন তাঁর উকিলের সঙ্গে একটা মকোর্দমা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, জগা হঠাৎ সেখানে গিয়ে দাঁড়াল আর ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

"তুই এখানে কি করছিস"—রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন সোমেশ্বরবাবু।

"মজা দেখছি—"

"মজা!"

"ইনি উকিলবাবু তো? টিয়াপাখীর মতো নাকটি। কিন্তু শেয়ালের মতো বুদ্ধি। ভারি মজা। ভারি মজা—"

খিক খিক করে হাসতে লাগল।

সেই দিনই তাকে দূর করে দিলেন সোমেশ্বরবাবু।

তারপর সে গেল তিনকু ঠাকুরের কাছে।

সেখানে তাকে গোয়াল পরিষ্কার করতে হত, বাসন মাজতে হত, কাপড় কাচতে

হত। বেশ কাজ করছিল, হঠাৎ একদিন সে দেখতে পেলে তিনকু ঠাকুর সাড়ম্বরে পুজো করছেন। অনেক ফুলের মালা, অনেক ভোগ, অনেক রকম খাবার। তিনকু ঠাকুর হাত জোড় করে রূপং দেহি, ধনং দেহি প্রভৃতি মন্ত্র আউড়ে চলেছেন উদাত্ত কণ্ঠে। জগা পিছনে বসে ধুনুচিতে হাওয়া দিচ্ছিল। হঠাৎ সে হেসে উঠল হো হো করে।

ধমকে উঠলেন।

"মর মুখপোড়া। হাসছিস কেন অমন করে।"

"কি মজা, কি মজা, ভগবানকে দারোগা বানিয়ে ঘুস দিচ্ছে বাবু। কি মজা—"

আরও জোরে হেসে উঠল।

"দূর হ' দূরে হ এখান থেকে—"

সেদিনই দূর করে দিলেন তাকে। যে চাকর পুজো নিয়ে এরকম ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাকে সহ্য করবার মতো মানসিক উদারতা ছিল না তিনকু ঠাকুরের। তাঁর বিশ্বাস, ভগবানের দয়াতেই তাঁর চাকরি হয়েছে এবং ভগবানের দয়াতেই তার চাকরিতে দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। ভগবানের দয়াতেই তাঁর একমাত্র ছেলে বি. এ. পাশ করেছে এবং ভগবানের দয়াতেই তারও চাকরি হবে।

নিবারণবাবু আপন মাতুল নন—মায়ের দূর-সম্পর্কের পিসতুতো ভাই তিনি এবং আমি তাঁর গলগ্রহ ভাগনে। অর্থাৎ আমিও চাকরেরই সামিল। তাই জগার সঙ্গে একটু বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার। তার মুখেই ও সব গল্প শুনেছিলাম। জগাকে সত্যই অদ্ভুত অসাধারণ লোক বলে মনে হত আমার।

একদিন জিগ্যেস করেছিলাম—"তুমি মাইনে নাও না কেন?"

"টাকা-পয়সার জঞ্জাল নিয়ে কি করব। বেশ তো আছি—"

"তোমার আপনজন কেউ নেই?"

"আছে একটা ছেলে। সে নিজে রোজগার করে খায়। আমাকেও খাওয়াতো সে। কিন্তু ভয়ে পালিয়ে এলাম একদিন—"

"কিসের ভয়?"

"ওরে বাবা, ছেলেটা ভারি ভক্তি করত আমাকে। আমিও তাকে খুব ভালবাসতুম। হঠাৎ মনে হল, ও বাবা এ তো ভারি মজার ফাঁদে পড়ে গেছি। মুকুজ্যেরা একটা ইঁদুরকে ফাঁদ পেতে ধরেছিল। সেই জাল-ঘেরা বাক্সের ভিতর ইঁদুরটাকে দেখেছিলাম আমি। হঠাৎ তার চেহারাটা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম এ তো ভারি মজা হয়েছে দেখছি, আমারও সেই ইঁদুরটার মতো দশা হয়েছে। আর নয়, এইবার সটকান দিই—সরে পড়লাম একদিন। ছেলেটা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বিজ্ঞাপনটা আমার চোখেও পড়েছিল কিন্তু আর ফিরে যাই নি। আর আমি ফাঁদে পা দি?"

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"আর কেউ নেই তোমার?"

"না, আর কেউ নেই। ওই মা-মরা ছেলেটাকে মানুষ করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম ও শেষে একটা ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেই রোজগার-পাতি করছে আমার আর দরকারই বা কি। কেটে পড়লাম একদিন।"

অদ্ভুত একটা হাসি চিকমিক করতে লাগল তার চোখ দুটিতে।

"কোথায় বাড়ি তোমার ?"

"বেশী দূর নয়, হরিপালে।"

"আমারও বাড়ি কাছেই। ভাণ্ডারহাটিতে—"

"আরে তাই নাকি! কে আছে সেখানে ?"

"কেউ নেই। এই মামাটিই আমার সম্বল। মামার দয়াতেই বেঁচে আছি—"

হাসি চিকমিক করে উঠল জগার চোখে।

"দয়া ? অাঁ ? ভারি মজার কথা বললে তো। তুমিও তো ভাই কম দয়ালু নও। তোমার মামার জুতো বুরুশ করা, তামাক সাজা, কাপড় কাচা, তোমার মামীর হরেক রকমের ফরমাশ খাটা আর বকুনি হজম করা এ সব তো তুমিই কর। তুমিই বা কম কিসে। আসলে কি জান ?"

"কি ?"

"সবই মজার ব্যাপার। দুনিয়াটাই মজাদার। তোমার মামা নাক টিপে রোজ যখন প্রাণায়াম করেন তখন আমার ভারি মজা লাগে। রগের শিরগুলো ফুলে ওঠে, মাঝে মাঝে চোখ দুটো মিটমিট করে, নাকটা থেকে শোঁ শোঁ করে নিশ্বাস পড়ে। ভারি মজা লাগে আমার—"

"মামার সামনে আবার হেসে ফেল না যেন। চাকরি যাবে তাহলে—"

"হাসি পেলে হাসব বই কি ? চাকরি ? চাকরির তোয়াক্কা করি না। যেখানে গতর খাটাব সেখানেই খেতে পাব। মাইনে তো চাই না। দিন কতক ভিক্ষেও করেছিলাম। সে-ও আর এক মজা—"

"কি রকম ?"

অধিকাংশ লোক ভান করে যেন তারা কালা। আবার কতকগুলো লোক উপদেশ দেয়—খেটে খাও। কোন কোন লোক আবার দশ নয়া বার করে বলে—তোমার কাছে ভাঙানি আছে ? পাঁচ নয়া তুমি নাও, পাঁচ নয়া তুমি আমাকে ফেরৎ দাও। আমার ইচ্ছে করে ওকে বলি পাঁচ নয়া তুমি নাও, আমার কাছে পঁচিশ নয়া আছে তাতেই চলে যাবে আমার। কিন্তু তা করিনি কখনও। করলে মজাটা নষ্ট হয়ে যেত। কত রকম মজাই যে হয়। একজন বলেছিল আমাদের প্রসেশনে যাবি ? জিগ্যেস করলাম, কি করতে হবে ? পতাকা হাতে নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে ঘুরতে হবে আমাদের সঙ্গে—বললে সে। কতক্ষণ ঘুরতে হবে ? ঘণ্টা দুয়েক, বললে সে। পঞ্চাশ নয়া দেব এর জন্যে। ঘুরলাম তাদের সঙ্গে। তারপর পুলিশ এল। দেখলাম ভং ভং করে পালাচ্ছে সবাই। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পঞ্চাশ নয়া তো পেলামই না, উপরন্তু পুলিশের লাঠি পড়ল পিঠে। সে এক নতুন ধরনের মজা। শেষে মনে হল পালানোতেও একটা মজা আছে, সেটাই বা ছাড়ি কেন। পুলিশের লাঠি খেয়ে পতাকা ফেলে আমিও ছুটে ঢুকে পড়লুম একটা গলির মধ্যে। সেখানে আবার দেখি আর এক মজা, দুটো বাঘা কুকুর মারামারি করছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোম-ওঠা একটা কুত্তি। সরে পড়লাম সেখান থেকে। কত মজাই যে দেখেছি জীবনে। রোজ দেখছি। তুমিও কম মজা নও। লাথি-ঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছ মামার আঁস্তাকুড়ে।"

"আমি যে ওদের ভালবাসি—"

"ও বাবা, সে তো ভারি মজা! তোমার ওটাকে ফাঁদ বলে মনে হয় না ?"

"না।"

"হয় না ? ভারি মজাদার লোক তো তুমি—"

এ ধরনের নানারকম আলাপ হত জগার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আমার মামার কাছেও জগা টিকতে পারল না। এবার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম হল। মামা একজন মনোমত গুরু খুঁজছিলেন। তাঁর পয়সা ছিল, তাই নানা ধরনের গুরুকে বাড়িতেই নিমন্ত্রণ করে আনতেন তিনি। বিবিধ চেহারার গুরুর সমাগম হত বাড়িতে। কেউ গেরুয়া আলখাল্লা পরা, কারো হাতে ত্রিশূল, কারো মাথা ন্যাড়া, কেউ জটাধারী, কারো হাতে কমণ্ডলু। কেউ কেউ ভস্ম-মাখা, কেউ কোপীন বস্ত্র। নানা চেহারায় নানা মূর্তি আসত। জগা একদিন জিগ্যেস করল—"মাঝে মাঝে এরকম সন্ন্যাসী আসছে কেন—"

"মামা গুরু খুঁজছেন।"

"গুরু! ভারি মজা তো। যেন মাছের বাজারে গিয়ে পছন্দমত মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কত রকম মজাই যে আছে সংসারে—"

"তুমি যেন মামার কাছে এ কথা বলতে যেও না।"

"পাগল! তা কি যাই। দূর থেকে দাঁড়িয়ে চুপটি করে মজাটি দেখব কেবল—"

দিন কয়েক পরে হরিদ্বার থেকে আর একজন হবু-গুরু এসে হাজির হলেন। বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বের কোনও ছাপ নেই। সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ পরা ভদ্রলোকের চেহারা। মাথায় কদম-ছাঁট চুল। গোঁফ-দাড়ি কমানো। মামা শুনেছিলেন ইনি নাকি আধ্যাত্মিক মার্গে অনেক দূর এগিয়েছেন। বাইরে কিন্তু কোন ভোলটোল নেই। এমন কি মাথায় একটা টিকিও নেই। মামার এক বন্ধু হরিদ্বারে থাকেন। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে তিনি এসেছিলেন মামার কাছে।

এসেই বললেন—"আমার এই দিকেই কাজ ছিল একটা। সুরেশবাবু অনেক করে অনুরোধ করেছিলেন তাই দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে। এমনি আলাপ করব। আপনাকে মন্ত্র দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি সামান্য লোক, আপনার গুরু হওয়ার মতো গুরুত্ব আমার নেই।"

মামা সশ্রদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"হরনাথ বাবার কাছে আপনার নাম শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন আপনি খুব উঁচুতে উঠে গেছেন, তন্ত্রের—"

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"ওসব গুজবে কান দেবেন না। আমার দৌড় যে কতদূর তা আমিই জানি। যাক—ওসব কথা—"

করুণ কণ্ঠে মামা বললেন, "কিন্তু আমার যে ভালো গুরু চাই একটি—"

ভদ্রলোক স্মিত মুখে চুপ করেই রইলেন।

তারপর বললেন—"এক কাপ চা হুকুম করুন।"

"নিশ্চয়।"

মামা হাঁক দিলেন—"ওরে জগা চা নিয়ে আয়!"

একটু পরেই জগা এক কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। জগা ঢুকতেই ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর যা করলেন তা খুবই অপ্রত্যাশিত।

উঠে গিয়ে প্রণাম করলেন জগাকে।

জগা ফিক করে হেসে বললেন—"এ আবার কি মজা করছেন আপনি—"

বলেই বেরিয়ে গেল সে।

"ইনি কে ? এঁকে কোথায় পেলেন আপনি ?"

"ও তো আমার বাড়ির চাকর জগা।"

"উনি মহাপুরুষ, মহাসাধক, উনিই আপনার গুরু হতে পারেন—"

"বলেন কি !"

"হ্যাঁ। ওঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা দিব্যজ্যোতি বেরুচ্ছে তা আপনি দেখতে পাননি ? ওঁকেই গুরু করুন আপনার—উনি যদি আপনার গুরু হতে রাজী হন তাহলে আপনাকে মহাভাগ্যবান বলে মনে করব আমি। আচ্ছা, আমি এখন উঠি। উনি কোথায় গেলেন। আর একবার ডাকুন তো—ওঁকে আর একবার প্রণাম করব।"

মামা জগা জগা বলে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু জগাকে আর পাওয়া গেল না। সে নিঃশব্দে সরে পড়েছিল।

সাত দিন ধরে খোঁজা-খুঁজি করেও জগাকে পাওয়া গেল না। শেষে আমি বললাম —"ও আমাকে বলেছিল হরিপালে ওর বাড়ি। সেখানে লোক পাঠালে হয়তো পাওয়া যেতে পারে—"

"তুমিই যাও না। হরিদ্বারের সাধু বলে গেছেন ও দুর্লভ রত্ন একটি। ওকে হাত-ছাড়া করা হবে না, যাও তুমি—"

গেলাম হরিপাল।

হরিপাল ছোট জায়গা, ভাবছিলাম কাকে জিজ্ঞেস করব জগার কথা। অনিশ্চিত-ভাবে হাঁটছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল জগা রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে আছে।

"এই যে জগা ! কি করছ এখানে ?"

"মজা দেখছি।"

"কি মজা—"

"ওই যে দেখ না। বাঁশ চিরছে সবাই—"

দেখলাম একটু দূরে বাঁশ চিরে মড়া বইবার ডুলি তৈরি হচ্ছে একটা।

"কেউ মারা গেছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমার সেই ছেলেটা। তারের খাঁচাটা ভেঙে গেল। কি মজা, কি মজা ! এইবার নিশ্চিন্দি হয়ে এখানে থাকতে পারব।"

"তুমি আমাদের কাছেই চল না। মামা ডেকেছেন তোমাকে।"

"ওরে বাবা ! ওখানে আর না। ওখানে গেলেই সবাই পেন্নাম করবে। ও মজা বেশী দিন ভালো লাগবে না—"

তার চোখের দৃষ্টিতে হাসি চিকমিক করে উঠল।

সৈনিক সেন

আমি আমার পার্টির কাজেই গিয়েছিলাম সেই শহরে। স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ট্রেন থেকে নামতেই ঝিম-ঝিম করে বৃষ্টি শুরু হল একটু। মফস্বল জায়গা। ফুলবেড়িয়ার বাগানে আমার ট্রাংকটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও কুলি পেলাম না। সঙ্গে আর কিছু ছিল না। আমার বিছানাপত্র নিয়ে আমার চাকরটা আগের ট্রেনে চলে এসেছিল। স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেলাম। চেনা লোক বেরিয়ে পড়ল। স্টেশন মাস্টার অন্য কেউ নয়, হারান, আমার বন্ধু একজন।

"কি ব্যাপার, তুই হঠাৎ এখানে!"

"পার্টির কাজে এসেছি। একটু ক্যানভাস করতে হবে। ফুলবেড়িয়ার বাগানবাড়িতে আমার জন্য জায়গা ঠিক হয়েছে। কিন্তু এই ট্রাংকটা নিয়ে যাই কি করে বল তো। এখানে তো রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি কিছু নেই। কোনও কুলিও যেতে চাইছে না—"

"না, এখানে স্টেশনে গাড়ি-টাড়ি বিশেষ থাকে না এত রাত্রে। কুলিও এত রাত্রে যেতে চাইছে না কেউ অতদূরে।"

"কিন্তু ট্রাংকটা আজ রাত্রে নিয়ে যেতেই হবে। ওতে অনেক দরকারি কাগজ-পত্র আছে —"

"বেশ, রেখে যাও আমার কাছে। আমি একটু পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পয়েন্টসম্যান রামু আসবে একটু পরে। গাড়িটা পাস করে দিয়ে সে দিয়ে আসবে তোমার ট্রাংকটা। মজুরি বেশী চাইবে। কত দেবে তুমি?"

"যা বলবে।"

"দু-টাকা দিও। মাইল খানেক যেতে হবে তো এত রাত্রে—"

"বেশ তাই দেব। টাকা দুটো তুমিই রাখ—" তাকে দুটো টাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টির মধ্যেই। পরদিন সভায় কি বক্তৃতা দেব, তাই ভাবতে ভাবতে পথ চলতে লাগলাম। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, পথ চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না কিন্তু ভিজে গেলাম বেশ। আশা ছিল আমার চাকর হরু নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। গিয়ে এক কাপ চা অন্তত পাব।

ফুলবেড়িয়ার রাস্তা আমার অচেনা নয়। আগে দু-একবার এসেছি। টর্চ জেলে জেলে পথ হাঁটতে হচ্ছিল অবশ্য, কারণ পাড়া গাঁ জায়গা, রাস্তায় কোনও আলো ছিল না। স্টেশন থেকে বেরিয়েই ব্যাঙের শব্দ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে ঝিল্লী-ধ্বনি। রাস্তার দু-ধারে অন্ধকার মাঠ। মাঠের ওপারে অন্ধকার আরও পুঞ্জীভূত, সম্ভবত ওগুলো ঝোপ ঝাড়, বন-জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে গোঙানি কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম একটা। দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দেখতে পেলাম স্তূপীকৃত কালো কি যেন একটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি পেল নিজের অজ্ঞতায়। একটা মোষের গাড়ি, প্রচুর বোঝা নিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে।

"ফুলবেড়িয়া এখান থেকে কতদূরে বলতে পার—"

গাড়ি থেকে কোন জবাব এল না। গাড়োয়ান ঘুমুচ্ছে না-কি? গাড়ির পিছন দিক থেকে লম্বা লম্বা কি যেন ঝুলছে। বাঁশ না কি?

যাই হোক এগিয়ে চললাম। ফুলবেড়িয়ার রাস্তা আমার অচেনা নয়। ফুলবেড়িয়াতে একবার পুলিশ ফায়ারিং হয়েছিল। আমিও ছিলাম সেই বিদ্রোহী জনতার মধ্যে। ভাগ্য ভালো ছিল প্রাণে মরিনি।

শিস্ দিতে দিতে পথ চলছিলাম। হঠাৎ একটা কুকুর এসে হাজির হল। প্রকাণ্ড কালো কুকুর। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা··· । একপাল কুকুর এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল আমাকে ঘিরে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল তারা আমাকে এগোতে দেবে না। রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলাম। দু-চারটে ঢিল খেয়ে তারা সরল একটু। আমি পথ পেয়ে আবার অগ্রসর হলাম। কুকুরগুলো কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে পিছনে পিছনে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ অন্তর্ধান করল। তারপরই সেই গোঙানি শব্দটা শুরু হল অবার। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই মোষের গাড়িটা আবার আমার দিকে আসছে। দ্রুতপদে চলতে শুরু করলাম।

ফুলবেড়িয়ায় একটা বাগানবাড়ি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা আছে। অনায়াসে সেখানে মীটিং হতে পারে। তাই আমাদের পার্টি থেকে ঘরটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র অসুবিধা স্টেশন থেকে দূরে। দ্রুতপদে চলছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মোষের গাড়িটা ঠিক আমার পিছু পিছু আসছে। চাকা থেকে যে শব্দ হচ্ছে তা যেন বহু মানবের মর্মন্তুদ ক্রন্দন। আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মনে হল ওটা মোষের গাড়ি তো? ছুটতে লাগলাম।

ফুলবেড়িয়ার বাগানবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পেঁছিলাম, তখন ঝড় উঠল একটা। প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের বেগে পড়ে গেলাম মাটিতে। আবার উঠলাম। এবার এগোতে চেষ্টা করলাম। আবার ফেলে দিলে আমাকে। ঝড় নয়, যেন একটা দৈত্য কিছুতেই এগোতে দেবে না আমাকে। কিন্তু আমি—সৈনিক সেন—দমবার ছেলে নই। হার মানি নি কারো কাছে। আমি এগোবই। মাথা হেঁট করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। ঝড় আমার পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ আবার থেমে গেল। কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আমি একটা গাছের ডাল পেলাম। ঝড়েই উড়িয়ে এনেছিল সেটা সম্ভবত। সেটা সংগ্রহ করে নিলাম।

ফুলবেড়িয়ার বাগান বাড়িতে পেঁছে দেখি বাড়িটাকে ঘিরে অসংখ্য কুকুর ডাকছে। সব কালো কুকুর। তাদের সম্মিলিত চীৎকারের একটা অর্থই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অন্ধকারে—"দূরে হয়ে যাও, দূরে হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও"। হাতে গাছের ডালটা ছিল। সেইটে আস্ফালন করে এগিয়ে গেলাম। সামনে যে কুকুরটা ছিল মারলাম ডালটা দিয়ে। মেরেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ডালটা যেন হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল। কুকুর নয়, কুকুরের ছায়া-মূর্তি। 'শন্-শন্' শব্দ হল মাথার উপর। উপরের দিকে চেয়ে দেখি অসংখ্য বাদুড় ঘুরপাক খাচ্ছে।

"হরু, হরু, হরু—"

চারদিকে কবাট বন্ধ করে হরু বসেছিল। আমার ডাক শুনে কবাট খুলে বেরিয়ে এল সে। দেখলাম ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে। মুখে রাম-নাম হাতে টিফিন কেরিয়ার।

"এ ভুতুড়ে বাড়ি বাবু। চলুন এখান থেকে পালাই। এসে আপনার বিছানা করে

রেখেছিলাম। সব তছনছ করে দিয়েছে। বালিশ ছিঁড়ে একাকার করেছে। বাসন-কোসন ভেঙে চুরমার করেছে। এই টিফিন কেরিয়ারে দু-পীস টোস্ট আর দুটো ডিম সিদ্ধ আছে। সেইটে হাতে করে আমি ক্রমাগত রাম-নাম করে যাচ্ছি। তাই আমাকে ছুঁতে পারে নি ওরা "উঃ বাবারে—" সঙ্গে সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারটা পড়ে গেল মাটিতে।

"আমার হাতে লাথি মেরেছে। রাম-রাম রাম-রাম। আপনি রাম নাম করতে করতে খেয়ে নিন এগুলো বাবু—"

আমি কিন্তু সে অবসর পেলাম না। কে যেন আমার নাকের উপর ঘুঁসি মারলে একটা। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম আমি। নাক দিয়ে রক্ত কিন্তু পড়ল না।

তারপরই খোনাসুরে কে যেন বলে উঠল—"ফিঁরে যাঁন। আঁপনার ইঁলেকশন্ মীটিং পঁন্ড কঁরে দেঁব আঁমরা—" আমি সৈনিক সেন, দমবার ছেলে নই। উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক এই সময়ে স্টেশন থেকে রামু এসে হাজির হল আমার ট্রাংকটা নিয়ে। ট্রাংকের উপর আমার নাম লেখা ছিল। শুধু নাম নয়, আমি যে পার্টির লোক, সে পার্টির নামটাও লেখা ছিল। ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার নামের পাশে। ট্রাংক রেখে চলে গেল কুলীটা।

গোঙানি শব্দটা আবার শোনা গেল। বেরিয়ে দেখলাম সেই মোষের গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। ট্রাংক থেকে টর্চ বার করে এগিয়ে গেলাম। টর্চ ফেলে দেখলাম বিরাটকায় মহিষ দুটো ঘাড় তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে। তাদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, চোখগুলো জ্বলছে। গাড়িতে মড়া বোঝাই করা রয়েছে। পাগুলো ঝুলছে পিছন দিকে। হঠাৎ আমার পুলিশ ফায়ারিং-য়ের কথাটা মনে পড়ল।

ঠিক এর পরই যা ঘটল তা অপ্রত্যাশিত।

কে যেন আমার কানের কাছে খোনাসুরে প্রশ্ন করলে, "আপনি কি আঁমাদের পাঁর্টির লোঁক? আঁমরা জানতাম আঁপনি—"

"হ্যা ঠিকই জানতেন। কিন্তু সম্প্রতি আমি দল ত্যাগ করে আপনাদের পার্টিতেই যোগ দিয়েছি—"

"তাই নাকি। আঁমরা তোঁ খঁবরের কাঁগজ পঁড়তে পাঁই না"—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য খোনা ধ্বনিত হয়ে উঠল—"সৈঁনিক সেঁন জিঁন্দাবাদ। সৈঁনিক সেঁন জিঁন্দাবাদ।" এরপর ছবিটাই বদলে গেল।

অন্তর্ধান করল মহিষের গাড়ি, অবলুপ্ত হয়ে গেল কুকুর আর বাদুড়ের দল। হরুর দুই গণ্ডে চুম্বন করে গেল কে যেন এসে।

তারপর যা হল তা আরও চমকপ্রদ।

খাবার টেবিলে কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেল দামী একটা টেবিল ক্লথ। আর তার উপর সাজিয়ে দিয়ে গেল চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—সব রকম। পরিতৃপ্তি সহকারে আহার সমাধা করলাম। তারপর ঘুমুলাম দুগ্ধফেনানিভ শয্যায়। যাদুমন্ত্র বলে সব যেন হ'য়ে গেল।

আভাস

'ছপ্'—আবার শব্দটা হল।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম আবার। এবারও কিছু বুঝতে পারলাম না। একটা বিষয় কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ—ব্যাং নয়। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমিও মরে গেছি বোধহয়। বোধহয় বলছি এই জন্যে যে 'আমি আছি' এই বোধটা লুপ্ত হয়নি এখনও। মনে হয় দেহটাও আছে, তা না হলে যা ঘটল তা চৈতন্যগোচর হল কি করে। ওই শব্দটা শুনতে পাচ্ছি কেন। অশরীরীরা কি কিছু শুনতে পায়? কান্না শুনতে পাচ্ছি। অনেক লোকের অনেক কান্না। অবলুপ্ত জীবলোকের হাহাকার অসংখ্য মশকের গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে। আমার এই আবছায়া-অস্তিত্ব নিয়ে একটা ছোট দ্বীপের উপর বসে আছি। চারদিকে জল আর অন্ধকার। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ আর অন্ধকারের একটা অবর্ণনীয় শব্দ ঘিরে আসছে আমাকে। আর মাঝে মাঝে ওই শব্দটা হচ্ছে। ওই আবার। ছপ্-ছপ্-ছপ্। কিন্তু এই শব্দটা যেন শব্দ ছাড়াও আরও কিছু। কিন্তু কি যে ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। একটা পরদা সামনে দুলছে। বিস্মৃতির পরদা? বিস্মৃতির? স্মৃতিশক্তির জন্য যে সুরেন শ্রুতিধর হয়েছিল, একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেছিল তার মনের সামনে আজ বিস্মৃতির পরদা ঝুলছে?

* * * *

কৃতবিদ্য ইঞ্জিনীয়ার সুরেন মল্লিক প্রচণ্ড ইলেক্‌ট্রিক 'শক্' খেয়েছিলেন। মরেননি, জীবন্মৃত হয়ে আছেন। চোখ বুজে শুয়ে আছেন চুপ করে। তাঁর যা মনে হচ্ছে তারই কিছু আভাস উপরে দিলাম। আরও দিচ্ছি। আভাসই দিচ্ছি। কারণ পুরো খবর আমিও জানি না।

* * * *

ছপ্-ছপ্-ছপ্…

ক্রমশ এগিয়ে আসছে শব্দটা। আরও কাছে এল। আরও কাছে…আরও…আরও। ছপ্-ছপ্-ছপ্-ছপ্—অতি দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। স্পর্শ পেলাম এবার। বিস্মৃতির পরদা সরে গেল। শব্দের সঙ্গে স্পর্শ এসে মিশতেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল ছবিটা।

সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠে জল জমেছে। প্রচুর বর্ষা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। ওপারে কদম গাছের সারি। অনেক কদম ফুল ফুটেছে। রোমাঞ্চিত কলেবরে প্রত্যেকটি ফুল অপেক্ষা করছে, বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটবে এইবার। আমিও অপেক্ষা করছি। সে অপেক্ষার তীব্রতা ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হচ্ছে আকাশের বিদ্যুৎ ঝলকে। তারপর অসম্ভব সম্ভব হল। বাঁ হাত দিয়ে নীল শাড়িটা তুলে মিতা আসছে। ডান হাতে ফুল, কদম ফুল। ছপ্-ছপ্-ছপ্…মিতা আসছে…হাওয়ায় মাথার চুল উড়ছে…ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে চাইল—রাগী রাগী মুখ…এ কি—কি হল…।

* * *

মিতা সেদিন আসেনি।

তারপর কত বছর কেটে গেছে ? কে জানে।

আজ এতদিন পরে জীবন্মৃত সুরেন মল্লিক সহসা অনুভব করলেন মিতা আবার এসেছে। ছপ্-ছপ্ পায়ের শব্দ তারই। সেই জলে-ভরা মাঠ পেরিয়ে আবার এসেছে সে। কিন্তু এবারেও তিনি যেন তাকে পেয়েও পেলেন না। তাঁর হাহাকারের আভাস দিচ্ছি।

* * *

ছাড়— ছাড়—অমন ভাবে আমার গলা আঁকড়ে ধরো না। এ কি—তোমার মুখ কই। তুমি কবন্ধ ? অ্যাটম বোমা তোমায় কবন্ধ করে দিয়েছে ? মিতা—মিতা—কথা বলবে না ?···বিজ্ঞানের উন্নতি মিতাকে কেড়ে নিয়েছে···মিতাকে—আমার মিতাকে···।

* * *

এরপর মৃত্যু হল সুরেন মল্লিকের। হঠাৎ অচল হয়ে গেল সচল নাড়িটা। তাঁকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল আর একটি মড়া এসেছে। মেয়ে মানুষের মড়া কবন্ধ। সবাই বললে মেয়েটি না কি রেলে মাথা দিয়েছিল। মেয়েটির নাম মিতা।

ডাক্তারি অভিজ্ঞতা

সারাজীবন ডাক্তারি করেছি। ডাক্তারি অভিজ্ঞতা নানারকম আছে। যে রোগী ভেবেছিলাম নির্ঘাৎ সেরে যাবে সে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা গেল, যে রোগ দুরারোগ্য মনে হয়েছিল তা সহজেই সেরে গেল সাধারণ ওষুধে। চারটাকা ফিয়ের তিনটেই মেকি টাকা দিয়ে যিনি ভেবেছিলেন খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন তাঁকে আবার ঘুরে আসতে হল অধিকতর পীড়িত হ'য়ে—এ ধরনের নানারকম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু এখন যে কথাটি লিখছি সেটি একটু ভিন্ন ধরনের।

রোগীটির বয়স আট নয় বছর। আমি যখন গেলাম তখন তার বয়সী আর একটি পাড়ার ছেলে তার কাছে বসেছিল। উত্তেজিতভাবে দু'জনের মধ্যে কি যেন আলোচনা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল ছেলেটি। আমি যাকে দেখতে গিয়েছিলাম তার নাম পল্টু।

"কেমন আছ পল্টু। কি হ'ল তোমার ?"

সঙ্গে সঙ্গে পল্টুর বাবা গোবর্ধনবাবু বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে।

"আপনার পুরিয়াতে কিছু হ'ল না মশাই।"

"বারে কমেছে বটে, কিন্তু চেহারা তেমনি 'ভসকা'। তখনি বললাম আপনাকে পালভ্ রিহাই (Palve Rehi) দেবেন না। জিতেনবাবু বলছিলেন তাঁকে কোন্ এক ডাক্তার নাকি বলেছেন, ও ওষুধে আজকাল আর কাজ হয় না। 'সর্বশিক্ষা' পত্রিকায় 'জেনে রাখুন' বিভাগে আমি যেন পড়েছিলাম ওইরকম একটা কিছু—"

গোবর্ধনবাবু সবজান্তা চৌকস লোক। আমাকে দিয়েই চিকিৎসা করান, আমিই তাঁর গৃহ-চিকিৎসক। 'ফি' কখনও দেন না অবশ্য, কিন্তু আমার চিকিৎসার সমালোচনায় তিনি পঞ্চমুখ। নিজের একটি হোমিওপ্যাথী বাক্স আছে। তাঁর বিশ্বাস অধিকাংশ

অসুখই হোমিওপ্যাথীতে সারে, যেগুলো সারে না সেগুলো কোনও 'প্যাথী'তেই সারে না। তবে সংসার করতে গেলে অনেক কিছু আজে-বাজে কাজ করতে হয়, ডাক্তারও ডাকতে হয়। তাই আমাকে ডাকেন মাঝে মাঝে। আপনারা যদি প্রশ্ন করেন বিনা পারিশ্রমিকে আমি এ রকম লোকের বাড়িতে চিকিৎসা করি কেন তাহলে আমাকে বলতেই হবে উনি আমার আত্মীয়। অর্থাৎ আমার মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো শালা। কিন্তু এর চেয়েও জোরালো আর একটি কারণ আছে। আমার থার্ড ডিভিসনে পাশ ছেলেটিকে উনি নানারকম কলাকৌশল করে নিজের আপিসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। আশা আছে উনি প্রসন্ন থাকলে সে চাকরিতে পার্মানেণ্টও হয়ে যাবে ছেলেটা। তখন অ্যাণ্টিবায়োটিকের (antibiotic) যুগ আসে নি। আমরা এমিটিন ইনজেকশন দিয়ে তখন পেটের অসুখ, লিভারের অসুখের চিকিৎসা করতাম।

বললাম—"পুরিয়াতে যখন কিছু হল না তখন 'এমিটিন' ইনজেকশন দিতে হবে।"

"এমিটিন দেবেন ?" ও তো সাংঘাতিক ওষুধ শুনেছি। খুব দুর্বল ক'রে দেয়।"

"না, না কিছু হবে না। কতো তো দিচ্ছি—"

"দেবার আগে তাহলে 'হার্ট'টা ভাল ক'রে দেখে নেবেন।"

"নেব

পলটুর সমবয়সী বন্ধুটি তখনও বসেছিল তার কাছে। সে বলল—"আমাকেও একবার এমিটিন দিয়েছিল, কিছু তো হয় নি।"

"না কিছু হবে না।"

গোবর্ধনবাবু চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন, তারপর দুম দুম ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

বুঝলাম 'ইনজেকশন' দেওয়ায় তাঁর মত নেই। কিন্তু আমার ডাক্তারি বিবেক বলতে লাগল 'ইনজেকশন' দিলে উপকার হবে। দিয়ে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে গোবর্ধনবাবু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

"ও মশাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে। শিগগির আসুন—"

"কি হল—"

"ছেলেটা হাসছে না। মুখ বুজে কি রকম 'গুম' হয়ে আছে। তখুনি বলেছিলাম এমিটিন দেবেন না। চলুন, চলুন—"

আমার ডিসপেনসারির দরজাটা আমার মাপসই নয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই চৌকাঠে মাথা ঠুকে যায়। তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে ঠুকে গেল মাথাটা। গোবর্ধনবাবু রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ছুটছিলেন। তাঁর বাড়ি আমার ডিসপেন্সারির কাছেই, সুতরাং আমাকেও দ্রুতপদে তাঁর অনুসরণ করতে হ'ল। পথে হোঁচটও খেলাম একবার। কাপড়পরা থাকলে হয়তো মুক্তকচ্ছও হ'তে হ'ত। কিন্তু প্যাণ্ট পরেছিলাম, সে দুর্ঘটনা আর ঘটল না।

গিয়ে দেখি পলটু মুখ বন্ধ ক'রে রয়েছে। চক্ষু দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত।

"কি হল পলটু। হাসছ না কেন" সপ্রতিভভাবে হেসে প্রশ্ন করলাম।

পলটু নীরব।

পলটু মুখটা ছুঁচলো করলে আর একটু।

"ও ঠিক টিটেনাস হয়ে গেছে মশাই। লক জ' (lock jaw), মুখ খুলতে পারছে না—"

সক্ষোভে ব'লে উঠলেন গোবর্ধনবাবু।

এমন সময় খাটের নীচে ঘটাং ক'রে শব্দ হ'ল একটা।

"আমার আন্‌টা গুলিটা পাচ্ছি না। খাটের নীচে নেই।"

খাটের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল পলটুর সেই বন্ধুটি।

"আন্‌টা গুলি?"

"শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

"আন্‌টা গুলি এনেছিলে না কি?"

"হ্যাঁ, আমার এই প্যান্টের পকেটে ছিল। চ্যামপিয়ন আন্‌টা গুলি ওটা। পলটুর বিছানায় বসেছিলাম, বিছানায় তো নেই দেখছি। কোথায় গেল—"

পলটুর দিকে চেয়ে দেখলাম সে চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে আছে।

"পলটু মুখ খোলো, দেখি তোমার কি হয়েছে—"

পলটু মুখ তো খুললই না, পাশ ফিরে শুল।

আমি তার পাশে বসে একটু মিনতির সুরেই বললাম—"খোলো না দেখি—"

খুলল না। বালিশে মুখ গুজড়ে শুয়ে রইল। রাগ হ'য়ে গেল হঠাৎ। জোর ক'রে মুখটা ঘুরিয়ে নাকটা চেপে ধরলাম। মুখ হাঁ হ'য়ে গেল। দেখি মুখের ভিতর সেই আন্‌টা গুলিটা।

গোবর্ধনবাবুর দিকে ফিরে বললুম—"দেখুন, মুখের ভিতর এই গুলি পুরে রেখেছিল।"

"বলেন কি! তাহলে তো ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ আপনার এমিটিনেরই 'এফেক্‌ট'। ওঃ সাংঘাতিক ওষুধ তো মশাই—"

এর পর তাই ক'রে ফেললাম যা আমার করা উচিত ছিল না। সংযম হারিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম—"চোপ রও। সবজান্তা বদমায়েস কোথাকার—"

বলেই হন হন ক'রে বেরিয়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম ছেলের ভবিষ্যতের দফাটি গয়া হয়ে গেল। একটি নীতিকথাও মনে হয়েছিল সেটাও শুনুন। কারো ছেলে যদি থার্ড ডিভিসনে পাশ করে তাকে বরং বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়াও ভালো, কিন্তু কোনও আত্মীয়ের ল্যাজ ধ'রে তাকে তার আপিসে ঢোকাবার চেষ্টা করা কখনও উচিত নয়। মানইজ্জত কিছু থাকে না, মনে হয় সর্বদা কে যেন টিকি ধ'রে আছে!

মণিকাঞ্চন

শেষ পর্যন্ত গা-ঢাকাই দিতে হইল। পাপ করিয়াছিলেন তাহার ন্যায্য শাস্তি পাইতেছেন এ সান্ত্বনাও মিস্টার স্যানিয়ালের মনে নাই। কারণ তাঁহার সহ-পাপী লোকটির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নাই। সে-ও একই অপরাধ করিয়াছিল, কিন্তু সে ছাড়া পাইয়া গিয়াছে। মিস্টার স্যানিয়ালের ধারণা, উপরের জনকয়েক হোমরা-চোমরা ব্যক্তিদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

মিস্টার স্যানিয়ালের একমাত্র সান্ত্বনা তাঁহার সংসারের আপাতত বিশেষ ঝামেলা নাই। একমাত্র ছেলেটি আমেরিকায় পড়াশোনা করিয়া সেইখানেই ঘরবাড়ি করিয়াছে। মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীও অনেক দিন আগে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে কিসের জন্য, কাহার জন্য মিস্টার স্যানিয়াল গভর্নমেণ্টের কয়েক লক্ষ টাকা চুরি করিতে গিয়াছিলেন এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহারা অপরূপরূপসী মণিকে দেখেন নাই। মণি সত্যই যেন মণি। রূপে, রসে, মদিরতায় পরিপূর্ণ একটি অপূর্ব সৃষ্টি-মহিমা সে। অনেকেই তাহার প্রেমে হাবুডুবু খাইয়াছে কিন্তু কেহই তাহাকে পায় নাই। সে অধরা নহে, তাহাকে ধরা সম্ভব, কিন্তু ধরা যায় না। যে জালে সে ধরা পড়িতে চায় সে জাল সকলের কাছে নাই, কারণ তাহা সাধারণ জাল নহে, তাহা সোনার জাল, হীরা-চুণী-পান্না-মুক্তা-ভূষিত ঐশ্বর্যের জাল হওয়া দরকার। মণি কুবের-পত্নী হইতে চায়। সর্বাঙ্গে মণির দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া সে কুবেরের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা সে একদিন আবিষ্কার করিল যাহারা সত্যই কুবের তাহাদের গলায় শুধু একটা মণি নয়, অনেক মণি দুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের 'হারেম' আছে, শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। কিন্তু মণি একেশ্বরী হইতে চায়। তাই আসল কুবেরদের কাছেও সে ধরা দিল না। অবশেষে তাহার দেখা হইয়া গেল মিস্টার স্যানিয়ালের সহিত একদিন। কে, স্যানিয়াল (কাঞ্চন সান্যাল) যদিও পঞ্চাশ পার হইয়াছেন কিন্তু বৃদ্ধ হন নাই। এখনও তাঁহার মনে সকাম কবিতা এবং চোখে লালসার স্বপ্ন জাগে। মণিকে পাইবার জন্যই তিনি কয়েক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল কোনও ভাল জায়গায় একটি মনোরম বাড়ি করিয়া মণিকে লইয়া স্বপ্নের স্বর্গলোক সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। যে কয়েক লক্ষ টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন তাহা মণিকেই দিয়াছিলেন, কিন্তু মণি-কাঞ্চন যোগ শেষ পর্যন্ত হইল না। বিধাতা বাধ সাধিলেন। চুরি ধরা পড়িল ··কাঞ্চন এখন ফেরারী আসামী···

মণি-কাঞ্চন যোগ কিন্তু একদিন সম্ভব হইয়াছিল। কি করিয়া হইয়াছিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

কাঞ্চনবাবু প্রথমে যেদিন গা-ঢাকা দিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িলেন, সেদিন একটি দূরগামী ট্রেনেরই শরণাপন্ন হইলেন প্রথমে। দিল্লীর টিকিট কাটিয়া চড়িয়া বসিলেন একটা দিল্লীর ট্রেনে। কিছুদূর গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল দিল্লীতে তো অনেক চেনা লোক—সেখানে গেলে তো সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িব। পরের স্টেশনেই নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন কিউল। ওয়েটিংরুমে রাতটা কাটাইয়া পূর্বগামী একটা ট্রেনে চড়িয়া বসিলেন সকাল বেলা। ভাগলপুরে নামিয়া পড়িলেন আবার। সেখান হইতে মন্দারগামী একটা ট্রেনে চড়িলেন। মন্দারে মধুসূদন আছেন, তাঁহাকে একটা প্রণাম করিয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। মন্দার পাহাড়ে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ নজরে পড়িল পাহাড়ের উপর হইতে কে একজন নামিতেছেন। কাছাকাছি আসিতেই চিনিতে পারিলেন—গদাই সেন।

"আরে কাঁচুবাবু যে! মধুসূদনের কাছে যাচ্ছেন? বেশ, বেশ, যান। বড় পবিত্র স্থান এটি। হ্যাঁ, ভাল কথা, কাগজে পড়ছিলাম আপনার নামে কি একটা 'কেস্' হয়েছে যেন—"

"হয়েছিল। মিটে গেছে সেটা—"

গদাই সেন বলিলেন—"তাই নাকি। আমি শুনেছিলাম যেন—"

"না, ভুল শুনেছিলেন। আচ্ছা চলি—"

কাঞ্চনবাবুর যদিও শ্বাস-কষ্ট হইতেছিল তবু তিনি দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। মধুসূদনের মন্দিরে পেঁাছাইয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। বড়ই হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদনকে প্রণাম করিয়া একবার তাঁহার ইচ্ছা হইল আরও খানিকক্ষণ থাকেন। কিন্তু ভয় হইল। গদাই সেন এখানে আসিয়াছে, সে যদি···মণির মুখটা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। সে কি সব ঘটনা শুনিয়াছে? তাহাকে পাইবার আশা আছে কি আর?···সেইদিনই কাঞ্চন সান্যাল মন্দার ত্যাগ করিলেন। গদাই সেনের সহিত আর দেখা হইল না। মন্দার হইতে ভাগলপুরে আসিলেন। সেখানে আবার একটা পশ্চিমগামী ট্রেনে চড়িয়া হাজির হইলেন দানাপুরে। সেখানেও স্টেশনেই দেখিতে পাইলেন স্থরেন পালকে। পূর্বপরিচিত লোক। সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। একটা ওয়েটিংরুমের বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন সেখানে। তাহার পর বাহির হইয়া দেখিলেন একটা ট্রেন ছাড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ চড়িয়া বসিলেন তাহাতে। গয়া···আগ্রা···হরিদ্বার···সম্বলপুর···নাগপুর···মীরাট···কোথাও শান্তি নাই। সর্বদাই ভয় হয়। কেহ তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেই মনে হয় এইবার বুঝি ধরা পড়িলাম। লোকটা অমন করিয়া চাহিয়া আছে কেন···একবার ট্রেনে একটা অচেনা লোক একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিল। বলিল, কাঞ্চনের চেহারা নাকি তাহার ছোট ভাইয়ের মতো। ভাইটি মারা গিয়াছে। সে বলিল আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে। কিন্তু রাত্রে ফটো তুলিবার মতো ব্যবস্থা নাই। সকালে উঠিয়া আপনার একটি 'স্ন্যাপ্' লইব। বিনিদ্র নয়নে বসিয়া রহিলেন কাঞ্চনবাবু। সেই ভদ্রলোক খানিকক্ষণ বকবক করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন অবশেষে। গভীর রাত্রে গাড়ি হঠাৎ থামিয়া গেল এক জায়গায়। কাঞ্চনবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন কোনও স্টেশন নয়। অন্ধকারের ভিতর গাঢ়তর অন্ধকারের মতো স্তূপীকৃত যাহা দেখা যাইতেছে তাহা বোধ হয় পাহাড়। সেইখানেই নামিয়া পড়িলেন তিনি।···রেলের বেড়া ডিঙাইয়া উপলবন্ধুর একটা স্থান পাইলেন। সঙ্গে যে ব্যাগটা ছিল তাহাই মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন সেখানে। তখনও তিনি একেবারে নিঃস্ব হন নাই, সঙ্গে তখনও বেশ কিছু নগদ টাকা ছিল। ওই ব্যাগেই সব ছিল। তাই ব্যাগটিই তিনি মাথায় দিয়া শুইতেন। ব্যাগে কয়েকটা হাফ-প্যাণ্ট এবং হাফ-শার্ট ও ছিল, আর ছিল গেঞ্জি, গামছা ও ঘটি একটি। ব্যাগটা একটা ছোটখাটো তাকিয়ার মতো হইয়াছিল। শুইবামাত্র তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেশ চমৎকার হাওয়া দিতেছিল।

সকালে উঠিয়া দেখিলেন চারিদিকে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। একটা পাহাড় তো খুব উঁচু। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কোথাও জনমানব নাই। অনেক দূরে কয়েকটা গরু চরিতেছে আর মাঝে মাঝে একটা বাঁশির স্থর ভাসিয়া আসিতেছে। সেই দিকেই গেলেন। গিয়া দেখিলেন একটা টিলার উপর একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ, তাহার তলায় বসিয়া একটি কিশোর বাঁশি বাজাইতেছে। গরুগুলি তাহারই। এখান হইতে মাইল খানেক দূরে তাহাদের গ্রাম সাপরা। ছেলেটি সাঁওতাল, কিন্তু বাংলা বলিতে পারে। কাঞ্চন-বাবু বলিলেন—"আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তোমাদের গ্রামে খাবার-টাবার পাওয়া যাবে কিছু?"

"না, ছোট গ্রাম। ওখানে কোন দোকান-টোকান নেই। আর এখন বাড়িতেও পাবেন না কাউকে। সবাই নিজের কাজে বেরিয়ে গেছে। আপনার ওই ব্যাগে গ্লাস কি ঘটি আছে?"

"কেন?"

"তাহলে আপনাকে দুধ দুয়ে দিতে পারতাম খানিকটা। ওই লক্ষ্মী গরুটা সত্যিই খুব লক্ষ্মী। যখন তখন ওর দুধ দুয়ে নেওয়া যায়—"

ব্যাগে যে ছোট লোটা ছিল কাঞ্চনবাবুর, সেইটা বাহির করিয়া দিলেন।

ভোমা—(ছেলেটির নাম)—সত্যিই এক ঘটি দুধ আনিয়া দিল তাঁহাকে একটু পরে। চমৎকার দুধ।

"ওই পাহাড়টার কোলে একটা ঝরনা আছে। সেখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে পারেন—"

কাঞ্চন সান্যাল ঝরনার ধারে গিয়াই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। উলঙ্গ হইয়া স্নানও শেষ করিলেন ঝরনায়। একটি চিন্তাই কিন্তু বার বার তাঁহার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। ইহার পর কোথায় যাইব? এ রকম জীবন আর কতকাল বহন করিতে হইবে? মণি কি এখনও তাঁহার কথা ভাবে? বড়লোকের সেই ছেলেটা কি এখনও তাহার কাছে যাতায়াত করিতেছে?

ভোমাই তাহাকে বলিল—"আপনি আমাদের গাঁয়ে চলুন। সেখানে আমার ঠাকুর্দা আছেন। তিনি বাড়িতেই থাকেন, খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, আর কাজ করতে পারেন না। আপনাকে দেখলে খুব খুশি হবেন তিনি।"

কাঞ্চনবাবু ভোমাকে একটি টাকা দিতে গেলেন। বিস্মিত হইয়া গেল সে।

"টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আমাকে অতটা খাঁটি দুধ খাওয়ালে—"

কলরব তুলিয়া হাসিয়া উঠিল ভোমা।

"তার জন্যে দাম নিতে হবে? ভারি মজার লোক দেখছি আপনি! চলুন, চলুন, আপনি সাপরায় আমাদের বাড়িতে থাকবেন, ঠাকুর্দা খুব খুশী হবেন আপনাকে পেলে। গল্প করবার লোক পাবেন একটা। আপনি বন্দুক ছুঁড়তে পারেন?"

"পারি। কিন্তু আমার বন্দুক তো আনি নি।"

"আমাদের একটা বন্দুক আছে। আমার দাদা শিকারী একজন। প্রায়ই ঘুঘু, বগেরি, বটের, তিতির মেরে আনে।..."

"তুমি এমন চমৎকার বাংলা বলছ দেখে অবাক্ হয়ে গেছি। বললে তুমি সাঁওতাল, অথচ যখন বাংলা বলছ—"

"আমার মা যে বাঙালী ছিলেন। সে অনেক কথা, চলুন গেলেই সব জানতে পারবেন।"

"মা বেঁচে আছেন এখনও?"

"না। তিনি বেশি দিন বাঁচেন নি, দাদার আর আমার জন্মের পরই তিনি মারা গেছেন—সে এক আশ্চর্য ঘটনা শুনেছি। চলুন, সব শুনতে পাবেন ঠাকুর্দার কাছে। যাবেন?"

"বেশ তোমাদের বাড়ি শহর থেকে কতদূর?"

"অনেক দূরে। শহরের নামও জানি না। শহরের সঙ্গে সম্পর্কই নেই আমাদের?"

সাপরায় আসিয়া কাঞ্চনবাবু অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। সাপরা গ্রাম পাহাড়ের কোলে। তিন ঘর সাঁওতাল বাস করে সেখানে। সভ্য জগতের সহিত সত্যই তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আত্মগোপন করিয়া থাকিবার মতো স্থান। ভোমার ঠাকুর্দাকে খুব ভালো লাগিয়া গেল কাঞ্চনবাবুর।

বুড়ো বেশী কথা বলে না। হাসিমুখে মিটমিট করিয়া মুখের দিকে চাহিয়া থাকে কেবল।

"বাবুর নাম কি?"—অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে প্রশ্ন করিল কাঞ্চনবাবুকে।

"কাঞ্চন।"

'অ্যাঁ' কাঞ্চন! কি কাণ্ড! ওরে ভোমা, এ কাকে আনলি তুই! আমাদের সেই কাঞ্চন গাছটাই ফিরে এল নাকি—!"

"কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না আমি—" কাঞ্চনবাবু সবিস্ময় প্রশ্ন করলেন।

"আমাদের এই বাড়ির সামনে একটা কাঞ্চন গাছ ছিল। অনেক ফুল ফোটাত সে। তার তলায় বসে বাঁশি বাজাতাম আমি, অনেক বাঁশী বাজিয়েছি। তারপর হঠাৎ কি হল কে জানে, গাছটা শুকোতে লাগল, আমার বৌমা যখন এল তারপর থেকেই। এই ভোমার মা! তার নামও ছিল কাঞ্চন। বোধ হয় হিংসে হল গাছটার। হিংসেয় জ্বলেপুড়ে শুকিয়ে গেল।"

হাসিমুখে কাঞ্চনবাবুর মুখের দিকে বুড়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল - "অভিশাপও দিয়ে গেল বোধ হয়। আমার বৌমাও বাঁচল না—"

আবার হাসিমুখে মিট মিট করিয়া চাহিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল —"তুমিও বলছ তোমার নাম কাঞ্চন। সেই গাছটাই মানুষ হয়ে ফিরে এল নাকি। গাছটাকে বড় ভালবাসতুম। তাই বোধ হয় মায়া কাটাতে পারে নি—"

আবার হাসিমুখে চাহিয়া রহিল তাঁহার মুখের দিকে।

"এসেছ, থাকো—"

থাকিয়াই গেলেন কাঞ্চন সান্যাল।

ভোমার দাদার বন্দুকটা লইয়া শিকার করিয়া বেড়াইতেন কাঞ্চনবাবু। দিনকতক পরে বেশ মিশিয়া গেলেন উহাদের সহিত। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি গজাইল। কাপড়, জামা, প্যাণ্ট, গেঞ্জি ময়লা হইয়া গেল। চেহারাটাও পোড়া পোড়া হইয়া গেল কিছুদিনের মধ্যে। উহাদের খাওয়া-দাওয়ায় এবং জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া গেলেন তিনি। কিন্তু মনের মধ্যে যে আগুনটা জ্বলিতেছিল তাহা নিভিল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল মণিকে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া আসিয়াছি, সে নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কি করিয়া তাহাকে পাইব? সে কি আরও টাকা চাহিবে? কত টাকা? একদিন বলিয়াছিল কয়েক লক্ষ টাকা তো দেখিতে দেখিতে খরচ হইয়া যাইবে। তাহার পর? কাঞ্চন বলিয়াছিলেন, আবার দেব। এইসব কথাই বার বার মনে হইত তাঁহার। মণি—মণির মতোই আলো বিকিরণ করিয়া তাঁহার মনের অন্ধকার জ্বলিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর তিনি বুড়ার কাছে বসিয়াছিলেন। বুড়া নানারকম সুখ-দুঃখের গল্প বলিতেছিল। বহুকাল পূর্বে প্রথম যৌবনে কোন এক সাহেবের ঘোড়ার

সাহস ছিল সে। ঘোড়াটাকে রোজ আধসের দুধ, আধসের ছাতু আর আধসের মদ খাওয়াইতেন সাহেব। নিজে দাঁড়াইয়া খাওয়াইতেন।...হঠাৎ গল্পের মাঝে থামিয়া গেল বুড়া।

"ওই, ওই, আজ আবার বেরিয়েছে—"

"কি বেরিয়েছে—"

"ওই দেখ না।"

কাঞ্চন সান্যাল দেখিলেন দূরে একটা পাহাড়ের চূড়া হইতে টর্চলাইটের মতো একটা কি যেন আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে।

"কি ওটা—"

"মণির ছটা।"

"মণির ছটা ? ওখানে মণি এল কি করে !"

"ওখানে একটা সাপ আছে। তার মাথায় আছে প্রকাণ্ড একটা মাণিক। সাপটা যখন বেরোয় তখন ওই রকম ছটা দেখা যায়—"

"মাণিক ?—"

"হাঁ গো ! সাত রাজার ধন মাণিক। আমার বৌমা কাঞ্চন তো ওই মাণিকের লোভেই প্রাণটা হারাল—"

"কি রকম—"

"সেদিনও সন্ধ্যার পর ওই রকম ছটা দেখা গেল আকাশে। বৌমা যখন শুনল সব, তখন চুপ করে রইল। তারপর অনেক রাত্রে কখন যে চুপি চুপি বেরিয়ে গেছে আমরা জানতে পারি নি কেউ। সে ওই মণির লোভে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে। এমন সময় একটা লোক এসে হাজির হল একদিন। তার চেহারাটাও অনেকটা সাপের মতো। খসখসে চামড়া, চোখ দুটো স্থির। সে এসে বলল আপনার বৌমা পাহাড়ের উপর উঠেছিল, সেইখানেই তার দেহান্তর ঘটেছে—। আর কিছু বলল না, চলে গেল।"

"তাই নাকি ! আশ্চর্য ব্যাপার তো ! ওই আলো সাপের মাথার মণি থেকে আসছে ?"

"তাই তো সবাই বলে—"

"সাপটাকে গুলি করে মেরে ফেলা যায় না ? তাহলে তো মণিটা সহজেই আমরা পেতে পারি।"

"ওখানে যেতে কেউ সাহস করে না। সে সাপ নাকি ভয়ঙ্কর। আগে দু'একজন গিয়েছিল। তারা ফেরে নি। আমাদের বৌমার কথাই ধর না। সে আর ফিরল না—"

গভীর রাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া কাঞ্চন সান্যাল বাহির হইয়া পড়িলেন। মণিটা হস্তগত করিতেই হইবে। সাপের মাথার মাণিক। সাত রাজার ধন...। পর্বত কিন্তু দুরারোহ। চারিদিকে অন্ধকার, পথ জানা নেই, বার বার পাথরে ঠোক্কর খাইতে খাইতে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর দিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন কাঞ্চন সান্যাল। পাহাড়ের মাথার উপর মণির আলোর ঝলক ক্রমশ যেন স্ফূর্তত্র এবং উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঞ্চন সান্যাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যেমন করিয়া হোক উঠিতেই

হইবে। কিছুদূর চড়িয়া কিছুক্ষণ হাঁপান, শ্বাস-কষ্ট কমিলে আবার হামাগুড়ি দিতে শুরু করেন। বন্দুকটা একটা বাধা হইয়া দাঁড়াইল। বন্দুকটা কিছু দূরে আগাইয়া দেন, আবার সেটাকে গিয়া ধরেন, এইভাবেই চলিতে লাগিলেন তিনি।

পাহাড়ের চূড়ায় যখন সত্যই উপস্থিত হইলেন তখন তিনি মৃতপ্রায়। আলোটাও আর দেখা যাইতেছে না। কোথায় গেল সাপটা? তাহার পর হঠাৎ আলোটা ঝলসিয়া উঠিল। পাহাড়ের অন্য দিক হইতে সাপটা সহসা আবির্ভূত হইল। আকাশস্পর্শী আলোকরশ্মিতে চোখ ধাঁধিয়া গেল কাঞ্চন সান্যালের। বিরাট সাপ অদূরেই বিশাল ফণাবিস্তার করিয়া দুলিতেছে। মাথার উপর দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে মণিটা। কাঞ্চন সান্যাল বন্দুকটা তুলিয়া তাক্ করিতেছিলেন এমন সময় অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটিল। সাপ মানুষের ভাষায় কথা কহিয়া উঠিল।

"আমাকে মারবার চেষ্টা করছেন কেন? আমার এই মণিটা চান তো আসুন, নিয়ে নিন—"

অবাক্ হইয়া গেলেন কাঞ্চন সান্যাল।

"আসুন, কাছে আসুন, কোনও ভয় নেই—"

কাঞ্চন সান্যালের শাপগ্রস্ত দেবতার কথা মনে পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে কাছে আগাইয়া গেলেন।

"মণিটা আমার মাথা থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথার উপর রাখুন। এ মণিকে সর্বদা মাথায় রাখতে হবে, মাটির উপর রাখলেই এ মাটির ঢেলা হয়ে যাবে। আসুন, নিয়ে নিন—"

ওই বিরাট সাপের ফণার উপর হইতে মণিটা তুলিয়া লইতে তবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন কাঞ্চন সান্যাল।

"আসুন, কোনও ভয় নেই—"

অবশেষে কাঞ্চন সান্যাল মণিটা সাপের মাথার উপর হইতে তুলিয়া লইলেন।

"নিজের মাথার উপরে রাখুন এবার। মাটিতে যেন না ঠেকে—"

কাঞ্চন সান্যাল মণিটা তুলিয়া নিজের মাথার উপর রাখিলেন। বেশ ভারি ওজনদার মণি।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। মণি-হীন সাপ রূপান্তরিত হইল একটি মানবীতে।

"আপনি কে?"

"আমি তোমার মা কাঞ্চন।"

কাঞ্চন সান্যাল অনুভব করিতে লাগিলেন তাঁহার মধ্যেও একটা পরিবর্তন ঘটিতেছে। হাত দুইটা অন্তর্ধান করিয়াছে, মাথাটা চওড়া ও স্থিতিস্থাপক হইয়া যাইতেছে, দুইটা পা জুড়িয়া গেল। একি। কাঞ্চন সান্যাল বিরাট সর্পে রূপান্তরিত হইলেন। তাঁহার মাথার উপর মণিটা দপদপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পরে যে খবরটা কাগজে বাহির হইয়াছিল তাহা হয়তো আপনারা কেহ কেহ পড়িয়াছেন। খবরটি এই—

"শ্রীমতী মণিমালা নামে একটি যুবতী তাঁহার সদ্যবিবাহিত পতি, বিখ্যাত ধনী রামসুখলাল খুবানীর সহিত রাত্রে বিছানায় শুইয়াছিলেন। ঘরের জানালা খোলা ছিল। বাতায়ন-পথে একটি বিরাট সাপ প্রবেশ করে। প্রবেশ করিবামাত্র অন্ধকার ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠে। তাহার পর সাপটা মণিমালার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। রামসুখলাল তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিয়া পড়েন। মণিমালাকে জড়াইয়া সাপটা ক্রমাগত তাঁহার চোখে-মুখে ছোবল মারিতে থাকে। মণিমালা ধস্তাধস্তি করিতে থাকেন। রামসুখলাল তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া বন্দুক লইয়া আসেন। তিনি গুলিও চালান। তাহার পর সাপের মাথা হইতে ঠক্ করিয়া কি একটা মেঝেতে পড়িয়া যায়। পড়িয়া যাইবামাত্র ঘরটা আবার অন্ধকার হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া দেখা গেল ফেরারী আসামী কাঞ্চন সান্যাল রক্তাক্ত দেহে বিছানায় পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপর পড়িয়া আছে একটা মাটির ঢেলা।"

ব্যাপারটা রহস্যময় বলিয়া মনে হইতেছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

ফুল ও মানুষ

বিকাশ বন্ধ কপাটে আঘাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ। আলোর কপাট। কিন্তু যতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ আর একটা নাটক জমে উঠেছিল পাশের বারান্দায়। টবে ছিল রজনীগন্ধা গাছ। রজনীগন্ধা ফুটেছিল তাতে। রজনীগন্ধার কাছে গুনগুন করছিল একটি ভ্রমর।

"তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দর, তুমি অতীব সুন্দর। কিন্তু—"

ভ্রমরের দিকে সোৎসুক নীরব দৃষ্টিতে চাইল রজনীগন্ধা। দৃষ্টিতেই নীরব ভাষায় লেখা ছিল তার প্রশ্নটা—"কিন্তু কি—"

"তুমি যদি শাদা না হয়ে কমলের মতো গোলাপী হতে তাহলে আরও সুন্দর হতে তুমি। হতে অতুলনীয়া—"

"কিন্তু আমি যা তাছাড়া আর কিছু কি হতে পারি—"

"নিশ্চয়ই পারো। তুমি না পারো কি? তোমার আদেশের অপেক্ষায় স্বয়ং বিশ্বকর্মা উন্মুখ হয়ে আছেন। তুমি যা বলবে তাই তোমাকে ক'রে দেবেন তিনি। তুমি শুধু ইচ্ছা কর—আমার শাদা পাপড়ি গোলাপী হোক, তাহলেই হ'য়ে যাবে। করবে?—"

খানিকক্ষণ মৌন থেকে রজনীগন্ধা বলল—"করব। তুমি যখন বলছ করব।"

উড়ে গেল ভ্রমর।

রজনীগন্ধার মনে কিন্তু রেখে গেল একটি অনুক্ত বাণী—তোমার পাপড়ির রংয়ের চেয়ে কমলের পাপড়ির রং আমার বেশী ভালো লেগেছে।

আলোর কপাট খুলেছিল।

কপাট খুলেই বিকাশকে দেখে আলোকিত হয়ে উঠেছিল আলোর মুখ।

"বিকাশ তুমি এসেছ! আজ সকালে আসবার কথা ছিল, এলে না তো, কোথায় গিয়েছিলে—"

"তনিমার কাছে গিয়েছিলাম। তাদের টেনিস ক্লাবের আমি সেক্রেটারি। আজ সকালে মিটিং ছিল। এবারও তনিমাকে আমরা পাঠাচ্ছি—এবারও ও চ্যাম্পিয়ান হবে।"

"তনিমা মেয়েটি খুব স্মার্ট না?"

"তা আর বলতে। অভিনয় করে কি চমৎকার। ওর বক্তৃতা কখনও শুনেছ?"

"না—"

"ওয়াণ্ডারফুল।"

আলোর মুখে ছায়া নেমে এল।

কিন্তু বলল না সে কিছু।

"তুমি কিন্তু বড্ড সেকেলে, নয়?"

"আমি যা, আমি তাই।"

"কিন্তু ইচ্ছে করলে তুমি তো নিজেকে বদলাতে পার। তোমার যা সুন্দর ফিগার, তুমি যদি স্পোর্টসে নামতে হৈ হৈ পড়ে যেত চতুর্দিকে। কিছুই শক্ত নয়। একটু প্র্যাক্‌টিস করলে গান, বক্তৃতা সবই করতে পার—"

"পারি?"

"নিশ্চয়ই পার।"

"পারলে তুমি খুশী হবে?"

"নিশ্চয়।"

ভ্রমর আবার ফিরে এসেছিল রজনীগন্ধার কাছে।

রজনীগন্ধা কিন্তু কমল হতে পারেনি।

চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

ভ্রমর দেখল সে শুকিয়ে গেছে।

তাকে ডাকল—বারবার ডাকল—কিন্তু আর সাড়া পেল না।

আলো কিন্তু পেরেছিল।

হয়েছিল সে নামজাদা খেলোয়াড়, নামজাদা নায়িকা, নামজাদা বক্তা। তার ছবি ছাপা হয়েছিল নানা কাগজে। তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা করেছিল মুগ্ধ জনতা।

বিকাশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার।

কিন্তু বিকাশ তাকে পেয়েও পায়নি। তার মনে হয়েছিল—যে আলোকে সে ভালবেসেছিল সে আলো নিভে গেছে, বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে।



বনফুল

রচনাবলী ১৯